জয়ন্তী-মৌচাক



শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
সঙ্কলিত



এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীসুপ্রিয় সরকার
১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা আট [illegible]

মুদ্রাকর—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

সূচনা

পঁচিশ বছরের মৌচাকের সুমধুর স্মৃতি বাংলার ছেলেমেয়েদের মনে জাগিয়ে রাখবার জন্যে "জয়ন্তী-মৌচাক" বার করছি। পঁচিশ বছরের মৌচাক থেকে আহরণ করে "জয়ন্তী-মৌচাক" শিশু-মহলে মধু পরিবেষণ করতে এসেছে। সব জিনিষের মত এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরে বাংলা দেশে নানা দিকে নানা বিষয়ে পরিবর্ত্তন ঘটেছে। বাংলার শিশু সাহিত্যের রূপও বদলে গিয়েছে। এই পঁচিশ বছরে বাংলার শিশু-সাহিত্য যে রূপ নিয়েছে তারই ছবি "জয়ন্তী-মৌচাকে" প্রতিফলিত হয়েছে ; তাই "জয়ন্তী-মৌচাক" সামান্য একখানা বই হিসাবে দেখ্‌লে এর প্রকৃত বিচার করা হবে না।

"জয়ন্তী-মৌচাকে"র খোপে খোপে যে মধু সঞ্চিত হয়েছে তা বাংলার শিশু সাহিত্যেরই মধু।

সম্পাদক হিসাবে সকলের কাছে আমার ঋণের বোঝা এত বড় ও ভারী যে তার বিবরণ দিলে একটা ছোট পুঁথি হয়ে যায়। সেই জন্যে সে প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকলাম। প্রত্যেক লেখক, বন্ধু, উৎসাহদাতা ও সহায়ককে এবং মৌচাকের অসংখ্য পাঠক-পাঠিকাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে এই ক্ষুদ্র সূচনা শেষ করছি।

কলিকাতা
১৩৫১

সুধীরচন্দ্র সরকার

পত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
নববর্ষ			১—৫
কবিতা			৬—২০
মৌচাক	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৬
শিল্	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৬
লাজের কাহিনী	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৭
উঃ !	কিরণধন চট্টোপাধ্যায়	...	৭
ঠিকানা	জসীমউদ্‌দীন	...	৮
প্রলাপ	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	৮
খুকুর পাঠশালা	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	৯
প্রজাপতি	বুদ্ধদেব বসু	...	৯
বাঘে মানুষে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৯
মুকুল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০
নীলমণি-মাষ্টার	হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	১০
কাঁচা সোনার রোদ	শিবরাম চক্রবর্ত্তী	...	১১
শীতের ফুল	প্রিয়ম্বদা দেবী	...	১১
ইউরোপের চিঠি	অন্নদাশঙ্কর রায়	..	১২
লিমেরিক	অন্নদাশঙ্কর রায়	...	১২
পুতুল	জসীমউদ্‌দীন	...	১৩
সারা দিন রাত	হেমচন্দ্র বাগচী	...	১৩
শালবনে	হেমচন্দ্র বাগচী	...	১৪
বক্‌সিং	সুধীর খাস্তগীর	...	১৪
দূর-যাত্রী	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	১৪
ভাল চাক্‌রী	প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৫
ফরমাস	প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৫
বিপন্ন	প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৬
ঘুমতি দেশের গান	রাধারাণী দেবী	...	১৭
চল্‌ব আমি হাল্‌কা চালে	কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম	...	১৭
সাঁওতাল বুড়ো	গিরীন্দ্রশেখর বসু	...	১৮
চাঁদের দেশে	সুনির্ম্মল বসু	...	১৮
বুড়ো শীতকাল	নরেন্দ্র দেব	...	১৯
শীতের সকাল	সুনির্ম্মল বসু	...	২০

বিষয়			পৃষ্ঠা
গল্প			২১—১০০
কাজের লোক	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	২১
আলোয় কালোয়	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৪
ঘুঁড়ির স্থতো	মণীন্দ্রলাল বসু	...	২৪
পারম্পর্য্য	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	২৬
কাঁচায় পাকায়	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৭
হাতী রম্‌জান	"জগন্নাথ পণ্ডিত"	...	২৮
কঙ্কাল-সারথী	হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৩৩
হরতনের গোলাম	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	৩৭
প্রাইজ	বুদ্ধদেব বসু	...	৪৩
আয় আয় চাঁদামামা	প্রেমাঙ্কুর আতর্থী	...	৪৫
'কলিকাতার গলিতে'	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	৪৯
চণ্ডিচরণের গান	মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫২
ছাগ-চরিত	অন্নদাশঙ্কর রায়	...	৫৪
চালিয়াৎ চন্দর	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	৫৭
চন্দর	প্রবোধকুমার সান্যাল	...	৫৯
গঙ্গাধরের বিপদ	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৬১
কচুরি-পানা	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	৬৪
কর্ত্তার বাড়ীর যাত্রা	মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	৬৬
শতফুটি-সহস্রফুটি দাদাঠাকুর	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	...	৬৮
তিন মূর্ত্তি	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	৭০
লালু	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৭২
নকুড়বাবুর অনিদ্রাদুর!	শিবরাম চক্রবর্ত্তী	...	৭৪
গানের গুঁতো	বিমল দত্ত	...	৭৭
এ্যাটাচি কেস	কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	...	৭৯
বুনো	বিশু মুখোপাধ্যায়	...	৮৪
লোভী ভ্রমর	ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়	...	৮৯
সারণ দেব	গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু	...	৯১
সত্যব্রতর মিথ্যাব্রত	সুনির্ম্মল বসু	...	৯৩
লাল কম্বল	ধীরেন্দ্রলাল ধর	...	৯৫
চন্দনপুরে	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	...	৯৮
ভ্রমণ কাহিনী			১০১—১১৩
অক্সফোর্ডের চিঠি	হুমায়ুন কবীর	...	১০১
ইউরোপের চিঠি	অন্নদাশঙ্কর রায়	...	১০৩
তুষারিকা	ভবানী ভট্টাচার্য্য	...	১০৬
কাশ্মীরের কথা	সুধীরচন্দ্র সরকার	...	১০৭

বিষয়			পৃষ্ঠা
সুন্দর সুইজারল্যাণ্ড	মণীন্দ্রলাল বসু	...	১০৯
চিতোর গড়	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	১১১
প্রবন্ধ			১১৪—১৩০
আমার ভারতবর্ষ অমর	বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত	...	১১৪
নিষ্কৃতি	পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু	...	১১৫
আমেরিকায় বাঙ্গালী লেখক	সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১১৭
শিকার ও শিকারী	প্রবোধকুমার সান্যাল	...	১২০
ছোট্ট একটি ছেলের কথা	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	...	১২৩
গ্রামের ছড়া	জসীমউদ্‌দীন	...	১২৫
বাপের কি মনে থাকে—		...	১২৭
আমি যদি রাজা হইতাম	মানসী চক্রবর্ত্তী	...	১২৮
চোখের ধাঁধা	ক্ষেত্রনাথ রায়	...	১৩০
সাধারণ-জ্ঞান			১৩১—১৩৯
কোনটা সত্যি	...	...	১৩৮
কোনটা ঠিক	...	...	১৩৯
গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা	...	...	১৪০—১৪৪
ধাঁধা	...	...	১৪৫—১৫০
শুভ কামনায়	...	...	১৫১—১৬১
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	...	...	১৫১
পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু	...	...	১৫১
বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত	...	...	১৫১
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	...	১৫১
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	...	১৫২
কালিদাস নাগ	...	...	১৫২
স্যার সি. ভি. রমণ	...	...	১৫৩
অন্নদাশঙ্কর রায়	...	...	১৫৩
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	১৫৩
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী	...	...	১৫৪
বুদ্ধদেব বসু	...	...	১৫৪
সুনির্ম্মল বসু	...	...	১৫৬
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	...	১৫৭
হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	...	১৫৮
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	...	১৬০
উমা দেবী	...	...	১৬০
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	...	...	১৬১
মধুচক্র	ইন্দিরা দেবী	...	১৬২—১৬৪

শরতের আনন্দ

—শ্রীসমর দে

জয়ন্তী-মৌচাক



(১)

দিগ্বিজয়ীর অতর্কিত নগর প্রবেশের মত, আবার বৈশাখ আসিয়াছে, আকাশে ঝড়ের নিশান উড়াইয়া, পথে প্রান্তরে ঘূর্ণী জাগাইয়া।

যাহা কিছু শুষ্ক, যাহা কিছু জীর্ণ, চৈত্রের বাতাসে তাহা ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে।

ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে, যাহা-কিছু গত দিনের, যাহা-কিছু গত বর্ষের।

পরিবর্ত্তে আসিয়াছে আকণ্ঠ রৌদ্র-পানে পরিপুষ্ট পত্র, নব-মঞ্জরীর মধুমান্ তপ্ত জীবন্ত সুবাস, পরিপক্কতার পরিপূর্ণ আশ্বাস।

জীবনে জাগুক সেই রৌদ্রতপ্ত সজীবতা, মন থেকে মনে ছড়াইয়া পড়ুক সেই তপ্ত মধুর মধ্যাহ্ন সুবাস; আজ নববর্ষে ঘরে ঘরে বৈশাখী ঝঞ্ঝায় ধ্বনিয়া উঠুক পরিপক্কতার সেই পরিপূর্ণ আশ্বাস!

আজ ঋতু বৈশাখ, দেবতা রুদ্র, রৌদ্র তাহার আশীর্ব্বাদ!

গতবর্ষে শুষ্ক বৃক্ষ হইতে যে পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, যে কুসুম কোরকে নষ্ট হইয়াছে, যে ফুল ফলে পরিণত হয় নাই, বৈশাখের আশীর্ব্বাদে অরণ্যাণী তাহার জন্য খেদ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। সময় নাই, পিছনের দিকে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার সময় নাই—পৃথিবীর চাই নূতন ফুল, পৃথিবীর চাই নূতন ফল। বৈশাখ তাহারই আয়োজনে ব্যস্ত।

আজ নববর্ষে জীবনে জাগুক সেই নব-আয়োজন।

যে পাঠ শেষ হয় নাই গত বর্ষে—তাহার জন্য নব-বর্ষে কোন খেদ নাই। নূতন পাঠ গ্রহণ করিবার আজই নবলগ্ন। আজ নব-মন্ত্রে গ্রহণ করো নব-বৈশাখের প্রভাত-রৌদ্রকে। জীবনে চলুক তাহারই আয়োজন। [বৈশাখ ১৩৪৩]

(২)

তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আগে, ঠিক এমনি দিনে, সেবারও পয়লা বোশেখে সে এসেছিল, হাতে ছিল তার এমনি আমের মঞ্জরী, কাণে দোলান ছিল জামরুলের সদ্য-ফোটা কুঁড়ির ঝুমকো, অঙ্গে এমনি জড়ান ছিল দুপুরের রোদের রূপালী ওড়না!

বেশ মনে পড়ে সেদিনের কথা।

সেই সে দাঁড়িয়ে আছে, কি অপরূপ তার গায়ের রঙ, যেন কচি আমে এই সবে হলুদ ধরেছে। কি তার দেহ সুরভি, কচি নেবু-পাতার ঘসা-গন্ধ তার দেহ থেকে এলিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। মুখে তার কি হাসি, কচি তাল-শাঁসের ভেতরকার জলটুকুর মত স্নিগ্ধ!

মনে-পড়ে সে বলেছিল, আমাকে তো চেন? আমি নববর্ষ! বল কি দেবে আমায় উপহার?

বলেছিলাম, বল তুমি কি চাও?

সে বলেছিল, আমি চাই, আবার যেদিন আসবো, তোমাকে এমনি যেন দেখতে পাই ফুলের মত সুন্দর, এমনি তাজা যেন থাকে তোমার মনের মধু! আর তুমি যা কিছু কর, তাতে আমার কোন দাবী নেই!

সাহস করে সেদিন তাকে আশ্বাস দিতে পারিনি। মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম, ওগো, যে দিয়েছে ফুলের বুকের মধু, আমার ও মনের মৌচাকে তেমনি ভাবে তুমি ভরে দাও মধু!

আজ আবার এসেছে সেই পয়লা বোশেখ। তেমনি ফুটেছে আমের মুকুল।

এখনি হয়ত সে আসবে!

সে কি দেখতে পাবে যা আশা করেছিল তিন শো

পঁয়ষট্টি দিন আগে? সে কি আমায় বলে দেবে, তেমনি তাজা আছে আমার মনের মধু?

ওগো নববর্ষ! যদি দেখ, তোমার ফুল গিয়েছে শুকিয়ে, যদি দেখ মধুহীন হয়ে গিয়েছে মন, তবু তুমি যেয়োনা ফিরে! তুমি আস, তাই সাধ থাকে ফুল ফোটাবার, মধু জোগাবার। ফুল না ফুটুক্‌, তবু তাই সাধ থাকে ফুল ফোটাবার! সে-ই জীবন!

[বৈশাখ ১৩৪৪]

(৩)

হে বৈশাখ, তুমি আবার এসেছ, বুকে নিয়ে আগুন-ফুলের মালা, আমি শিশু কিশলয়, সভয়ে তোমাকে প্রণাম করি। যদি দগ্ধ হই, তাতে দুঃখ নেই। তার আগে যেন আমি ফুটে উঠতে পারি। আমার মধ্যে আছে সেই তপস্যার জোর, যা দিয়ে তোমার আগুন হয়ে উঠবে মধু, তোমার নিঃশ্বাস হবে সুরভি।

হে বৈশাখ, তুমি আবার এসেছ, সঙ্গে নিয়ে উন্মাদ ঝড়ো হাওয়া, আমি আমের মঞ্জরী, সভয়ে তোমাকে প্রণাম করি। তোমার তাণ্ডব নাচে যদি ঝরে যায় সব ফল-হওয়ার আশা; এই মিনতি, বাঁচিয়ে রেখো শুধু একটী মঞ্জরীকে, যা থেকে ফলবে আবার ফল। আমি জানি সেই রসায়ন, যা দিয়ে, তোমার রোদকে গুঁড়িয়ে আমি আনবো পক্কতা, একটী সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা।

হে বৈশাখ, তুমি আবার এসেছ, বুকে নিয়ে বর্ষণ-হীন মেঘ, আমি ক্ষুদ্র তড়াগ, সভয়ে তোমাকে প্রণাম করি। আমি জানি, আমি যাব শূন্যে মিলিয়ে—আমার তীরে এসে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক কেঁদে ফিরে চলে যাবে বিমুখ হয়ে। তবুও আমি জানি, আমি আবার ফিরে আসবো, বন্ধন-হীন বর্ষা-ধারায়। বৈশাখে আমার তপস্যা, বর্ষায় আমার সিদ্ধি।

হে বৈশাখ, তুমি আবার এসেছ, বুকে নিয়ে পুণ্য-পাবন-শক্তি, আমি ধরণী, তোমাকে সভয়ে নয়, সাদরে বরণ করি। তোমার অগ্নি-তেজ যে শঙ্কা করে করুক, আমি জানি, তার মধ্যে আছে জীবন-মন্ত্র। তোমার জ্বলন্ত পাবকের স্পর্শে বর্ষে বর্ষে আমি, অগ্নি-স্পর্শ-পূতা সীতার মত হয়ে উঠি মহীয়সী।

[বৈশাখ ১৩৪৫]

(৪)

গত বছর ঠিক এমনি দিনে সে এসেছিল, এমনি বোশেখের প্রথম দিনের সকালবেলা।

একটা ছোট্ট কুঁড়ি।

বলেছিল, এমন সৌরভে আমি বিকশিত হব যে সারা বন আমার সুগন্ধে ভরা থাকবে!

আজ আবার এসেছে সেই বোশেখ মাসের প্রথম সকালবেলা।

একলা বসে তাকে খুঁজছি কোথায় গেল সে? কোথায় গেল তার সে সুরভি?

হঠাৎ শুনি মাটির বুক থেকে কে যেন কথা বলে উঠলো। কাণ পেতে শুনি, কে যেন বলছে,—আমি মাটি, তুমি যাকে খুঁজছো সে হারায় নি। আমার বুকে বীজ হয়ে সে লুকিয়ে আছে। গত বছর এমনি দিনে যাকে দেখেছিলে, আজ এই নতুন দিনে যদি তাকে খুঁজে না পাও, মনে করো না যে সে নেই, নতুন রূপ নিয়ে আসবে বলে আবার সে নতুন করে সাজছে।

... ...

হারায় না, কেউ হারায় না, কিছু হারায় না। বোশেখের প্রথম দিনের আলো ঝলমল এমন প্রভাতে কিছু হারায় না, হারাতে পারে না।

... ...

গত বছরে এমনি দিনে বলেছিলাম, আরও দু'পা এগিয়ে যাব এবার।

সবটুকু যেতে পারিনি। একলা তো পারতুম যেতে। আমার সঙ্গে যে ছিল, সে ছিল বড় পেছিয়ে, তাকে সঙ্গে না নিয়ে কি করে আমি একলা যাব এগিয়ে?

তবু তো থামি নি।

আজ তাই শুধু এইটুকু বলি, টিক্‌ টিক্‌ টিক্‌ করে, যে সময়ের নদী, নিরবধি চলেছে বছর থেকে বছরে, যুগ থেকে যুগান্তে, যেন পারি তারি মত চলতে। ঘড়ির মত নয়, সময়ের মত যেন পারি চলতে। নাই বা হলো সময়ের সঙ্গে কিন্তু যেন পারি সময়ের মত চলতে।

গত বছরে এমনি দিনে বলেছিলাম আরও দুটি মুখে ফোটাব হাসি, আরও দুটী প্রদীপে জ্বালবো আলো, আর কইবো শুধু একটী কথা সারা বছর ধরে, যার সুবাস থাকবে সবার মনে,—

আজ ভাবি, সে-কথা কি বলা হয় নি, জ্বলেনিকো সে প্রদীপ, ফোটেনি সে হাসি?

যদি নাই জ্বলে থাকে, যদি নাই ফুটে থাকে, জানি একদিন তা ফুটবে, একদিন আমার এই হাতে জ্বলবে সে প্রদীপ—

তারি জন্যে আমি আজ চৈত্রের শেষ রজনী জেগে বোশেখের প্রথম দিনকে বন্দনা করেছি।

আজ নয়, কাল নয়, একদিন যেন পারি একটী মুখেও হাসি ফোটাতে, একটি প্রদীপে আলো জ্বালাতে, একটি কথা রেখে যেতে, যার মধ্যে আমি থাকবো বেঁচে।

... ...

এমনি ভাবে ঘরে ঘরে জ্বলবে প্রদীপ, আমার হাতে

জ্বালানো তোমার হাতে জ্বালানো। ঘরে ঘরে জ্বলে উঠবে লক্ষ প্রদীপের আলো।

সেই আলোর দেয়ালী দেখতে ভগবান আবার আসবেন নেমে আমাদের ঘরে।

[বৈশাখ ১৩৪৬]

(৫)

এই বৈশাখে মৌচাক একুশ বছরে পড়লো।

যে দিন সে জন্মেছিল, সেদিন তোমাদের মধ্যে অনেকেই তোমরা জন্মাও নি।

তখন সবেমাত্র একটা মস্ত বড় ভূমিকম্প সমস্ত পৃথিবীর গোড়া নাড়া দিয়ে ঠাণ্ডা হয়েছে। এত বড় ভূমিকম্প পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও হয় নি। সে ভূমিকম্পের নাম হোলো মহাযুদ্ধ।

ভূমিকম্প হয়ে গেলে যেমন বাড়ী-ঘর-দোর চারিদিকে ভেঙ্গে চুরে পড়ে থাকে, তেমনি সেদিন সারা পৃথিবী ভেঙ্গে চুরে গিয়েছিল।

আশী লক্ষ লোক বন্দুক হাতে রণ-ক্ষেত্রে মারা যায়।

আর ছু'কোটী পঞ্চাশ লক্ষ লোক যুদ্ধের দরুণ মারা যায়।

একুনে তিন কোটী ত্রিশ লক্ষ এই যুদ্ধে প্রাণ দিতে বাধ্য হলো······

শুধু একটি জাতির রণ-পিপাসার জন্যে।

সেদিন যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল জার্ম্মানী, কিন্তু শেষকালে তাকে পরাজয় মানতে হলো। কিন্তু সেদিনকার সে পরাজয় সে ভোলেনি। তাই আজ আবার সে সমস্ত পৃথিবীকে নামিয়েছে রণ-ক্ষেত্রে।

সেই যুদ্ধ থেকে আর এই যুদ্ধের আরম্ভ পর্য্যন্ত একুশ বছর হয়ে গেল।

এই যে একুশ বছর, এ-রকম একুশ্ বছর পৃথিবীর ইতিহাসে আর আসে নি।

এই একুশ বছরে কামারের ছেলে হয়েছে মুসোলিনী।

মুচীর ছেলে হয়েছে হিট্‌লার।

চাষার ছেলে হয়েছে ষ্টালিন—

পথের মানুষ অর্জ্জন করেছে রাজার মুকুট······

রাজার মুকুট খসে পড়ে গিয়েছে পথের ধূলায়······

এই একুশ বছরে পনেরো জন রাজা হারিয়েছে রাজ-সিংহাসন আর মুকুট······

রাশিয়া হয়েছে সোভিয়েট রিপাবলিক, তুরস্ক হয়েছে ইস্তাম্বুল, পারস্য হয়েছে ইরাণ, মাঞ্চুরিয়া হয়েছে মাঞ্চুকুয়ো ·········পনেরোটী রাজ্যের গিয়েছে নাম বদলে······

এই একুশ বছরের মধ্যে জন্ম হয়েছে লীগ অফ্ নেশনস্ এর, ভারতে জন্মেছে নতুন আন্দোলন, জেগেছে নতুন মানুষ······

এই একুশ বছরে মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী হয়েছেন মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন হয়েছেন দেশবন্ধু, জাতীয় কংগ্রেস নিয়েছে রাজ্য শাসনের ভার—

এই একুশ বছরে ইংলণ্ড আরো কাছে এসেছে ভারতবর্ষের—

জল-পথ ছেড়ে আকাশ-পথে মানুষ আরম্ভ করেছে যাতায়াত—

পৃথিবী এসেছে ঘরের দরজায়, বেতারে···

এই একুশ বছর, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একুশ বছর আর হয় নি—

এমন বিচিত্র, এমন কোলাহলময়, এমন উত্থান-পতনে চির-বন্ধুর······

··· ··· ··· ···

আজ মৌচাক একুশ বছরে পড়ায়, সে-কথাই আজ বিশেষ করে মনে জাগছে। এই সমস্ত উত্থান-পতনের মধ্যে মৌচাক নিয়মিত ভাবে নিয়ে এসেছে তোমাদের কাছে তার আনন্দের সম্ভার।

মৌচাকের গর্ব্ব, আজ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় ছেলে-মেয়েদের কোন কাগজ, এই দীর্ঘ জীবনের সৌভাগ্য পায় নি।

এ গর্ব্ব, এ আনন্দ তোমাদেরই।

মৌচাকের আশা তোমরা যখন বড় হবে, তখন তোমরাও এমনি দেখবে, তোমাদের পরে তোমাদের ঘরে যারা এসেছে, তাদের হাতেও আসছে মৌচাক!

হয়ত তখন কাজের ভিড়ের মধ্যে মনে পড়বে···একদিন যখন তোমাদের বয়স কম ছিল, কাজের ছিল না ভিড়, বিকেল বেলা খোলা জানলার ধারে বসে মৌচাক পড়ছো ······কখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে; চোখেও পড়েনি···

মনে পড়বে সেই কিশোর কালের কথা!

তাই আজ এই নতুন বছরে মৌচাক কামনা করে, সে যেন এমনি থাকে বাংলার কিশোর-কিশোরীর নিত্য-সাথী!

[বৈশাখ ১৩৪৭]

(৬)

রাত্রির শেষের দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। শুনি, খুব কাছে, কোথায় যেন কে একজন শিশু কাঁদছে। ঘুম আর হলো না। তার কান্না লক্ষ্য করে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

নীরব নির্জন পথ। কোথাও আর কোন সাড়া শব্দ নেই। শুধু মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে, একটি শিশুর কান্না ···অতি কাতর কান্না···

মাথার ওপরে নীরবে চৈত্রের আকাশ, রাত্রির নীল থেকে ভোরের না-নীল না-কালো না-শাদায় পরিণত হচ্ছে, নীরবে চাঁদ পৃথিবীর দিকে ঝুলে কি যেন দেখছে···নীরবে

তারারা মিট মিট করছে···নিবু নিবু বাতি বুঝি এইবার যায় নিভে।···

তার মাঝে সেই কান্না লক্ষ্য করে আমি চলেছি... চলেছি, মানুষের ঘর-বাড়ী ছাড়িয়ে, তবুও শুনি সে কান্না। ...চলেছি, পাহাড়-নদী-সাগর পেরিয়ে,—তবু শুনি সেই কান্না···সব দেশ, সব নদী, সব পাহাড়ের সব শেষে, যেখানে পৃথিবী হবে সবে সুরু, তারি একটু দূরে দেখি, একটি ছোট্ট ছেলে, কাঁদতে কাঁদতে আমাদেরই পৃথিবীর দিকে আসছে···তারই সেই কান্না লক্ষ্য করে আমি চলে এসেছি আজ গিরি নদী সকলের শেষে এই না-দাগ-মাটীর দেশে···

তার কাছে আরো এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে শিশু?

কান্নায় ভরা দু'চোখ থেকে হাত নামিয়ে সে বল্লে, আমি নব-বর্ষ!

—কিন্তু এমনি করে কেন কাঁদছো তুমি?

—আমি হারিয়ে গিয়েছি···

—তোমার মা-বাবা, তাঁরা কোথায়?

—আমি জন্মেই দেখছি আমি একা···কেউ নেই আমার···তাই আমি কাঁদি···

—আমাদের পৃথিবী যে তোমার অপেক্ষা করছে... চোখের জল মুছে তুমি এসো আমাদের ঘরে···

—সেই জন্যেই তো এসেছি···যেখানে আমি ছিলাম··· সেখানে তারা আমায় বলেছিলো, পৃথিবীতে গেলে আমি শুনতে পাবো আমাকে বরণ করার জন্যে মানুষের ঘরে ঘরে শাঁখ বাজবে, দেখবো আমার জন্যে তারা নতুন ফুলের সব মালা গেঁথে রেখেছে··সেই সব শুনে তো আমি চলে এলাম···

—ভালই করেছ······

—কিন্তু কৈ, তোমাদের পৃথিবীতে কৈ বাজে শাঁখ···? কৈ, তোমাদের পৃথিবীতে ফুল··? কৈ, কে গাঁথে মালা? শাঁখ নেই, ফুল নেই, মালা নেই, আদর করে ডেকে নেবার কেউ নেই···এ আমি এলাম কেন?

—শাঁখ, মালা, ফুল সব আছে··হে নবজাত শিশু, তোমার মা-ও আছেন পৃথিবীতে তোমার অপেক্ষায়··· তুমি ভয় পেয়ো না···তুমি দুঃখ করো না···তুমি এসো আমাদের ঘরে···

—কিন্তু আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না···কিছু শুনতে পাচ্ছি না···শাঁখের বদলে শুনছি···পৃথিবী থেকে আসছে কি বিকট সব গর্জ্জন, যেন পাহাড় পড়ছে ভেঙে, ফুলের বদলে দেখছি··পৃথিবীর মাটীতে মুখ রেখে মরে পড়ে আছে মানুষের দল···চারিদিকে ধোঁয়া···কি বিকট ধোঁয়া...তার মাঝে কি করে খুঁজে পাব আমার মার মুখ···

—যে বিকট গর্জ্জন তুমি শুনছো, ভয় পেয়ো না, এখনি থেমে যাবে তা···তার পেছনে শুনবে, তেমনি বাজছে শাঁখ ...চারিদিকে মাটিতে মুখ রেখে দেখছো যে সব মানুষের মরা দেহ—তারি থেকে এখনি ফুটে উঠবে ফুল···এমন ফুল পৃথিবীতে আর কখনো ফোটেনি···এই যে দেখছো ধোঁয়া···এখনি হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে তা···তার আড়ালে দেখবে, মার সেই হাসি মুখ···তেমনি হাসিতে ভরা···

—কিন্তু কেমন করে বিশ্বাস করি তোমার কথা?

—এমনি আরো অনেকবার অনেক ধারাই হয়ে গিয়েছে ···তোমারই মতন আরো অনেক শিশু এমনি পৃথিবীর দ্বারে এসে দাঁড়িয়ে ভয়ে কেঁদেছে···ঢুকতে করেনি সাহস... এমনি ভাবে আশ্বাস দিয়ে আমি তাদের এনেছি ডেকে— তারা দেখে গিয়েছে—আমি বলিনি মিথ্যে।

—কিন্তু তুমি কে?

—ভয়হীন মনে, হে নবজাত শিশু, তুমি চলে এসো আমাদের এই পৃথিবীতে...আমি তোমাকে ডাকছি... আমি বৎসরের শেষ দিন···চৈত্রের শেষ রাত্রি···

[বৈশাখ ১৩৪৯]

(৭)

ভাগ্যিস আমিও পথ হারিয়ে ঘুরে মরছিলাম, তাই না তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল······

সে-ও পথ হারিয়ে ঘুরে মরছিল·· ···

মরা-নদীর বালুচরে দুজনে হলো দেখা······

জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি বুঝি পথ হারিয়েছ?

সে বল্লে, হাজার হাজার বছর ধরে এই পথে এসেছি, গিয়েছি, আজ প্রথম এই পথ হারালেম।

জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় যাবে?

সে বল্লে, বাংলা দেশে···আমার জন্যে তারা সবাই অপেক্ষা করে আছে···আমি গেলে তবে আমের বোল মুকুল হবে···মেঘে মেঘে ঘুমিয়ে আছে ঝড়ের দেশের ছেলে-মেয়েরা···আমি গিয়ে ডাকলে তবে তারা জাগবে···

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম, পরিচয়?

সে বল্লে, আমার নাম বৈশাখ, সেই আমার পরিচয়··· তুমি বলতে পার, কোন্ পথে যাব? চিরপরিচিত পথে আমি আজ গিয়েছি পথ হারিয়ে···

বল্লাম, এস আমার সঙ্গে! আমি তোমাকে বাংলা দেশে নিয়ে যাব, বুক ফুলিয়ে সকলের কাছে বলবো, তোমাদের বৈশাখ এবার পথ হারিয়ে যাচ্ছিল ফিরে, আমি তাকে নিয়ে এসেছি পথ দেখিয়ে···এসো বন্ধু, এস, আমার সঙ্গে···

কিছুদূর এসে সে বল্লে, আমি আর যাব না

জিজ্ঞাসা করি, কেন?

মুখ ভার করে সে বলে, তুমি ভাল লোক নও!

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি, কেন?

সে বলে, আমি পথ হারিয়ে গিয়েছি জেনে, তুমি আমাকে আরো বিপথে নিয়ে চলেছ···তোমার মতলব ভাল নয়!

আমি জিজ্ঞাসা করি, কি করে বুঝলে?

সে বলে, হাজার হাজার বছর যে-পথে আনাগোনা করেছি, সে পথ কি দেখলে আমি চিনতে পারি না? আমি যে-পথ দিয়ে আসি, সে-পথের দুধারে থাকে চৈতালী ফসল···তার বদলে এ কোন্ পথ দিয়ে তুমি নিয়ে চলেছ, এ যে দুধারে মানুষের কঙ্কাল···আমি যে-পথ দিয়ে যাই, তার দুধারে ফুটে থাকে অশোক পলাশের রক্ত প্রদীপ··· তার বদলে তুমি এই যে পথ দিয়ে নিয়ে চলেছ, এ-র দুধারে যে দেখছি···চাপ চাপ লাল লাল কি সব রয়েছে··· রক্ত-ফুল তো নয়···এ যে সদ্য রক্ত···রক্তে পা ভিজিয়ে আমি তো চলতে শিখিনি কোনদিন···তাই বলছি, আমি আর যাব না!

আমি হতাশ হয়ে বল্লাম, তুমি আমাকে যাই মনে কর না কেন, বাংলা দেশে যাবার তোমার এই মাত্র পথ··· এই পথ দিয়েই তোমাকে যেতে হবে এবার!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৈশাখ বলে, তোমাকে বিশ্বাস করতে পারলাম না···আমি যে-পথ দিয়ে বারে বারে এসেছি, দূর থেকে সে-পথে শুনেছি মানুষের গান···এ-পথে যতই এগিয়ে চলেছি, ততই শুনছি, কান্না আর কান্না···

আমি তাকে বুঝিয়ে বলি, এবার এই কান্নার পথেই তোমাকে আসতে হবে আমাদের দেশে···

শূন্য মাঠে ঘূর্ণী হাওয়া জাগিয়ে সে বলে, আমি রইলাম এবার এই পথের ধারেই বসে···

আমি হতাশ হয়ে বলি, কিন্তু তারা যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, যাকে আনতে তোমাকে পাঠালাম, সে কই?

সে বল্লে, তাদের বলো, তোমাদের বৈশাখ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে ফিরে!

সেই ব্যর্থ বৈশাখের বাণী নিয়ে এইবার এসেছি তোমাদের কাছে ফিরে···

বৈশাখ নেই···তার বদলে কাল-বৈশাখই এবার আমাদের ঋতুরাজ।

[বৈশাখ ১৩৫১]





মৌচাক

(১)

ঝর্‌ছেরে মৌচাকের মধু
গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ায় !
দাওয়ায় ব'সে ভাবিস্‌ কি আর
আয়রে তোরা বেরিয়ে আয় !

(২)

কোন্‌খানে চাক খুঁজ্‌তে হবে
কোন্‌ বাগানে কোন্‌ বনে,
তুড়ুক নেচে ফুড়ুক উড়ে
শালিক হ'ল চন্‌মনে !

(৩)

ভোম্‌রা চলে বন্‌বনিয়ে
হন্‌হনিয়ে আমরা যাই,
ঠিক্‌-তুপুরের আগুন হাওয়া
গন্‌গনিয়ে ছুট্‌ছে ভাই ।

(৪)

শুক্‌নো পাতার পাঁপর-ভাজা
পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যায় ;
জাম্‌রুলে ফুল ঝাম্‌রে পড়ে
আম্‌কলী-রঙ্‌ আম-পাতায়।

(৫)

হাওয়ার সাথে ছুট্‌ছি মেতে
রোদের তাতে মুখ্‌-রাঙা,
কঞ্চি হাতে খুঁজ্‌ছি কেবল
কোথায় মধু চাক্‌-ভাঙা ?

(৬)

মৌমাছি যা হাবিস্‌ করে
ফুলের ফুটোয় শুঁড় দিয়ে,
তাই নেবো ভাই, তাই নেবো আজ—
ফিরবো না তো গুড় নিয়ে !

(৭)

কুড়ুক-পাখীর কান জুড়োনো
আওয়াজ ধ'রে চল্‌ চলে,
কাঠ্‌বিড়ালীর পিছন-পিছন
ঘুরবো কাঁটার জঙ্গলে ।

(৮)

লিচুর পাতায় বগ্‌লী যেথায়
বানিয়েছে লাল-পিঁপ্‌ড়েরা
সেই বনে চল্‌ সেই গহনে
মৌমাছিদের সেই ডেরা !

(৯)

সর্‌ষে-ফুলের মৌ ঝাঁঝালো,—
পদ্মফুলের মৌ মিঠে,—
মৌচাকেরই লাখ্‌ কুঠ্‌রীর—
মধ্যে কে রয় কোন্‌ পিঠে ?

(১০)

দেখ্‌তে হবে চাখ্‌তে হবে,
চল্‌ ছুটে ভাই যাই সবে,—
মৌচাকে মৌমাছির পুঁজি
মন্‌ যে ভোলায় সৌরভে !

[বৈশাখ ১৩২৭]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শিল্

ঠিক দুক্কুর বেলা ঘুর্‌ঘুট্টি !
থই থই মেঘ কালো কুর্‌কুট্টি !
ইন্দ্রের কোচ্‌ম্যান্‌ গলা খাঁক্‌রায়,
ঐরাবতের পিঠে বেত হাঁক্‌রায় !
হুড়মুড় ধায় হাতী আস্‌মানেতে,
শুঁড়ে শুঁড়ে জড়াজড়ি আস্‌তে যেতে !
ঠিক্‌ দুক্কুর বেলা ভূতে মারে ঢিল !
ঢিল কয় ঢিল নয়, শিল্‌ ! শিল্‌ ! শিল্‌ !

টুক্‌টাক্ ঠুস্‌ঠাস্ চড়্ বড়াবড়্!
শিল পড়ে, মেঘ ডাকে কড়্ কড়া কড়্!
কাগ্-মারা গুল্‌তিতে ছুট্‌ছে গুলি!
কেউ কয় গুলি নয় আওটা পুলি!
কেউ কয় পারিজাত! ফুল্ ফেলছে!
কার্ত্তিক-গণেশেতে কড়ি খেল্‌ছে!
ঝাপ্‌টায় দরজায় আঁটা দায় খিল্!
ঘরে ঘরে কলরব, শিল্! শিল্! শিল্!

ক্রমে বাড়ে তোড়ে পড়ে ফটিক-ফুলি,
কঁড়ো-মড়ো রব যেন উড়ের বুলি!
ভ'রে যায় মুখ চোখ জলের ধূলোয়,
দানাদার শিল ঝাড়ে সাতশো কুলোয়!
হাঁস্ ফাঁস্ ঝড়ে গাছ খায় হিম্‌শিম,
মিশ্‌মিশে মেঘ পাড়ে ফুট্-ফুটে ডিম্!
ডিম খেয়ে দাড়ি ঝাড়ে মিঞা হাল্‌ফিল্,
খিল্ খিল্ হাসে বিবি খিল্! খিল্! খিল্!

ভৃঙ্গী ভূতের রাজা বাজায় শিঙে,
"শিলের প্লাবন হ'ল দার্জ্জিলিঙে।"
পর্ব্বত—আখ্‌রোট্ পেস্তার ডাঁই!
পাত্-বাদামের কুচি তাতে ঠাঁই ঠাঁই!
পথ ঘাট ধবধব্ ঢালা মার্ব্বেল!
সাগরের কূলে যেন ঝিনুক অঢেল্!
ধামা-জোড়া মোয়া বাঁধো জড়ো ক'রে শিল!
ঝর্ণার জলে শিল্ পিল্ পিল্ পিল্!

[ভাদ্র ১৩২৭] সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

লাজের কাহিনী

বিছানার সাথে মিশায়ে আছেন ফটিকচাঁদের মাতা
রোগে উপবাসে শীর্ণ শরীর চাম্‌ড়ায় হাড় গাঁথা।
কবিরাজ এসে নাড়ী টিপে কেসে শামুকের ডিবা ধরে
কহিল নস্যে মুড়ান গোঁফের অভাব পূরণ ক'রে,
লাজ ব্যবস্থা, ফটিকচন্দ্র, লাজ দিয়ো আজ মাকে।
বৈদ্যের বোল না বুঝে ফটিক, ফ্যাল্ ফ্যাল্ চেয়ে থাকে।
বলে কবিরাজ "খই হল লাজ, খই খেতে দেবে আজ
আর মধু সহ এই বড়ী"—বলে চলে গেল কবিরাজ।
খই কিনিবার পয়সা নাহিক ফটিকের প্রাণ ওড়ে
গঙ্গাজলের জালা হাৎড়ায় তুলসীর তলা খোঁড়ে;
খুঁড়িতে খুঁড়িতে তিনটি পয়সা পাইল ফটিকচাঁদ
কাদা মাখা কালো পয়সা-কটিতে ধরেনাক আহ্লাদ।
বাজারের দিকে চলিল ফটিক গলি ছেড়ে দ্রুত পায়
রাজপথে ভিড়! চলে পুরবাসী কার শোভাযাত্রায়?
তাড়াতাড়ি খই খরিদ করিয়া ফটিক ভিড়িল ভিড়ে
ঘোড়-সওয়ারের চাপনে যেথায় তাজা লোক হয় চিঁড়ে;
রাজার নায়েব হাতী চ'ড়ে আজ এই পথে নাকি যাবে
তাই এ জনতা, তামাসার লোভে কতজন খাবি খাবে।
ধ্বজা কত ওড়ে ময়দান জুড়ে সারি সারি কত তাঁবু
চাবুকের ঘায়ে কত না বাবুকে হ'তে হবে আজ কাবু;
খান্দানী যত খয়ের-খাঁ আসে গামছা ও গাড়ু হাতে
ভন্ ভন্ ক'রে আমোদ গিলিয়া ফেরে তাই সাথে সাথে।
সহসা নকীব ফুকারিল—"হের হুজুরের তাঞ্জাম"
পথ ছেয়ে গেল ঝাণ্ডা নিশান হাজারো সরঞ্জাম।
ঝল্‌মল্ করে, ঝক্‌মক্ করে, করে পথ গম্ গম্
বেণেগুলো দেয় গিনি, আসরফি ধ্বনি ওঠে ঝম্ ঝম্!
তমসুক-তাজ খেতাবী-রাজারা কাটা কান ঢেকে চুলে
রাজা-নায়েবের হাতীর গলায় নিজ হার দ্যায় খুলে।
ফটিকের মাথা দ্যাখাদেখি গেল বিগ্‌ড়িয়ে একেবারে
খইয়ের ঠোঙা সে ডালি দিল পথে সমারোহ-দেবতারে।
হাঁ হাঁ ক'রে এল সহর-কোটাল "কে রে তুই কে রে ছোঁড়া?
ঠোঙা ছুঁড়ে গায়ে নায়েবে তামাসা! লাগাও বিরাশী কোড়া!"
কোড়া খেয়ে গেল মূর্চ্ছা ফটিক, সংজ্ঞা ফিরিল যবে
সারা গায়ে ব্যথা, পথ সে আঁধার, ফিরে গেছে ঘরে সবে
উঠে ব'সে ক্লেশে বলে ম্লান হেসে "বলেছিল কবিরাজ
লাজ দিয়ো মাকে, সে দেওয়া হয়েছে, দিয়েছি পেয়েছি লাজ!"

[বৈশাখ ১৩৩০] সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

উঃ!

ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর—অগ্নির বৃষ্টি—
জ্বলে-পুড়ে গেল বুঝি ব্রহ্মার সৃষ্টি!
ওরে মেঘ জল ঢাল্, প্রাণ কর্ ঠাণ্ডা,
ফুটি-ফাটা দুনিয়াটা, গেল তার জান্‌টা!
আম খেয়ে কাজ নেই, ঘামে খাবি খাচ্ছি;
কাঁটালের কত রস খুব কসে পাচ্ছি!
রগ করে টিপ্-টিপ্, নাড়ী নেই নাড়ীতে;
সাধ হয় ডুবে থাকি কুল্পির হাঁড়িতে;—
পাড়ি দিই একদম্ লম্বা সিম্‌লে!
পয়সার খাঁকৃতি; টিকিট না কিনলে,
পথে ধরে করবে ইজ্জত নষ্ট?
নচেৎ কি সইতেম এতখানি কষ্ট?
ছেলে-বুড়ো কাৎরায়, সাঁতরায় ঘামেতে,
কী করবে আনারস-জামরুল-জামেতে?
হাড়-মাস ভেজে-ভেজে সাঁৎলে তুল্লে
আগুনের হল্‌কায়, জানালা খুল্লে!
'বরফ' 'বরফ' কোরে প্রাণ-পাখী হাঁক্‌রায়,
তাই কি সুবিধে বাপু? পাঁচ-সিকে দাম চায়!
তদুপরি, কন্ কন্ ঝন্-ঝন্‌বন্ত
নড়ো-নড়ো পড়ো-পড়ো যে কয়টি দন্ত

ঝুঁকে আছে, খুলে যাবে ঠাণ্ডা লাগলে,
রেখেছি অনেক কোরে আগ্‌লে সাম্‌লে !
ফট্ ফট্ ঘোড়াগুলো রাস্তায় মরচে,
পাখীগুলো গাছে বসে ছট্ ফট্ করছে।
ধুঁকছে গরুগুলো বন্ধ গোয়ালে,
শুকিয়ে যায় জিভ আট্‌কে চোয়ালে ;
ঘর-দোর হল তেতে আগুনের খাপরা ;
জল লাগে বিস্বাদ গরমের ভাপ্‌রা ;
উঠচে তাই থেকে, বাপরে ! বাপরে !
পালিয়ে যাব কোথা ? কি ভীষণ তাপ্‌রে।
সান্‌চেনা সান্‌চেনা খস্‌খসে, ফ্যানেতে,
দেখিনি এমন তাত, কখ্‌খনো জ্ঞানেতে !
গল্ গল্ ঘাম ঝরে কখনো বা বিন্‌বিন্,
বন্‌-বন্ মাথা ঘোরে, ক্ষীণ নাড়ী হোলো ক্ষীণ !
আন্ বেল্ পানা কোরে ; মিছরির সরবৎ,
সন্দেশ-পানতুয়া লাগচে বিষবৎ !
দম্ গেল আটকে, হাঁস-ফাঁস্, হাঁস-ফাঁস !
কোথা ডাব, তরমুজ, কচি-কচি তাল-শাঁস !
দুধ-ঘি-রাব্‌ড়ি, ল্যাংড়া-বোম্বাই
চাইনা গো চাইনা, প্রাণ করে আই-ঢাই !
গায়ে-পিঠে বিঁধ্‌চে তপ্ত আল্‌পিন্ ;
ঘেমে ঘেমে দুর্ব্বল—গা-মাথা ঝিম্‌-ঝিম্ !
কি করি কোথা যাই বুঝি নাকো কিচ্ছু—
বাঁধা যেন হাত-পা—কামড়ায় বিচ্ছু !
থেকে থেকে ফোক্‌রাই—বাবারে উঃ !
কে যেন কানের পাশে হেসে বলে ফুঃ !

[আষাঢ় ১৩২৭] কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

ঠিকানা

ঠিকানাটা লিখে দিলুম ভাই-বোনেরা খবর নিও,
কেমন থাকে পুতুলগুলো লিখে আমায় পত্র দিও।
ঘুম-পাড়ানী মাসী পুতুল, সেই যে কেবল ঘুমিয়ে থাকে,
রাতের বেলা তোমাদের ভাই চোখে ঘুমের আঁজন আঁকে।
তাহার কথা জানিও মোরে, আর যে পুতুল চাঁদের পিসী,
—বুড়ো বটের মাসতুতো বোন, দাঁতে কেবল ডলছে মিসী।
এদের কথা লিখোই মোরে, দুঃ ছাই মোর কেবল যে ভুল ;
আকাশপুরীর রাজ-কন্যে আহার করেন দোপাটি ফুল।
রেশমী মেঘের চাদর গায়ে তারার মালা গলায় দোলে,
তবু তাহার মন উঠে না চাঁদের কুসুম ছিঁড়বে বলে ;
পাতালপুরীর রাজকন্যে নিদ্ মহলায় ঘুমিয়ে থাকে,
সীপাই-সেনা সব শুয়েছে কেউ না হাঁকে কেউ না ডাকে ;
নরম গরম বাতাস বহে, কখন আলো কখন আঁধার,
সেই নিরবের মধ্যে যেন থেকে থেকে কাটছে সাঁতার।
এ সব কথা চিঠির গায়ে লিখ্‌তে যদি হয় কভু ভুল ;
বলে রাখছি কাঁদব আমি ভাঙব মাথা ছিঁড়ব যে চুল।

তোমাদের যে ঘর সংসার, নানা কাজের হট্টগোলে,
পৈতে বিয়ে অন্নপ্রাসন এসব ধন্ধে সময় চলে।
তা হ'লে কি লক্ষ্মীরা সব মাঝে মাঝে খবর নিও ;
কেমন থাকে বিড়ালছানা আমায় লিখে পত্র দিও।
কুকুর-ছানা ঘুমায় রাতে, দুষ্টু ইন্দুর পালায় কোথা,
কবার কাঁদেন ব্যাঙের পিসী, লিখো আমায় সকল কথা।
তোমাদের ওই পেয়ারা গাছে কখন হবে ফুলের কুঁড়ি ;
দোলনা বেঁধে দুলবে যখন গায়ে তাকে মারবে ছুঁড়ি।
তোমাদের যে দু'ধাল গরু আর যে তাহার ছোট্ট বাছুর
সবার কথাই লিখো যেন, বাদ না রহে কোন কিছুর।
কি বলেছিলে ?—ঠিকানাটা ! এই রসো ভাই দিচ্ছি বলে
বাড়ী আমার গল্প দেশের কল্প-নদীর তটের কোলে।
সেখানে ভাই ছোট্ট খোকা, ঠ্যাং ভাঙিলে আরশুলাটার,
চোখের জলে বক্ষ ভাসায়,—ঘর বেঁধেছি কাঁদনে তার।
ঝড়ের শেষে পথের ধারে দেখে মরা পাখীর ছানা
যে খুকিটি কেঁদে আকুল সারাটা দিন খায়না খানা ;
জড়ি বড়ি ওষুধ বেঁটে চায় তাহারে বাঁচিয়ে দিতে
আমার ছোট আবাসখানি দেখতে পাবে সেখানটিতে।
সেখানে ভাই সুয্যি ওঠে, রাতে চাঁদের পিদীম জ্বলে,
দেখা সে সব যায় সে কেবল তোদের মত চক্ষু হ'লে।

[ভাদ্র ১৩৩১] জসীমউদ্দীন

প্রলাপ

কখ্‌খন বোলো নাক বোসদের বেচারে
টুক্‌টুকে ব্যাঙ্‌গুলো লাগে ভাল আচারে
জান নাকি বলে দিয়ে রামাটার হোল কি ?
শামলা মাথায় দিয়ে পরে শেষে নোলক-ই
গলা ধরে গেল তাই পেয়ে গেল রক্ষে
নইলে দেখতে জল বার হত চক্ষে।
একবার বেরুলে ত থামাতে হুকুম নেই,
লাইসেন্স আছে যার শুধু জানি পারে সেই।
লাইসেন্স পাওয়া সেও সোজা বড় কাজ নয়
দাড়ী যদি না থাকে ত শাড়ী পরে যেতে হয়
তাও শাড়ী পাবে কোথা বাজারে যে মাগ্‌গি
দরসা একটা পেলে জানবে যে ভাগ্যি।
এত বকা মিছে হল, যেন রেগো নাক ভাই
বোসদের বেচা বলে শুনেছি যে কেউ নাই
না থাকেত বয়ে গেল রামাটাত আছে ঠিক,
নইলে ঘড়িটা কেন মিছে করে টিক্ টিক্,
ফিরিওলা কেন রোজ রাস্তায় হেঁকে যায়
জল পড়ে পাতা নড়ে, কেন গরু ঘাস খায়।

আকাশেতে আলু তবে ছোঁড়ে নাক কেন লোক
রোদ না উঠলে পরে কেন কাটে নাক নখ ;
এসব প্রমাণ বাপু কোথা দিয়ে এড়াবে
তার চেয়ে বাসে চড়, বেহালায় বেড়াবে।
তর্ক ত সোজা নয় যদি চাও আঁটতে
এনসাই ক্লোপিডিয়া রোজ হবে ঘাঁটতে।

[শ্রাবণ, ১৩৩৭] শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

খুকুর পাঠশালা

দেখেছ কি পাঠশালা, খুকু যার মাষ্টার !
টালা থেকে টালিগঞ্জ, ভারি নাম ডাক তার।
পুষি, পুলো, বুধি পড়ে পড়বার সে কি ধুম
খুকুর ধমকে গোটা পাড়াটাই নিঝ্ঝুম্ !
পড়ুয়ারা যত পড়ে বেত পড়ে বেশী তার
কিল চড় চাপড়টা তাও পড়ে এস্তার ;
'চুপ চুপ' বলে খুকু সবাই খবরদার
গোলমাল করেছ কি খেতে হবে মার
পুষি তুমি আন দেখি পড়া
মিউ থেকে ম্যাও মিহি থেকে চড়া
কেঁউ কেঁউ ঘেউ ঘেউ সব
মুখস্ত চাই ভুলোটার।
খালি বুঝি উস্খুস্ মন
মতলব খালি পালাবার।
পড়াশুনা হবে তবে ছাই
বলবে সবাই জানোয়ার।
বুধি, তুমি একেবারে গরু
মাথায় শিংটা শুধু সরু
হাম্বা যে ইংরিজি নয়
তোমায় বোঝাব কত বার

[অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯] শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রজাপতি

প্রজাপতি, তুই কেন এত চঞ্চল ?
প্রজাপতি, তুই কেন এত সুন্দর ?
রোদে ঝলোমলা তোর দুটি ছোট পাখা
রামধনু-ভাঙা রঙের গুঁড়োয় মাখা,
রামধনু-রাঙা আলোর ঝলকে আঁকা।

আমি ছোট ছেলে, চুপ করে' চেয়ে থাকি,
তোকে দেখে-দেখে রঙে ভরে' যায় আঁখি
মোর চোখ, সে কি তোর মত সুন্দর ?
মোর চোখ, সে তো তোরি মত চঞ্চল।
চোখ যেতে চায় অনেক, অনেক দূরে
হাল্কা হাওয়ায় নতুন আকাশে উড়ে,
হাল্কা পাখায় মেঘে-মেঘে ঘুরে-ঘুরে।

কোথায় সে-দেশ, জানি নে তাহার নাম,
কত সে দূরের ? কেমন সে নিঃঝাম ?

প্রজাপতি, তুই মোর চেয়ে সুন্দর।
প্রজাপতি, তুই মোর মত চঞ্চল ?
পাখা কাঁপে তোর উছল আলোর নাচে,
তবু কেন তুই এত কাছে ? এত কাছে ?
দেখে আসিবি না, আকাশ-পারে কি আছে ?

আমার কেবল চেয়ে থাকা আর চাওয়া,
আমি ছোট ছেলে, বারণ বাইরে যাওয়া।

[ভাদ্র, ১৩৪০] শ্রীবুদ্ধদেব বসু

বাঘে মানুষে

সুঁদর বনের কেঁদো বাঘ,
সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ
যথাকালে ভোজনের কম হলে ওজনের
হোতো তার ঘোরতর রাগ।
একদিন ডাক দিল গাঁ গাঁ,
বলে, "তোর গিন্নিকে জাগা।
শোন্ বটুরাম ন্যাড়া পাঁচ জোড়া চাই ভ্যাড়া,
এখনি ভোজের পাত লাগা।"
বটু বলে, "এ কেমন কথা,
শিখেচ কি এই ভদ্রতা।
এত রাতে হাঁকাহাঁকি ভালো না, জানোনা তা কি,
আদরের এ যে অন্যথা।

মোর ঘর নেহাৎ জঘন্য,
মহাপশু, হেথায় কি জন্য !
ঘরেতে বাঘিনী মাসি পথ চেয়ে উপবাসী
তুমি খেলে মুখে দেবে অন্ন।
সেথা আছে গোসাপের ঠ্যাং।
অদ্ভুত ভাজা কোলা ব্যাং।
আছে বাসি খরগোষ, গন্ধে পাইবে তোষ,
চলে যাও নেচে ড্যাং ড্যাং।

নইলে কাগজে প্যারাগ্রাফ
রটিবে, ঘটিবে পরিতাপ।"
বাঘ বলে, "রামো রামো, বাক্যবাগীশ থামো
বকুনির চোটে ধরে হাঁপ।

তুমি ন্যাড়া, আস্ত পাগল,
বেরোও তো, খোলো তো আগল।
ভালো যদি চাও তবে আমারে দেখাতে হবে
কোন ঘরে পুষেচ ছাগল।"

বটু কহে, "একী অকরণ,
ধরি তব চতুশ্চরণ,
জীব-বধ মহাপাপ, তারো বেশী লাগে শাপ
পরধন করিলে হরণ।"
বাঘ শুনে বলে "হরি হরি,
না খেয়ে আমিই যদি মরি,
জীবেরই নিধন তাহা; সহমরণেতে আহা
মরিবে যে বাঘী সুন্দরী।

অতএব ছাগলটা চাই,
না হলে তুমিই আছ ভাই।"
এত বলি তোলে থাবা, বটুরাম বলে, "বাবা,
চলো ছাগলেরই ঘরে যাই।"
দ্বার খুলে বলে, "পড়ো ঢুকে,
ছাগল চিবিয়ে খাও সুখে।"
বাঘ সে ঢুকিল যেই দ্বিতীয় কথা
বাহিরে শিকল দিল রুখে।

বাঘ বলে "এতো বোঝা ভার,
তামাসার এ নহে আকার।
পাঁঠার দেখিনে টিকি, ল্যাজের শিকির শিকি
নেই তো, শুনি নে ভ্যাভাকার।
ওরে সিংসুক সয়তান,
জীবের বধিতে চাস্ প্রাণ!
ওরে ক্রুর, পেলে তোরে থাবায় চাপিয়া ধরে
রক্ত শুষিয়া করি পান!

ঘরটাও ভীষণ ময়লা।"
বটু বলে, "মহেশ গয়লা
ও ঘরে থাকিত,—আজ থাকে তোর যমরাজ
আর থাকে পাথুরে কয়লা।"
গোঁফ ফুলে ওঠে যেন ঝাঁটা,
বাঘ বলে, "গেল কোথা পাঁঠা!"
বটুরাম বলে নেচে, "এই পেটে তলিয়েচে,
খুঁজিলে পাবে না সারা গাঁ-টা॥"

[শ্রাবণ, ১৩৪০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুকুল

মাধবী যায় যবে চলিয়া
বাতাসে শেষ কথা বলিয়া,
কেহ না পারে তারে ধরিতে,-
দাহন দানবের আকারে
যখন হানে বন-শাখারে
দাগিয়া পীতরেখা হরিতে,—
নিঠুর তপনের তাপরে
যখন পবনের কাঁপনে
বকুল ঝরি' পড়ে ত্বরিতে,
তখন বলো কোন্ সাহসে
কে ভোলে আকাশের দাহ সে,
কে ছোটে বাঁচিতে কি মরিতে?
কে চলে বাধাহীন চরণে
নবীন রসে রূপে বরণে
তাপিতে ভুবনেরে বরিতে?
মুকুল সুকুমার সে যে গো,
মাধুরীরসে দেহ মেজে গো
বনের কোল আসে ভরিতে॥

[১৩৩৪, বৈশাখ] রবীন্দ্রনাথ

নীলমণি-মাষ্টার

চেয়ারেতে ঢুল্‌চেই,
কাছা যাঁর ঝুল্‌চেই,
নন্ তিনি ডাক্তার,
তবু নাম-ডাক্ তাঁর—
—নীলমণি মাষ্টার!

ভূত-কালো মূর্ত্তিটি,
যায় উবে ফুর্ত্তিটি,
কুত্তাও রাস্তার,
বেত্ খেয়ে বশ তাঁর,
—নীলমণি মাষ্টার!

ঢ্যাঙা ঠিক তালগাছ,
ছোঁয়নাকো আঁশ-মাছ,
কট্‌কটে বক্তার,
দোক্তাতে সখ তাঁর,
—নীলমণি মাষ্টার!

মেজাজটি রুক্ষ হে,
স্থায় সুধু দুঃখ হে,
হাসি তাঁর চেষ্টার,
সিম্‌লেতে বাস তাঁর,
—নীলমণি মাষ্টার!

টিকি-রেখে চুল-ছাঁটা,
ট্যাড়া চোখ গোল ভাঁটা,
ছেলে পিটে রোজ্‌গার,
হাড়ে নেই মাস্ তাঁর,
—নীলমণি মাষ্টার!

বিচ্ছিরি দাড়ী-গোঁপ—
গোচ্ছার কাঁটা-ঝোপ!
'ড্যাম, ফ্যুল্ নচ্ছার'
কয় খালি মুখ তাঁর,
—নীলমণি মাষ্টার!

যেই ক্ষেপে ধম্‌কায়,
পিলে বাপ্, চমকায়,
কেঁদে নেই নিস্তার,
বাড়ে তাতে বিষ তাঁর,
—নীলমণি মাষ্টার!

ঘটাঘট্ গাঁট্টাতে,
চটাচট্ চাঁট্টাতে,
ঘাম ছোটে আত্মার,—
পাথরের হাত তাঁর,
—নীলমণি মাষ্টার!

ভুল হ'লে হিষ্ট্রীতে,
ধোঁয়া দেখি দৃষ্টিতে,
রুল তুলে হুঙ্কার,
ঘাড়ে চাপে খুন তাঁর,
—নীলমণি মাষ্টার!

ইস্কুলে রোজ যায়,
রোগ তাঁকে ভয় পায়,
চুপ খালি রোব্‌বার—
জারিজুরি, রোখ্ তাঁর,
—নীলমণি মাষ্টার!

[আষাঢ়, ১৩৩০] শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

কাঁচা সোণার রোদ!

কাঁচা সোণার রোদ!
ঐ এলরে বন্যা—ভেঙে গগন-অবরোধ!
আকাশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে,
মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে পড়ে,
গাছের মাথায় জড়িয়ে পড়ে
সোনালী পাড় খোদ!
কাঁচা সোণার রোদ!

কাঁচা সোণার রোদ!
আকাশ-থলে উজাড় হয়ে কার ঝরে সম্পদ!
যা ছিল রে চোখের কোণায়
ভোরের আলোর রূপোর বোনা—
হয়ে গেল সোনায় সোণা!
কুড়িয়ে নে নগদ!
কাঁচা সোণার রোদ!

কাঁচা সোণার রোদ!
মাটির দুর্গ-জয়ে নামে আলোক-সেনার ক্রোধ!
ফুলের কাছে অলি আনার,
অলির পাখায় গান জাগানোর,
ধুলার কুলায় ফুল-ফোটানোর—
আলোক-বোনার রোদ।
কাঁচা সোণার রোদ!

কাঁচা সোণার রোদ!
মার চুমু কি সূর্য্য পেল তাই অতো আমোদ?
আলোয় আলো মুখের হাসি
ছড়িয়ে পড়ে রাশি রাশি,
তাই বুঝি ও ভালোবাসি'
মায়ের চুমার শোধ—
কাঁচা সোণার রোদ!

কাঁচা সোণার রোদ—
তাই বুঝি তার ভাই বোনদের সেই চুমাটির বোধ
দেবার লাগি, মনের সুখে
ছড়ায় ধরায় সকৌতুকে
তোমার মুখে আমার মুখে
মার মতো দরদ—
কাঁচা সোণার রোদ।

[অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯] শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

শীতের ফুল

শীতের সকাল বেলা বসেনি ফুলের মেলা
বাগানের সবুজ দাওয়ায়।
পাণ্ডু গাঁদা দু-চারিটি সাদা কুন্দ বেচারীটি
কেঁপে মরে শীতের হাওয়ায়!

প্রজাপতি পথ ভোলা এসে দিয়ে যায় দোলা
সে কেবল উপহাস করা
মধু-মাছি হেলা করে চলে আন্‌পথ ধরে।
পাবে যেথা মধুর পসরা!

শীতের নরম আলো এদের বেসেছে ভালো
সারাদিন চেয়ে আছে মুখে
সাঁজের শীতল বায়, আদর করিয়া যায়
তুলে যেন নিতে চায় বুকে!

শিশিরের বিন্দু ঝরে ললাটে মুখের পরে
ব্যথী তারা সমবেদনায়,
দুখের দিনের ভাগী এবারে পূজার লাগি
সঁপিয়া দিয়াছে আপনায়!

তাই তারা পায় আলো নিশীথিনী বাসে ভালো
শিশির সরস করি রাখে।
প্রজাপতি হেসে চায় তাতে কিবা আসে যায়
দেবতার পথ চেয়ে থাকে!

[মাঘ, ১৩৩০] প্রিয়ম্বদা দেবী

ইউরোপের চিঠি

কী লিখি মৌচাকের তরে?
কী লিখি মৌচাকের তরে,
আষাঢ় মাসে গ্রীষ্ম আসে
বসন্ত যায় বন বাসে
সূর্য্য হেসে ঘুমিয়ে পড়ে
আমার মুখের হাসির পরে।

সূর্য্যলোকের ঘুম পাড়ানী
নীল আকাশের ঘুম পাড়ানী
আজ দুপুরে বাজায় দূরে
কোন গীতিকা কেমন সুরে
চোখের পাতায় বাজে বাণী
কাজ ভুলানী খেলু ভুলানী।

ট্রামের সাথে পাল্লা দিয়ে
বাস্ চলেছে ঝিম্ ঝিমিয়ে।
চল্‌তে যেন চায় না, হেন
গতিক ওদের হলো কেন?
চাকায় চাকায় ঘুম জড়িয়ে
থম্‌কে ওরা রয় দাঁড়িয়ে।

আইস্ ক্রীমের ঠেলা গাড়ী
ভীড় জমেছে কাছে তারি।
ক্রিকেট খেলা সারা বেলা
তেষ্টা পেলে বরফ গেলা
খেলায় জেতার চেষ্টা ভারি
লোক জমেছে সারি সারি।

বনের মাঝে পাতার ফাঁকে
হাজার পাখী বেজায় ডাকে
গাছের তলা থামাও চলা
ছায়ায় শুয়ে ছাড়ো গলা
ভ্যাঙাও ঐ কুকু—টাকে
ব্ল্যাক বার্ডকে স্প্যারো—টাকে।

প্রজাপতি গোটা দু'চার
হাতের কাছে উড়ছে ক'বার!
ধরতে চাও? জাল বিছাও
চট করে, ভাই, জাল গুটাও।
ধরলে? ধরে করবে কি আর
মুক্তি তারে দাও গো এবার।

ঘুমের ঘোর ঘনায় চোখে
এবার যাবো স্বপ্ন-লোকে!
ফুলের বাস চারি পাশ
মে-ফুলেরা ফেল্‌ছে শ্বাস
তাদের শ্বাস নাসায় ঢোকে
এখন আমি স্বপ্ন-লোকে।

[শ্রাবণ, ১৩৩৬] শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

লিমেরিক

(১)

এক যে ছিলেন বাবু
তাঁর ছিল এক তাঁবু।
তাঁবু নিয়ে সঙ্গে
বাবু গেলেন বঙ্গে
(সেথায় হলেন) ম্যালেরিয়ায় কাবু॥

(২)

এক যে ছিল মানুষ
নিত্য ওড়ায় ফানুষ।
অবশেষে একদিন
ব্যাপার হলো সঙ্গীন—
ফানুষ ওড়ায় মানুষ॥

(৩)

এক যে ছিল ছাগল
একেবারে পাগল।
আস্ত একটি টাকা
ফেল্লে খেয়ে একা—(তারপর)
কে খেলে সেই ছাগল?

(৪)

এক যে ছিল অসুর
রাবণ তার শ্বশুর।
দু বেলা তার বাবার
সামান্য জলখাবার
তিরিশ হাজার পশু॥

(৫)

একটি লোক ছিল তার নাম হরিশ
তাকে শুধালুম, তুই কি করিস?
বলে আমি মারি যত গণ্ডার
লুট করি বড় বড় ভাণ্ডার।
আমি বলি, তারপর কি করিস?

(৬)

একটি মেয়ে ছিল তার নাম মিনু
তার এক ভাই ছিল তার নাম চিনু।
আর তার পুতুল
তার নাম তুতুল
গুণে দেখ—এক, দুই, তিনু॥

(৭)

একটি ছেলে ছিল তার বাড়ী পাড়া গাঁয়
সাবান মাখেনা, খোস তার সারা গায়,
চিরেতা খায় না
ঘা ধুতে দেয় না
শেষকালে সেই ছেলে মারা যায়॥

[ফাল্গুন, ১৩৪৩] শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

পুতুল

পুতুল তুমি পুতুল ওগো! কাদের খেলা-ঘরের ছোটখুকু,
কাদের ঘরের ময়না পাখি। সোহাগ-করা
কাদের আদর টুকু।
কার আঁচলের মাণিক তুমি! কার চোখেতে কাজললতা হয়ে
এসেছ এই সোনার দেশে রামধনুকের রঙের হাসি লয়ে।
ভোর বেলাকার শিশির তুমি কে রেখেছে
শিউলী ফুলের পরে,
খোকা ভোরের হাসিখানি কে দেখেছে পদ্ম পাতায় ধ'রে।

পুতুল, তুমি! মাটির পুতুল, নানা জনের স্নেহের অত্যাচার
হাসিমুখে সইতে পার আপন-পরের তাই ধার না ধার।
তাইত তুমি পুতুল লয়ে সারাটা দিন খেলাও খেলাঘরে
তুমি পুতুল, তাইত পুতুল খেলার সাথী
তোমার স্নেহের তরে।
পুতুল! আমার সোনার পুতুল! আমি পুতুল হব
তোমার বরে,
তুমি হবে আমার পুতুল সারাটা দিন কাটবে আদর করে।
তোমায় আমি চাঁদ বলিব, জোছনা দিয়ে মুছিয়ে দিও মুখ,
তোমায় আমি ব'লব মানিক মালা হয়ে জুড়িয়ে দিও বুক।
তুমি আমার উদয় তারা হাতে পায়ে জলবে সোনার ফুল,
তুমি আমার রূপের-সাগর রূপকথা যার খুঁজে পায়না কূল।
আমি তোমার কি হ'ব ভাই? পুতুল!
আমার রাঙাপুতুল-খুকু,
ঘুম-পাড়ানী মাসী পিসীর ঘুমের দেশের ঘুম ঘুমনীটুকু।

* একটি ছোট্ট খুকীর নাম পুতুল।

[আষাঢ়, ১৩৪২] জসীমউদ্‌দীন

সারা দিন রাত

সারা দিন রাত যেথা ঝরিছে শিশির
উদাসী মাঠে,
পাখীদের গান বহি' শ্বসিছে সমীর
উদাসী মাঠে,
আলোর ঝরণা ঢালে পূর্ণিমার চাঁদ
যেথা রাত্রি বেলা,
যেথা যুঁইফুল ফোটে আর হাস্নুহানায়
বসায় মেলা,
সেখানে কি যাবে তুমি খোকনমণি
কবির সাথে,
সারা দিন রাত যেথা ঝরিছে শিশির
উদাসী মাঠে?
নীল আকাশের মাঝে তারার মতন
তোর চোখের তারা—
সন্ধ্যামণির রঙ্ তোমার ঠোঁটে
হাসিতে হারা।
ধূলিভরা ধরণীর পূর্ণিমা চাঁদ
তুমি খোকনমণি—
দু'খানি কোমল করে সাধ যায়
ঢেলে দিই সোনার খনি।
আকাশ জুড়িয়া তোর বাঁশী বাজে
শুনি আর দিবস কাটে।
আলোর ঝরণা ঢালে পূর্ণিমা চাঁদ
উদাসী মাঠে।

রৌদ্রের ঝিকিমিকি ভাসিছে যেথায়
নদীর জলে,
গাছের ছায়ার সাথে ছোট্ট তোমার ছায়া
কি কথা বলে?
ফুলে ফুলে কা'রা যেন নেমে আসে ধরি' হাত
রাত্রি বেলা।
পাখা ওড়ে গান গায় কোমল স্বরে
রাত্রি বেলা।
সারা দিন রাত তা'রা গান গায় নির্জ্জন
উদাসী মাঠে,
আকাশ জুড়িয়া তা'রা জ্যোৎস্নায় গান গায়
উদাসী মাঠে।

ধরিয়ো কবির হাত যদি সাধ যায় তোর
সেখানে যেতে।
হাস্নুহানায় যেথা মৌমাছি দিন রাত
উঠিছে মেতে।
ক্লান্ত যখন সব শ্রান্ত যখন
নয়ন ঢুলে,

রজনীগন্ধা যবে ধীরে ধীরে তা'র শ্বেত
পাপ্‌ড়ি খুলে—
সাম্‌নে পুঁথির পাতা খোলা প'ড়ে থাকে
আর রজনী কাটে,
ধরিয়ো কবির হাত যদি যেতে সাধ যায়
উদাসী মাঠে!

[ভাদ্র, ১৩৪২] শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

শালবনে

গিয়েছিনু সন্ধ্যায় শালবনে একেলা।
হু-হু ক'রে হাওয়া বয় নির্জ্জন—
কালো জল, ছোট নদী খঞ্জন—
নুড়িতে নুড়িতে চলে কি খেলা—
সন্ধ্যায় শালবনে একেলা!

পাতায় পাতায় ওঠে শব্দ
পাখী নাই লোক নাই—স্তব্ধ—
কাছে এসে বসো, শোনো সে সময়
কারা যেন ভেসে আসে—কথা কয়!
রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ গুঞ্জন—
কালোজল ছোট নদী খঞ্জন!

দিশাহারা জলধারা নুড়িতে
ছলছলি' যায় চলি' কোথা' গো!
যেন দু'টি বুড়ো আর বুড়ীতে
হাসে আর কথা কয় সেথা গো!
মনে মনে হাসি আর চেয়ে রই
শুনি কিবা ঝরণার কথা বই!

লোক নাই, পাখী নাই, পোকা নাই—
পাতায় পাতায় কারা হাসিছে,
মেঘ নাই, রোদ নাই, ছায়া নাই
ধূসর ধোঁয়াটে ধরা ভাসিছে
কালো পাথরের পরে সন্ধ্যায়
বসেছিনু শালবনে একেলা।

[আশ্বিন, ১৩৪৪] শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

বক্‌সিং

লাল সিং—নীল সিং
খেল্‌ছিল বক্‌সিং।

লাল বলে, নীল তোর
গায়ে বড় বেশী জোর!

নীল বলে, ধুত্তোর—
চালাকিটা জানি তোর,

ওই বলে খুশী ক'রে
ফাঁক তালে মার' ধরে

লাল বলে,—এই নাও—
এ ঘুষিটা সাম্‌লাও,—
ওকি ভাই কুপকাৎ—
একেধারে ধূলিস্যাৎ?

এক দুই তিন চার,
উঠে প'ড় এইবার—
পাঁচ ছয় সাত আট,
ওরে বাছা ষাট্ ষাট্
লাল কেন নাক তোর—
লেগেছে কি বড় জোর?

নয় দশ—থাম্‌লাম্
তোর কাছে জিত্‌লাম্।

হাতে হাত দাও ভাই
রাগ পুষে কাজ নাই!

[আশ্বিন, ১৩৪৮] সুধীর খাস্তগীর

দূর-যাত্রী

ঝড়ের হাওয়ায় মুখে এসে লাগে
ঢেউয়ের ছিটে,
মুখে এসে লাগে কণা-কণা ফেনা
নোন্‌তা-মিঠে।
উতল উছল উথ্‌লেছে জল
উড়ছে ঝড়;
আজ আমাদের নৌকায় ভাই
নাই নোঙর।
সার বেঁধে বসে' দাঁড় তুলে নিই
উড়াই পাল,
সমুখে মোদের কূল নাই, শুধু
আগামী কাল।

সাগর-পাখীরা এলানো ডানার
হানে ঝাপট,
সাহসে বিশাল স্ফীত আমাদের
বক্ষতট।
আলোর ইসারা নাই এতোটুকু,
না থাক্ তারা;
স্নায়ুতে-শিরায় শুধু যাত্রার
প্রখর সাড়া।
সার বেঁধে বসে' দাঁড় টানি মোরা
উড়াই পাল,
দুই চোখে আশা, দুই বাহু ভরা
বল বিশাল।

বেগে উজ্জ্বল ছুটছে এ জল
অহর্নিশ,
ভয় করি নাকো, আমরা নাবিক
ইউলিসিস্।
খুঁজি নাকো পার, বিশ্রামাগার,
খুঁজি না দিক্,
শুধু যাত্রার আনন্দে মোরা
জল-পথিক।
তার তরে মোরা পাড়ি মারি ভাই
উড়াই পাল,
ঠুঁটো হাত মেলে সহজে যাহার
নাই লাগাল।

তোমাদের তরে থাকুক নিঝুম
শ্যামল মাটি,
ঠাণ্ডা দাওয়ায় বিকেলে বিছানো
শীতল-পাটি।
বিছানায় থাক্ নরম চাদর,
চাঁদের ছিটে,
ছোট করে' রাখো নিজের পরিধি
কাঠে ও ইঁটে।
উত্তাল ঢেউয়ে পড়ি দিই মোরা
উড়াই পাল,
তোমাদের ঘিরে চারিদিকে থাক্
ঘন দেয়াল।

সার বেঁধে বসে' দাঁড় হেনে জল
করছি ঘোলা,
উপরে ঝড়ের নীচে সাগরের
নাগর দোলা।
জলতল হ'তে হাঙর কুমীর
মারছে ঘাই,
প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর সাথে
করি লড়াই।
সার বেঁধে বসে দাঁড় টানি মোরা,
উড়াই পাল,
ঢেউ-ভুজঙ্গ মারছে ছোবল,
ডাকে কোটাল।

জীবনের স্বাদ বুঝ্‌লুম ভাই
আমরা বরং,
জলতরঙ্গে বাজাই আমরা
জলতরঙ্।
দূর বিদেশের মাটির গন্ধ
লাগছে নাকে,
কোন্ আকাশের ধূসর তারাটি
মোদের ডাকে।

তা'রি সন্ধানে পাড়ি মারি মোরা
উড়াই পাল,
দাঁড় বেয়ে মোরা বাধা-নিষেধের
ভাঙি আড়াল।

[বৈশাখ, ১৩৪০] শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ভালো চাক্‌রী

পাঁজাদের রাজারাম গাঁজাখোর হাবাতে,
পাঁজাকোলা করে' হয় খাট থেকে নাবাতে।
তাই বলে বেল্লিক বে-হিসেবী নয় সে,
শেখেনিকো তেড়ি কাটা এতখানি বয়সে।
একালের ছেলেদের মত নয় বেয়াড়া,
চা-খেয়ে ও বিড়ি খেয়ে মেয়ে মেয়ে চেহারা।
সাঁঝে শুধু গাঁজা খায়, আর করে গল্প,
সকালে আফিম খেয়ে মাথা নাড়ে অল্প।
হাঁড়িতে পচাই খায়, তাড়ি খায় ভাঁড়েতে।
ভাং খেয়ে ডাংগুলি খেলে বসে' দাঁড়েতে।
গুলি খায় বার কত,—চরস ও চণ্ডু,
খায় সে হিসাব মত ;—কালিদাস কুণ্ডু
ম'রতে যে বসেছিল গোখ্‌রোর কামড়ে,—
ক'লকের গুণে তা'র বেঁচে গেছে না মরে'।
সেই থেকে রাজারাম কোনোখানে যায় না,
সাপে খাওয়া রুগী ছাখে আগে নিয়ে বায়না।
হুঁকো তা'র বাঁয়ে থাকে,—হাঁড়ি ভাঁড় ডাইনে,
সরকার দরকার—তিনটাকা মাইনে।
হাতে কাজ না থাকে তো পোড়ো নাকো গর্ত্তে,
যেয়োনা আগড়পাড়া ঘোড়া ভাড়া ক'রতে।
খোঁজ নিয়ো রোজ গিয়ে হাজারীর বাজারে,
তাজা খাজা কিনে দিয়ো রাজারাম পাঁজারে।
গাঁজা সাজা জানো যদি,—তুড়ি দিতে সমঝে,—
চাই কি প্রসাদ পাবে, —নাই কোনো ভ্রম যে।
চাই কি সে হাই তুলে ছাই দেবে ছড়িয়ে,—
খুসী হ'য়ে খাট থেকে পড়ে' যাবে গড়িয়ে।
ডাক্তার ডেকে রাখো,—দেরী হলে ঠ'কবে।
রাজারাম কোলে করে' 'খোকা' বলে বকবে।

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২] শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ফরমাস

হাবুল নাকি কাবুল যাবি ?
কাবুলীমটর ক্ষেতেই পাবি।

গাছে গাছে ঝুলছে মেওয়া,
অপেক্ষা যা পাড়িয়ে নেওয়া।

লক্ষ্মী হাবুল, আনতে তুলে।
মণ পঁচিশেক যাস্‌নে ভুলে।

পা'ড়তে গেলে ধ'রবে পুলিশ ?
তাও তো বটে, তুই যা 'ফুলিশ্' !

আচ্ছা তবে দু'মণ-খানিক
কিনেই আনিস লক্ষ্মী মাণিক !

বেশী না হোক বস্তা পিছু
হ'বেই হবে সস্তা কিছু।

আ'সতে যেতে খরচ যে খুব !
তা'র ওপরে তুই যা' বেকুব ;

কোথায় যে কে ঠকিয়ে নেবে,—
সেই থেকে তাই ম'রছি ভেবে।

কাজ কি হাবুল মজুর ডেকে ?
দু'মণ বোঝা কাবুল থেকে।

মাথায় ক'রেই আনলি না হয় ?
দাম দেওয়া চাই ? দেব যা হয়।

কি ঘোর কলি ? আগাম নিবি ?
বেঘোরে শেষ প্রাণটা দিবি ;—

আমি তখন প'ড়ব ফাঁকি ?
মনের কথা বুঝছি না কি ?

হ্যাঁরে হাবুল, এমনি ক'রে
ধনে প্রাণে মা'রবি মোরে ?

তুই যে আমার পাড়ার ছেলে,
নেহাৎ তোরে পাঠাই জেলে,—

কিম্বা করি খড়ম পেটা,—
ইচ্ছে তো নয় আমার সেটা।

আচ্ছা তবে, রইল কথাই,
নগদ নিবি, বেশতো রে, তাই।

মাস কাবারে শুধব তোরে
নগদ দু'টি পয়সা ক'রে।

দু'মণ মেওয়া আনিস তবে।
দু'চার আনার মধ্যে হ'বে।

কিন্তু বাপু জেনেই রাখো,
জোচ্চুরিটি চ'লবে নাকো।

জিনিষ যদি টাটকা না হয়,—
ভাঙ্‌লে ফেটে আটখানা হয়—

নিক্তিতে তা'র ওজন যদি
কম্‌তি পড়ে একটি রতি,—

দাম তবে তুই চাস্ তো, চামার
আস্ত তোরে রা'খব কি আর ?

আসিস্ তখন পাড়ার ভিতর,
দেখে নেব কেমন ইতর।

[মাঘ, ১৩৪৮] শ্রীপ্রভাতমোহন্ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপন্ন

রামমণি মোক্তার,—আহা কিবা শোক তা'র।
ট্রেনেতে হারিয়ে গেছে কৌটোটি দোক্তার।
বুড়ী তার গিন্নী মানিয়াছে সিন্নি,
পতির বিপদ দেখে' চড়ে' গেছে রোখ তা'র।
দু' ছটাক স'রষে পিষে নিয়ে জোরসে
মেখে নিল রামমণি স্ত্রীর পরামর্শে।
মাংসের ঝোল খেয়ে কাংস্যের পাত্রে
দশ সের নস্যের সেঁক নিল রাত্রে।

বন্ধুরা বলে "বাপু, চাও যদি বাঁচতে
চটি পরে চটপট চলে' যাও রাঁচিতে।
খাঁড়ি মুসুরের ডাল হাঁড়ি করে' খেয়ো না,
দাঁড়িপাল্লায় চড়ে' কারো বাড়ী যেয়ো না ;
সাড়ী পরে হেঁচো না ; দাড়ি নেড়ে নেচো না ;
কিনো না মটরশুঁটী, পুঁটীমাছ বেচো না।
এইরূপে চেপেচুপে থাকো দেখি মাস তিন,
ঠিক দেখো ফেটে যাবে কামিজের আস্তিন।"

কেউ বলে' "উঁহু, উঁহু, গেঁটে বাতে ধ'রবে ;
যদি বা বাঁচতে কিছু একেবারে ম'রবে।
তার চেয়ে কথা শোনো সোজা পথ বাৎলাই,
মোজা পরে' কিনে আনো তাজা দুটো কাৎলাই।
পিঁড়ে পেতে চিঁড়ে দিয়ো খাও তাই পুড়িয়ে ;
কাঁচপোকা পাঁচপোয়া দিয়ো তাতে গুড়িয়ে।
কাসি পেলে হাঁচবে, ঘুম পেলে নাচবে,
তিনমাস করে দেখো ঘরে বসে' বাঁচবে।"

কেউ বলে "শোনো কথা, চাও যদি রক্ষা,
দক্ষিণে চলে যাও নয় হবে যক্ষ্মা।
সাগরের ধারে থেকো হা-ঘরের তাঁবুতে ;
কোজাগরে কচি শাখ সাঁৎলিয়ে সাবুতে
মুনিয়ার টুপি করে' চুপি চুপি খাইও,
নীচু চোখে কিছু দিন পিছু হটে' যাইও।
ফণিমনসার কাঁটা বাটা খেও দুপুরে,
কাঁটা মেরো পাঁটা পেলে, চাঁটা মেরো কুকুরে।"

কেউ বলে "কাজ নেই অতদূর আগিয়ে ;
উত্তরে চলে যাও দক্ষিণে না গিয়ে।
কাৎ হয়ে দাঁত মেজো, হাত দিয়ে হাঁটুতে,
রাতকাণা মাছ ভেজো সাতখানা চাটুতে।
মিছামিছি কেঁদো নাকো, বেঁধে ফেলো বিছানা ;
শিলংএতে সব পাবে,—দুধ, মধু, ঘি, ছানা।
'উল্' দিয়ে ফুলকপি বেঁধে রেখো ভুঁড়িতে ;
সব দোষ কেটে যাবে দেখো তিন তুড়িতে।"

"সস্ত্যেন করো" বলে বাবা তার বৃদ্ধ।
শালী বলে "খেতে হ'বে সিমপাতা সিদ্ধ।"

থাকোরাম ডাক্তার, ইয়া বড় নাক তার ;
সে বলে, সারিয়ে দেবে, ভিজিট মেটাক তার।
নানা জনে মানা করে ঘুমাতে ও খাইতে।
শেষে হ'ল রামমণি গ্রামছাড়া তাইতে।
শালপাতে ডাল-ভাতে খেয়ে গেল 'শাল্‌খে'।
আলবাৎ বেঁচে আছে,—খুঁজে দেখো কালকে,

শ্রাবণ, ১৩৪১] শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুম্‌তি দেশের গান

"ঘুম্‌-ঘুম্‌-ঘুম্‌—ঘুম্‌, ঘুম্‌তি দেশের হাওয়া !"
নিত্যি সাঁঝে ধরার মাঝে তোমার আসা যাওয়া !
ঘুম-সাগরে ঘুমের দ্বীপে ঘুম্‌-ঝল্‌মল্‌ পুরী !
ঘুমরাজাদের ঘুম ভাঙাতে বাজ্‌ছে ঘুমের তুরী !
ঘুম-সভাতে ঘুম-সভাসদ ঘুমের কিরীট মাথে
ঘুমরাণী ঘুম-সিংহাসনে ঘুমের দণ্ড হাতে ;
ঘুমের বিচার করেন শুধুই ঘুম ঢুলুনির ঘোরে।
ঘুমের কুসুম ঘুমিয়ে ফোটে সন্ধ্যা-সকাল ভোরে !
ঘুম-সখীদের ঘুম-সেতারে ঘুম-গান হয় গাওয়া—
"—ঘুম্‌-ঘুম্‌-ঘুম্‌—ঘুম্‌, ঘুম্‌তি দেশের হাওয়া !"

"ঘুম্‌-ঘুম্‌-ঘুম্‌—ঘুম্‌, ঘুম্‌তি দেশের হাওয়া !"
ঘুম-তটিনীর ঘুমের স্রোতে সাঁতার কেটে নাওয়া !
ঘুমন্ত চাঁদ ঘুমিয়ে হাসে ঘুম আকাশের নীলে !
ঘুম ঝিঁঝিরা ঘুমগুঞ্জন গাইছে গলার মিলে !
ঘুম প্রদীপে ঘুমের আলো ঘুমায় ঘরের কোণে,
ঘুম-জোনাকী ঝিলিক্‌ মারে ঘুমের বেতস-বনে !
ঘুম-শিশুরা ঘুমের দোলায় ঘুমিয়ে হোলো সারা।
ঘুমকাতুরে-মায়ের ঘুমে জড়ায় চোখের তারা !
ঘুম অধরে ঘুমের সরস সুধার পরশ পাওয়া !
ঘুম্‌-ঘুম্‌-ঘুম্‌—ঘুম্‌, ঘুম্‌তি দেশের হাওয়া !

"ঘুম্‌-ঘুম্‌-ঘুম্‌—ঘুম্‌, ঘুম্‌তি দেশের হাওয়া !"
ঘুম-চিল্কায় ঘুম নৌকা ঘুম বৈঠায় বাওয়া ,
ঘুম-পুকুরে দিন-দুকুরে ঘুমের কমল ফোটে !
ঘুম-সুবাসে মাতাল অলি ঘুম-বাগানে ছোটে !
ঘুমের বশে প্রভাত পশে, দুপুর ঢোলে ঘুমে,
ঘুম আবেশে সন্ধ্যা আসে,—রাত্রি ঘুমের চুমে !
ঘুমের মাদল বাজায় বাদল শরৎ ঘুমের বাঁশী
ঘুমের মলয় বসন্তে ব'য় গ্রীষ্মে ঘুমের হাসি।
শূন্য ক্ষিতি, গল্প-গীতি, ঘুমের ঘোরে ছাওয়া,—
"ঘুম্‌-ঘুম্‌-ঘুম্‌—ঘুম, ঘুমতি দেশের হাওয়া !"

[পৌষ, ১৩৩৮] শ্রীরাধারাণী দেবী

চলব আমি হাল্‌কা চালে

চল্‌ব আমি হাল্‌কা চালে
পল্‌কা খেয়ায় হাওয়ার তালে,
কুসুম যেমন গন্ধ ঢালে
তরল সরল ছন্দে রে।
যেমন চলার ছন্দ লুটে
চন্দ্র ডোবে সূর্য্য উঠে,
সন্ধ্যা সকাল সমীর ছুটে
যেমন সে আনন্দে রে॥
নাই বা হলেম মস্ত ভারী
নাই হ'ল ঘর লাখ্‌ দুয়ারী
বিশটে ঘোড়া দশটা দ্বারী
ভিড় সে দেওয়ান গোমস্তার।
ভারিক্কি কি ! উঠ্‌তে গেলে
স্কন্ধে ক'রে তুলবে ঠেলে
মূর্ত্তি দেখেই ছুটবে ছেলে,
চাইনে সে ভার, নমস্কার॥
যে ভার বয়ে রাখাল ছেলে
মাঠে মাঠে বেড়ায় খেলে,
হাতের বেণু দেয় সে ফেলে
একটু যদি ভার ঠেকে।
ব'সে মাটির সিংহাসনে
মাঠের সপ্ত রাজ্য গোনে
দুন্দুভি তার বাজ্‌ছে শোনে
সাত সমুদ্দুর পার থেকে॥
এরোপ্লেন্‌ ঐ মোষ গোঙানো
ঢাউস যেন আকাশ-দানো
বিরাট বিপুল ভয় দেখানো
চাইনে হ'তে চাইনে ভাই।
হাল্‌কা পাখার পাল তুলে সে
মরাল ওড়ে আকাশ ঘেঁসে
পদ্ম যেন চল্‌ছে ভেসে,
অম্‌নি পাখায় উড়তে চাই॥
চাঁদের দেশের চরকা বুড়ী
কাটছে সুতো যাচ্ছে উড়ি,
তেম্‌নি উদাস গগন জুড়ি
চল্‌ব উড়ে হাল্‌কা বায়।
বুদ্‌বুদ-জল-বিম্ব যেমন
হাওয়ায় উড়ায় রাঙায় কিরণ,
স্বপন-পরীর যেমন উড়ন
তেমনি এ প্রাণ উড়তে চায়॥
মস্ত জাহাজ ব্যস্ত ভারি
সিন্ধু-ডাকাত জাল-পসারী
মীনের ভীতি ধ্বংস-চারী
চাইনে ভাই ঐ জল-শকুন।

ছন্দ দোদুল্ আমার তরী
—আমার তরী সলিল-পরী—
নাচবে ঢেউএর নূপুর পরি,
উজান-পানে টান্‌বে গুন ॥
আন্‌ব কাগজ আন্‌ব কেয়া
গড়ব আমার ঠুন্‌কো খেয়া,
অশথ পাতার ভেঁপুর দেয়া
বাজবে ঘন, হাঁক্‌বে জোর—
চাঁদ সদাগর আসছে ওরে
রত্ন মাণিক বোঝাই করে,
সপ্ত ডিঙা ফিরছে ঘরে
ফির্‌ছে বেউলো লখিন্দোর ॥
সাবমেরিনের মরণ-নীতি
ভরা ডুবি করছে নিতি,
কুমীর হ'তেও ভীষণ রীতি
ডুব দিয়ে সব খাচ্ছে জল!
আমি হব পান-কউড়ি
সঙ্গে সাথী মীন-গৌরী
ফিরব ঘু'রে জল-দেউড়ি
দেখব জলের শীতল তল ॥
ভাবছ বুঝি, বাঃ কি মজা,
রেলের গাড়ীর লাইন সোজা
লক্ষ লোকের বইছে বোঝা
ঝড়ীর সনে দিচ্ছে রেস্!
আমার ভরসা চরণ-নেয়ে,
মাঠের বাউল চল্‌ব ধেয়ে
পথের সকল ছেলে মেয়ে
চিন্‌বে আমায় জান্‌বে দেশ ॥
আবার পথে ফির্‌ব যবে
সবাই ঘিরে কুশল কবে,
সুদূর আমার নিকট হবে
সকল যে ঘর ইষ্টিশান!
বন্দর মোর সকল ঘাটে
গহন বনে ধানের মাঠে,
আমার সহজ ছন্দ-নাটে
বন্ধ সারা সৃষ্টিথান ॥
আমার রাখাল আমার চাষী
সবাই বলে—ভালবাসি।
বিদায় কালে বলি, "আসি!"
"যাই" এখানে বল্‌তে নাই!
আমার আলাপ জলে স্থলে
সহজ চলায় চোখের জলে,
লতা ছিঁড়ে কুসুম দ'লে
হয় যে আমায় চল্‌তে ভাই ॥

[আশ্বিন, ১৩৩৪] নজ্‌রুল ইস্‌লাম

সাঁওতাল বুড়ো

টিন্ টিন্ টুন্ টুন্ ঘণ্টা হাতে,
তীর, ধনুক, কুড়ুল সাথে,
সুতী কম্বল কাঁধে ঝোলে,
মিটু মিটু আলো লণ্ঠন দোলে
সাঁওতাল বুড়ো দোরে দোরে
শীতের রাতে পাহারা ঘোরে।
নীরব, নিথর, নিঝুম রাত
নড়ে না'ক গাছের পাত,
ডুবল চাঁদ পাহাড় পারে,
আঁধার ঘেরে চারি ধারে;
পাঁচিল ঘেঁসে সাঁওতাল বুড়ো
কাঁপছে শীতে জড় সড়;
ঘণ্টা নাহি বাজে আর
চোখে স্বপন ভাসে তার।
হঠাৎ কুকুর ঘেউ ঘেউ ডাকে,
এলো কি কেউ বেড়ার ফাঁকে?
চম্‌কে বুড়ো তুলল লণ্ঠন,
বাজল ঘণ্টা ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঠন্;
টিন্ টিন্ টুন্ টুন্ চলল বেজে,
পাহারা ফেরে দ্বিগুণ তেজে।
ঘুমের ঘোর আবার নামে,
টুন্ টুন্ টিন্ টিন্ ঘণ্টা থামে,
ধানের ক্ষেতে ঢুকল চোর,
দূরে হল্লা উঠল জোর;
আবার ঘণ্টা ঠন্ ঠন্ বাজে,
জাগিয়ে সবে ঘুমের মাঝে।
টিন্ টিন্ টুন্ টুন্ রাত্রি ভোর
সাঁওতাল বুড়ো তাড়ায় চোর।

[ফাল্গুন, ১৩৪২] শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

চাঁদের দেশে

চাঁদের দিকে চেয়ে খোকা ভাবে,
কেমন করে চাঁদের দেশে যাবে,
উদাস খোকা ভাবে।
ছায়া-পথের তারার দিকে চেয়ে
মন্ চলে যায় আলোর-সিঁড়ি বেয়ে।
তারার দিকে চেয়ে।
মা ডেকে ক'ন—খোকা, খোকা, খোকা,
—রাত্ দুপুরে জাগ্‌তে কি হয়, বোকা!
অবুঝ কেন খোকা।
খোকা শুধায়—বল্‌না আমায় মাগো
চাঁদের দেশে—পারব যেতে নাগো!
বল্‌না ওমা মাগো।

বল্‌না মাগো—কোথায় গেলে তবে
চাঁদে যাবার পথ্‌টি সোজা হবে।
কোথায় গেলে তবে!
অবাক্ খোকা বুদ্ধিতে না পেয়ে
রইলো শুধু চাঁদের দিকে চেয়ে।
বুদ্ধিটি না পেয়ে।
হঠাৎ খোকার নিটোল গালের পরে
চাঁদের সোহাগ জ্যোৎস্না হয়ে ঝরে।
নিটোল গালের পরে।
চুপে চুপে জ্যোৎস্না যেন বলে
তোমার কাছে আমিই এলাম চলে—
জ্যোৎস্না যেন বলে
এক্ষুণি আজ ঘুমের-পরশ দিয়ে
স্বপ্নে আমি তোমায় যাব দিয়ে
ঘুমের পরশ দিয়ে।
শীঘ্র এখন ঘুমিয়ে পড়, তবে
জেগে সেথায় যাওয়া কঠিন হবে
ঘুমিয়ে পড় তবে।
খোকার দু'টি ডাগর নয়ন বেয়ে
ধীরে ধীরে ঘুম্‌টি এলো ছেয়ে
নয়ন দু'টি বেয়ে

[চৈত্র, ১৩৩৪] শ্রীসুনির্ম্মল বসু

বুড়ো শীতকাল

পৌষালী দিন জুড়ে
ঝাপসা কুয়াশা ফুঁড়ে
চুপিসাড়ে এলো কুঁড়ে
বুড়ো শীতকাল!
ওরে, বুড়ো শীতকাল।

মাথায় রুক্ষ জটা
দাড়ী গোঁফ্‌ কটা কটা,
খড়ি ওঠা রং চটা
তোব্‌ড়া দু'গাল!
বুড়ো শীতকাল!

চোখ ছোট, নাক মোটা
কান পুরু, ঠোঁট ফাটা
হাতে পায়ে খাঁজ কাটা
ভাঁজ পড়া ছাল!
বুড়ো শীতকাল!

পরেছে টিবেটি-টুপি
চুড়োয় তুলোর থুপি
সর্দ্দি কাশির ফুঁপি
হাঁচির মশাল!
বুড়ো শীতকাল।

মোটা এক কম্বল
গোটা গায়ে সম্বল
তাই মুড়ে টলমল
দেড়ে চণ্ডাল!
বুড়ো শীতকাল।

জড় সড় হ'য়ে ব'সে
আগুন পোয়ায় ক'সে
বরফের দেশ চ'ষে
যেন সে নাকাল!
বুড়ো শীতকাল!

কাঁপে ঠায় সারা রাত,
এই বুঝি ছাড়ে ধাত,
হাঁপানী আবার বাত
সাত রোগ ঘাল,
বুড়ো শীতকাল।

শীতের সে যাতনাতে
শিশিরের আঁখিপাতে
ভিজে ওঠে রোজ রাতে
আকাশ পাতাল
বুড়ো শীতকাল!

কন্‌-কনে নিঃশ্বাসে
ঠাণ্ডা জলের পাশে
দাঁতে দাঁত লেগে আসে
নড়েনা চোয়াল!
বুড়ো শীতকাল!

হাই তোলে খুব ভোরে
হু হু হাওয়া উত্তোরে
কেঁপে মরে চেপে ধ'রে
লেপ কাঁথা শাল!
বুড়ো শীতকাল।

থেলো ডাবা হুঁকো হাতে
দা' কাটা তামাক তাতে
প্রাণপণে টেনে যাতে
বোনে ধোঁয়া জাল!
বুড়ো শীতকাল!

কাশে খালি খুক্-খুক্
লাগে ভাল রোদটুক্
বসে এসে ঠুক্ ঠুক্
বদিয়াতি চাল!
বুড়ো শীতকাল!

[মাঘ, ১৩৩২] শ্রীনরেন্দ্র দেব

শীতের সকাল

মাঠের ধারে
পুকুর পাড়ে,
কলার ঝাড়ে
কাঁপ্‌ছে হাওয়া।

যেই দিকে চাই
দেখ্‌তে যে পাই
চারদিকে ভাই
শিশির ছাওয়া,

ঠাণ্ডা বেজায়,—
কন্‌কনে বায়
বেদম কাঁপায়
শরীর খানি,

বাতাস ছোটে,
শীতের চোটে
শিউরে ওঠে
সকল প্রাণী।

পূব্‌ আকাশে
আলোক হাসে,
হিম্‌-বাতাসে
কাঁপ্‌ছে কারা ?

ঘর্‌টি জুড়ে'
চাদর মুড়ে'
ঘুম্‌-কাতুরে—
ঘুমায় তারা।

শীত এলোরে,
আজ্‌কে ভোরে
ঘুমের ঘোরে
থাক্‌বি নাকি ?

গাছের শাখে
পাতার ফাঁকে
কাতর-ডাকে
চড়ুই পাখী।

গাছের ডালে
ঘরের চালে
আজ্‌ সকালে
পড়্‌লো আলো।

আয়রে সবাই
বাইরেতে যাই
রোদ্‌টাকে ভাই
লাগ্‌ছে ভালো।

ভোরের আলো
ঝল্‌মলালো,
কী জম্‌কালো
ঝর্‌ছে হাসি !

হাস্‌ছে এবার
মল্লিকা ঝাড়,
গন্ধ তাহার
আস্‌ছে ভাসি'।

কাঁপন-ভরা
শীতের ধরা
আকুল-করা
আলোয় মাতে,—

শীতের ঊষায়
রোদ ঝরে' যায়,
আয়রে সেথায়
প্রাণ জুড়াতে।

[মাঘ, ১৩৪০] শ্রীসুনির্ম্মল বসু





কাজের লোক

কর্ত্তা জানেন, তিনি আছেন বোলেই সংসারের কাজ অমন গড়গড় কোরে চলে যাচ্ছে।—উনুনে হাঁড়ি চড়ছে, গয়লা দুধ দিচ্ছে, ধোবা কাপড় কাচছে, কলে জল আসছে, পেন্সিল কাটছে ছুরি, কাপড় সেলাই করছে ছুঁচ, দোয়াত যোগাচ্ছে কালি। বাড়িতে কর্ত্তা একমাত্র কাজের, নইলে যে কি হতো, তা কর্ত্তাই জানেন। আর গিন্নী জানেন, কর্ত্তা অকেজো, তিনিই সব। গিন্নীর দুই ছেলে জানে, বাড়ির কর্ত্তা-গিন্নী সবই তারা। হরে, মেধো—দুই চাকর জানে, তারা আছে, তাই কর্ত্তা-গিন্নী খেয়ে বাঁচছেন। রামী-দাসী, সে জানে, কাজ যা-কিছু সে-ই করে, আর সবাই নিষ্কর্ম্মা—কাজের কাজিনী কেবল এই রামী।

রাতের বেলায় সেদিন আর্টষ্টুডিও থেকে মস্ত কাঁচে বাঁধানো কর্ত্তা, গিন্নী, দুই ছেলে, দুই চাকর, এক ঝি, মায় ভুলো-কুকুর, পুসি-বেরালটার পর্য্যন্ত একটা 'গুরুপ' ফটো মুটের মাথায় এসে উপস্থিত। সকাল হতেই কর্ত্তা সেটা খাটাতে সোরগোল বাধিয়ে দিলেন। কেমন তা শোনো—

কৈ মেধো তো এখনো পেরেক আনলে না! মেধো! মেধো! তোর নাম কি মেধো? আজ্ঞে না, তো তবে তুই এলি কি করতে? কি বল্লি, মেধো এখন বালিশের ছারপোকা মারছে? কে তাকে এখন ছারপোকা মারতে বল্লে? ডাক ব্যাটাকে। এখন ছবি টাঙানো হবে, তার খোঁজ নেই, উনি গেলেন ছারপোকা মারতে। ছারপোকা কি পালিয়ে যাচ্ছে? ডাক ব্যাটাকে!

মেধো! মেধো! ব্যাটা এদিকে একবার এলে হয়! ও কি রে মেধো, অমন কোরে কাঁপ্‌ছিস কেন? ম্যালেরিয়া হয়েছে বুঝি? ব্যাটা, তোকে বলিনি, রোজ সকালে উঠে কুইনেন খাবি! খাস্‌নি কেন পাজি! এখন ছবি টাঙাতে হবে, উনি ম্যালেরিয়া নিয়ে এলেন! কি বল্লি, জ্বর হয়নি? তবে কাঁপছিস কেন? কাজ কামাই করবার ফন্দি। উহুঁ, সেটি হচ্ছে না। দে, পেরেক দে। কি বল্লি—পেরেক কোথায় পাবি? তোকে বল্লুম না, বাজার থেকে কিনে আনতে। কখন বল্লুম? আমি কি ঘড়ি দেখে রেখেছি? তোকে বলিনি তো তবে কাকে বলেছিরে ব্যাটা? বল্ কাকে বলেছি—নাম কর্ তার! চুপ কোরে রৈলি কেন? কি বল্‌ছিস্, পেরেক আনবার নাম-গন্ধও করিনি? তবে কি আনতে তোকে বল্লুম তখন? রসগোল্লা আনতে? ব্যাটা, চালাকি পেয়েছ—ছবি টাঙাতে রসগোল্লা দরকার হয়? যা, ফাজলামি করিস্‌নি—শীগ্‌গীর পেরেক নিয়ে আয়।

রোসো, যেখানে-সেখানে তো পেরেক পোঁতা যাবে না; তার একটা হিসেব চাই। কাগজ পেন্সিল দাও তো গিন্নী! কি করব, সে খবরে তোমার দরকার কি? মেপেজুপে দেখতে হবে দেয়ালটা লম্বাই বা কত, চওড়াই বা কত, উঁচুই বা কত—কড়ি কাঠ অবধি! হরে! হরে! যা শিগ্‌গির একখানা মই নিয়ে আয়। মই নেই? যা চাইব, ব্যাটা বলবে, নেই! নেই বল্লে ছবি টাঙানো হয় কি কোরে রে ব্যাটা? যা, যেখান থেকে পারিস, যেমন কোরে পারিস, একখানা মই তোকে আনতেই হবে! অমন হাঁ-কোরে উপর দিকে দেখছিস কি? মই কি আকাশ থেকে পড়ছে না কি! ব্যাটা দৌড়লো যেন বর্ষার টাট্টু!

অঙ্ক কসে দেয়ালটার মাপ ঠিক করা চাই। ইটের মাপ দিয়ে তাকে ভাগ করতে হবে—আবশ্যি সুর্কির ভাগটা বাদ দিয়ে; তাহলেই ধরা যাবে ঠিক কোন্ কোন্‌খানে কত-কত ইঞ্চি পরে ইটের জোড় আছে। তারই মুখে পেরেক বসাতে হবে; তাহলে আর ইটের গায়ে পেরেক পড়বে না। যেখানে সেখানে পেরেক ঠুকে-ঠুকে গিন্নী দেওয়ালের যা ছিরি করেছেন।

হরে! হরে! একটু অন্যমনস্ক হোয়েছি, আর ব্যাটা পালিয়েছে। দাঁড়াও না, ব্যাটা আসুক। আগে ছবি টাঙানো হোক, তারপর সমস্ত দিন এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখবো। গিন্নী! গিন্নী! দাসীটাকে একবার পাঠিয়ে দাও শিগগির। কেন, কি-বৃত্তান্ত, সে সব বল্‌বার সময় নেই। শিগ্‌গির আসতে বল। দুধের কড়াটা এখন নাবিয়ে

রাখুক না! যাওতো বাছা একবার বাজারে। আহা, মেধো গেছে সে তো জানি গো! সেই জন্যেই তো ঝীকে পাঠাচ্ছি। দেখো বাছা, হরেটা না, না, মেধোটা বুঝি বাজারে গেছে পেরেক আনতে—ব্যাটা একবার জিজ্ঞেস কোরে গেল না, কি-রকম পেরেক আনবে—তার যদি কোনো আক্কেল থাকে—আঃ গিন্নী, তুমি বক্‌বক্ কোরো না—যাক্‌গে দুধ উথলে! যাও তো বাছা, বল্‌গে তো, মুণ্ডি দেওয়া পেরেক নয়, আঁকড়ি-দেওয়া পেরেক চাই। বুঝলে—আঁকড়ি-দেওয়া পেরেক; মনে থাকবে ত? না হয় বাগান থেকে আঁক্‌সিটা হাতে কোরে যাও। যাও বাছা, আর দাঁড়িও না—গিন্নীর কথা শুনো না তুমি। চলে যাও।

আঃ ঝিটা কি চলে গেল নাকি? ওঝি। ঝি! এত তাড়া কিসের বাছা তোমার—ঘোড়ায় কি জিন দিয়ে এসেছ। সব কথা না শুনেই ছুট দাও কেন? শোনো, হরেকে বল্‌বে, ছ'ইঞ্চি পেরেক যেন আনে। ছ' ইঞ্চি—আঁকড়ি-দেওয়া। ভুলবে্ না তো? ঐ আঁকশিটা নিয়ে যাও?

ঐ যাঃ, দড়ি আনতে আবার কে যায়? ছেলেটা কোথায় গেল? চন্দ্রকান্ত, শোনোতো বাবা, এদিকে। চট্‌কোরে একবার বাজার যাও তো। ঝি চাকর কেউ বাড়ী নেই; তুমি একবার না গেলে তো চল্‌ছে না। কিছু দড়ি আনতে হবে। লেখা-পড়া এখন থাক্। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট কোরো না;—যাও।

ঐ দেখ, বল্‌তে না বল্‌তেই ছুট দিয়েছে। এ বাড়ির রোগই দেখছি এই—ধীরে-সুস্থে কেউ কিছু করবে না। ওরে সুয্যি! সুয্যি! নিশ্চয় এখনো ঘুমুচ্ছে! ছেলেটা এত ঘুমুতেও পারে। দেখ না, পাছে টের পাই বোলে চোখে জল দিয়ে আসছে। সুয্যি, তোর দাদা বাজারে গেছে দড়ি আনতে—হয়তো জাহাজের দড়ি এনেই হাজির করবে। যা, চট্ কোরে বোলে আয়, আর দাঁড়াসনে—কি বলবি? হ্যাঁ কি বলছিলুম? এই দেখ, দড়ি যেন বেশি মোটা না হয় বুঝলি। কড়ে আঙুলের মতো আনলেই হবে। আরে আমার হাতের কড়ে আঙুল নয়—তোর হাতের। যা, কড়ে আঙুলটা উঁচু কোরে যা, নইলে ভুলে যাবি। পথে কোন ইয়ারের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিসনে যেন!

গিন্নী! গিন্নী! সর্ব্বনাশ হয়েছে! সর্ব্বনাশ হয়েছে! হাতুড়ি আছে? হাতুড়ি? আঃ, তখন কি জানতুম গা, যে ছবি টাঙাতে হবে! ভাবলুম মিছামিছি হাতুড়িটা মর্চ্চে ধোরে নষ্ট হচ্ছে, তাই পুরানো লোহার সঙ্গে বিক্রি কোরে দিলুম। আহা, তুমি তো বলেছিলে রাখতে গো! কিন্তু মর্চ্চে ধোরে লোহা ক্ষয়ে গেলে কি তার দাম পাওয়া যেত? তাই তো বিক্রি কোরে দিলুম। এখন উপায়? কাকে হাতুড়ি আনতে পাঠাই? তুমি ছাড়া বাড়িতে যে কেউ নেই। কি হবে? গিন্নী, লক্ষীটি, তুমি যদি—না, না, তুমি কি কোরে যাবে? হরে! এসেছিস্? বাঁচালি! মইখানা রেখে যা একটা হাতুড়ি নিয়ে আয় শিগগির! কোথায় পাবি? আমি কি কামারের ব্যবসা করি যে হাতুড়ির খবর রাখব? জিজ্ঞেস করতে তোর লজ্জা হল না!

চন্দ্রকান্ত ফিরে এসেছ? বেশ! ওকি অমন কোরে মাথা চুলকুচ্চো কেন? মরা মাছি হয়েছে না কি? নয় ত তবে শুধু শুধু মাথা চুলকোও কেন? ওকি নখে আবার কি হলো? নখুনি নাকি! এই দেখো ছবি টাঙানোর সময় নখুনি কোরে বসলো! যাও এইবার রেখে মইখানা নিয়ে দেয়ালটা ফিতে দিয়ে একবার মেপে ফেল। আঃ, মইখানা আবার ছোট এনেছে। সুয্যি, যা, ঐ তক্তপোষখানা এইদিকে টেনে নিয়ে আয়, ওর উপর মই রাখা হবে। এই যে হরে এসেছিস। ব্যাটা গেল আর এলো; সব জানতো কোথায় হাতুড়ি পাবে, না পাবে, আমার কাছে ন্যাকা সেজে দুষ্টুমি করছিল! রাখ্ ঐখানে হাতুড়ি, মইখানা ধর! ঝি, তুমি ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকো, পেরেক পুঁততে যেই বালি পড়বে, তুমি সাফ্ কোরে নেবে। সুয্যি এইনে পেন্সিলটা কাট্। মেধো, যা তুই এই বেলা আমার জন্যে এক ছিলিম ভালো কোরে তামাক সেজে নিয়ে আয়।

কি বল্লে চন্দ্রকান্ত—লম্বা ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি? চওড়া কত? আড়াই ফুট! উঁচু ১২ ফুট ৭৷৷০ইঞ্চি। ঠিক মেপেছ ত? ভুল হয়নি? আর একবার মেপে দেখ। ঠিক আছে? বেশ! মেধো, তামাক কৈ রে? সুয্যি মাপগুলো লিখেছিস্ তো ঠিক? হরে, মইখানা ভালো কোরে ধরিস—যেন হড়কে না যায়! ঝি তুমি পালিয়ো না। সুয্যি কাগজ-পেন্সিলটা দে, আমি এইবার হিসেবটা করি। এই গিয়ে হলো সওয়া-পাঁচ ইঞ্চি। সওয়া পাঁচ দুগুণে সাড়ে দশ; সাড়ে দশ আর সওয়া পাঁচ—পৌনে ষোল। ওরে মেধো তামাক কৈ রে! চন্দ্রকান্ত, দাঁড়াও, এখন মই থেকে নেমো না। হরে, জেগে আছিস, না মই ধরে ঘুমিয়ে পড়লি? ঝি, ওখানে আবার ঘোমটা দিয়ে বসলে কেন? এদিকে এসে দাঁড়াও। এই গিয়ে হল তিন ফুট পৌনে চার ইঞ্চি। চন্দ্রকান্ত ফিতে দিয়ে ঘরের মেঝে থেকে একবার মাপো তো—তিন ফুট পৌনে চার ইঞ্চি কোথায় হয়। মেপেছ? সুয্যি, পেন্সিলটা ভালো কোরে বেড়ে দে। এই নাও, এই পেন্সিল নিয়ে ঠিক ঐ তিন ফুট পৌনে চার ইঞ্চির মুখে একটা কুলের আঁটির মতো দাগ দাও।

দাগ তো দেওয়া হলো; এখন পেরেক কে পোঁতে? হরেটা বেজায় ফাজিল, ওর কর্ম্ম নয়। মেধো বুড়ো হয়েছে, হাত কাঁপে, সোজা কোরে পুঁততে পারবে না সুয্যিটা ছেলে মানুষ, কাজ নেই। বাকি রইলেন দাসী আর গিন্নী—ওরা মেয়ে মানুষ,মইয়ে উঠবে কেমন কোরে? বাবা চন্দর, তুমিই তাহলে পেরেকটা পোঁতো—এই নাও

হাতুড়ি, এই নাও পেরেক। এই হরে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিস কি ?—এগুলো তুলে দে না। না, না তুই মই ছাড়িস নি—অ্যাঃ বলতে বলতেই ব্যাটা ছেড়ে দিয়েছে—ধর্ ধর্ পড়ে যাবে এখুনি। তুই ব্যাটা যদি মই ছাড়বি তাহলে ঐ মই দিয়ে তোর মাথা গুঁড়িয়ে দেবো! মেধো, হাতুড়ি পেরেক তুলে দে—দেখিস যেন হাতুড়িটা হাত-ফস্কে আমার মাথায় ফেলিস্‌নি।

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঐ দাগের উপর। এক ঘা, দুই ঘা, তিন ঘা—ব্যস্ থামো। দেখ-দিকিন পেরেকটা কতখানি ঢুকল। কি বল্লে, মোটেই ঢোকেনি ? হা, হা, হা, তা কখনো হতে পারে ? আচ্ছা আর-এক ঘা জোরে দাও। কি বল্লে ইটে লাগছে ? আরে না, না,—ইট ওখানে নেই, ইট লাগবে কি কোরে ? তবু বলে, আছে! কখ্খনো নেই—আলবৎ নেই! তুমি ঠোকো জোর্‌সে। ফের বলে ইট আছে আমি এতক্ষণ অঙ্ক কোসে মাথা ঘামিয়ে বার বার করলুম ওখানে ইট নেই আর উনি এক ঘা হাতুড়ি ঠুকেই বল্লেন ইট আছে! তর্ক কোরো না বল্‌ছি চন্দ্রকান্ত, ওটা তোমার ভারি বদ স্বভাব। বাজে কথা বোলে সময় নষ্ট কোরো না—পেরেক পোঁতো! কি বল্লে, পেরেক কেন ঢুক্‌ছে না, বুঝতে পারছ না ? সে তোমার বুঝে কাজ নেই, তুমি নিজের কাজ কর। তবু ঢুক্‌ছে না ? ওকে ঢুকতে হবে—ওর বাবাকে ঢুকতে হবে! লাগাও জোর্‌সে হাতুড়ি—আরো জোর্‌সে! কি বল্লে, পেরেক তুমড়ে গেল ? অ্যাঃ নতুন পেরেকটা মাটি কোরে ফেল্লে! মেধো, তুই কি-রকম পেরেক এনেছিস্ যে তুমড়ে গেল! নিশ্চয় ও শিসের পেরেক, লোহার নয়। কি বল্লি, শিসে কিনা পরখ কোরে দেখব ? দেখবই তো, তোকে কি অম্‌নি ছাড়ব নাকি ? নিয়ে আর তো পেরেকটা কাগজে দাগ পড়ে কিনা দেখি। নাঃ শিসের নয়; দাগ পড়লো না, লোহার বটে! তবে ঐ হাতুড়ির দোষ! হরে, কি-রকম হাতুড়ি এনেছিস্ রে গাধা, যে পেরেক ঠোকা যায় না ? কি বল্লি, ঠুকে দেখব ? নিয়ে আয় তোর মাথাটা ঠুকে দেখি ? কি বল্লি, যে-মাথাটা হাতের কাছে আছে সেইটে ঠুকে দেখব ? কৈ, হাতের কাছে আবার মাথা কৈ রে ব্যাটা! কি বল্‌ছ সুয্যি, হাতুড়ির কোনো দোষ নেই ? দোষ নেই তো পেরেক পোঁতা গেল না কেন ? ইট আছে, তাই ? ফের ইট-ইট করবি তো ইট মেরে ঠ্যাং খোঁড়া কোরে দেব! বল্, হাতুড়ির দোষ,—হাতুড়িতে ঘা লাগে না। কি বল্লি, ঘা লাগে না তো লোহার পেরেক তুমড়ে গেল কি কোরে ? তা বটে! জানি চন্দুরেটা কোনো কর্ম্মের নয়! একটা পেরেক পুঁতবে, তাও পারলেনা,—ফেল্লে সেটা বেঁকিয়ে! দাও, দাও, আমাকে হাতুড়িটা—তোমাদের দ্বারা হবে না। এই ব্যাটা হরে, মইটা ধরিস্ হুঁসিয়ার হয়ে! একি, মইটা আবার মচ্‌মচ করে যে।

দে, হাতুড়িটা তুলে দে, একটা নতুন পেরেক এনে দে। দেখি, বাছা পেরেক কেমন না প্রবেশ করেন! এই তো, বাপের সুপুত্রের মতো চলেছেন। ইস্ এখানে একটু আটকালো যে!—ও কিছু নয়—ও একটা সুকির চাংড়া। দি'চ্ছ ভেঙে। ওয়ান্, টু, থ্রি—উহুহুহু—গেছিরে মরেছিরে! দুত্তোর হাতুড়ির নিকুচি করেছে। উহুহুহু! যা, যা, শিগ্‌গির জল নিয়ে আয়, কানি নিয়ে আয়, বরফ নিয়ে আয়, অডি কোলন নিয়ে আয়, আইসব্যাগ নিয়ে আয়, উহুহুহু হুহু! এই ব্যাটা হরে মই ছেড়ে পালালো। ধর্, ধর্, গেলুম বুঝি পোড়ে। ওরে ব্যাটা শিগ্‌গির আয়—মইখানা ধর—আমি যে নামতে পারছি না। উহুহুহু আঙুলটা ঝন্‌ঝনিয়ে গেল!

বাবা চন্দ্রকান্ত, একজন ভালো ডাক্তার ডাকো—হোমিওপ্যাথিক নয়, এ্যালোপ্যাথিক, ঐ অলুক্ষুণে ছবিটা এখুনি বাড়ী থেকে বিদেয় কর ওর জন্যে আমার বুড়ো-আঙুলটা গেল। উহুহুহু! ও পাপ আর রেখো না। কি বল্লে, তার আর কিছু পদার্থ নেই—ভেঙে ছিঁড়ে গুঁড়িয়ে গেছে ? কে ভাঙলে ? হরে-অল্‌বড ডেটা বুঝি দৌড়ে যাবার সময় মাড়িয়ে দিয়েছে ? না তো, তবে কি কোরে ভাঙলো ? আমার হাত থেকে হাতুড়ি পোড়ে ভেঙেছে ? বেশ হয়েছে! আপদ গেছে।—উহুহুহু!

কি বলছিস্ সুয্যি, ইট দেখে পেরেক পুত্‌লে এমন হতোনা ? ইট আমি দেখিনি ? তবে অতক্ষণ ধোরে অঙ্ক কসলুম কি করতে র‍্যা। দ্যাখনা একবার অঙ্কটা। দেখেছিস্ ? মাথায় ঢোকে নি বুঝি ? তবে ফের ইট ইট করছিস্ কেন ? কি বল্লি, কসতে ভুল হয়েছে ? চার নাম বত্রিশ করেছি ? কৈ দেখি ? হ্যাঁরে তাইত! ভুল হয়ে গেছে বটে! ভুল হবে না!—গিন্নী যে কানের কাছে বকর্-বকর্ আরম্ভ করলেন—তাতে মাথার ঠিক থাকে। গিন্নী! গিন্নী! তোমার জন্যেই আমার বুড়ো আঙুলটা গেল। উহুহুহু! এ যে বেজায় চিড়িক্-চিড়িক্ করছে! কৈ, ডাক্তার এখনো এলো না ? আইসব্যাগটা দাও, মাথা ভারি গরম হয়ে উঠেছে!

উঃ বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। ভাত নিয়ে এসো। বেলা হলো, এখনও রান্না হয় নি! এতক্ষণ কি সব না কি ? যেটি আমি না দেখব, সেইটি হবে না তবে একটু দুধ নিয়ে এস, বড্ড গা ঝিম্‌ঝিম্ করছে দুধও জ্বাল দেওয়া হয় নি ? কেন ঝিয়ের কি পক্ষাঘাত হয়েছে নাকি ? বলি, আমারই না হয় আঙুল ভেঙেছে, আর তো কারো কিছু হয়নি, তবে সব ঠুঁটোর মত বসে ছিল কেন ? নিয়ে এসো দুটো সন্দেশ খেয়ে পিত্তি রক্ষা করি। কি বল্লে, সন্দেশ আনা হয় নি ? নিয়ে আয় তো হাতুড়িটা একবার দেখি, কেন সন্দেশ আসে নি। ওকি সবাই ছুটে পালালো যে! এখন করি কি ? বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। নিজের মাথাটাই চিবিয়ে খাবো নাকি।

গিন্নী, গিন্নী, কোথায় গেলে গিন্নী ? একবার এদিকে এসো। দেখসে আমি সংসার-যুদ্ধে আহত হয়ে পড়ে আছি—একলাটি বৈঠকখানা ঘরে! আমার সেনারা সব ছত্রভঙ্গ। তুমি তাদের নিয়ে এইবার সংসার চালনা কর।

[কার্ত্তিক, ১৩২৭] মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

আলোয় কালোয়

পূবের পাখি তারা বাসা বেঁধে থাকে মলয়দ্বীপে চন্দন বনে, ঝাঁক বেঁধে ওড়ে পূব আকাশে সোনার আলোয়। ধান ক্ষেতের কচি সবুজ মেখে নিয়ে সবুজ হল তাদের ডানা, হিঙ্গুল ফলের কস লেগে হল রাঙা তাদের ঠোঁট।

তার একটি পাখী একদিন ধরা পড়লো। সওদাগর তাকে জাহাজে করে নিয়ে গেল, উদয়াচল ঘুরে পশ্চিম সাগর পার হয়ে আজব সহরে। সেখানে সবুজ নেই—কেবল বাড়ী, কেবল বাড়ী; ইঁট, কাঠ, চুণ, সুরকী, কল-কারখানা, ধুঁয়া ধুলো আর কুয়াশায় দিক্‌বিদিক্ আকাশ বাতাস পর্য্যন্ত ঢাকা, দিনরাত্রি সমান অন্ধকার। আলো-গুলো যেন সেখানে জ্বলছে না। কুয়াশায় ভিজে কম্বল মুড়ি দিয়ে রাস্তার ধারে বসে সে জ্বরে কাঁপছে! সূর্য্যের রথ সহরের পাঁচিলে এসে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায় সহর ছেড়ে! মলয় বাতাস দুয়োরের কপাট ধরে নাড়া দিয়ে দেখে কিন্তু ঘর খোলা পায় না কোন দিন!

সবুজ পাখী সেখানে খাঁচায় রইলো—কালো লোহার শক্ত খাঁচা—কলের কুলুপে চাবি দেওয়া খাঁচা! খায় দায় পাখি থেকে থেকে কুলুপ ধরে নাড়া দেয়, কুলুপ নড়ে চড়ে কিন্তু খোলে না! কল-ঘরের এক কোণে পাখির খাঁচা—কলের ধুঁয়ো থেকে থেকে ভূষো ছিটিয়ে যায় তার গায়ে, সবুজ পাখনা কালো হয় দিনে দিনে! পাখি সেখানে থাকে মনের দুঃখে, শুনতে শুনতে শেখে সব খটো মটো বুলি, যেন লোহার কলের খট্‌খটাং! তাই শুনতে লোক জড়ো হয়! সেই কলের ছাই ভস্মমাখা পাখনা দেখে অবাক হয়ে যায়—একি আশ্চর্য্য পাখি! নাচতে পারে, গাইতে পারে, বলতে পারে, কইতে পারে, পড়তেও পারে। পাখি সে থেকে-থেকে নিজের কথা চেঁচিয়ে বলে—ওরে উড়তে পারিনি রে উড়তে পারিনে—বেঁচে আমি মরে আছি! থেকে-থেকে রাগ করে গা ঝাড়া দেয়—লোকে তার মনের কথা বোঝে না, তামাসা দেখে হাসে আর হাততালি দেয়। আজব সহরের মানুষ তারা কেউ বোঝে না মলয় দ্বীপের পাখির কি দুঃখ, তার দুঃখুটা বোঝে শুধু ভোরের আলো। সে কোন দিন কুয়াসা সরিয়ে কারখানা ঘরের কোনটিতে এসে দেখা দেয়, সবুজ পাখির গায়ে হাত বোলায়। ভয়ে ভয়ে আসে আলো, ভয়ে ভয়ে সরে যায়। পাখি বলে—যদি কোন দিন সিন্ধুপারে যাও হে আলো, তবে ভুলোনা, মলয় দ্বীপের সবুজ ঘরে আমার খবর পৌঁছে দিও; বোলো আমি বেঁচে মরে আছি!

আলো বলে, যেদিন আমি বড় হয়ে উঠবো সেদিন নিশ্চয় নিশ্চয় তোমার কথা তোমার আপনার লোকের কাছে জানিয়ে আসবো।

শীত কাটলো, পরিষ্কার হোলো দিনে দিনে আকাশ, আলোর তেজ বেড়েই চল্লো। আর সে ভয় ভয় আসে না; অন্ধকারের ঘরে আসে রাণীর মতো চারিদিক আলো করে, কারখানার কলকব্জা ঝক্‌ঝক্ করতে থাকে আলো পেয়ে, পাখি আলো মাখা ডানা কাঁপিয়ে বলে—আর কেন এইবার। আলো বল্লে—থাকো থাকো আজ রাতের শেষে খবর পাবে!

খাঁচার পাখি ছট্‌ফট করে—সকাল কখন হয় তারই আশায়।

সেদিন ভোরের বেলায় কলের খাঁচায় ধরা ক্লান্ত পাখি ঘুমিয়ে গেল সেই সময় কলখানায় বাঁশী ডাক দিল কুলিদের।

পাখির কাছে আলো এসে বল্লে চুপি চুপি—মলয়দ্বীপে গিয়েছিলেম, তাদের তোমার দুঃখের খবর দিলেম!

পাখী ঘুমন্ত চোখ একটু খুলে শুধোলে—তারা কি বলে পাঠালে বল শুনি?

আলো খাঁচার মধ্যে এগিয়ে এসে বল্লে—সবাই আহা করলে, কেবল একটি পাখি সে যেমন ছিল তেমনি রইল!

পাখি ঘাড় তুলে বল্লে—তারপর?

আলো তার পিঠে হাত বুলিয়ে বল্লে—তারপর সে ঝরা পাতার মতো গাছের তলায় লুটিয়ে পড়লো ধুলোতে, আর সবাই বল্লে—আহা মরে বাঁচলো রে!

খাঁচার পাখি আর কোন সাড়া দিলে না!

কল ঘরের কল চল্লো তেজে খট্‌খটাং।

যার পাখী সে খাঁচার কাছে এসে দেখলে—পাখি মরে গেছে, আলো তার উপর পড়ে কাঁদছে!

[কার্ত্তিক, ১৩৩০] শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূতো

একটা ঘুড়ি কেটে উড়ে চলেছে—দেড় পয়সা দামের একটা লাল ঘুড়ি।

মিত্তিরদের বাড়ীর বিন্দি বারান্দায় বসে তার ছোট ভাইকে দুধ খাওয়াচ্ছিল, সে দেখ্‌লে, অনেক উঁচুতে একটা ঘুড়ি কেটে তাদের ছাদের দিকে উড়ে আসছে, অনেক সূতো। দুম্ করে সে খোকাকে কোল থেকে নামিয়ে বারান্দার মেজেতে শুইয়ে ছাতের দিকে ছুটল। খোকা কেঁদে উঠ্‌ল, দুধের বাটির ওপর কাক ও বিড়াল দু-দিক্ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল; সেদিকে বিন্দি একটুও লক্ষ্য করলে না; সে কাঠের সিঁড়ি কাঁপিয়ে এক ছুটে ছাদে হাজির। পিসিমার সব বড়ি মাড়িয়ে তাড়াতাড়ি ছাতের কোণে গিয়ে একটা সরু লম্বা বাঁশ তুলে নিলে। ঘুড়ির সূতো তাদের ছাত পেরিয়ে পাশের দত্তদের বাড়ীর ছাতে গিয়ে পড়েছে। ঘুড়ি ধরার জন্যে ছাতের চারকোণে চারটে বাঁশ সব সময় খাড়া থাকে। উত্তর কোণের বাঁশটা তাড়াতাড়ি নিয়ে বিন্দি ঘুড়ির সূতো ধরতে চেষ্টা করল, তার বাঁশটা দত্তদের বাড়ীর ছাদের ওপর এসে পড়্‌ল।

এদিকে দত্তদের বাড়ীর মংজু সামনে অঙ্কের খাতাটা

খুলে আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়েছিল। একটা ঘুড়ি তাদের ছাদের দিকে আস্‌ছে দেখে সে টেবিলটা ঠেলে লাফিয়ে উঠ্‌ল, টেবিলের ওপর কালির দোয়াতটা উল্টে পড়ে খাতার উপর কালির ঢেউ বয়ে গেল, টেবিল গড়িয়ে কালির স্রোত তার কাপড়ে মেজেতে ছড়িয়ে পড়ল, সেদিকে সে একটুও লক্ষ্য না করে এক ছুটে ছাতে গেল। ঘুড়ির স্যুতোটা ঠিক তাদের ছাদের উপর; কিন্তু বড় উঁচুতে, তাড়াতাড়ি এক সরু লম্বা বাঁশ তুলে স্যুতোটা ধরতে যাবে, বিন্দির বাঁশটা তার বাঁশের ঘাড়ে এসে পড়ল! তারপর দুই বাঁশে খটাখট্ খটাখট্ ঠোকাঠুকিতে রীতিমত যুদ্ধ লেগে গেল। ঘুড়ির স্যুতো তখন দত্তদের ছাদ পেরিয়ে কোথায় চলে গেছে; কিন্তু তাদের বাঁশের লড়াই আর থাম্‌তে চায় না।

মংলু রেগে আগুন হয়ে বলে উঠল—আমাদের ছাতের ঘুড়ি তুই কেন ধর্‌বি। সে খুব জোরে বিন্দির বাঁশে এক ঘা দিলে, বাঁশটা বিন্দির হাত থেকে খসে মিত্তিরদের বাড়ী আর দত্তদের বাড়ীর মাঝখানের গলিটায় দু-টুক্‌রো হয়ে পড়ল। গলিটায় মিত্তিদের বাড়ীর বড়বাবু আর দত্তদের বাড়ীর বড়বাবু দু-জনে দুই চেয়ারে বসে খোস গল্প করছিলেন, বাঁশের এক টুক্‌রো দত্তদের বাড়ীর বড়বাবুর মাথার টাকের ওপর গিয়ে সশব্দে পড়ল, তিনি আর্ত্তনাদ করে উঠলেন, তারপর ঢিপির ওপর ফোলা টাক্‌টায় হাত বুলাতে বুলাতে মিত্তিরদের বড়বাবুকে ছেলেমেয়েদের শাসন সম্বন্ধে উপদেশ ও বক্তৃতা শোনাতে আরম্ভ করে দিলেন। মিত্তিরদের বড়বাবুর মেজাজটা একটু রুক্ষ, তা-ছাড়া বক্তৃতাটা বড় মিষ্টি শোনাচ্ছিল না। তিনিও চটে গিয়ে দত্তদের বড়বাবুকে তাঁদের বাড়ীর ছেলেদের গুণপনা শোনাতে আরম্ভ করে দিলেন। দুইজনের হাতে বাঁশের সেই দুই টুক্‌রো; সেই বাঁশের টুক্‌রো ছুঁড়ে ঘুরিয়ে খুব কথা কাটাকাটি চলতে লাগল, ব্যাপারটা হয়ত কথার ঝগড়া থেকে বাঁশের লড়াইয়ের গড়াত, হঠাৎ মিত্তিরদের বড়বাবুর চোখ পড়ল তাঁর স্ত্রী দোতালার ঘরের জানলা থেকে কট্‌মট্ করে চেয়ে আছেন, তাঁর হাত থেকে বাঁশের টুক্‌রো খসে পড়ল, মুখও বন্ধ হয়ে গেল, ঝগড়াটা থেমে গেল।

ঘুড়িটা তখন রাস্তার এক মোড়ের ওপর উড়ে চলেছে। এক জুতোর দোকানের এক মুসলমান ছোকরা দেখতে পেলে অনেক স্যুতোর মাথায় একটা ঘুড়ি কেটে চলেছে। দোকানের সামনের রকে এক কাবুলিওয়ালা আঙ্গুর নিয়ে বেচতে বসেছিল। ছোকরাটি তাড়াতাড়ি কাবুলিওয়ালার পাশের লম্বা লাঠিটা তুলে নিয়ে সামনের এক ঘোড়ার গাড়ীর ছাদের ওপর উঠে ঘুড়িটা ধরতে গেল। লাঠি নিয়ে গেল দেখে কাবুলিওয়ালাটা হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। তার লাল সাজ ও মুখভঙ্গি দেখে গাড়ীর ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠল, বেগতিক দেখে ছোকরাটি লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে দোকানের দিকে ছুটল। কাবুলিওয়ালাটা লাঠিটা তুলে তার ঝুড়ির দিকে চেয়ে দেখে, মোড়ের মোটা গরুটা তার আঙুরগুলো সব প্রায় খেয়ে শেষ করে ফেলেছে; কাবুলিওয়ালার এই আঙুরের গুচ্ছগুলির প্রতি অনেকদিন থেকেই লোভ, শুধু কাবুলিওয়ালার লাঠি এগোতে সাহস করে না। তখন লাঠি আর কাবু, তারপর কেউ নেই দেখে সে আঙুরগুলি মনের সুখে তাড়াতাড়ি মুখে পুরছিল, কাবুলিওয়ালাটা তার দিকে লাঠি তুলে এগিয়ে আসছে দেখে সে পা দিয়ে আঙুরের ঝুড়িটা উলটে ফেলে পথের ভিড়ের মধ্যে পালাল। গরু পালাল, আর সেই ছোকরাটা দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে। অগ্নিশর্ম্মা হয়ে কাবুলিওয়ালা লাঠি নিয়ে তাকে মারতে ছুটল। ওই শক্ত হাতের মোটা লাঠির এক ঘা খেলে আর বাঁচতে হবে না—ছোকরাটি আপনাকে বাঁচাবার জন্যে সামনে সাজান জুতোগুলো কাবুলিওয়ালার দিকে ছুঁড়তে আরম্ভ করে দিলে—বুট, সু, চটি, নাগ্‌রা, হাতের কাছে যা পেলে তাই ছুঁড়ে কাবুলি-ওয়ালাকে মারতে সুরু করলে। মোটা বুটের তিন ঘা মুখে আর বুকে খেয়ে কাবুলিওয়ালা ত জখম হয়ে বসে পড়ল; কিন্তু ছোকরাটার জুতা ছোঁড়া আর থামে না। জুতাগুলো সশব্দে রাস্তায় এসে পড়তে লাগ্‌ল।

ঠিক এই সময়ে দোকানের সামনে দিয়ে এক বুড়ো বর ট্যাক্সি হাঁকিয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছিল। সে তিনবার বিয়ে করেছে, তবু তার বিয়ে করার সাধ মেটে-নি। ট্যাক্সি গাড়ীটি দোকানের সামনে আসতেই একটা পাম্প-সু সেই গাড়ীর চালকের হাতে গিয়ে লাগল, সে বাপ্ বলে গাড়ী চালাবার চাকাটা ছেড়ে দিলে, মোটরটা যেন ক্ষেপে এগিয়ে ছুটল। আর একটা হিল্ উঁচু করা মেয়েদের জুতো বুড়ো বরের রং-করা ফোঁপরা গালে সজোরে গিয়ে পড়ল, তার বাঁধান দাঁতগুলো মাড়ি থেকে খসে গেল, গলার ফুলের মালাটা হাতে ধরে সে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল।

মোটরটাও ক্ষেপে সাম্‌নে চলেছে। মিউনিসিপালিটির লোকেরা রাস্তার অর্দ্ধেকটা খুঁড়ে পাইপ বসাচ্ছিল। পাশের মাটির এক ঢিপিতে মোটরটা জোরে ধাক্কা খেয়ে কাত হয়ে থাম্‌ল, এই বুঝি উল্‌টে যায়! ভয়ে দিশাহারা হয়ে বুড়ো-বর মোটর থেকে লাফিয়ে পড়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে কুলীদের খোঁড়া পথের গর্ত্তে গড়িয়ে পড়ল; একটু আগে খুব বৃষ্টি হয়ে যাওয়াতে গর্ত্তগুলো জলে ভরে গেছে, সেই জল কাদার মধ্যে পড়ে বুড়ো-বর গোঁ-গোঁ কর্‌তে লাগ্‌ল। কুলিরা যখন তাকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় টেনে তুল্‌ল, তখন তার মুখ ছড়ে গেছে, ডান হাত কেটে গেছে, বাঁ-পা ভেঙে গেছে, গলার মালা ছিঁড়ে গেছে, সিল্কের কাপড়, পাঞ্জাবী কাদায় কালো হয়ে গেছে। তার আর মোটর হাঁকিয়ে বিয়ে করতে যাওয়া হল না। কোন মতে মোটরে শুইয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে চল্‌ল।

ঘুড়িটা তখন প্রায় সহর ছাড়িয়ে এক খালের তীরে এসে পড়েছে। খালের পাশে এক বাড়ীর ছাদে সন্ধ্যার ম্লান আলোয় তরুণ বলে এক যুবক একা করুণ-চোখে জলের দিকে চেয়ে বসে আছে। সে যে মেয়েটিকে

বাসে আজ তার বিয়ে, কিন্তু তার সঙ্গে নয়। এক ভদ্রলোক তাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। যুবকটি বনে, বলে মেয়েটির বাবা তার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী ধান। তাই তার মন বড় খারাপ। সে চুপচাপ ভাবছিল। ঘুড়ির সুতো প্রায় তার মাথার উপর গেল, হঠাৎ একটী ঘুড়ির সুতো দেখে সে লাফিয়ে ,ছুটে ধরতে গেল, কিন্তু সুতোটা তাদের ছাদ পেরিয়ে চলে গেছে, ঘুড়িটা সেই বিয়ে বাড়ীর দিকেই উড়ে চলেছে। তার মনও বিয়ে-বাড়ীর দিকে ছুটল। আর একবার মেয়ের বাবাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী করবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি ছাদ থেকে নেমে বিয়ে বাড়ীর দিকে চল্ল।

বিয়ে বাড়ীতে ততক্ষণ সানাই বাজছিল, লুচি ভাজা হচ্ছিল, কত হৈ চৈ গোলমাল হচ্ছিল, ঘুড়িটা যখন বিয়ে বাড়ীর কাছে এল তখন সব নিঝুম। কর্ত্তারা গালে হাত দিয়ে বসেছে, সবাইয়ের মুখ ভার, বাড়ীর মেয়েরা কান্না সুরু করেছে, খবর এসেছে যে বর বিয়ে কর্‌তে আস্‌ছিল সে পথে মোটরকার থেকে পড়ে খোঁড়া হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। সে বিয়ে করতে আস্‌তে পার্‌বে না। কি হয়? আজ রাতে মেয়ের বিয়ে না হলে যে উপায় নেই!

গিন্নির সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করে মেয়ের শুক্‌নো মুখ দেখে কর্ত্তা ঠিক করলেন, সেই গরীব তরুণকে ডেকে এনে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। নিজেই তাকে ডেকে আন্‌বার জন্যে চল্লেন। বুক একবার ভয়ে কেঁপে উঠ্‌ল। হয়ত সে বাড়ী নেই, হয়ত সে মনের দুঃখে কোথাও চলে গেছে, সে যদি রাজী না হয়, যদি অভিমান করে!

বাড়ী থেকে বেরিয়েই সম্মুখে তরুণকে দেখে কর্ত্তা অবাক হয়ে গেলেন, আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন, এস বাবা এস, আমায় উদ্ধার কর।

তরুণও অবাক্, বিয়ে বাড়ী নিঝুম অন্ধকার ছিল, সে বিয়ে বাড়ীতে ঢুক্‌তেই, সানাই বেজে উঠল, আলো সব জ্বলে উঠল, বামুনের উনানে লুচি ভাজার কড়া, পোলায়ের ডেকচি চাপালো, মেয়েদের মহলে হৈ চৈ পড়ে গেল, শঙ্খধ্বনি হল, তার গলায় ফুলের মালা দিয়ে সবাই তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলে।

কনে ততক্ষণ লুকিয়ে কাঁদ্‌ছিল; বুড়োবরের কথা ভেবে সারাদিন তার বুক দুরদুর করছে, তারপরে এ নতুন বিপদে সে মুষ্‌ড়ে পড়ে ছিল। জানলার পাশে বসে সে তরুণকে দেখ্‌তে পেলে। তখন তার মুখে হাসি ফিরে এল। হঠাৎ সে দেখ্‌লে একটা ঘুড়ির সুতো তার জানলার পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

ওরে সাজবি চল, বলে তার বন্ধুরা তাকে ধরে নিয়ে যেতে এল। রোস ভাই ঘুড়িটা ধরি, বলে মেয়েটি জানলা দিয়ে তার সুন্দর হাত বাড়ালো।

ঘুড়ির সুতো তার হাত থেকে ফস্কে চলে গেল, ঘুড়িটা মুচ্‌কে হেসে বিয়ে বাড়ীর ওপর দিয়ে উড়ে কোথায় চলে গেল।

ওরে শীগ্‌গীর চল, আবার এ বর না ফস্কে যায়, বলে কনের বন্ধুরা কনেকে সাজতে ধরে নিয়ে গেল।

কিন্তু যে দেড় পয়সা দামের লাল ঘুড়িটার জন্যে এত কাণ্ড হল সে ঘুড়িটা যে কোথায় কেটে পড়ল তা কেউ জান্‌তে পারলে না।

[কার্ত্তিক, ১৩৩০] শ্রীমনীন্দ্রলাল বসু

পারম্পর্য্য

কর্ত্তা বুড়ো হয়েছেন, একটা খানসামা না হলে আর চলে না। এমন খানসামা চাই যে নিজেই সব দেখে শুনে কাজকর্ম্ম করবে, কর্ত্তাকে তার জন্যে বকাবকি করতে হবে না। অনেক খোঁজাখুজির পর একটি চটপটে খানসামা জুটলো। সে বল্লে দশঘরার নবাববাবুর বাড়ীতে তার খানসামাগিরির শিক্ষা আরম্ভ, তার পর চোরকাঁটার জমিদার, শেষে ঘুঘুচরের মহারাজ—এঁদের কাছে কাজে সে হাত পাকিয়েছে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত কোনো কাজ শিখতে তার বাকী নেই। শুনে কর্ত্তা ভারি খুসি, বল্লেন, "বেশ, তুমিই থাক। কাজকর্ম্ম সব দেখে শুনে নাও।" সে কাজকর্ম্ম সব বুঝে নিচ্ছে এমন সময় কর্ত্তা তাকে ডেকে বল্লেন—"ওহে, কাজ তো বুঝে নিচ্চ, কাজের পারম্পর্য্য বোঝ?" সে মাথা চুলকে বল্লে—"আজ্ঞে না কর্ত্তা, টুলো-পণ্ডিতের ঘরে তো কাজ করিনি যে ও কথার মানে বুঝবো!" কর্ত্তা বল্লেন—"পারম্পর্য্য মানে এই পর পর আর কি! যেমন ধর তোমায় তেল আনতে বল্লুম, তুমি তখনই বুঝবে, এর পর স্নানের জলের দরকার, তারপরই ভাতের ঠাঁই করে ভাত, তারপর তামাক, তারপর ঘুমের বিছানা তৈরি! এই এক হুকুম থেকেই তোমাকে তার পরের পরের কাজগুলি বুঝে নিয়ে করতে হবে—একেই বলে কাজের পারম্পর্য্য! বুঝলে?" খানসামা জোড় হাত করে বল্লে—"আজ্ঞে বুঝলুম।" কর্ত্তা বল্লেন—"দেখ, এখানে যদি চাকরি বজায় রাখতে চাও, তাহলে ঐ পারম্পর্য্য বুঝে কাজ করতে হবে।" খানসামা বল্লে "যে আজ্ঞে।"

সেই দিন রাত্রে কর্ত্তার একটু মাথা ধরলো। তিনি নতুন খানসামাকে ডেকে পাঠালেন মাথাটা একটু টিপে দেবার জন্যে। দুমিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, আধঘণ্টা গেল, একঘণ্টা গেল, খানসামার দেখা নেই। কর্ত্তা বিরক্ত হয়ে ছট্‌ফট্ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন শেষ

রাত্রি তখন খানসামা এসে দরজা ঠেলাঠেলি করে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লো। কর্ত্তা চেঁচিয়ে উঠে বল্লেন, "কেরে ?"

"আজ্ঞে আমি হুজুর !"

কর্ত্তা রেগে উঠে বল্লেন—"এতক্ষণে আসবার তোমার ফুরসুৎ হোলো—পাজী ব্যাটা !"

"আজ্ঞে কি করব হুজুর ; পারম্পর্য্য করতে করতে একটু দেরী হয়ে গেল।"

"এতক্ষণ ধরে কি পারম্পর্য্য করছিলি ব্যাটা !"

"আজ্ঞে আপনি বলে পাঠালেন আপনার মাথা ধরেছে, তাই বুঝলুম এরপরই ডাক্তার ডাক্‌তে হবে, ছুটলুম ডাক্তারের বাড়ীতে। ডাক্তার এলেই ওষুধ দেবে তো? ছুটলুম দাওয়াই-খানায় তাদের বলতে তাড়াতাড়ি দোকান না বন্ধ করে। ওষুধ খেয়ে যদি আপনার অসুখ না সারে তাহলেই তো পটল তুলবেন—সেই ভেবে উকিলকে খবর দিতে ছুটলুম যদি উইল করেন। তারপর শ্মশানের ভাবনা। খাট জোগাড় করা, কাঠ জোগাড় করা, লোকজন ডাকা। তারপর শ্রাদ্ধ—বামুন পুরুতকে খবর দেওয়া, কি কি জিনিস চাই তার ফর্দ্দ করা—সব এই একরাত্রের মধ্যে করে ফেলেছি কর্ত্তা! দেখুন না হুজুর আপনার বৈঠকখানায় লোক গিস্‌গিস্ করছে। এখন কিছু টাকা দ্যান, দেনাগুলো মেটাই। তারপর নেমন্তন্ন করতে বেরুতে হবে।"

কর্ত্তা সব শুনে খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে রইলেন, তারপর গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"পারম্পর্য্য তো এখনো শেষ হয় নি বাপু !"

খানসামা অবাক হয়ে বল্লে—"তাই নাকি, আর তো আমার কিছু মাথায় আসছে না কর্ত্তা !"

"মাথায় এনে দিচ্ছি তোমার! রোসো না"—বলে আবার বল্লেন—"কর্ত্তার মৃত্যুর পর তার খানসামা কি আর থাকে ?"

"আজ্ঞে কর্ত্তা" বলে খানসামা মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগল।

কর্ত্তা বল্লেন—"তা হচ্ছে না বাপু, পারম্পর্য্য যখন এতদূর পর্য্যন্ত টেনেছে তখন ওর শেষ অবধি তোমায় নিঁয়ে যেতে হবে।"

খানসামা কট্‌মট্ করে চেয়ে বল্লে—"আচ্ছা!" বলে ঝট্ করে বেরিয়ে গেল।

কর্ত্তা ভয় ভয় ভাবতে লাগলেন চাকরটা এর পরেও পারম্পর্য্য করতে অগ্রসর হয় কিনা।

[কার্ত্তিক—১৩৩১] মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কাঁচায় পাকায়

বাদশার আগাগোড়া পাকা দাড়ীর মাঝে একটি মাত্র কাঁচা ও বেগমের সব কাঁচা চুলের মধ্যে একটি পাকা চুল দেখা যায়। বেগমের কিছুতেই পছন্দ হয় না বাদশার দাড়ী—তা যতই কেন বাদশা আতর কস্তুরীতে দাড়ী মাজুন। ওদিকে বেগমসাহেবা—তিনিও মাথায় হীরে মুক্তোর ঝাপটা সিঁথি পরে মাথাঘষা মেখেও সেই একগাছি পাকা চুল বাদশার চোখ থেকে ঢেকে রাখতে পারেন না। দুজনে দুজনকে দেখে মুখ ফেরান, দুজনেই মনের দুঃখে থাকেন, শেষে এমন হ'ল যে, বাদশার দরবারে কাঁচা-দাড়ি এবং বেগমের দরবারে পাকা চুল যাদের তাদের টেকাই দায় হল। কবি আসে, কালোয়াৎ আসে, ছবিওয়ালী আসে, চুড়ীওয়ালী আসে, কেউ খাতির পায় না, উল্টে বরং ধমক খায়, গর্দ্দানি খায়, সরে পড়ে প্রাণ নিয়ে। উজির ভেবেই অস্থির—কি উপায় করা যায়! নাপিত নাপ্তিনীকে উজীর ডেকে বলেন—তোরা সাঁড়াসী দিয়ে চুল দু-গাছা উপড়ে দে, আপদ চুকুক। হাজাম হাজামিন্ দুজনে ভয়ে শিউরে উঠে বলে—দোহাই উজীর সাহেব, এমন কাজ আমাদের দ্বারা হবে না—সাঁড়াসী দিয়ে আমাদের দাঁত উপ্‌ড়ে ফেলতে বলেন তো পারি, বাদশা বেগমের উপর অস্তর চালাই এমন নেমকহারাম আমরা নই! উজির নিশ্বাস ফেলে গালে হাত দিয়ে বসেন! —কি উপায়!

মোল্লা দো পেঁয়াজা পেঁয়াজ, রসুন খেতে বড়ই ভালবাসেন, কিন্তু হাতে পয়সা নেই মাসকলাই কেনবারও। ফতোয়া দেন মস্‌জিদে দু-বেলা ; কোন ফল হয় না। তাঁর বিবি তাঁকে বলেন—দেখ এই সময় বাদশা বেগমকে খুসী করতে পার তো কিছু হতে পারে।

মোল্লা দোপেঁয়াজা বল্লেন—তা জানি, পেঁয়াজও হতে পারে পয়জারও হতে পারে।

বিবি বল্লেন—দেখ না চেষ্টা করে। কিছু না হওয়ার চেয়ে সে-ও যে ভাল।

মোল্লা সকালে কোমর বেঁধে মজলিসে হাজির! দেখেন সবাই যে যার দাঁড়ি মোচড়াচ্ছেন আর চুপ করে বসে আছেন। এমন কি যার দাঁড়ি গোঁফ কিছুই নেই সেও হাত বোলাচ্ছে শুধু গালের ওপরটাতেই। নাচ গান আমোদ আহ্লাদ সব বন্ধ! বাদশা মোল্লার দিকে চাইতেই মোল্লা মস্ত এক সেলাম ঠুকলেন, কিন্তু বাদশার উচ্চবাচ্য নেই। তখন মোল্লা একবারে দাঁড়িয়ে উঠে যে ভাবে ফতোয়া দেয় লোকে সেই ভাবে সুর করে গান সুরু করলেন দাঁড়ি নেড়ে, যথা,—

"আব দাড়ি চাপ্ দাড়ি,
চুলবুল চসমেদার দাড়ি,

কুল্‌পাকা এক কাচ্চা
ওহি দাড়ি সব্‌সে আচ্ছা।

বাদশা খুসী হয়ে তালে-তালে ঘাড় নাড়ছেন দেখে দো-পেঁয়াজা আবার গাইলেন—

"এক দাড়ি মান মনোহর
এক দাড়ি ভব্বো
এক দাড়ি খালিফ্‌ ফজিহৎ
এক দাড়ি ঠচ্‌ঢো
সদর পাক্কা অন্দর কাচ্চা
ওহি ওহি সব্‌সে আচ্ছা!"

শুনে-শুনে বাদশা একগাল হেসে ফেল্লেন, সেই সময় অন্দরেও হাসির রোল উঠলো, পর্দ্দার আড়ালে! এক সঙ্গে বাদশা বেগম আমির ওমরা এবং সহরের কাঁচা পাকা যে কেউ খুশী হয়ে গেল। মোল্লার আর প্যাঁজ রসুন ধরে না ঘরে। সহরের বাড়ি বাড়ি দাড়ীর গান উল্টে পাল্টে লোকে গাইতে থাকলো, যার যেমন খুশী সুরে—

(দাড়ির গান)
আব্‌ দাড়ি চাপ দাড়ি,
চুলবুল চসমেদার দাড়ি—
কুলপাক্কা এক কাচ্চা
সব্‌সে দাড়ি ওহি আচ্ছা!
এক দাড়ি মান মনোহর,
এক দাড়ি ভব্বো,
এক দাড়ি খালিফ্‌ ফজিহৎ,
এক দাড়ি ঠচ্‌ঢো!—
সদর পাক্কা অন্দর কাঁচ্চা
ওহি ওহি সব্‌সে আচ্ছা!
লম্বে দাড়ি ওহি আচ্ছা।
ছোটে ছোটে ওভি আচ্ছা।
দাড়িমে সভি সচ্চা।
পাকে কাচ্চে সভি আচ্ছা।
"আচ্ছা আচ্ছা" বোলি সাচ্চা।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হাতী রমজান

আমাদের মণ্টু মাষ্টার সেদিন বক্সিং দেখ্‌তে গিয়েছিল। পরদিন রবিবার, স্কুল ছুটী, তার উপর বাড়ীর বড়রাও কেউ ছিল না। কাজেই মণ্টুবাবু, তার দুই ভাই, আর বন্ধু কালু, এই কজন মিলে দুপুর বেলায় বাইরের বারান্দায় বেশ জমিয়ে গল্প আরম্ভ করলে।

মণ্টু খুব হাত পা নেড়ে বক্সিংএর বর্ণনা করছিলো। লালু আর গণেশ দুজনেই তার ছোট, কাজেই তারা দাদার সব কথা হাঁ করে গিল্‌ছিল, যদিই বা সে কিছু নেহাৎ অবিশ্বাস করার মত বল্লে, ত তাতেও তাদের কিছু বল্‌বার উপায় নেই। শুধু এক কালু মাঝে মাঝে "য-যাঃ, বাজে বকিস্‌ নি" ইত্যাদি বলে নিজের মান বজায় রাখছিলো।

মণ্টু বল্লে—"যাই বলিস্‌, বক্সিং জিনিষটা একটা সায়েন্সের মত সায়েন্স; ঠিক ওজন মাফিক এক ঘুসী চোয়ালের নীচে বসালে খুব বড় জোয়ানকেও চিৎপটাং—যাকে বলে নক্‌ আউট্‌ করে ফেলা যায়।"

লালু ভয়ে ভয়ে বল্‌লো "দাদা, বক্সিং করতে কি খুব গায়ের জোর দরকার?"

"না, তেমন কিছু নেই। ওটা কি জানিস্‌, ঠিক যেন কুস্তীর প্যাঁচের মত, জোরের চেয়ে কায়দার দরকার বেশী।"

গণেশ বল্লে, "আচ্ছা দাদা, যদি একটা কুস্তীগির পালোয়ান আর একটা বক্সিংয়ের ওস্তাদে লড়াই হয় তো কে জেতে?"

মণ্টু কুস্তীগিরের নামে নাক সিঁট্‌কিয়ে বল্লে "দূর গাধা! কুস্তীগিরের আবার লড়াই, তারো আবার কথা! ঐ যে কাল ব্যাট্‌লিং প্যাট্‌ বক্সিং কল্লে, সে ইচ্ছে করলে এক মিনিটে তোর কাল্লু কিঙ্কর গামা সব কটাকে ঘায়েল করে দিতে পারে?"

কালু ছেলেবেলায় কিঙ্কর সিংকে দেখেছিল, তার কাছে এ কথাটা নেহাৎ বাজে ঠেকাতে সে তক্ষুনি বলে উঠল—"ভাগ্‌ ভাগ্‌, রেখেদে তোর ব্যাটলিং প্যাট্‌। কিঙ্কর এক রদ্দায় তার মুণ্ডটা ছিঁড়ে গঙ্গা পার করে দিতে পারতো।"

মণ্টু মহা ক্ষেপে বল্লে "মেলা বকিস্‌ নি, যা জানিস ন তা নিয়ে কথা বলিস কেন? ঢের ঢের কুস্তীগির দেখেছি, যত ভুঁদো মোটা মেড়ার দল! বক্সিং লড়্‌নেওয়ালার সামনে দাঁড়ায় এমন কুস্তীগির জন্মায় নি। বিলেতে বে কুস্তী দেখেরে? আর এক একটা বক্সিং লড়িয়ে প্রতি ম্যাচে দশ বিশ হাজার পাউণ্ড পায়!"

বাড়ীর দরোয়ানদের বুড়ো জমাদার, রামগিল্টড় সিং (সে মণ্টুর ঠাকুরদাদার আমলের লোক) এতক্ষণ কাছে বসে ঝিমাচ্ছিল। কুস্তী, বক্সিং, লড়াই এই সব শুনে সে হঠাৎ কাণ খাড়া করে উঠে বল্লে—"এ, মণ্টুদাদা, বোব সিং কোন দেশের পালোয়ান আছে?" বুড়ো ঔ ইংরেজী জানে না, কাজেই সে ভেবেছে বক্সিং বুঝি বা বোক সিং গোছের একটা নাম।

দরোয়ানজীর কথা শুনে মণ্টুর দল ত প্রথমে অবাব হয়ে হাঁ করে খানিক তাকাল, তারপর ব্যাপারটা বুঝে চার জনে খুব হাসল। একটু সামলে নিয়ে মণ্টু বুড়োকে বক্সিংটা কি জিনিস তা বুঝিয়ে দিলে।

সব শোনবার পর দরোয়ানজি বল্লো—"ও, বোক্সিং গোরাদের ঘুসা লড়াকে বোলে। হামি তো ভাব্‌লো যে সেটা নাজানি কি জবরদস্ত পালোয়ান হোবে। গামাকে মারে; কিঙ্করকে পিটে দেয়—হেঃ, হেঃ, হেঃ"—দরোয়ানজি খুব একচোট হেসে নিলে।

বুড়োর হাসিতে মণ্টু চটে বল্লে—"এত হাস্‌বার কি আছে? একটা ঘুসী লড়াইয়ে গোরা অমন দশ পনরটা কুস্তীগির পালোয়ানকে মেরে ফ্লাট্‌ করে দিতে পারে। তুমি তার জান কি?"

দরোয়ানজি গম্ভীর ভাবে বল্ল "হামি আর কি জানে! হামি তো আজ পচা-শ বর্স কলকাতায় রয়েছি আর তার আগে পন্দ্রা বর্স পল্টন মে কাম করেছি; হামি তো অনেক দেখ্‌লো, অনেক শুন্‌লো।" এই বলে খানিক চুপ করে, বুড়ো হঠাৎ মণ্টুর দিকে ফিরে বল্ল, "একদিকে কিঙ্কর সিং অন্য দিকে—বন্দুক সঙ্গীন বাদে—এক পল্টন গোরা দাঁড় করিয়ে দাও। কিঙ্কর এক এক রদ্দায় দশ বিশটাকে জখম করে, পল্টনকে পল্টন দু ঘণ্টায় সাফ্‌ করে দেবে! আরে কিঙ্কর ত মরে গেলো, গোলাম, আলিয়া, ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ে, সব ত মরে গেলো, এখন বোক্সিং এল লড়াই করতে, হাঃ!"

মণ্টু বেশ তিলকে তাল করে বাড়িয়ে বল্‌তে পারত, কিন্তু দরোয়ানজির একা কিঙ্কর এক পল্টন গোরা সাফ্‌ করার বহর দেখে সে বেজায় দমে গেল। তাই দেখে গণেশ মহাখুসী হয়ে দরোয়ানজিকে জিগ্‌গেস কল্লে—"জমাদার, ভেট্‌কুয়ার কে ছিল?

"আরে ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ের নাম শুনোনি? আড়্‌টাই (আড়াই) প্যাঁচ ভেটকুয়ার—তার দু প্যাঁচ ছিল হাত পা সব লাগিয়ে, আর আধা প্যাঁচ ছিল হাত লাগান বাদে। এই আড়্‌টাই প্যাঁচে সে দুনিয়া ফতে করেছিল। শুন্‌বে তার কথা?"

"হাঁ, হাঁ, শুন্‌বো" সবাই বলে উঠলো। দরোয়ানজি তখন গোঁফে তা দিয়ে সোজা হয়ে বসে বল্‌তে লাগলো।

বলম্‌বটেরের লওয়াব (নবাব) ছিল একটা ভারী বড়ো লওয়াব। তার ছিল বড়ো বড়ো হাথি, হাজার হাজার ঘোড়া, সিপাহি পল্টন তোপা তমঞ্চা, আরো কতো কি। আর ছিল তার এক পালোয়ান, হাথি রমজান। সেটা দেখতে ছিল একটা হাথির মতো আর তার গায়ে জোর ছিল দুটো হাথির সমান। তার সঙ্গে কুস্তীতে কেউ পেরে উঠত না। জয়পুর, ঢোলপুর, মুলতান, লাহোর, সব দেশের পালোয়ান তার কাছে লড়তে এসেছিল। রমজান লড়তে নেমে এদিকে লাফিয়ে ওদিকে কুঁদে দুই হুম্‌কি মেরে, তিন পাঁয়তারা কসে, ঠিক বাঘের মতো গির্জ্জয়ে, অন্য পালোয়ানটার ঘাড়ে পড়ত আর দুটো হাথির শুঁড়ের মতো লম্বা হাতে জড়িয়ে তাকে কাবু করে এক আছাড়ে চিৎ করে ফেল্‌তো। আছাড়ের চোটে কতো পালোয়ানের হাথ্‌ গোড় ভেঙ্গে চুরে যেতো।

শেষে ভয়ে কেউ তার সঙ্গে লড়তে চাইত না। না লড়তে পেয়ে রমজান ঠিক বুনো বাঘের মতো হয়ে গেলো। সে আজ এর বাড়ীর দেয়াল ধাক্কা মেরে ফেরে ফেলে দেয়, কাল আর কারুর গাড়ী ঘোড়া উল্টে দেয়, এই মত করে সহরে বড়া অত্যাচার লাগিয়ে দিলো। শেষে যখন সহরের লোক সব মিলে লওয়াবের কাছে লালিশ (নালিশ) কর্‌লো, তো তখন লওবাব হুকম্‌ দিলে রমজানকে মোটা মোটা শিক্‌লি দিয়ে বেঁধে রাখতে। সকাল বিকাল সেই শিক্‌লি ধরে চারটে হাথি রমজানকে টহ্‌লাতে নিয়ে যেতো।

অনেক দিন গেলো, সন্তুপুরের রাজার গদ্দি হোলো। সে খুব ধুম, কত তামাসা, নাচ গান, খেল ঠেট্‌র, কত্তো কিচ্ছু হোলো। কত দেশের রাজা উজির লওয়াব ওমরাহ এল সে সব দেখতে। আর সেই সময় এল সেই বলম্‌-বটেরের লওয়াব। লওয়াব ত যা দেখে তাতেই বলে "বেশ, বেশ, তবে হামার রাজত্বে এ সব অন্যো রকম আছে। কি রকম আছে জিগেস্‌ কল্লে সে কিচ্ছু বোলে না, শুধু হাসে। সব শেষের দিন হোলো দঙ্গল।

—লালু বল্লে, "দঙ্গল আবার কি!"

দরোয়ানজি বল্লে, "দঙ্গল মানে কুস্তীর ভারী লড়াই, অনেক লোক লড়ে, যে জিতে যায় সে এক ঘড়া টাকা আর শাল দোশালা অনেক কিছু পায়।"

—মণ্টু বল্লে, "ও বুঝেছি। টুর্‌নামেণ্ট।"

দরোয়ানজি বল্লে 'তা হোবে'—বলে বলতে লাগলো—"রাজার বড় পালোয়ান ভুট্টা সিং আর তার দুই সাগির্দ (চেলা) ত অনেক খেল অনেক কুস্তী দেখালো। রাজা খুসী হয়ে তাদের বখশীস্‌ করে, লওয়াবকে বল্লে "লওয়াব সাহেব, কুস্তী কেমন হোলো?" লওয়াব বল্লে, "বেশ, বেশ, তবে হামার দেশে এ সব অন্যো রকম হয়।"

রাজা অবাক হয়ে বল্লো, "সে কি হুজুর, কুস্তীর আবার অন্যো রকম কি হোবে?" লওয়াব ত কিচ্ছু বল্লে না, শুধু হাসলো।

রাজা চটে বল্লে, "লওয়াব সাহেবের দেশে সবই নতুন, সেখানে কুস্তীও আজব গোছের কিছু হোবে।"

লওয়াব বল্লে, "বিশ্বাস না হয় আপনার পালোয়ানদের পাঠিয়ে দেবেন, তাদের নতুন রকম কুস্তী শিখ্‌লিয়ে (শিখিয়ে) দেবো।"

রাজা বল্লে "হাঁ? তবে আলবাত্‌ আমার পালোয়ান সব সেখানে যাবে। আপনি তাদের শিখলাবার বন্দোবস্ত করুন।"

লওয়াব বল্লে, "বেশ, বেশ। তাই হোবে।" বলে একটু হাসলো।

তারপর কিছু দিন গেলো। রাজার হুকুমে পালো-য়ানেরা দিন দশ দশ হাজার ডন বৈঠক, দৌড়, কুস্তী, চালাতে লাগলো। শেষে যখন তারা বল্লে, "হুজুর, অন্‌-দাতা সব তৈয়ার" তখন রাজা তাদের লোক লস্কর সমেত

পাঠিয়ে দিলে বলম্‌বটের সহরে। সেখানে নওয়াব ত তাদের খুব খাতির করে থাকার খাওয়ার দেখার, সব বন্দোবস্ত করে দিলে। দু চার পাঁচ দিন যাবার পর রাজার বড়ো পালোয়ান ভুট্টা সিং একদিন মস্ত পাগড়ী বেঁধে নওয়াবের দরবারে গিয়ে লম্বা সেলাম ঠুকে বল্লে, "হুজুর সরকার, এবার হুকুম হোক্ আমাদের কুস্তীর লড়াইয়ের।"

নওয়াব বল্লে, "বেশ, বেশ, কাল হোবে।"

তার পরদিন বিকালে নওয়াবের দরবারের সাম্‌নে কুস্তীর জায়গা ঠিক হোলো। হাথি রমজানের লড়াই দেখতে মুল্লুক শুদ্ধ লোক জড় হোলো। চারিদিকে সোরগোল, চারিদিকে ঠেলাঠেলি, সবাই সাম্‌নে এগোবার চেষ্টা করছে, এমন সময় কাড়া নাক্কাড়া শিঙ্গা বেজে উঠলো। সিপাহি সোয়ার চারিদিকে ছুটল। দেখতে দেখতে নওয়াব সাহেবের সওয়ারি এসে পড়ল। চারিদিকে লোক ঝুঁকে কুর্ণিশ করে একেবারে চেঁচিয়ে বন্দেগী জানালো, তারপর সব চুপ।

নওয়াব এসে কুস্তীর আখড়ার ধারে সিংহাসনে বসলো। খিদমতগার, খাওয়াস্, চামর বরদার সব চারিদিকে ছুটাছুটি করে তার আরামের বন্দোবস্ত করলে। নওয়াব একটু জিরিয়ে নিয়ে গম্ভীর ভাবে বল্লে, "সত্তুপুরের পালোয়ানরা কোথায়?"

"হুজুর খোদাবন্দ" বলে লম্বা সেলাম ঠুকে ভুট্টা সিং এসে দাঁড়ালো।

"তোমরা আমার সহর দেখছ কেমন? এখানে থাক্‌তে কষ্ট হচ্ছে না তো?"

"হুজুরের সহর তো দুনিয়া মশুর (প্রসিদ্ধ) আর হুজুর সরকারের মেহেরবাণী (কৃপা) যার উপর পড়েছে তার সুখের সীমা নেই, সে কথা এ বান্দা হর্‌ঘড়ি (প্রতি মুহূর্ত্তে) বুঝেছে।" নওয়াব খুসী হয়ে বল্লে—"বেশ, বেশ, তবে আর কিছুদিন আরাম করো, তারপর দেশে ফিরে যাও।"

ভুট্টা সিং ফের ঝুঁকে লম্বা সেলাম ঠুকে বল্লে—"যো হুকুম খোদাবন্দ। তবে গোস্তাকি মাফ (অপরাধী ক্ষমা) করলে এ গোলাম একটা আর্‌জি পেশ (নিবেদন) করে।"

নওয়াব বল্লে, "বেশ, বেশ, নির্ভয়ে বলো।"

পালোয়ান বল্লে, হুজুর, রাজা সাহেবের হুকুম ছিল ঐখানের কুস্তী দেখে যেতে।"

নওয়াব এ কথা শুনে একটু হাসলো। তারপর খানিক চুপ করে তামাক টানলো। চারিধারে একেবারে চুপ, কেউ কথা বলে না। তারপর নওয়াব বল্লো, "তোমাদের কি প্রাণের মায়া নেই। হাথি রম্‌জানের হিম্মতের কিছু খবর রাখো?"

ভুট্টা সিং ফের লম্বা সেলাম ঠুকে বল্লে, "হুজুর এ বান্দার জান (প্রাণ) তো মনিবের হাতে। আর গোস্তাকি মাফ করবেন, অনেক পালোয়ানের হিম্মৎ আমি দেখেছি, না হয় রম্‌জানেরটাও দেখে নেবো।"

এই কথা শুনে নওয়াবের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠলো। সে একবার সিংহাসনের হাতলে ভর দিয়ে চোখ লাল করে তল্‌ওয়ার মুঠিতে চেপে ধরে, পালোয়ানের দিকে ঝুঁকলো, তারপরই একটু হেসে বল্‌লো—"বেশ, বেশ, তবে তোমরা সব তৈরী হও, আমি তোমাদের শিখ্‌লাবার (শিক্ষা দেবার) বন্দোবস্ত করছি।" এই বলে নওয়াব জোর গলায় হুকুম দিলে—"রমজানকে হাজির করো।" বলে সে সিংহাসনে ঠেস দিয়ে গম্ভীরভাবে তামাক খেতে লাগলো।

সত্তুপুরের পালোয়ানরা তৈরী হয়ে আখড়ায় নামলো। ওস্তাদের লম্বা চৌড়া শরীর, প্রকাণ্ড বুক, লম্বা হাত, মহিষের মত ঘাড়। সে আখড়ায় নেমে একবার সেখানের মাটি মাথায় ঠেকালে, তারপর নওয়াবকে সেলাম করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুকের উপর হাত গুটিয়ে, যে পথে হাথি রম্‌জান আসবে, সেদিকে তাকিয়ে অচল হয়ে রইলো। তার সাগির্দরাও ঠিক তারই মতো সব করলো।

অল্প দেরী হোলো, তারপর হঠাৎ দূরে একটা ভয়ানক চেঁচামেচি সোরগোল শোনা গেল। আওয়াজটা এগিয়ে আসতে ক্রমে দেখা গেল যে রাজার সড়ক (রাজপথ) দিয়ে চারটে হাথি আর একদল বর্শা বল্লমধারী সিপাহি বিষম সোরগোল আর হুড়াহুড়ি করতে করতে আসছে। আরো কাছে এলে দেখা গেলো যে, ডাইনে দুই হাথি, বাঁয়ে দুই হাথি, শিকৃলি ধরেছে আর তার মাঝে সেই শিকৃলিতে বাঁধা হাথি রম্‌জান গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে চলে আসছে। তার দাপটে, শিকৃলি জঞ্জীরের ঝন্‌ঝনাতে আর সিপাইদের "হঠ্ যাও, হঠ্ যাও" চীৎকারে, পথের দু'ধারের লোক প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। এই রকম গোলমাল করতে করতে রম্‌জান কুস্তীর আসরে এসে পৌছালো।

পাঁচ হাথ লম্বা, চার হাথ ছাতীর বেড়, ছয় মণ ওজন, লাল ভাঁটার মতো দুই চোখ,—তার উপর সে দুটো ক্রমাগত ঘুরছে—বাঘের মতো মোছ (গোঁফ)। তারপর লড়াইয়ের নামে সে ক্ষেপে রয়েছে, তার গায়ের লোম খাড়া, আর সে ক্রমাগত গজরাচ্ছে আর দাঁতে দাঁত ঘসছে ঠিক যেন একটা হাথি মস্ত্ (মত্ত) হয়েছে। আসরের ধারে এসে সে প্রথমে নওয়াবকে সেলাম করলে, তারপর এদিক ওদিক মাথা ফিরিয়ে খুঁজতে লাগলো, কে চায় তার সঙ্গে লড়তে।

সত্তুপুরের পালোয়ানেরা তার নজরে পড়তেই সে কোমরের শিকৃলিতে টান মেরে, সেদিকে ঝুঁকে, বেশ ভাল করে তাদের দেখে নিলে। দেখা হয়ে গেলে হঠাৎ সে ভয়ানক জোরে হো হো করে হেসে উঠলো, আর তার পরেই মুখ চোখ লাল করে ঘাড় বেঁকিয়ে বুক ফুলিয়ে ভীষণ গর্জ্জন করে সত্তুপুরের পালোয়ানদের দিকে লাফিয়ে এগোবার চেষ্টা করলে—ঠিক যেন একটা বুনো বাঘ শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ছে।

তার চেহারা দেখে আর গর্জ্জন শুনে চারিধারের লোকের মধ্যে ভয়ের চিৎকার গেলো, আর সত্তুপুরের পালোয়ানদের মধ্যে এক ওস্তাদ বাদে আর সবাই পালিয়ে ভেগে গেলো। ওস্তাদেরও মুখ সাদা, গায়েও ঘাম ছুটছে, কিন্তু সে ইজ্জৎ বাঁচানর জন্যে তখনো দাঁড়িয়ে রইলো। চারিদিকে যখন এই মতো গণ্ডগোল, তখন নওয়াব সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে জোর হেঁকে বল্লো—'খবরদার বেয়াদব বেতমিজ, চুপ রও।

মনিবের তাড়া খেলে ডালকুত্তা যেমন চুপ হয়ে যায়, তেমনি নওয়াবের ধমকে রমজানও আড়ষ্ট হয়ে গেলো। নওয়াব খানিক তার দিকে কট্‌মট করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, ফের এসে বসলো। বসে হুকুম দিলে—"লোহারকে বোলো শিকলি খুলে দিতে।" লোহার গিয়ে শিকলি খুলে দিলে। মাহুতরা হাথি নিয়ে দূরে সরে দাঁড়ালো। রম্‌জান চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

নওয়াব হুকুম্ দিলে—"হাথ মিলাও।"

কট্‌মট্ করে তাকাতে তাকাতে, ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে, রম্‌জান আস্তে এগিয়ে ভুট্টা সিংয়ের দুই হাত চেপে ধরলে।

নওয়াব বল্লে "তফাৎ যাও"। রম্‌জান সরে দাঁড়াল! নওয়াব ফের ভুট্টা সিংকে জিগেস কল্লে,"—কি, লড়্‌বে তুমি? ওস্তাদের তখন মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না, সে মাথা ঝুঁকিয়ে বুঝালো যে সে লড়্‌তে চায়।

নওয়াব একবার মুখ বেঁকিয়ে বল্‌লে—"রমজান, লড়ো"। হুকুম্ পাবামাত্র রম্‌জান বাঘের মতো গর্জিয়ে, তোপের মত আওয়াজ করে তাল ঠুকে ভীষণ দাপটের সঙ্গে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আখড়া তোলপাড় করে ফেল্লে। সত্তুপুরের ওস্তাদ তাল ঠুক্‌বার, পাঁয়তারা কষবার চেষ্টা কল্লে, কিন্তু তখন তার ধড় থেকে জান্ বেরোবার মতো হয়েছে, পা আর চলে না, হাত আর নড়ে না।

দুচার দশবার লাফালাফি করে হঠাৎ মোড় ঘুরে ভয়ানক তেজে হুম্‌কী দিয়ে রম্‌জান ভুট্টা সিংহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভুট্টাসিং ঝুঁকে, দু'পা ফাঁক করে, হাথ এগিয়ে রম্‌জানের হম্‌লা (আক্রমণ) সাম্‌লাবার চেষ্টা কর্‌লো। কিন্তু তার হাথ পুরো এগোবার আগেই রম্‌জানের দুই লম্বা হাথ তার ঘাড় গর্দ্দান বেড়িয়ে, পিঠের উপর দিয়ে ঘুরে, তার দুই বাজু চেপে ধর্‌লো। তাকে এরকম করে ধরে রম্‌জান খানিক চুপ করে দাঁড়ালো। তারপর দুই ঝাঁকিতে সত্তুপুরের ওস্তাদের পা মাটি থেকে ছাড়িয়ে এক ঝট্‌কায় তাকে মাথার উপর শূন্যে তুলে ধর্‌ল! চারিধার তখন চুপ, সবাই দম্ বন্ধ করে দেখছে যে কি হয়।

তারপর 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে রম্‌জান ভুট্টা সিংকে জোরে আছ্‌ড়িয়ে ফেলে দিলো।—ভুট্টা সিং দাঁতে দাঁতে লেগে বেহুস অবস্থায় চিৎ হয়ে পড়ে রইলো।

নওয়াব হুকম্ দিলে—"হাথি লাও, রম্‌জান্‌কে শিকলি বাঁধো। আর একে ডুলিতে কোরে নিয়ে গিয়ে হকিম বৈদ্ (বৈদ্য) দেখাও।"

দুদিন পরে ভুট্টা সিংএর জ্ঞান হোলে সত্তুপুরের রাজার লোকেরা তাকে নিয়ে দেশে ফিরলো। সাগির্দরা তো পালিয়ে গিছলো, তারা সরমের (লজ্জার) দরুণ আর দেশে ফিরলো না।

নওয়াব রাজাকে চিঠ্‌ঠি দিলো—"হুজুরের পালোয়ানকে ঠিক মত কুস্তী শিখ্‌লাতে পারলাম না। এ লোকের সাহস আছে কিন্তু এ নেহাৎ কমজোর, একজন জোয়ান মরদ্ যদি পাঠাতে পারেন তো তাকে শিখ্‌লিয়ে দেবো।"

চিঠি পেয়ে রাজার মাথা হেঁট হোলো। রাজা সভাসদ সকলকে বল্লে—"দশ হাজার লাগে পঞ্চাশ হাজার লাগে, রমজান্‌কে হারাতে পারে এমন পালোয়ান চাই। এ অপমান শোধ না নেওয়া পর্য্যন্ত আমি মাথায় পাগড়ি লাগাব না।"

—এত দূর চলে দারোয়ানজি একটু দম নিলে। এই সুযোগে কালু মণ্টুকে বল্লে "কিরে, তোর ব্যাট্‌লিং প্যাট হাতি রমজানের সঙ্গে পারতো?"

মণ্টু একটু দমে গিয়েছিল। সে ঢোক গিলে বল্লে—প্যাট তো মিড্‌ল ওয়েট, সে পারতো না, তবে ডেম্পসি কিম্বা টুনি হলে কি হোতো বলা যায় না।'

দারোয়ানজি জিগেস কল্লে "ডেম্‌সি কে"

কালু বল্লে "সে মার্কিন দেশের এক মস্ত ঘুষো লড়িয়ে।"

দারোয়ানজি বল্লে, "হোঃ, মার্কিন! রমজান তাকে ঠিক মার্কিন কাপড়ের মতো ফেড়ে দুই টুকরো কোরে দিতো।"

গনেশ বল্লে "হাঁ হাঁ তা হবে। তারপর কি হোলো বলো না।" দারোয়ান বল্লে, "রও বাবা, একটু খইনি খাইয়ে লিই।"—বলে একটু খইনি মুখে দিয়ে সে ফের আরম্ভ কল্লে—"তারপর ত সত্তুপুরের রাজার লোক চারিদিকে ছুট্‌লো। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, মূলতান, আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, বম্বাই, সব দেশ লোক গেলো কিন্তু কোনও পালোয়ান রমজানের সঙ্গে লড়তে রাজী হোলো না; সবাই বলে "জিতলে তো অনেক পাবো, কিন্তু মরে গেলে জান ফিরে দেবে কে?"

এদিকে সত্তুপুরে রাজ (রাজত্ব) ত অচল হোয়ে গেলো। রাজার মাথায় পাগড়ী নেই, কাজেই দরবার হয় না, লোক সব হয়রান হয়ে গেলো।

কিছুদিন যায়, তারপর একদিন সত্তুপুরে এক সন্ন্যাসী এলো। সন্ন্যাসী যেখানে যায় সেখানেই হায় হায় শোনে, শেষে সে একদিন জিগেস কর্‌লে, হয়েছে কি। তাকে লোকে সব কথা বল্‌তে সে বল্লো—"আচ্ছা, এর উপায় আমি করছি।" এই বলে সে সটান রাজার সাম্‌নে গেল। সেখানে গিয়ে সন্ন্যাসী "মহারাজের জয় হৌক" বলে আশীর্ব্বাদ করতে রাজা বল্লে "ঠাকুর! হেরে অপমান

হয়ে ত বসে আছি, জয় হবার ত কিছু লক্ষণ দেখছিনা।"

সন্ন্যাসী বল্লে, "মহারাজ আমি সব শুনেছি। কেউ রমজানের সঙ্গে লড়তে চায় না, তাও জানি। তবে যে লোক লড়তে পারে তার কাছে লোক গিয়েছিল কি ?"

রাজা, উজির, সর্দ্দার সবাই মুখ উঁচিয়ে জিগেস কল্লে, "কে সে বাহাদুর মরদ ?"

সন্ন্যাসী বল্লে, "নেপালের সেরা ওস্তাদ ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ে ; সে জানে আড়্‌-ঢাই প্যাঁচ, তার দেড় প্যাঁচে সে তুনিয়ার সব পালোয়ানকে হারিয়েছে, তার হাতে আছে এখনো পুরা এক প্যাঁচ।"

রাজা এ কথা শুনে উজীরের মুখের দিকে তাকালো। উজীর বল্লে, "আড-ঢাই প্যাঁচ ভেট্‌কুয়ারের নাম আমরা শুনেছি। তবে সে ওস্তাদ কারুর কথার বা খাতিরে লড়ে না, তাই তার কাছে লোক যায় নি।"

সন্ন্যাসী একটু হেসে বল্লে, "ঠিক। তবে সে আমার ভক্ত, আর মহারাজের বাপও আমাকে ভক্তি করতেন, কাজেই আমি এর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" এই বলে সন্ন্যাসী তার গায়ের বাঘছাল থেকে অল্প চারটি লোম ছিঁড়ে নিলো আর ঝুলী থেকে একটা শুকনো আমলকী বার কল্লে। এইগুলো রাজার হাতে দিয়ে সে বল্লে— "তোমার লোকের মারফৎ এক চিঠি আর এই নিশান (চিহ্ন) দাও পাঠিয়ে ভেট্‌কুয়ারকে, আর চিঠিতে লিখো যে, বাবা টঙ্করনাথের হুকুম্, তুমি হাজির হও।"

এই বলেই "মহারাজের জয় হোক" বলে সন্ন্যাসী হন্ হন্ করে চলে গেলো। না নিল ভিক্ষা, না নিল দান। যা হোক সে দিনই ত সত্তুপুর থেকে লোক রওয়ানা হোলো নেপালে। দু তিন হপ্তা পরে সে সব লোকজন এলো ফিরে, আর তাদের সঙ্গে এলো ভেটকুয়ার পাঁড়ে।

সাড়ে তিন হাত লম্বা মানুষটা, তার মাথায় দেড় হাত পাগড়ী, তিন হাত ছাতীর বেড়, জাংঘ বরাবর হাত, ছোট ছোট বেঁকা পা—তার ধড়্‌টা যেন পাঁচ হাত লম্বা জোয়ানের মত; পা দুটো যেন ছোট ছেলের, মুখে শিকারী বিল্লির মত মোছ আর উঁচু হাড্ডিদার গালের উপর ছোট ছোট চোখ। কথায় কথায় সে হাসি, আর হাস্‌লেই তার চোখ যায় লুকিয়ে, এই রকম ত ভেটকুয়ার পাঁড়ের চেহারা। সে যখন সভায় এসে সেলাম করে "মহারাজ কি জয় হোক" বলে দাঁড়াল, তখন সভাশুদ্ধ লোক ত তাকে দেখে অবাক।

ভেটকুয়ার পাঁড়ে ব্যাপার বুঝে একটু হেসে বললো, "আমার আছে আড্‌-ঢাই প্যাঁচ। এ পর্য্যন্ত দেড় প্যাঁচের বেশীর খরিদ্দার জোটেনি। হুজুরের কৃপায় পুরা আড্‌-ঢাই প্যাঁচের খরিদ্দার পাইতো খুসী হয়ে দেশে ফিরে যাব।"

এ কথায় রাজার ভরসা বাড়লো। সে তখনি পাঁড়েজির দরুণ বলম্‌বটেরের লওয়াবের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিল। চিঠিতে লেখা ছিলো—"শিখ্‌বার জন্যেও যাকে আপনার কাছে পাঠালাম তাকে তো আপনার পালোয়ান যা জানে তাই শিখ্‌লালো। এখন আপনার পালোয়ানকে শিখ্‌লাবার জন্যে আমার কাছে লোক মওজুদ। যদি হুজুরের অনুমতি হয় তো তাকে পাঠাই।

লওয়াব চিঠি পড়ে রেগে লাল হয়ে উঠ্‌লো। তারপর একটু হেসে জবাব দিলো, "বেশ, বেশ। ওস্তাদকে পাঠিয়ে দিন। যদি হুজুরের দেশে রমজানকে শিখ্‌লাবার মতো ওস্তাদ কেউ থাকে তো সে শিখিয়ে যাবে। শিখ্‌লাবার মতো জ্ঞান যদি তার না থাকে তা হলে সে ফিরে যাবে কিনা সন্দেহ।"

রাজা ভেট্‌কুয়ারকে জবাব পড়ে শুনালো। শুনে পাঁড়েজি চোখ মুছে দাঁত বার করে হেসে বল্লো—"সবই তো বাবা টঙ্করনাথের হিচ্ছা (ইচ্ছা)! শিখ্‌তে হয় শিখবো শিখলাতে হয় শিখলাবো।" তারপর লোক-লস্কর সঙ্গে নিয়ে ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ে একদিন বলম্‌বটেরের দরবারে হাজির হোয়ে সেলাম কল্লে।

তার সাড়ে তিন হাথ শরীরের উপর দেড় হাথ পাগড়ী এই অদ্ভুত চেহারা দেখে লওয়ারের দরবার শুদ্ধু লোক তো হেসে উঠলো। ভেট্‌কুয়ার এদিক ওদিক দেখে, লওয়াবের দিকে ফিরে চোখ বুজে, দাঁত বার কোরে খুব জোরে হাসলো। তার হাসির চোটে সবাই অবাক হয়ে চুপ করে গেলো। তখন সে ফের লওয়াবকে সেলাম করে বল্লে— আমাকে দেখে হুজুর আর হুজুরের দরবারের সকলের এত আনন্দ হয়েছে দেখে বড্ড খুসী হলাম। এখন সরকার (প্রভু) আজ্ঞা করুন আপনার পালোয়ানও আমায় খুসী করুক।"

লওয়াব বল্লে—"বেশ, বেশ, কালই হোবে।"

পরদিন আবার সেই আগেকার মত ভিড় গণ্ডগোল বাধলো। আবার লওয়াব এসে ভেট্‌কুয়ারকে লড়বে কিনা জিগেস কল্লে। তারপর তাকে তৈরী হতে বলে, রমজানকে আনতে হুকুম দিলে।

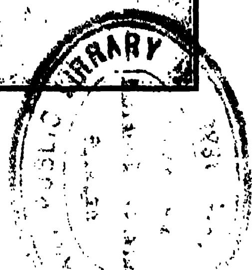
ভেট্‌কুয়ার যখন তৈরী হয়ে আখড়ায় নামলো, তখন তাকে দেখে লওয়াবের একটু চোখ ফুটলো। লওয়াব দেখলে যে, তার পা দুটো ছোট আর বেকা; কিন্তু তার বদনটা (দেহ) অসম্ভব হিম্মতি জোয়ানের। তার ঘাড় গর্দ্দান, ছাতি পিঠ সব যেন পেটা লোহার তৈরী, আর সব জায়গায় যেন বড় বড় সাপ খেলে বেড়াচ্ছে। তার হাথ দুটো ত যেন দুটো জ্যান্ত অজগর সাপ।

কালু বল্লে, "সাপ কিরে ? কি বলে !"

মণ্টু তাচ্ছিল্য করে বল্লে—"বুঝলি না। মস্‌ল্ প্লে।"

দরোয়ানজী তাদের দিকে একটু তাকিয়ে ফের বলতে লাগলো—"এদিকে হাথিতে ঘেরা রমজান্ তো হুল্লোড় করতে করতে এগিয়ে এলো। পাঁড়েজি সে দিকে দেখে গম্ভীরভাবে লওয়াবকে বল্লে— হুজুরের দেশে বুঝি কুস্তীর আগে ভালুক নাচের রীত আছে ? আমাদের দেশে তো মানুষ ভালুক নাচায়, হুজুর তো দেখি হাথিকে ভালুক নাচান শিখলিয়েছেন।"

কি চাই?




MOR

তারপর রমজান্ এসে পৌঁছে ত গর্জ্জন লাফ্‌ঝাপ্ দাঁতে দাঁত ঘসা আরম্ভ করলে। ভেটকুয়ার মোছে (গোঁফে) তা দিতে দিতে বেশ মন দিয়ে তাকে দেখতে লাগলো, ঠিক্ যেন সে একটা চিড়িয়াখানায় নতুন জানাওয়র্ (জানোয়ার) দেখছে।

রম্‌জানের শিকলি খোলা, হাথ মিলানো সবই হোলো। ভেটকুয়ার বেশ সহজ ভাবেই সব করলো; তারপর লওয়াবের হুকমে যখন রমজান্ লড়্‌তে নেমে লাফাঝাপি গর্জ্জন আরম্ভ কোরলো তখন ভেট্‌কুয়ার তার দিকে ফিরে চোখ মুজে দাঁত বার কোরে খুব হেসে উঠ্‌লো যেন সে কতই আমোদ পাচ্ছে। হেসেই সে হাততালি দিয়ে তালে তালে বোলতে লাগ লো—'বাহ্‌রে বেটা, বাহ্, বাহ্, নাচে ভালু নাচে ভালু, নাচে মেরে ভালুয়া।'

আসর শুদ্ধ লোক ত অবাক! রমজান্‌তো এম্নিতেই ক্ষেপে ছিলো। এসব দেখে শুনে সে আরও ভয়ানক বেগে ক্ষেপে, হাঁ করে গর্জ্জন করে, রাচ্ছসের (রাক্ষসের) মতো হুমকি দিয়ে ভেট্‌কুয়ারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

পাঁড়ে সট্ কোরে—যেন ডুব মেরে—রমজানের পায়ের ভিতর দিয়ে গলে পেছনে চলে গেলো,—যেন ছু মন্তর্, এই ছিল সামনে, এই গেল পেছনে। পেছনে গিয়ে ছোট এক পা তুলে রমজানের পেছনে এক লাথি লাগালো। লাথির চোটে আর নিজের বেগ না সাম্‌লাতে পেরে রমজান্ গদ্দাম করে পড়ে গেলো। তা দেখে ভেট্‌কুয়ার লওয়াবের দিকে ফিরে, চোখে মুঁজে, বত্তিশটা দাঁত বার কোরে,বিনা আওয়াজে হাসতে লাগ্‌লো, মনে হোলো যেন সে লওয়াবকে ভেংচাচ্ছে।

আছাড় খেয়ে রমজানের চেঁচান বন্ধ হোলো। সে মুখ বন্ধ করে দস্তুর মাফিক লড়্‌তে লাগলো। কিন্তু কি করবে? ভেট্‌কুয়ার ঠিক ভেল্কী বাজির মতো সড়াক্ সড়াক্ এদিক ডুব ওদিক গোঁত্তা খেয়ে তাকে এড়িয়ে প্যাঁচ ছাড়িয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

—মণ্টু বল্লে 'সাইড ষ্টেপিং। লোকটা নিশ্চয় বক্সিং জানতো।'

দরোয়ানজি চটে বল্লে 'ফের বোক সিং! সে বেটা কুস্তীর কি জানে? বোক সিংএর বাপ এলেও এরকম লড়্‌তে পারতো না। শুনবে তো শোনো।'

কালু বল্লে "হাঁ, হাঁ, শুন্‌বো! মণ্টু, তুই চুপ কর।"

দরোয়ানজি বলতে লাগ্‌লো—এই মতো লড়াই চল্লো। যদিই বা রমজান্ কোনও রকমে ভেট্‌কুয়ারের বদনের কোথাও হাথ লাগায়, তো সেখানে ঠিক যেন সাপ কিল্‌বিল্ করে খেলে উঠে আর রমজানের হাথ খুলে যায়। আর ভেট্‌কুয়ার সরে গিয়ে কেবল লাথি চালায় আর হাসে। হাথ একবারও উঠায় না। খানিকক্ষণ এরকম হবার পর রমজান্ আর নিজেকে সাম্‌লাতে পারলোনা, সে আবার গর্জ্জন করে, দুহাথ বাড়িয়ে ভেট্‌কুয়ারের উপর লাফিয়ে পড়লো, যেন সে তাকে চেপে পিষে মার্‌তে চায়।

রমজানের লাফানোর সঙ্গে সঙ্গে "জয় বাবা টঙ্করনাথ" বলে চেঁচিয়ে ভেট্‌কুয়ার, ঠিক বিজ্‌লীর চমকের মত, এক গোঁৎ খেয়ে রমজানের দুই পায়ের মাঝে ঝুঁকে নিজের ঘাড় ঢুকিয়ে দিলে, দেখে মনে হোলো যেন রমজান্ তার পিঠে সওয়ার হয়েছে। তারপর পলকের মধ্যে এক ভীষণ ঝট্‌কায় সে সোজা হোলো, আর রমজান্ ঠিকরে আস্‌মানে উঠে তিন চার ঘুমণ্ডি (ডিগ্‌বাজী) খেয়ে গদ্দাম করে আছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়্‌লো।

তখন ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ে লওয়াবের সামনে এগিয়ে এসে ঝুঁকে সেলাম ঠুকে বল্‌লে—"হুজুর, ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ে তো জানে আড়্‌-ঢাই প্যাঁচ, আধা প্যাঁচ তো সরকারের পালোয়ান চিৎ হয়ে গেলো, এখন হুকুম্ হোক জনাবের, অন্য কেউ আসুক বাকী দুই প্যাঁচ তাকে শিখলায়ে দি।"

লওয়াব ত এতক্ষণ মন্তর-ফুকা সাপের মতো আড়ষ্ট হয়ে ছিলো। পাঁড়েজির কথায় উঠে বসে সে তার তারিফ (প্রশংসা) করে, তাকে শাল, দোশালা দিয়ে বল্লে—"আমি তোমার কুস্তী দেখে খুসী হয়ে গেছি। তুমি ফিরে যাও। আমি রাজা সাহেবকে চিঠি দিচ্ছি।"

ভেট্‌কুয়ার চিঠি নিয়ে সন্তুপুরে ফিরে এলো। চিঠিতে ছিলো—"যে শিখতে এসেছিলো সে শিখে গিয়েছে। যে শিখ্‌লাতে এসেছিলো সে শিখলিয়ে গিয়েছে। সাবাস্ হুজুর! আমি আস্‌বো হুজুরের সঙ্গে হাত মিলাতে।"

রাজা চিঠি পড়ে ভেট্‌কুয়ারের পাগ্‌ড়ীতে নিজের শির-প্যাঁচ লাগিয়ে দিলো। তারপর তাকে দশ হাজার মোহর, শাল দোশালা, জওহরাৎ (মণিমুক্তা) ইনাম (বখ্‌সীস) দিয়ে, হাথির উপর বসিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলো।

[কার্ত্তিক, ১৩৩৪] "জগন্নাথ পণ্ডিত"

কঙ্কাল-সারথি

উঃ! ম্যালেরিয়ার মত ছ্যাঁচ্‌ড়া অসুখ পৃথিবীতে আর কিছু আছে কি? উঁহু।

এই ত্যাখনা, সখ্ করে সেদিন ঢাকুরিয়ার 'লেক' দেখতে গিয়েছিলুম, সন্ধ্যার একটু আগে। হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে আমার জ্বর এল।

সেকি যে-সে জ্বর, যে-সে কাঁপুনি? না পারি দাঁড়াতে, না পারি বসতে. একেবারে ঘাসের উপর পড়লুম শুয়ে। কি শীত রে বাপ! পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে, কাঁপতে কাঁপতে কেমন যেন আচ্ছন্নের মত হয়ে রইলুম।

সেই ভাবে কতক্ষণ ছিলুম, ভগবান জানেন। তবে

একবার চাদরের ভিতর থেকে জ্বল্-জ্বল্ ক'রে চোখ মেলে উঁকি মেরে দেখলুম, চারিদিকে গাঢ় অন্ধকারের মেলা বসেছে, কোথাও জনমানবের সাড়া নেই!

বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল। কোথায় বাগবাজারে আমার বাড়ী, আর কোথায় প'ড়ে আছি আমি, একলা। গুণ্ডায় গলায় ছুরি বসাতে পারে, সাপে কামড়াতে পারে, বিনা-চিকিৎসায় প্রাণপাখী ফুড়ুক্ ক'রে পালিয়ে যেতে পারে! বাড়ীর লোক এতক্ষণে হয়তো ভেবে সারা হচ্ছে।

আর তো এখানে থাকা চলে না! যেমন ক'রেই হোক, আমাকে আজ বাড়ী যেতেই হবে।

অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালাম। গায়ের ভিতর দিয়ে তখনো যেন আগুনের ঝলক্ ছুটছে, চোখের সাম্‌নে দিয়ে যেন রাশি রাশি সর্ষে ফুল নাচতে নাচতে একবার আঁধার-সাগরে ডুবে যাচ্ছে, আর একবার ভেসে ভেসে উঠছে! প্রতিবার পা ফেলি আর মনে হয়, এই বুঝি আমি দড়াম্ ক'রে পপাত ধরণী তলে হলুম! তবু থামলুম না, মাতালের মতন টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে চললুম।

রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে! সেই রাত্রে আমি প্রথম বুঝতে পারলুম, পৃথিবী কত বেশী স্তব্ধ হ'তে পারে। সহরের হট্টগোলে রাগ হয় বটে, কিন্তু এ স্তব্ধতাও সহ্য করা অসম্ভব! একটা ব্যাং, কি একটা ঝিঁ ঝিঁ পোকা, কি একটা পাহারওয়ালার নাক পর্য্যন্ত ডাকছে না, গাছের পাতায় বাতাসের একটু নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছে না! সারি সারি কোম্পানীর আলোর থামগুলো নীরবে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চক্ষে যেন থম্‌থমে অন্ধকারকে নিরীক্ষণ করছে! তিমির-তুলির প্রলেপ-মাখানো গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ীর পর বাড়ী দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তারাও যেন প্রেতপুরীর মতন নিস্তব্ধ—তাদের ভিতর থেকে একটা ঘুম-ভাঙ্গা খোকার কান্নার আওয়াজ পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত জেগে উঠছে না। কে যেন আজ নিদুটীর মন্ত্র প'ড়ে সমস্ত জগৎকে বোবা করে দিয়ে গেছে।

জ্বরের ঘোরে চলেছি তো চলেছিই—এই নিঃশব্দ পল্লী ছেড়ে সহরের শব্দের রাজ্যে গিয়ে পড়বার জন্যে প্রাণ যেন আই-ঢাই করতে লাগল, তবু এ পথ আর শেষ হ'তে চায় না। এ পথ যেন আজও শেষ হবে না, কালও শেষ হবে না—আমাকে যেন কোন অভিশপ্ত আত্মার মতন চলতে হবে অনন্তকাল ধ'রে। এক বেচারা ইহুদীর গল্প পড়েছিলুম। কার শাপে তাকে নাকি অনন্তকাল ধরে সারা বিশ্বে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে হয়েছিল।' আমারও তাই হ'ল নাকি?—

মাথাটা একবার নাড়া দিয়ে ভাবলুম, দূর ছাই, এ-সব কি উদ্ভট কথা ভাবছি? জ্বরে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

মাঝে মাঝে এক-একটা মাঠ—যেন এক-একটা অন্ধকারের মায়া সরোবর! সেখান দিয়ে যেন অন্ধকারের ঢেউ বইছে, অন্ধকারের স্রোত ছুটে আসছে আমাকে গ্রাস করবার জন্যে! অন্ধকারের তরঙ্গের ভিতরে গাছগুলোকে দেখাচ্ছে যেন বড় বড় দৈত্য-দানবের মত—পথিকের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে খাবার জন্যে তারা ওঁৎ পেতে প্রস্তুত হয়ে আছে! কান্না-ভরা কন্‌কনে বাতাস এসে চুপিচুপি যেন আমার কাণে কাণে বলে যাচ্ছে—ওহে নিঝুম রাতের অজানা মানুষ! এ মৃত্যুপুরীর ভিতর দিয়ে কোথায় চলেছ তুমি? আমার কথা শোনো, ভূত-প্রেতরা একে একে জেগে উঠেছে, এই বেলা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও, যাও গো!......

আরো খানিক অগ্রসর হয়ে মনে হ'ল পৃথিবীর সমস্ত শব্দ এসে আমার দুই পায়ের দুই জুতোর ভিতর আশ্রয় নিয়েছে! প্রত্যেকবার পা ফেলি, আর সেই শব্দগুলো জুতোর ভিতর থেকে চল্‌কে উঠে রাজপথের উপরে আছাড় খেয়ে প'ড়ে আমাকে চম্‌কে চম্‌কে তোলে। শব্দ শুনতে চাই, নিজের পায়ের শব্দ পাচ্ছি, কিন্তু কেন জানি না, সে শব্দ শুনে শুনে মন আমার খুসি হবে কি, আরো বেশী নেতিয়ে পড়তে লাগল!—সে যেন রাজপথে ঘুমন্ত কোন অশরীরী প্রেতাত্মার চিৎকার, আমার পদাঘাতে সে যন্ত্রণায় গজ্‌রে গজ্‌রে উঠছে!

... ...

আঃ! এতক্ষণ পরে রসা রোডের মোড়ে এসে পড়লুম। অশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ট্রামওয়ের একটা লোহার থামে ঠ্যাসান দিয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিলুম।

এখানটাও তেমনি নির্জ্জন ও তেমনি নিস্তব্ধ হ'লেও আমার মন যেন অনেকটা আরাম পেলে। এই তে ট্রামের রাস্তা, এই পথ ধ'রে সিধে গেলেই—যত মাইল দূরেই থাক্—আমাদের পাড়া বাগবাজার পাওয়া যাবেই যাবে! খানিকদূর এগুতে পারলেই লোকজনেরও সাড় পাব নিশ্চয়, আর ট্রাম ও বাস বন্ধ হ'লেও ট্যাক্সি মেলা তো অসম্ভব নয়!

তখন জ্বরে আমার চোখ ছল্‌ছল্ করছে, কাণ করছে ভোঁ ভোঁ, আর মাথা ঘুরছে বোঁ-বোঁ ক'রে! বার বার ইচ্ছে হ'তে লাগল পথের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বার জন্যে, কেবল বাপ-মায়ের বিষন্ন কথা ভেবেই মনের মুখের সে ইচ্ছা দমন করলুম, অনেক কষ্টে। নিজে-নিজেই বললুম, মন, তুমি শান্ত হও! এই পথের শেষেই আছে তোমার বাড়ী, তোমার আত্মীয় স্বজন, তোমার নরম তুলতুলে বিছানা! কোন রকমে চক্ষু মুদে এই পথটুকু পার হ'তে পারলেই—ব্যাস্, সকল কষ্ট সকল ভাবনার অবসান!

হঠাৎ দূর থেকে একটা শব্দ জেগে উঠে চারিদিকের নিস্তব্ধতার মুখে যেন ভাষা দিলে! ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্ ঘড় ক'রে একটা বাজ-ডাকার মত শব্দ আমার দিকেই এগিয়ে আসছে—তারপরেই শুনলুম ভেঁপুর আওয়াজ—ভোঁপ্, ভোঁপ্, ভোঁপ্!

ট্যাক্সি, না বাস্?

আহ্লাদে চাঙ্গা আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

তারপরেই দেখা গেল, নীচে দুটো আর উপরে একটা আলো। তিনটে আলো দেখেই বুঝলুম ট্যাক্সি নয়, বাস্ আসছে!......তাহ'লে জ্বরের ধমকে আমি ভুল বুঝেছিলুম, বাস্ যখন চলছে তখন রাত খুব বেশী হয় নি! কিন্তু আশ্চর্য্য, এরি-মধ্যে এ-অঞ্চলটা এমন ভয়ানক নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে? বাবা, আমার কল্‌কাতার গোলমাল বেঁচে থাক্, এ-অঞ্চলে আবার ভদ্রলোক বাস করে?

কিন্তু বাসের আলো অত-বেশী জ্বলছে কেন, সাম্‌নের সারা পথে সে যেন আগুণের ঢেউ বইয়ে ছুটে আসছে! আর এই নিরালা পথে অত-জোরে ভেঁপু বাজবারই বা দরকার কি, এ-অঞ্চলের সন্ধ্যের পরেই ঘুমকাতুরে লোক-গুলোর কাণে যে তালা ধ'রে যাবে!

উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ধুলোয় ধুলোয় পথ অন্ধকার ক'রে একখানা রাঙা টক্‌টকে মস্ত-বড় বাস আমার কাছে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন তীব্র, তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল,—"ধর্ম্মতলা, ওয়েলেস্‌লি, শ্যামবাজার!"

আমি তাড়াতাড়ি বাসে উঠে একখানা গদীমোড়া আসনের উপর গিয়ে ধুপ্ ক'রে বসে পড়লুম। হোক্ শ্যামবাজারের বাস্, এই শুদ্ধ মড়ার মুলুক থেকে এখন তো স'রে পড়ি, শ্যামবাজার থেকে বাগবাজার পায়ে হেঁটে যেতে এমন বিশেষ দেরি লাগবে না!

কিন্তু কেন জানি না, বাসের ভিতরে ঢুকেই আমার বোধ হ'ল, আমি যেন এক জগৎ ছেড়ে আর এক অচেনা জগতের ভিতরে প্রবেশ করলুম!

বাস ছুটছে, তার ভেঁপু বাজছে। এত বেগে বাস্ ছুটছে, তার জান্‌লাগুলো সব খোলা রয়েছে, অথচ বাহির থেকে বাতাসের একটুখানি ঝলক্ পর্য্যন্ত আমার গায়ে লাগছে না! ভারি অবাক হয়ে গেলুম। আমার জ্বর কি এত বেশী উঠেছে যে দেহের অনুভব করবার ক্ষমতাটুকুও আর নেই?

পথ তেমনি নির্জ্জন আর নিসাড়। কিন্তু বাতাসও কি আজ ঘুমিয়ে পড়েছে? আমার খালি মনে হ'তে লাগল, দমবন্ধ হয়ে সারা পৃথিবী আজ মারা পড়েছে—তারা কোথাও আর জীবনের লক্ষণ নেই। বেঁচে আছি খালি আমি ও এই বাসের ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টার।

আমরা তিনজন ছাড়া বাসের ভিতরেও কোন আরোহী ছিল না। থাক্‌বেই বা কেন? এত রাতে কার ঘাড়ে ভূত চাপবে যে বাসে চ'ড়ে বেড়াতে বেরুবে!

বাসের ভেঁপু বাজছে আর বাজছে আর বাজছে! কাণ যে ঝালাপালা হ'য়ে গেল! কণ্ডাক্টারের দিকে ফিরে বিরক্ত স্বরে বললুম, "ড্রাইভারকে বারণ ক'রে দাও। পথে লোকও নেই, গাড়ীও নেই,—তবু এত 'হর্ন' বাজছে কেন?"

লোকটা শিখ। মস্ত বড় লম্বা দেহ, মস্ত-বড় দাড়ী। সে কালা আর বোবার মত আমার পানে তাকিয়ে রইল।

আবার বললুম, "শুনছ?" 'হর্ন' দিতে বারণ কর!"

সে তবু জবাব দিলে না, ড্রাইভারকে হর্ন থামাতেও বললে না। লোকটা সত্যি-সত্যিই কালা ও বোবা নাকি? কিন্তু না, তাই বা হবে কি ক'রে? এই খানিক আগেই তো সে "ধর্ম্মতলা, ওয়েলেসলি, শ্যামবাজার" ব'লে চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করছিল!

সে বোধ হয় আমার কথার জবাব দিতে চায় না। এরা কি ভেবেছে যে এদের ভেঁপুর আওয়াজে সারা সহরের ঘুম ভেঙ্গে যাবে, আর তাহ'লেই সবাই বিছানা থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ছুটে এসে বাসের প্যাসেঞ্জার হয়ে বসবে?

কিন্তু সহর জাগবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করলে না। পথের আশেপাশে লেড়ী কুকুরগুলো আরাম ক'রে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, কিন্তু এই বাসের সাড়া পেয়েই তারা তাড়াতাড়ি উঠে, ল্যাজ পেটের তলায় ঢুকিয়ে ছুটে পালাতে লাগল—মহা ভয়ে কেঁউ কেঁউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে! আজ্‌কে বাইরের জীবের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে কেবল ঐ কুকুরগুলোর কাছ থেকে, কিন্তু তারাও দেখা দিয়েই অদৃশ্য হচ্ছে!

কুকুরগুলো কেন আমাদের বাস দেখে পালাচ্ছে? মনের ভিতরে কেবল এই প্রশ্নই জাগতে লাগল—কেন? কেন? কেন?

কণ্ডাক্টার কেন আমার কথার জবাব দিচ্ছে না— কেন? কেন? কেন?

ড্রাইভার কেন ক্রমাগত ভেঁপু বাজাচ্ছে—কেন? কেন? কেন?

... .

কণ্ডাক্টারের দিকে ফিরে বললুম, "তোমার ভাড়ার পয়সা নাও।"

সে মস্ত একখানা কালো হাত বাড়ালে। ভাড়া দিয়ে টিকিট নেবার সময়ে আমার হাতে তার হাতের ছোঁয়া লাগল—উঃ, অমনি মনে হ'ল কে যেন একখানা তীক্ষ্ণ বরফের ছুরি দিয়ে আমার হাতে খ্যাঁচ্ ক'রে খোঁচা মারলে! জ্যান্ত মানুষের হাত এমন ঠাণ্ডা-কন্‌কনে হয়!

আশ্চর্য্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম। তার লম্বা চুল আর দাড়ী গোঁফের জঙ্গলে ভরা মুখখানা বাসি-মড়ার মুখের মত স্থির। তার চোখেও পলক পড়ছে না। তার চোখ যেন পাথরে গড়া।

আমার বুকটা গুড়গুড় করতে লাগল। আজকের সহরের এই নির্জ্জনতা, পৃথিবীর এই নিঃশব্দতা, বাতাসের এই অভাব, ভাড়াটে বাসের এই ভেঁপুর আওয়াজ,

কণ্ডাক্টারের এই উদাসীন মূর্ত্তি—সমস্তই যেন রহস্যময়, সমস্তই যেন অস্বাভাবিক!

কী কুক্ষণেই আজ বাড়ীর বাইরে পা দিয়েছি!

যতবার ফিরে তাকাই, ততবারই কণ্ডাক্টারের সেই মড়ার মত স্থির মুখ আর পলক-হারা পাথুরে দৃষ্টি চোখে পড়ে! কেমন একটা অমানুষিক ভাবে আমার মনটা ছেয়ে গেল—আর সহ্য করতে পারলুম না—সামনের বেঞ্চের উপরে, দুই হাতের ভিতরে মাথা রেখে চোখ মুদে আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলুম।—ভাবলুম, শ্যামবাজারে পৌঁছবার আগে আর মাথা তুলে চাইব না!

কিন্তু মাথা তুলতে হ'ল—আবার চোখ খুলতেও হ'ল।

আধ ঘণ্টারও বেশী সময় কেটে গেছে, গাড়ীও না থেমে ক্রমাগত ছুট্‌ছে, তবু এখনো শ্যামবাজার এলো না কেন?

মুখ তুলে জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। শ্যামবাজার তো অনেক দূরের কথা, গাড়ী এখনো ভবানীপুরেই আসেনি! অথচ গাড়ী এত বেগে ছুট্‌ছে যে, পথের দু-পাশের বাড়ীগুলো তীরের মতন পিছনে স'রে স'রে যাচ্ছে! এও কি সম্ভব?

হতভম্বের মতন মুখ ফিরিয়েই দেখি, গাড়ীর ভিতরে দশ বারো জন লোক ব'সে রয়েছে! নিজের চোখকেও আমি আর বিশ্বাস করতে পারলুম না!

আমি হলপ্‌ ক'রে বলতে পারি, এতক্ষণের ভিতরে গাড়ী একবারও থামে নি। তবু কোত্থেকে এরা এল, কখন এরা গাড়ীতে উঠল?

একে একে সকলকার মুখের পানেই তাকিয়ে দেখলুম, সব মুখই মড়ার মতন স্থির, নির্ব্বিকার, সব চোখের পাথুরে দৃষ্টিই আড়ষ্ট হয়ে আছে! কে যেন শ্মশান থেকে কয়েকটা মৃতদেহ তুলে নিয়ে এসে বেঞ্চের উপরে সারি সারি বসিয়ে দিয়ে গেছে!

তাদের ভিতরে বাঙালী আছে, খোট্টা আছে, সায়েব আছে। কিন্তু তারা সবাই চেয়ে আছে আমার দিকেই। সে চাউনিতে কোন ভাবের আমেজ নেই, সে চাউনি যেন চাউনিই নয়—অথচ সে চাউনি দেখলেই গা ছম্‌ছম্‌ করে, দেহের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়! তাদের চাউনি যেন চোখের ভিতর দিয়ে আসছে না,—আসছে আলোকের উপর ওপার থেকে, অন্ধকারের আত্মার ভিতর থেকে, যে দেশে জ্যান্ত মানুষ নেই সেই দেশ থেকে! ভাবহীন অথচ ভয়ানক তাদের সেই চাহনি!

আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, গাড়ীর ঝাঁকুনীতেও তাদের কারুর দেহ একটুকুও নড়ছে না! গাড়ীর ভিতরে ব'সেও তাদের দেহ যেন গাড়ীকে না ছুঁয়ে শূন্যে বিরাজ করছে! মনে হ'তে লাগল, আমার অজ্ঞাতসারে যেমন হঠাৎ তারা গাড়ীর ভিতরে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, তেমনি হঠাৎ তারা আবার হাওয়া হ'য়ে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে পারে, আমার অজান্তেই। যেন তারা ছায়ার কায়াহীন অনুচর—দেখা দেয়, ধরা দেয় না। তাদের দেখা যায়, ধরা যায় না!

আমার সভয় দৃষ্টি আবার পথের দিকে ফিরিয়ে নিলুম। গাড়ী তেমনি হেঁচকি-তোলা আওয়াজের মতন ভেঁপুর শব্দ করতে করতে তীব্রবেগে ছুটছে—কিন্তু তখনো ভবানীপুর আসে নি! আমি শ্যামবাজার, না সোজা যমালয়ের দিকে চলেছি?

কি এক দুঃসহ অজানা টানে অস্থির হয়ে চোখ আবার গাড়ীর ভিতরে ফেরালুম। গাড়ীতে ইতিমধ্যে লোকের সংখ্যা আরো বেড়ে উঠছে—তারাও স্থির নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে!

সমস্ত গাড়ীর ভিতরে একটা বোঁট্‌কা গন্ধ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে—যেন বাসি-মড়ার গন্ধ। হাসপাতালে মড়ার ঘরে গিয়ে আমি একবার এই রকম গন্ধই পেয়েছিলুম!

আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিলে, বুকের কাছটা শিউরে শিউরে উঠতে লাগল—আমি কি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি?

আর থাকতে না পেরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বললুম, "এই কণ্ডাক্টার, গাড়ী বাঁধো।"

কণ্ডাক্টার কোন সাড়া দিল না, গাড়ী থামাবারও চেষ্টা করলে না।

আবার বললুম, কিন্তু কোন ফল হ'ল না।

রেগে দাঁড়িয়ে উঠে কণ্ডাক্টারের দেহ ধ'রে আমি নাড়া দিতে গেলুম—কিন্তু তাকে ছুঁতেও পারলুম না! চোখের সামনে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাকে স্পর্শ করতে পারছি না—সে দেহ যেন হাওয়া-দিয়ে তৈরী!

হঠাৎ গাড়ীর সব লোক একসঙ্গে অট্টহাস্য সুরু ক'রে দিলে! সে অদ্ভুত বীভৎস হাসি আসছে যেন অনেকদূর থেকে, অনেক আকাশ-বাতাস ভেদ ক'রে, অনেক-সমুদ্র-পাহাড়-প্রান্তর পার হয়ে, অনেক নরকের অন্ধকারে ডুব দিয়ে—অথচ তার আওয়াজ এত স্পষ্ট যে, আমার কাণ যেন ফেটে যাবার মত হ'ল!

আমি পাগলের মতন চীৎকার ক'রে বললুম, "গাড়ী থামাও, জলদি গাড়ী থামাও,—এই ড্রাইভার!"—গাড়ী থামানো ঘণ্টার দড়ী ধ'রে আমি ঘন ঘন নাড়তে লাগলুম!

ড্রাইভার এতক্ষণ পরে আমার দিকে মুখ ফেরালে—সে মুখে এক তিলও মাংস নেই, সে মুখ সাদা ধব্‌ধবে হাড়ের মুখ—নাক-চোখের জায়গায় তিন-তিনটে গর্ত্ত, দু-ঠোঁটের জায়গায় দু-সারি দাঁত বেরিয়ে আছে!

এতক্ষণ তবে এই পোষাকপরা কঙ্কালটাই গাড়ী চালিয়ে আসছে?

গাড়ীর ভিতরে অট্টহাসির আওয়াজ আরো বেড়ে উঠল!

আর সইতে পারলুম না—সেই ভীষণ অট্টহাসি শুনতে শুনতে আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

জ্ঞান হ'লে দেখলুম, নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছি, আমার চারপাশে ব'সে মা, বাবা, ভাই আর বোনেরা।

শুনলুম, আমি নাকি রসা রোডের ফুটপাথের উপর জ্বরের ঘোরে বেহুঁস হয়ে শুয়েছিলুম।

কালকের রাতের বিভীষিকার কথা সকলকে বললুম।

বাবা বললেন, "ও-সব বাজে কথা। জ্বরের ঝোঁকে 'লেকের ধার থেকে রসা রোড পর্য্যন্ত এসেই বেহুঁস্ হ'য়ে প'ড়েছিলে। তারপর ঐ-সব খেয়াল দেখেচ।"

কিন্তু আমার মন বলতে লাগল—না, না, আমি যা দেখেছি তা খেয়াল নয়, খেয়াল নয়!

[আষাঢ়, ১৩৩৬] শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

হরতনের গোলাম

—১—

তোমরা অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা কানে শুনেছ, কিন্তু আমি চোখে দেখেছি এক অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত ঘটনা। তখন আমার বয়স অল্প;—বোধ হয় বারো-তেরো।

বৃন্দাবন, ডাক-নাম বিনু, ছিল আমার সব-চেয়ে ভালোবাসার বন্ধু। এক ক্লাসে পড়তুম, দিনরাত একসঙ্গে থাকতুম, সে ছাড়া আর কারো সঙ্গে খেল্‌তে, কথা-কইতে আমার ভালো লাগতনা। আমাদের পাশেই ছিল তাদের বাড়ি।

তখন আমরা নতুন তাস খেল্‌তে শিখেছি। বিনু সবার একদিনের জন্য মামার বাড়ি গিয়ে বিন্তি খেলা শিখে এসেছিল। এসেই সে আমায় ঐ খেলা শিখিয়ে দিলে। দু-জনেই নতুন খেলিয়ে, কিন্তু বিনু দু-চার বাজি খেললেই পাকা ওস্তাদ হয়ে উঠলো। আমি প্রায় প্রতি বাজিতেই তার কাছে হারতুম। কোথায়ই বা তাকে জিতেছি? স্কুলের লেখা-পড়ার প্রাইজে, খেলা-ধূলার প্রাইজে সে বরাবরই আমায় হারিয়ে এসেছে; এমন কি নিমন্ত্রণ খেতে বসেও কোনো দিন তাকে জিততে পারিনি; সে বরাবর আমার চেয়ে বেশী খেয়েছে। এক-এক সময় সন্দেহ হতো আমার মায়ের স্নেহটিও বুঝি সে আমার চেয়ে বেশী-কোরে জিতে নিলে। কিন্তু এতে আমার দুঃখ ছিলনা। কারণ তাকে যে আমি সত্যিই ভালো বাসতুম।

রোজ সন্ধ্যার পর স্কুলের পড়া শেষ কোরে, খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের সদর-বাড়ির পশ্চিম কোণে ভাঙা নহবৎ-খানার নীচের অন্ধকার কোটায় লুকিয়ে বসে তাস্ খেলতুম। এই ঘরটায় পুরা-কালে কে থাকত জানিনা; এ বাড়ি যখন জম্‌জমাট ছিল, তখন হয় তো কর্ত্তাদের সানাই-ওয়ালারা এইখানে বস-বাস করত। এখন এখানে দিনে-রাতে কারো পায়ের ধূলা পড়েনা—এক চুপি-চুপি আমাদের ছাড়া। এই ঘরটা আমাদের দুই-বন্ধুর ভারি মনের-মতো ঘর ছিল;—এর মধ্যে বাড়ির ভিতরকার তাড়াহুড়ো এসে পৌঁছতে পারতনা; আমরা দু-জনে পায়রার খোপের মতো একটু-খানি জায়গায় বেশ নির্জ্জনে নিশ্চিন্তে মুখোমুখি বসে মনের কথা অবিরাম গল্‌গল্ করতে পারতুম। আমাদের ছুটির দিনগুলো নির্ব্বিঘ্নে নিবিড় আনন্দে কাটত—এই ঘরখানির কোলে মাথা রেখে শুয়ে। বিনু নিজের হাতে ঐ ঘরের একটি কোণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোরে রাখত। এর কোনো আভরণ ছিলনা—এর সমস্ত অভাব ও দৈন্যকে আমরা আমাদের অন্তরের আনন্দ দিয়ে ঢেকে রেখেছিলুম। নইলে সেই কঙ্কাল-সার জীর্ণ অন্ধকার কোটরের মধ্যে আমাদের কচি দুটো প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠতে পারত না।

বিনু মামার বাড়ি থেকে এক-জোড়া তাস সংগ্রহ কোরে এসেছিল—বোধ হয় তার মামাদের আড্ডার পরিত্যক্ত তাস। তাস-জোড়াটা ছিল খুবই পুরানো—ভদ্রসমাজে নিতান্তই অচল। সম্ভবত তাই এত সহজে সে-বেচারা ওস্তাদ খেলোয়াড়দের কড়া হাতের কঠিন চাপড় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিনুর ছোট্ট নরম হাতখানিতে এসে পড়বার সৌভাগ্য পেয়েছিল। বেচারাকে যে অনেক দিন ধরে অনেক চড়-চাপড় সইতে হয়েছে সে তার চেহারা দেখলেই বোঝা যেত। কিন্তু কোন্ গুরুতর অপরাধে তার কান-গুলো যে এমন নির্দ্দয়-ভাবে কাটা গিয়েছিল এবং কেনই বা তার বুকের উপর আঁচড় টেনে-টেনে এমন ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারতুম না। এ তার কোন্ পাপের শাস্তি?—কে জানে!

তার এই জীর্ণশীর্ণ চেহারা দেখে আমাদের কেমন মায়া করত; সেই জন্যে তার উপর জোরজবরদস্তি করতে পারতুম না। একে নিয়ে অতি সন্তর্পণে খেলতুম;—আস্তে-আস্তে তুলতুম, আস্তে-আস্তে ফেলতুম, ভাঁজাতুম খুব আল্‌গা হাতে। খেলা শেষ হয়ে গেলে ধীরে-ধীরে গুছিয়ে একখানি রুমাল মুড়ে তুলে রাখতুম—অতি যত্নে। সত্যি বল্‌ছি, এই তাসকে এত ভালোবাসতুম আমরা যে এর বদলে নতুন ঝক্‌ঝকে তাস কিনে আনতে আমাদের লোভটুকু পর্য্যন্ত হয়নি কোনো দিন। এই তাসের ছবি দেখে আমার মনে হতো—এরা যেন এক-কালে এই বাড়িরই মানুষ ছিল, এখন তাস হয়ে গেছে। তোমরা হেসো না; এর হরতনের গোলামটিকে আমার মনে হতো ঠিক যেন বুড়ো ঠাকুর্দ্দার দারোয়ান এ! এর ফোঁটা-ওয়ালা তাস-গুলোও যেন কেমন-এক-রকমের। এক-একদিন বিনুর সঙ্গে খেলতে-খেলতে প্রদীপের ঝাপ্‌সা আলোয় এর আটা-নওলা-দওলার রঙিন ফুটকিগুলোর দিকে চেয়ে-চেয়ে হঠাৎ আমার চোখ কেমন ধাঁধিয়ে যেত—মনে হতো আমি

যেন তাদের ঐ ফুটকিগুলোর ফাটলের মধ্যে দিয়ে কতদূর চলে গেছি—সে যেন কতকালের আগেকার কোন্‌খানে! —যারা অনেক-কাল আগে এখানে ছিল যেন তাদের কাছে! সেখানে কি দেখতুম, কি শুনতুম মনে নেই কিন্তু সে-সব দেখে-শুনে কেমন তন্ময় হয়ে যেতুম। হঠাৎ বিনুর ডাকে আবার ফিরে আসতুম। সে ধমক দিয়ে বল্‌তো—"কি বসে-বসে ভাবচিস?—খ্যাল্‌না!" আমি অমনি তাড়াতাড়ি যা-হোক-একখানা তাস ফেলে দিয়ে খেলায় আবার মন দিতুম। কিন্তু বুকটা কেমন ছম্‌ছম্ করতে থাকতো। মনে হতো এ নিশ্চয় যাদুকরা তাস!

বিনুকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম—"এই তাস নিয়ে তোর মামার বাড়ীতে কারা খেলত রে বিনু?" বিনু বলেছিল—"শুনেছি দাদামশাই খুব পাকা খেলিয়ে ছিলেন; কেউ না-কি তাঁকে তাস-খেলায় হারাতে পারত না। লোকে হিংসে কোরে বলতো, সে তাঁর খেলার গুণ নয়, তাসের গুণ! তিনি তাস গুণ-করতে জানতেন। বোধ হয় এ তাঁরই আমলের তাস।" বিনুর দাদামশাইকে আমরা চোখে দেখিনি; তার মামাদেরই দেখতুম খুব বুড়ো! উঃ, তাহলে না-জানি তিনি কত বুড়ো! এ সেই আস্তিকালের-বস্তি-বুড়োর হাতের গুণ-করা তাস! এ তাস ছুঁতে বুক ছম্‌ছম্ করত, কিন্তু তবু ভালোবাসতুম বিনুর-দেওয়া এই তাস-জোড়াটাকে।

এই তাস নিয়ে বিনু গম্ভীর মুখে রোজ আমার সঙ্গে খেলতো। তাকে খেলায় জিততে পারতুম না বোলে সে প্রায়ই হাসতে-হাসতে বল্‌তো—"জানিস্ মল্লি, এ আমার দাদামশাইয়ের গুণ-করা তাস! এ-তাস হাতে থাকলে কেউ আমায় জিততে পারবে না;—তুইও না!"

আমাদের আড্ডা ঘরের দেওয়ালে গোরুর চোখের মত একটা সরু কুলুঙ্গিতে ছোট্ট একটি তেলের প্রদীপ জ্বলতো—আমাদের বসবার কোণটুকু আলো-কোরে; বাকি ঘরটা অন্ধকারের আবছায়ায় পড়ে থাকতো—কালো চাদর মুড়ি দিয়ে। খেলা জমে উঠতো, সঙ্গে-সঙ্গে রাতের অন্ধকারও জমে উঠতো। একে-একে বাড়ীর প্রদীপ সব নিভে যেত, ঘরের পাশে সরু গলির পথটা ক্রমে নির্জ্জন হয়ে আসতো। চৌধুরী-বাড়ির দো-তলার জানলা থেকে যে এক-ফালি সরু আলো এসে অন্ধকার গলির উপর পড়তো, ক্রমে সেটুকুও অস্ত যেত; গলির ফাঁকটা ভরাট্ হয়ে উঠতো—জমাট অন্ধকারে। আর সেই কালো পাথরের মতো অন্ধকারের উপর দিয়ে মাঝে-মাঝে শুনতুম কে যেন পায়চারি করছে লাঠি-হাতে খড়ম-পায়ে—খট্-খটাস্! খট্‌খটাস্! তার পরেই খুব দূর থেকে একটা খেঁকি কুকুর বুক-ফেটে কাৎরে উঠতো—কেঁই-কেঁই! আর অমনি ঝুলের ঝালর ও মাকড়সার জাল-দিয়ে-ঘেরা আমাদের ঠাকুর্দ্দার আমলের পুরানো ঠাকুরদালানের কাল্-প্যাঁচা ও চামচিকে-বাদুড়গুলো অন্ধকারের মধ্যে কখনো হুস্-হুস্ কখনো হিস্-হিস্ শব্দে তাদের বাচ্চাগুলোকে সাবধান কোরে দিত। এবং মাঝে-মাঝে ফট্‌ফট্ কোরে হাততালির আওয়াজে কাকে যেন আমাদের ঘরের দিকে তাড়িয়ে দিত! ঐ বুঝি সে এলো! এই ভাবতে ভাবতে আমার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসতো। হাতের তাস মাটিতে নামতো না! বিনু ধমক দিয়ে বল্‌তো—"কি করছিস্? খ্যাল্ না!" তার এই ধমকানিতে আমার চট্‌কা ভাঙতো। আর সঙ্গে-সঙ্গে চারিদিকের ঐ বিশ্রী শব্দগুলোও যেন ভয়ে-ভয়ে চুপ কোরে যেত। তা যদি না হতো তাহলে বোধ হয় ঘর থেকে ছুটে আমি বাবার কাছে পালিয়ে যেতুম, কিছুতেই বিনুর সঙ্গে খেলতুম না।

সেদিন খেলা আরম্ভ করতেই হঠাৎ খুব জোরে ঝড়-বৃষ্টি এলো। একটা ঝড়ের দমকা আমাদের কোলের তাসগুলাকে উল্টে-পাল্টে ভেস্তে দিয়ে ঘর থেকে খানিকটা ঝুল ও ধূলো উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। বিনু বল্লে—"মল্লি, দরজা-জানালাগুলো বন্ধ কোরে দে!" আমি উঠে জানালাগুলো বন্ধ করতে লাগলুম। পশ্চিমের জানালাটায় হাত দিতেই কে যেন সজোরে আমার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সেক্‌হ্যাণ্ড কোরে চলে গেল! আমি তাড়াতাড়ি হাতটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলুম—কিছু বুঝতে পারলুম না। বুকটা ধুক্‌ধুক্ করতে লাগলো।

খেলতে বসেই সে বাজি জিতলুম। আশ্চর্য্য কাণ্ড! যা কখনো হয়নি, তাই হলো। বিনুও অবাক। সে একটু বেশী-কোরে মন দিয়ে খেলতে বস্‌লো। কিন্তু পরের বাজীও জিততে পারলে না। আমার কেমন সন্দেহ হলো—এলোমেলো ঝড় এসে তাসের যাদুটা উড়িয়ে নিয়ে গেল নাকি!

আমি ক্রমাগতই জিততে লাগলুম। কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছিল এ জেতায় আমার কোন বাহাদুরি নেই; প্রতিবারেই এমন তাস আসছিল যে খেল্লেই পিঠ পাওয়া যায়; কে যেন ম্যাজিক করে ভালো-ভালো তাসগুলো বেছে-বেছে আমার হাতে তুলে দিচ্ছে। বিনু বার-বার হেরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলো—"আজ আমার পড়তা খারাপ পড়লো দেখছি!" তার এই দীর্ঘশ্বাসটি আমার বুকে গিয়ে বাজলো! আমি চঞ্চল হয়ে উঠলুম! আমার মন কেঁদে বলতে লাগলো—"আমি জিত চাই না, বিনু জিতুক!" আমি ফন্দি কোরে বিনুকে জিতিয়ে দেবার জন্যে হাঁকুপাঁকু করতে লাগলুম; কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। আজকের ঐ ঝড়ে কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেছে!

বিনু ফেল্লে হরতনের বিবি, তাকে সেই পিঠটা দেবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি খেল্লুম গোলাম, কিন্তু পিঠ তোলবার সময় দেখা গেল গোলামটা চেহারা বদলে সাহেব হয়ে গেছে। কাজেই পিঠটা আমাকেই নিতে হলো। পরের হাতে আমি খেল্লুম চিঁড়ের দশ; আমি জানতুম বিনু এ

ফোঁটার লোভ কিছুতেই ছাড়তে পারবে না, সে নিশ্চয় গোলাম দিয়ে পিঠটা নেবে; বিনু ফেল্লেও গোলাম, কিন্তু আমার দশ-খানা হঠাৎ দু ফোঁটা চুরি কোরে কেমন করে যে আটা হয়ে গেল, আমি কিছুতেই বুঝতে পারলুম না। আমি অবাক; বিনু বাজি হেরে গোঁ-হয়ে বসে রইল।

রাগ হলে বিনুর বড়-বড় চোখ-দুটো আরো বড় হয়ে উঠতে দেখেছি, কিন্তু আজ যেন অস্বাভাবিক রকম বড় হয়েছে বোলে মনে হতে লাগলো। সে-বারের খেলাতে তার হাতের ফ্রাই ইস্কাবনের দশখানার উপর চিঁড়ের তাতা পাশিয়ে দিতে গিয়ে যখন সেটা রঙের সাতার তুরুপ হয়ে গেল, তখন তার সেই হঠাৎ-বড়-হয়ে-যাওয়া চোখ দুটো কেমন-এক-রকম-ভাবে বিস্ফারিত কোরে সে আমার দিকে চাইলে যে সে-চাহনিতে আমার সর্ব্বশরীর ঝিমঝিম্ কোরে এলো।

বিনুকে ভয়ে ভয়ে বল্লুম—"ভাই, আর খেলে কাজ নেই। চল যাই।" বিনু সে কথা কানেই তুল্লে না।

ক্রমে রাত গভীর হয়ে এলো। মনে হলো বাড়ীর সবাই ঘুমিয়েছে; আমাদের এ ঘরখানারও যেন ঘুম ধরেছে;—এর দরজা-জানলা ইট কাট ঘুমে ঢুলছে। প্রদীপের আলোটা থেকে-থেকে কেবল হাই তুলছে। কড়ি কাঠের খোপে-খাপে চড়াই পাখীগুলো গল্প শেষ কোরে শুয়ে পড়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম! হাতের তাসগুলোর দিকে চেয়ে দেখি সাহেব-বিবিদের চেহারা ঘুমে জড়িয়ে আসছে। ক্রমে মনে হলো সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ঘুমের ঝোঁকে দুলছে—ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্! আমিও তার সঙ্গে দুলতে লাগলুম—ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্!

হঠাৎ চট্‌কা ভাঙলো চৌধুরী-বাড়ীর ঘড়ির শব্দে—ঢং! সেই শব্দ অন্ধকারের ঘুম ভাঙাতে-ভাঙাতে অনেক দূর চলে গেল।

ও কি? ও কিসের শব্দ? কড়িকাঠের কাছে ঐ কোনের গর্ত্ত থেকে কে অমন বিশ্রী সুরে নিশ্বাস টানছে হুউউউস্‌স্‌স্!—হুউউস্‌স্! আমি চম্‌কে উঠে বিনুকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ও কিসের শব্দ ভাই?"

বিনু কথা কইলেনা; শুধু তাস থেকে চোখ তুলে কড়ি কাঠের দিকে চাইলে, আর আমার মনে হলো তার সেই ড্যাব্‌ডেবে চাহনিটা চোখ-থেকে ঠিকরে বেরিয়ে কড়িকাঠের অন্ধকার কোণে গিয়ে এঁটে রইলো—জ্বল্ জ্বল্ কোরে চেয়ে আমার দিকে। বিনুকে আমি কান্নার সুরে বল্লুম—"ভাই, আমার বড় ঘুম পেয়েছে।"

বিনু বল্লে—"আচ্ছা, আর দু-হাত খেল।" আমি চম্‌কে উঠলুম—তার গলা শুনে। কি গম্ভীর আওয়াজ! এ তো বিনুর গলা নয়। কে তার গলার ভিতর থেকে কথা কইলে?

কোনো রকমে এই দু-হাত খেলা এখন শেষ করতে পারলে বাঁচি! কোনো দিকে কান দেবার, কোনো দিকে চোখ দেবার আমার আর সাহস হচ্ছিল না। ইচ্ছা হচ্ছিল এই তাস দিয়ে চোক-কান ঢেকে ফেলি। আমি খুব চোখের কাছে তাস এনে এক-মনে খেলতে লাগলুম।

সে-হাত বিনু খেলেছিল রঙের নওলা। আমার হাতে গোলাম ছিল, কিন্তু পিঠ নেবার ইচ্ছা ছিল না। কি-করে লুকোলে বিনু সেটা ধরতে পারবে না ভাবছি, বিনু বোলে উঠলো সেই রকম বিষম ভারি গলায় ঘর কাঁপিয়ে—"গোলামটা আছে তো?"

ভয় হলো ধরা পড়ে গেছি। বাঁ-হাতের তাসের সারি থেকে চট্-কোরে হরতনের গোলাম তুলে নিয়ে হরতনের নওলার উপর ফেলতে গিয়ে দেখি—সামনে নওলা নেই; বিনুও নেই। অ্যাঁ!

বুকটা ধ্বক্ কোরে উঠলো।

এ-পাশ ও-পাশ চেয়ে দেখি শুধু বিনু নয়, একখানি তাস ও নেই।

বোঁ করে মাথাটা ঘুরে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলুম। গা-হাত-পা ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগলো; ঘরের চার কোণ থেকে চারটে বিকট হাসি খিল্‌খিল্-শব্দে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর উপরে নহবৎখানা থেকে ঢাক ঢোল কাঁসি বাঁশি সব এক সঙ্গে বেজে উঠলো। আমি কাঁপতে-কাঁপতে মাটিতে শুয়ে পড়লুম। মনে হলো আমার হাত-পায়ের সমস্ত খিল যেন আল্‌গা হয়ে গেছে—উঠে-হেঁটে পালাবার আর উপায় নেই।

আমার কান্না আসতে লাগলো—বিনু—আমার বিনু কোথায় গেল? উপর থেকে ভাঙা কাঁসিখানা ফাটা আওয়াজে বলতে লাগলো—কৈ না না! কৈ না না! আমি খুব চেঁচিয়ে ডাকলুম—বিনু, বিনু! কিন্তু আমার গলার স্বর মুখ দিয়ে না বেরিয়ে পেটের ভিতর চলে গেল—ঘুরতে-ঘুরতে, গোঁ-গোঁ-শব্দে!

একবার আশা হলো বিনু হয়তো বাইরে গেছে—এখনি আসবে। কিন্তু বাঁ-হাত থেকে ডান হাতে তাসটা নিয়েছি মাত্র—এই এতটুকু সময়ের মধ্যে সে এতবড় ঘর পেরিয়ে বাইরে গেল কেমন করে? হয়তো আমি অন্ধকারে দেখতে পাইনি। তাই হবে। এই মনে কোরে দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম, কিন্তু গিয়ে দেখি—একি যেমন খিল বন্ধ করেছিলুম, ঠিক তেমনিই আছে। তবে? তবে সে কেমন কোরে বাইরে গেল?

হঠাৎ মনে হলো বিনু আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে এই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে নেই তো!

কিন্তু কোথায় লুকোবে? ঘর যে ফাঁকা। আসবাবের মধ্যে মাত্র একটা ভাঙা আলমারি। তার পিছনে বড় জোর আঙুল পাঁচেক জায়গা। তার মধ্যে একটা মানুষ থাকতে পারেনা। তবু সেখানটা একবার দেখলুম। ঘরের একোন, ওকোন এধার ওধার প্রদীপ ধোরে দেখলুম তন্ন তন্ন কোরে। কিন্তু সে কোথাও নেই—কোথাও নেই!

(৩)

কতক্ষণ পড়ে-পড়ে কেঁদেছিলুম জানি না। যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, তখনও কান্নার জলে চোখ আমার ঝাপ্সা। রাত তখন নিশুতি। চারিদিক নিঝুম। কেউ কোথাও নেই; কেবল আমাদের তিন মহল প্রকাণ্ড বাড়ি-খানা দেখলুম ভয়ঙ্কর আতঙ্কে কাঠ-হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; যেন তার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠছে। চৌধুরিদের চৌতলার চিলের ছাদটা আমাদের দিকে এতখানি গলা-বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি হলো রে, কি হলো? কোথায় গেল?" পশ্চিম-কোণের ঢ্যাঙা সুপুরিগাছটা কিছু না বোলে শুধু ডিঙি-মেরে আকাশের দিকে মুখ-তুলে ইসারায় দেখিয়ে দিলে—আমাদের বাড়ির ঠিক মাথায় একটা মস্ত-বড় কালো পাখী তাসের মতো নানা রঙে চিত্র-বিচিত্র করা ডানা মেলে মেঘের ধার দিয়ে অন্ধকারে ভেসে চলেছে—কাকে ঠোঁটে নিয়ে! তাই দেখে চারিদিক থেকে চাপা গলায় সবাই বোলে উঠলো—"আ হা হা!" অমনি আমার বুকের ভিতরটা কোরে উঠলো—"আহাহা! বিনুকে ওরা ভেল্কি-বাজিতে উড়িয়ে নিয়ে গেল!"

ভাবতে-ভাবতে আমার চোখের সামনে থেকে যেন সব একে-একে মুছে আসতে লাগলো, পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা ধীরে-ধীরে সরে যেতে লাগলো; আমি যেন একটা অতল অন্ধকারের মধ্যে ডুবতে লাগলুম—পলে-পলে, তালে-তালে!

তারপর মনে পড়ে অন্ধকারে চেনা-পথ ধোরে বাড়ির ভিতরের দিকে যাচ্ছিলুম; হঠাৎ কানে এলো তাস পেটার শব্দ—চটাস্-চটাস্! এত রাত্রে এখানে অন্ধকারে তাস খেলে কে? মুহূর্তের মধ্যে আমার চলা বন্ধ হয়ে গেল; আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম।

বারান্দার পশ্চিম-কোণে ঘুরঘুট্টে অন্ধকারের মধ্যে আমাদের খাজনা-ঘর। দিনের বেলা এর সামনে দিয়ে যেতে আমাদের গা-ছম্ছম্ করে, সে জন্য এদিকটা আমরা কেউ মাড়াতুম না। আমাদের বিশ্বাস যত রাজ্যের ভূত-প্রেত ঐখানে বাসা বেঁধে মনের সুখে ঘরকন্না করছে। আমরা ঐ মহলটা তাদের ছেড়ে দিয়েছিলুম। সেখানে কস্মিনকালে সকাল-সন্ধ্যায় আলো-গঙ্গাজল পড়ত না;—ঝাঁটও কেউ দিত না। এই খাজনা-ঘর যে কত কালের তা কেউ জানে না;—বাড়ির মধ্যে সব-চেয়ে পুরানো এই জায়গাটা। শোনা যায়, ঠাকুরদাদার যিনি ঠাকুরদাদা ছিলেন তাঁর আমলে জমিদারির খাজনা এলে এই ঘরে গচ্ছিত রাখা হতো—মাটির তলায় একটা চৌখুপির মধ্যে। সরু সুড়ঙ্গের মতো এই ঘর; সামনে মোটা-মোটা লোহার গরাদে-দেওয়া খাঁচার মতো দরজা—পিতলের শিকল দিয়ে আষ্টে-পৃষ্টে জড়ানো। সামনে দাঁড়ালে একটা স্যাঁৎসেঁতে পচা গন্ধ নাকে আসে, আর চোখে পড়ে কালি-ঝুলি-মাখা একটা অন্ধকারের কুণ্ডলী—দিন-রাত ঘূর্ণির মতো ঘুরছে!

এই ঘর কতকাল যে খোলা হয়নি তার ঠিক নেই। খোলবার দরকারই হয়-নি। কারণ বহুদিন হলো আমাদের সে জমিদারী নেই; তার খাজনাও আর আসে না। ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনেছি, আমার ঠাকুরদাদার যিনি দাদামশাই ছিলেন তাঁর অগাধ টাকা ছিল—একটা রাজা-রাজড়ার তেমন থাকে না। কিন্তু তিনি ভারি কৃপণ ছিলেন। একটি পয়সাও কাউকে প্রাণ থাকতে দিতে পারতেন না—এমন কি নিজের ছেলে-মেয়েকেও নয়। তিনি কেবল টাকার পর টাকার রাশ জমা কোরে চলতেন। লোকে টাকা খরচ কোরে নাম কেনে, তিনি টাকা না খরচ করার বাহাদুরিতে লোকের কাছে খেতাব পেয়ে-ছিলেন! টাকার উপর তাঁর এমন মায়া ছিল যে, পাছে মারা যাবার পর তাঁর টাকা খরচ হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি তাঁর যথাসর্ব্বস্ব যখের হাতে সমর্পণ কোরে যান—যার কাছ থেকে একটি কাণা-কড়িও বার হবার যো নেই!

এই যখের কাহিনী একটা মস্ত-বড় গল্প! কেমন কোরে একটি সুন্দর নয় বছরের ছেলেকে মেঠাই ও খেলনার লোভ দেখিয়ে তার বাপ-মায়ের কাছ থেকে চুরি কোরে আনা হয়, কেমন কোরে তাকে লাল চেলির গরদ পরিয়ে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে, ঐ অন্ধকার খাজনা-ঘরের তলায় বন্ধ চৌখুপির মধ্যে—যেখানে কেবল ঘড়া-ঘড়া টাকা সাজানো আছে, আর-কিছু নেই, আর-কেউ নেই—না বাপ, না মা, না আলো, না বাতাস—সেইখানে একলাটি বসিয়ে রেখে, তারপর ঐ চৌখুপিতে ঢোকবার পথটা দশ-মন পাথর দিয়ে চিরদিনের মতো বুঁজিয়ে দেওয়া হয়, সে কথা শুনতে-শুনতে আমার চোখে জল আসতো—বুক দুর-দুর করতো; আর ঠাকুরদাদার, সেই পাষণ্ড ঠাকুর্দার উপর রাগ হতো। ঠাকুরমা বলতেন—"আহা, ঐ সুন্দর নয় বছরের ছেলেটি কত কেঁদেছে, বাবা-বাবা-কোরে বুক-ফেটে কত চেঁচিয়েছে, তেষ্টায় একফোঁটা জলের জন্য ছটফট্ করেছে, তবু কেউ তাকে ঐ চৌখুপির দরজা খুলে দেয়নি।" শুনে আমার গলা কাঠ হয়ে আসতো। তারপর ক্ষিধে-তৃষ্ণায়-ভয়ে কাতরাতে-কাতরাতে বেচারা কখন যে হাঁপিয়ে মরে গেছে, সে হয়তো নিজেই বুঝতে পারে নি। এখন সে যখ হয়ে আছে—ঐখানে বসে-বসে কেবল টাকার ঘড়া আগলাচ্ছে। কারো সাধ্য নেই যে ঐ টাকা সেখান থেকে নিয়ে আসে! আমার ঠাকুরদাদার বাবা না কি একবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বেশী দূর যেতে হয়নি; মেজের পাথরে একটি মাত্র সাবলের ঘা দিতেই তিনি গোঁ-গোঁ করতে-করতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তিন দিন তাঁর কাঁপুনি ছিল; সাত দিন তাঁর মুখে রা ছিল না। কেন যে এমন হলো, কেউ জানেনা, তিনি নিজেও কিছু বলেননি; কারো সাহসও হয়নি—জিজ্ঞাসা করতে। সেই থেকে ঐ ঘরের দিকে আর কেউ যায় না।

মনে হলো ঐ খাজনা-ঘর থেকেই যেন তাসখেলার শব্দ পেলুম। যদিও ওদিকে যেতে বুক দুর্দুর্ করতে লাগলো, কিন্তু বিনুর জন্যে না গিয়ে পারলুম না; যদি

সে ওখানে থাকে—যদি সে আমায় দেখতে পেয়ে ছুটে আসে।

বুকটা দু-হাতে চেপে খাজনা-ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম; লোহার গরাদে-দেওয়া দরজা দিনের বেলা শিকল-দিয়ে বাঁধা থাকে কিন্তু এখন দেখলুম খোলা। অন্ধকারে চোখে কিছু দেখা গেলনা, কিন্তু কানে শোনা গেল—কারা দুজন যেন দরজার দুইধার থেকে সজোরে ছুটে এসে মাথায়-মাথায় অনবরত ঠোকা-ঠুকি করছে—দুম্, দুম্, দুম্! আমার কেমন মনে হলো যেন এইখানকার এই অগাধ সম্পত্তি এই যখের ধন—কে নেবে তাই নিয়ে দুই ভূতের লড়াই চলেছে।

আমি এক-মনে এদের লড়াইয়ের তাল শুনছি, হঠাৎ বিনুর মতো কার গলা পেলুম। সে বল্‌ছে—"বিবির চেয়ে রঙের গোলাম বড়।" আর একজন কে সরু গলায় বলে উঠলো—"দূর বোকা, তা কখন হয়? গোলাম হলো সাহেব-বিবির চিরকেলে কেনা-গোলাম; হলোই না-হয় সে রং মেখেছে!"

গোড়ায়-গোড়ায় আমিও একদিন বিনুকে বলেছিলুম—"গোলাম কেন বিবির চেয়ে বড় হবে বিনু?" বিনু বলেছিল—"এই-রকম যে নিয়ম।" আজও আবার সেই কথা উঠেছে। এও তাহলে আমাদের মতন নতুন খেলিয়ে দেখছি।

আবার শুনলুম—"তুই কিচ্ছু খেলতে পারিস না! মল্লি তোর চেয়ে ঢের ভালো খেলে।" বিনু আমায় ডাকতো মল্লি বোলে।

মনে হলো, আমার যখন নাম করেছে, এ তখন নিশ্চয় বিনু! বিনুর গলায় আমার নাম শুনে ঐ ঘরের মধ্যে ছুটে যাবার জন্যে আমার প্রাণটা আকুলি-ব্যাকুলি করতে লাগলো, কিন্তু পারলুম না; ভয় হলো, পাছে ঐ দুটো পাগলা ভূতের মাথা-ঠোকাঠুকির মধ্যে পড়ে থেঁৎলে যাই! আমি চুপ-কোরে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ অন্য লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো—"অ্যাঁ, হরতনের গোলাম কোথায় গেল? হরতনের গোলাম! ভারি আশ্চর্য্য!—এই ছিল, এই নেই! চোখের পাতা ফেল্‌তে-না-ফেলতেই উড়ে গেল?"

আমার ভারি হাসি পেল—ঐ যাদু-করা তাস এদের সঙ্গেও যাদু খেলছে দেখছি!

বিনু বলে উঠলো—"হরতনের গোলাম?—সে তো মল্লির হাতে।"

আমি নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখি—সত্যই তো, এই হরতনের গোলাম, যা দিয়ে বিনুর নওলার পিঠ নিতে গিয়েছিলুম, সেখানা আমার হাতেই রয়েছে তো!

অন্য লোকটা বোলে উঠলো—"কৈ হ্যায়—মল্লিবাবুকো কাড় লে আও!"

সেই শুনে আমি তাড়াতাড়ি হরতনের গোলামখানা খাজনা-ঘরের ভিতর ছুঁড়ে দিয়ে এক-ছুটে নিজের শোবার-ঘরে পালিয়ে এলুম।

(৪)

ঘরে এসেও ভয়ে বুকটা ধ্বক্ ধ্বক্ করতে লাগলো—এই বুঝি সে এসে আমায় জাপ্‌টে ধরে নিয়ে যায়! আমি পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে মড়ার মতো পড়ে রইলুম। খানিকক্ষণ কেউ এলোনা, তারপর কে একজন খস্‌খস্ শব্দে বারান্দা দিয়ে চলে গেল—বোধ হয় আমার ঘর চিন্‌তে পারলে না। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরতে যাচ্ছি, এমন সময় কে আবার তড়াক-কোরে লাফিয়ে আমার বিছানায় উঠলো। আমি ভয়ে কাঠ! যে এলো, সে খানিক বিছানার এদিক-ওদিক ঘুরে-ঘুরে আমার গা শুঁকে-শুঁকে বেড়াতে লাগলো; তারপর আমার মাথার কাছে এসে মুখ-ঢাকা চাদরখানা ধরে সজোরে টানতে লাগলো—মুখ খুলে দেখবে। ওরে বাবারে! আমি প্রাণপণে চাদরখানা আঁকড়ে রইলুম, কিছুতেই মুখ খুল্‌তে দিলুম না। তারপর সে পায়ের দিকে গেল। তার নিশ্বাসের হাওয়ায় আমার পা-দুখানা ঠাণ্ডা হিম হয়ে এলো। আমার পা-ধোরে হিড়-হিড়-কোরে টেনে নিয়ে যাবে না ত? ভয়ে পা গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করলুম, পারলুম না। খানিকক্ষণ সে চুপ কোরে রইলো, বোধ হয় কি ভাবলে, তারপর আমার পাশে এসে ধুপ-কোরে শুয়ে পড়লো। সর্ব্বনাশ! এখন করি কি! কিন্তু ঠিক সেই সময় আমার পুষি-বেড়ালটা ম্যাঁও-শব্দে ডেকে উঠতেই, সে তড়াক কোরে বিছানা থেকে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

পুষিকে কাছে পেয়ে আমার ভয় অনেক ভেঙে গেল। তখন আবার বিনুর ভাবনা এলো—তাহ'লে সত্যিই কি বিনুকে ওরা ঐখানে—ঐ চৌখুপির মধ্যে নিয়ে গেল! সেখান থেকে সে পালিয়ে আসবে কি কোরে? এই সব ভাবছি, হঠাৎ কে কানের কাছে মুখ এনে খুব চুপি-চুপি ডাকলে—"মল্লি, ভাই মল্লি! বিনুর কাছে যাবে? বিনুর কাছে!"

আমি ধড়মড়-কোরে উঠে বসলুম—বিনুর কাছে যাবার জন্যে বুকটা লাফিয়ে উঠলো; কিন্তু ভারি ভয় হতে লাগলো—যদি আর ফিরে আসতে না পারি?

সে তখন বল্লে—"ভয় কি! চল না! বিনু তোমার জন্যে বড় কাঁদছে।"

বিনুর কান্নার কথা শুনে বুক ফেটে যেতে লাগলো। আমি ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বল্‌তে লাগলুম—"ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বিনুকে এবার ফিরিয়ে এনে দাও—বিনুর জন্যে আমার বড্ড মন কেমন করছে।"

আমার কান্না শুনে সে চুপি-চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দেখলুম, একটা মস্ত পাগড়িওয়ালা চেহারা—ঠিক যেন হরতনের গোলাম।

এই হরতনের গোলামটিকে তাসের মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশী ভালোবাসতুম। আমাদের বাড়িতে যে বড়ো থুরথুরে দরোয়ান ছিল—ঠাকুরদাদার আমলের, তাকে খুব

ছেলেবেলার দেখেছিলুম, অল্প-অল্প তার চেহারা মনে পড়ে ; কিন্তু বেশ মনে আছে রোজ সকালে সে একটি কোরে রসমুণ্ডি আমায় খাওয়াত। কি মিষ্টি লাগতো সে রসমুণ্ডি ! এখনো যেন তার স্বাদ মুখে লেগে আছে। আমার মনে হলো, এই হরতনের গোলাম যেন সেই বুড়ো দরোয়ান— এখন তাসের ছবি হয়ে গেছে। সে বোধ হয় আমার কান্না দেখে লাঠি-হাতে বিন্নুকে খুঁজে আনতে গেল। আবছায়ার মতো মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমার পুষি-বেড়ালটা হারিয়ে যেতে, আমার কান্না দেখে, সে এমনি কোরে একদিন তাকে খুঁজে আনতে বেরিয়েছিল।

কতক্ষণ গেল ; ঘরের ঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দ করতে করতে কতদুর চলে গেল, মনের মধ্যে কত ভাবনা এলো গেল— তবু বিন্নু এলোনা। হায়, সে কি আর আসবে ? ঐ ভয়ঙ্কর চৌখুপি ঘর—যার সামনে দুটো ভীষণ ভূত মাথা ঠোকাঠুকি করছে অনবরত, সেখান থেকে বিন্নুকে কে উদ্ধার কোরে আনবে ? ভাবতে-ভাবতে আমার শরীর এলিয়ে আসতে লাগলো, চোখের পাতা জড়িয়ে আসতে লাগলো, কপালে যেন কে নরম ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিলে ; আর অমনি এক-নিমিষে মনে হলো, আমি যেন একখানা তাসের উপর শুয়ে কোথায় চলেছি—হাওয়ার সঙ্গে ভেসে-ভেসে !

তাসখানা ভাসতে-ভাসতে এসে আমায় একটা চারি-দিক-আঁটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে নামিয়ে দিলে। দেখলুম সেই অন্ধকারে বসে দুজন এক-মনে তাস খেলছে ; বিন্নু আর একটী ছোট ছেলে—সুন্দর দেখতে, থোকা-থোকা কোঁকড়া চুল চাঁদের মতো কপালের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক যেন বিন্নুর ছোট ভাইটি। বিন্নু তার সঙ্গে খেলতে লাগলো, আমার দিকে একবার চেয়েও দেখলে না। আমার ভারি রাগ হলো—হিংসেও হলো। এরি মধ্যে এর সঙ্গে এত ভাব ! আমি মুখ গোঁ-করে রইলুম।

ছেলেটি একবার তাস থেকে মুখ তুলে মিষ্টি সুরে জিজ্ঞাসা করলে—"এ কে, বিন্নু ?"

বিন্নু গম্ভীর গলায় বল্লে—"ও মল্লি !"

সে বল্লে—"বেশ হলো ; আমরা তিনটি ভাইয়ে কেমন একসঙ্গে এইখানে থাকব।"

আমি রেগে চীৎকার কোরে উঠলুম—"না, না—আমি এখানে কিছুতেই থাকব না !"

অমনি হরতনের গোলাম এসে আমার পিঠে কোরে তুলে নিলে। বিন্নু সেটার উপর লাফিয়ে চড়তেই সেখানা ভারি হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মজা দেখে ছেলেটা খিল্-খিল্-কোরে হেসে উঠলো।

বিন্নু বললে—"দাঁড়া, আমরা তিন জনেই এক-সঙ্গে যাব।"—বোলে ছেলেটীর কানে-কানে কি বললে। ছেলেটি বললে—"চল, যাই।" কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়েই ধুপ-কোরে পড়ে গেল। দিন-রাত এক জায়গায় বসে থেকে-থেকে তার পা অসাড় হয়ে গেছে। বিন্নু তাকে কোলে-কোরে তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তাসগুলোকে কি বল্লে, তারা ফর্-ফর্ কোরে উড়ে এসে পাখীর মতো ডানা ছড়িয়ে দাঁড়ালো। আমরা উড়তে যাচ্ছি, এমন সময় কড়ি-কাঠ থেকে দুটো কালো চামচিকে এসে তাসগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর দুই দলে যা যুদ্ধ। —আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি। আমি ভয়ে ঠক্‌ঠক্-কোরে কাঁপতে লাগলুম। চারিদিক থেকে অন্ধকারগুলো ছুটে আমাদের সামনে তালগোল পাকিয়ে পথ-আটকে দাঁড়ালো —যেন আমরা পালাতে না পারি ! ছেলেটি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বল্লে—"বিন্নু, দেখেছিস তো, এরা আমায় যেতে দেবে না ! তোরা কেন প্রাণে মরবি ? পালা !"

বিন্নু বল্লে—"না ভাই, তোকে ছেড়ে কিছুতেই যাবনা।" চামচিকে-দুটো তাই শুনে ফ্যাঁস্ কোরে উঠলো। এমন সময় হরতনের গোলামটা ছুটে গিয়ে একটা চামচিকের পেটে সজোরে এক ঘুষি বসিয়ে দিলে। চামচিকেটা তার ধারালো নখ দিয়ে হরতনের গোলামখানাকে আঁকড়ে ধরে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো, আর সেই ফাঁকে অন্য তাসগুলো আমাকে নিয়ে উড়ে পালালো। বিন্নু আর সেই ছেলেটি দেখলুম সেই ঝটাপটির মধ্যে হিম্‌সিম্ খাচ্ছে ! আমি তাসের উপর থেকে হাত বাড়িয়ে বিন্নুকে ডাকতে লাগলুম—"বিন্নু, আয় আয় !" বিন্নু আমার দিকে ফিরেই চাইলে না ; ছেলেটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলো। আমার কান্না পেতে লাগলো ! তাসগুলো উড়তে-উড়তে এসে আমাকে বিছানায় ফেলেই উড়ে গেল —বোধ হয় বিন্নুদের উদ্ধার করতে। তার পর কি হলো জানি না !

৫

"মল্লি ! মল্লি !"

আমি ধড়মড়-কোরে উঠে বসলুম। ঝড়ের মতো ধাক্কা দিয়ে কে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। সকালের আলোয় ঘরটা আলো হয়ে উঠলো। মনে হলো যেন একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন কেটে গেল। আমি ছুটে গিয়ে দুই-হাতে বিন্নুর গলা জড়িয়ে ধরলুম,—বিন্নু, এসেছিস ভাই, এসেছিস ?"

সে বল্লে—"আসব না ত কি ! তুই ষ্টুপিড্, এত বেলা অবধি ঘুমচ্ছিস কেন ?"

আমি বল্লুম—"কখন্ এলি ভাই !"

সে বল্লে—"অনেকক্ষণ ! তোকে ডেকে-ডেকে আমার গলা চিরে গেল। তোর আজ হয়েছে কি ? চোখ অমন রাঙা কেন ?"

আমার ধাঁধা লাগলো। বিন্নু তো সবই জানে, তবে এমন আশ্চর্য্য হচ্ছে কেন ?

আমি আমতা-আমতা কোরে বল্লুম—"কাল রাত্রে তুই খেলতে-খেলতে হঠাৎ অমন অন্তর্দ্ধান—"

সে বাধা দিয়ে বল্লে—আমি কেন অন্তর্দ্ধান হতে যাব ! তুইতো খেলা ফেলে চোখ মুছতে-মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলি।"

আমার আরো ধাঁধা লাগলো। এ কি ঘুমের ঝোঁকে সবই স্বপ্নের মতো দেখলুম! কিন্তু এত যে কাণ্ড, সে সবই স্বপ্ন? ইচ্ছা হচ্ছিল আগাগোড়া সব কথা বিনুকে খুলে বোলে হেঁয়ালিটা পরিস্কার কোরে নিই, কিন্তু পারলুম না। দিনের আলোয় কথাগুলো এমন অদ্ভুত বোধ হতে লাগলো যে বল্‌তে লজ্জা হলো। আমার ভূতের ভয়ের জন্যে বিনু যা আমায় ঠাট্টা করে!

বিনু বল্লে—"কি ভাবছিস? চল বাইরে যাই।"

আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের সেই বাইরের ঘরে গিয়ে দেখি—ঘরময় তাস ছড়ানো; সমস্ত দেহ তাদের ক্ষত-বিক্ষত! তাদের বুকের উপর কে যেন মনের আনন্দে ধারালো নখ দিয়ে কেবল আঁচড়ের-পর-আঁচড় টেনেছে। বেশ বোঝা গেল রাত্রের মধ্যে খুব একটা মারামারি কাণ্ড হয়ে গেছে। আমি সভয়ে বিনুর দিকে চেয়ে বল্লুম—"বিনু দেখছিস!"

বিনু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লে—"আমারই জন্যে তাসগুলো গেল!"

"আঁ! তোমারই জন্যে? তার মানে?—সেই চৌখুপি ঘর থেকে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে? তা হলে তো সবই ঠিক!"

কিন্তু বিনুর মুখ-দেখে কিছু বুঝতে পারলুম না। একটু ইসারা পাবার আশায় আমি বিনুকে আবার জিজ্ঞাসা করলুম—"কি কোরে এমন হলো বিনু!" বিনু কোনো জবাব দিলে না, শুধু আঙুল দিয়ে ভাঙা আলমারিটা দেখিয়ে দিলে।

আমি আল্‌মারি খুলতেই একরাশ আরসোলা ফর্‌ফর্‌-কোরে ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো। তারপর ডানা-মেলে উড়ে অন্ধকার কোণের একটা গর্ত্ত দিয়ে কোথায় চলে গেল—বোধ হয় মাটির তলা দিয়ে সেই চৌখুপির মধ্যে। আমি হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলুম।

বিনু বল্লে—"তাসগুলো কুড়ো!"

আমি তাসগুলো কুড়িয়ে, গুছিয়ে দেখি সবই আছে, কেবল একখানা নেই—সেই হরতনের গোলাম!

তবে?

এই তো ঠিক মিল্‌ছে! সেই হরতনের গোলাম—যাকে নিয়ে কাল রাত্রের ঐ সমস্ত অদ্ভুত ঘটনার উৎপত্তি—সে নেই কেন। সে গেল কোথা?

সে কোথায় আছে, আমি জানি। সে আছে সেই-খানে—সেই চারিদিক-বন্ধ চৌখুপির মধ্যে, যেখানে সেই নয়-বছরের সুন্দর ছেলেটি চিরদিন একা অন্ধকারে বসে আছে।

কালকের সব কাণ্ড বিনু নিশ্চয় ভুলে গেছে; সকালে ঘুম থেকে উঠে তার আর কিছুই মনে নেই। তার যে ঘুম! এমন তো আমারও এক-একদিন হয়। রাতের ঘটনা স্বপ্ন-দেখার মতো সকালে সব ভুলে যাই। কাল রাত্রে আমি যদি ঘুমিয়ে পড়তুম, তা' হলে আমিও হয়ত সব ভুলে যেতুম; আজ সকালে উঠে অবাক হয়ে ভাবতুম—তাই তো হরতনের গোলাম-বেচারা গেল কোথায়?

১৩৩২] মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাইজ

বরঞ্চ খবরের কাগজওয়ালাদের হাঁকডাকের চোটে ভারতবর্ষ এক সেকেণ্ডে স্বাধীন হ'য়ে যেতে পারে, কিন্তু বিরিঞ্চি কোন পরীক্ষায় কখনো সেকেণ্ড হ'বে না—ঢাকা কলেজিয়েট্ ইস্কুলের থার্ড ক্লাসের ছেলেদের এই ধারণা। অন্তত এতকাল তা-ই ছিলো। কিন্তু এবারকার য়্যানুয়েলে অসম্ভব হয়েছে সম্ভব; কিষ্কিন্ধ্যার অঞ্চল থেকে—কথা নেই, বার্ত্তা নেই, হঠাৎ কে একজন উড়ে' এসে জুড়ে' বসলো; হনুমানের মতোই প্রকাণ্ড এক লাফ্ দিয়ে য়্যানুয়েল পরীক্ষা উৎরোলো—বিরিঞ্চিকে ছিয়াত্তর নম্বর পেছনে ফেলে। সারা ইস্কুলে সাড়া পড়ে গেছে।

অথচ, শিবু যেদিন প্রথম ইস্কুলে এসে ভর্ত্তি হ'ল, কে এত কল্পনা ভাব্‌তে পেরেছিলো! দেখ্‌তে ছোট্ট, রোগা, ময়লা—মাথার চুল কদমফুলের মতো করে ছাঁটা—ঢিলে পায়জামার ওপর জিনের কোট চাপানো, পায়ে নোঙরা নাগরা—ওকে দেখে বিরিঞ্চি এণ্ড কোম্পানী তো হেসেই বাঁচে না। বিরিঞ্চি দেখ্‌তে সুন্দর, বড়লোকের ছেলে—তা'র ওপর ক্লাশ থ্রি থেকে সে বরাবর ফাস্‌ট্ হ'য়ে আস্‌ছে, সুতরাং—বাকিটা না বল্‌লেও চলে।

তাই বলে' বিরিঞ্চির দেমাক-টেমাক নেই—সে-ই প্রথম দিন গায়ে পড়ে' আলাপ কর্‌তে গিয়েছিলো শিবুর সঙ্গে। সেদিনকার ঘটনা বিরিঞ্চি জীবনে ভুল্‌তে পারবে না।

শিবুর বাবা চাক্‌রী করেন কোন-এক-পট্টমে—সেখানেই শিবুর জন্ম এবং এই তেরো বৎসর যাপন। ফলে, সে বাঙ্‌লাটা বলে ভাঙা ভাঙা, কিন্তু তার মুখে ইংরেজির খই ফোটে। সত্যি কথা বল্‌তে কি, বিরিঞ্চির বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা শিবু যতটা বুঝতে পেরেছিলো, শিবুর সাহেবি ঘেঁসা ইংরিজি বিরিঞ্চি বুঝে ছিলো তার চেয়ে ঢের কম। সুতরাং আলাপ জমে নি। বিরিঞ্চি অবিশ্যি বন্ধুদের কাছে ব্যাপারটার রঙ্ ফিরিয়ে বলেছিলো—তাই সে যাত্রায় তা'র মুখ-রক্ষা হ'ল। কিন্তু মন তার শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

শনিবার থার্ড পিরিয়ডে যিনি ট্রান্স্‌লেশন্ করান্, তিনি নতুন মুখ দেখে যখন শিবুর নাম জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন, শিবু উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বল্‌লে, 'ছিবদাও রায়'। অম্‌নি সবাই—মায় স্যার্ নিজে—হো-হো করে' হেসে উঠ্‌লো। শিবুর কাণ দুটো ঝাঁ ঝাঁ কর্‌তে লাগ্‌লো।

স্তব্ তখন আড়চোখে শিবুর পায়জামার দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, 'Are you a Bengalee ?'

শিবু দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নাম শিবদাস।'

থাক্, সেদিনকার মত ব্যাপারটা সেখানেই চুক্‌লো। বিরিঞ্চি মনে মনে একটু খুসী না হ'য়ে পার্‌লো না; এবং ক্লাসের ফাজিল ছেলেগুলো শিবুকে দেখ্‌লেই 'ছিবদাঃ' বলে' চেঁচিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

এক সপ্তাহ এই চল্‌লো, কিন্তু শিবু একটুকুও ঘাব্‌ড়ালে না। কিন্তু পরের শনিবার সেই মাষ্টার-মশাইয়ের ওপর সে নিলে প্রতিশোধ। তিনি দিব্যি পড়িয়ে যাচ্ছিলেন, শিবু হঠাৎ তুখোড় ইংরিজিতে বলে' উঠ্‌লো, 'ওটা কাপ্‌বোর্ড্ নয়, স্তব্—কাবার্ড্।'

এইবার মাষ্টার মশাইয়ের কান ঝাঁ ঝাঁ করার পালা। রীতিমত চটে' গিয়ে তিনি বল্‌লেন, 'তোমার ভারি সাহস তো হে ছোক্‌রা—আমার ভুল ধর্‌তে আসো!'

শিবু দিব্যি হাসিমুখে বল্‌লে—'আমার দোষ কি বলুন্? —এতগুলো ছেলে ভুল শিখ্‌বে, এ আমি সইতে পারিনে।'

তারপর রীতিমত একটা কাণ্ড হ'য়ে গেলো। স্তব্ আগুন হ'য়ে বললেন, 'রোসো, ডেঁপো ছোক্‌রা—তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। এক্ষুণি চল্‌লুম হেড্ মাষ্টারের কাছে; তোমাকে আজ্‌কে বেত না খাইয়েছি তো আমি চাক্‌রিই ছেড়ে দেবো।' বলে' রাগে গজ্ গজ্ কর্‌তে তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।—ছেলেরা সব হতভম্ব। শিবু হাত-পা নেড়ে ইংরিজি উচ্চারণ সম্বন্ধে বক্তৃতা সুরু করে' দিল। ছেলেটাকে এক্ষুণি লিক্‌লিকে বেতের ঘা খেতে হ'বে মনে করে' বিরিঞ্চি বাস্তবিক দুঃখিত হ'ল।

খানিক বাদেই হেড়মাষ্টারের ঘরে শিবুর ডাক পড়লো। ব্যাপারটা কি হয়, জান্‌বার জন্য কয়েকটি ছেলে শিবুর পেছন পেছন গিয়ে বাহিরের বারান্দায় ঘোরাঘুরি কর্‌তে লাগলো। মিনিট দশেক পরে শিবু বেরিয়ে এলো অক্ষত-দেহে এবং সেই স্তবুটি ম্লান মুখে। ক্রমশঃ শোনা গেলো, যে হেড্ মাষ্টার শিবুকে সৎ সাহসের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন, এমন কি, তা'র সঙ্গে হ্যাণ্ড্‌শেক্ করেছেন পর্য্যন্ত, এবং মাষ্টার মশাইকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে খামকা খিটিমিটি কর্‌বার জন্যে ধম্‌কে দিয়েছেন।

এরপর থেকে শিবুকে মুখের ওপর ঠাট্টা কর্‌তে কেউ আর সাহস পায় না; এমন কি, অনেক ছেলেই—এবং কোন কোন মাষ্টারও—তাকে সমীহ করে' চলে। ক্লাশের কোনো ছেলে তা'র সঙ্গে কথা বলে না; টিফিনের সময় গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে একা একা চীনেবাদাম চিবোয়। বিরিঞ্চির মনে হ'ল, হেড্ মাষ্টারের কাছে এই গৌরবটা তা'রই পাওয়া উচিত ছিলো, এবং শিবু যে তত ভালো ইংরেজি জান্‌বে, এটাতেও যেন তা'র মন সায় দিতে চাইলো না। বিরিঞ্চির মনে অবিশ্যি হিংসে নেই, কিন্তু তা'কে শিবুর সঙ্গে কথা বলতে কেউ কখনো দেখ্‌তো না। শিবু দরকার হ'লে সকলের সঙ্গেই কথা বল্‌তো, কিন্তু যা'কে গল্প-করা বলে, তা সে কারুর সঙ্গেই কর্‌তো না। বিরিঞ্চির চারিদিকে ক্লাসের সব ছেলেরা ভোম্‌রার মতো গুন্ গুন্ করে, সমস্ত ইস্কুলে শিবুর সঙ্গী শিবু নিজে। শিবু থাকে হস্‌টেলে—সেখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ তা'দের হিস্‌ট্রির টীচার—অবিনাশবাবু। অবিনাশবাবুর ছ' বছরের ছেলেটি বাপের সঙ্গে থাকে—নর্ম্যাল্ ইস্কুলে পড়ে। মাস খানেক না যেতেই সে শিবু-দার বেজায় ন্যাওটা হ'য়ে পড়্‌লো। পণ্টু শিবুর টেবিল গুছোয়, দোকান থেকে টুক্‌টাক্ কাগজ, পেন্সিল এনে দেয়; শিবু ইস্কুল থেকে ফিরে ছাতে বসে পণ্টুকে গল্প শোনায়—অদ্ভুত, আজগুবি সব গল্প। তবু—শিবু যে একা, সে একা।

হাফিয়ার্লিতে বিরিঞ্চির কান ঘেঁষে বন্দুকের গুলি চলে গেলো; শিবু সবগুলো সাব্‌জেক্টে ফার্স্ট্, কিন্তু বাঙলায় সাঁইত্রিশ পেয়ে মোটের ওপর তিন নম্বরের জন্যে সেকেণ্ড হইয়া গেল! বিরিঞ্চির সম্মানটা কোন রকমে বজায় রইলো, কিন্তু বিরিঞ্চি একমাত্র বিরিঞ্চি নয়, এ-কথা বুঝতে কারুর বাকি রইলো না। বিরিঞ্চি সাতাশে জুলাই, সোমবার থেকে রোজ দশ ঘণ্টা করে' পড়া সুরু কর্‌লে। তবু—তবু—ওর নৌকো ডুব্‌লো। য়্যানুয়েলে শিবু বাঙলায় মেরে দিলে বিরানব্বই। আর যাবে কোথা? পাঁচ বছর যাবৎ বিরিঞ্চি প্রত্যেক বার পেট থেকে গলা অবধি প্রাইজ্ বই নিয়ে বাড়ি ফেরে—এবারে সবগুলো প্রাইজ্ উঠেছে শিবুর নামে—মায় গুড্ কণ্ডাক্ট, রেগুলার য়্যাটেন্‌ডেন্স। বিরিঞ্চির জন্যে সুধু একটি প্রাইজ—সেকেণ্ড্ প্রাইজ্। কাল প্রাইজ্-ডে। বিরিঞ্চির মুখের দিকে তাকানো যায় না, কিন্তু শিবুর চেহারার কোনো পরিবর্ত্তন নেই—তা'র যেন কিছুই হয় নি। আগুন ছুঁলেই যেমন হাত পোড়ে, পরীক্ষা দিলেও তেম্‌নি এম্‌নিতেরো ফার্স্ট হ'তে হয়—তা'র মুখের ভাবখানা এই।

প্রাইজ্-ডিষ্ট্রিবিউশন্ হ'য়ে গেছে; সন্ধ্যে হয় হয়—অভ্যাগত ভদ্রলোকেরা যার যার বাড়ী ফিরে' যাচ্ছেন; প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডে ছোট ছোট দল বেঁধে ছেলেরা এখনো জট্‌লা পাকাচ্ছে। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে একটা গাছের আড়ালে শিবু বসে' আছে—তা'র সামনে এক গাদা বই ছড়ানো। কমিশনার্ সাহেব তা'র সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ কর্‌ছেন, কমিশ্‌নার পত্নী তা'র হাতে বই তুলে' দেবার সময় প্রত্যেকবার মিষ্টি করে' হেসেছিলেন, তিন-বার সমবেত ভদ্রমণ্ডলী তা'কে উৎসাহ দিয়ে হাততালি দিয়েছে,—কিন্তু এখন, এখন সে একা—চব্বিশখানা বই নিয়ে সে একা।

বিরিঞ্চি মাত্র একটি প্রাইজ্ পেয়েছে—দু'খানা বই; কিন্তু সে প্রাইজ নিয়ে বেরিয়ে আসা মাত্র থার্ড ক্লাসের অর্দ্ধেক ছেলে তা'র সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, উৎসুক ব্যগ্রকণ্ঠে শুধিয়েছে, 'দেখি, কি বই পেলি?' বিরিঞ্চি বই দেখিয়ে আবার সযত্নে ফিতে বেঁধে রেখেছে। বাড়ি

থেকে তা'র বাপ মা, ভাই বোন সবাই এসেছে, সভা ভেঙ্গে যাওয়ার পর তা'কে ঘিরে সবাই দাঁড়িয়েছে—ঐ তো, শিবু তা'দেরকে দেখ্‌তে পাচ্ছে। বিরিঞ্চি একটি মাত্র প্রাইজ্‌ পেয়েছে—দু'খানা মাত্র বই—তাইতেই ওরা সবাই কত খুসি, বই দু'খানা সবাই হাতে নিয়ে-নিয়ে দেখ্‌ছে—ছোট ভাইটা হাততালি দিয়ে লাফাচ্ছে, ছোঁট বোন বেণী দুলিয়ে দুলিয়ে কতই কথা না বল্‌ছে! মা-বাবার মুখ কেমন হাসিতে ভরা! ঐ ওরা আস্‌ছে—বিরিঞ্চি ওর পাস দিয়েই গেলো, কিন্তু ও এখন কোনো-দিকেই তাকাচ্ছে না—মার সঙ্গে গল্প করছে। শিবুর সঙ্গে রেষারেষির ওর এখন সময় নেই।···ওরা সবাই গিয়ে মোটরে উঠ্‌লো।

তারপর শিবু একটা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে তার চব্বিশ-খানা বই নিয়ে হস্‌টেলে ফির্‌লো। অন্ধকার ঘর; শিবু টেবিলের ওপর চুপ্‌ করে' বইগুলোকে এনে ফেল্‌লে।

পন্টু তা'র শব্দ পেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বল্‌লে, 'কই দেখি শিবু-দা, কি-কি বই পেলে?'

শিবু আলো জ্বালাতে জ্বালাতে বল্‌লে, 'আমার কোন চিঠি এসেছে রে?'

'জানি নে—না বোধ হয়। কই, দেখাও না বই!'

'বলনা আমার কোন চিঠি আছে কিনা!' বলে' সে চিঠির আশায় টেবিলের কাগজ পত্র পলট্‌ পালট্‌ করতে লাগ্‌লো।

পন্টু শিবুর হাত ধরে' আবদারের স্বরে বললে, "দ্যাখাও না বই?"

"ফের দুষ্টুমি!" বলে' শিবু ঠাস্‌ ক'রে পন্টুর গালে এক চড় বসিয়ে দিলে।

পন্টু নিতান্ত অপ্রস্তুত হ'য়ে ভ্যাঁ করে' কেঁদে ফেল্‌লে।

শিবু তখন ওর গায়ে হাত বুলিয়ে, মিষ্টি কথা বলে আদর করে—নানা ভাবে ওর কান্না থামাবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো। পন্টু কিছুতেই প্রবোধ মানে না! শেষে শিবু বললে, "এই সবগুলো বই তোকে দিলাম—নে।'

'সত্যি?' হঠাৎ পন্টু হেসে ফেল্‌লে, 'সত্যি বলছ, শিবু-দা?'

'সত্যি রে, সত্যি। তুই আয় এখানে পন্টু টেবিলটার ওপর উঠে বোস্‌। কত সুন্দর সুন্দর ছবি আছে, দেখ্‌বি।'

পন্টু এক লাফে টেবিলের উপর চড়ে' বস্‌লো, আর শিবু একে-একে তা'র চব্বিশখানা বই থেকে তা'কে ছবি দেখালে। শিবুর মন অনেক হাল্‌কা হ'য়ে গেছে।

[পৌষ, ১৩৩৬] শ্রীবুদ্ধদেব বসু

আয় আয় চাঁদামামা

রতনের মনটা আজ ভারী খারাপ হোয়ে আছে। সকালবেলা সে পাড়ায় খেলতে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরে এসে অবধি সে আর মাকে দেখতে পাচ্ছে না। ঠাকুরমা বলছেন—মা মামার বাড়ীতে গিয়েছে—দু-দিন বাদেই ফিরে আস্‌বে মা।

কথাটা কিন্তু রতনের মোটেই ভাল লাগ্‌ছে না। মা তো তাকে ফেলে কোথাও যায় না! মায়ের ওপর অভিমানে তার চোখে জল এসে গেল। ঠাকুরমার পিঠে দুম্‌ দুম্‌ কোরে দুই কীল বসিয়ে দিয়ে সে বল্লে—কেন তুমি যেতে দিলে?

ঠাকুরমা কোনো রকমে চোখের জল চেপে বল্লেন—পাগলা ছেলে, দু-ঘণ্টা মাকে ছেড়ে থাকতে পারিস্‌ না—

রতন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল—আমাকে মামার বাড়ী নিয়ে চল।

কান্না শুনে রতনের বাবা এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে বাবা?

রতন কাঁদিতে কাঁদিতে বল্লে—আমি মার কাছে যাব। বাবা কোনো কথা না বলে মুখ গম্ভীর কোরে চলে গেলেন। দু-দিন পরে তিন দিনের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই রতন-জিজ্ঞাসা করলে, মা এসেছে?

ঠাকুরমা বল্লেন—এতদিন পরে বাপের বাড়ী গেছে, বোধ হয় ওবেলা আস্‌বে।

রতন চেঁচিয়ে মেচিয়ে বাড়ী মাথায় কোরে তুল্লে—আমি খাব না—নাবো না, কিছু করব না। ঠাকুরমা বল্লেন, লক্ষ্মী বাবা, ও রকম করে না। ওবেলা-দেখো সে ঠিক এসে হাজির হবে। তোমাকে কত আদর করবে।

রতন বল্লে—আমি তো তার সঙ্গে কথা ক'ব না।

ঠাকুমা বল্লেন—সেই ঠিক—তা হোলেই সে বেশ জব্দ হবে। কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে রতন আবার বল্লে—ও-বেলা যদি না আসে?

ঠাকুমা বল্লেন—ঠিক আসবে রে পাগ্‌লা, ঠিক আস্‌বে। ও-বেলা খেলা শেষ কোরে বাড়ী ফিরে যখন দেখলে মা তখনো আসেনি, তখন রতন মহা হাঙ্গামা সুরু কোরে দিলে। খাবারের থালা ছুঁড়ে, কাপড় ছিঁড়ে সে চীৎকার কোরে কাঁদতে লাগ্‌ল। তার বাবা, ঠাকুরমা, পুরোনো দাস-দাসী কেউ থামাতে পারে না।

ঠাকুমা বল্লেন—চল রতন, আমরা আজ ছাতে গিয়ে শুই।

ছাতটা ছিল রতনের কল্পরাজ্য। তার মা গ্রীষ্মের সময় মাঝে মাঝে ছাতে গিয়ে শুতেন। নিঃসীম নীল আকাশের নীচে শুয়ে ওপরের তারাগুলো সম্বন্ধে কত রকমের অদ্ভুত প্রশ্ন তুলে মাকে সে ব্যতিব্যস্ত কোরে তুল্‌ত। মা বিরক্ত হোয়ে বলতেন—আর পারি না বাপু তোর সঙ্গে বকতে—এবার ঘুমো। তার পরে তার মাথা চাপড়ে গান ধরতেন—আয় আয় চাঁদামামা, আয় আয় আয়রে।

রতনের শিশুমন তারার দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে লেগে যেত—তার পরে কখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়্‌ত জান্‌তেও পারত না।

কিন্তু রতনের বাবা তাদের এই ছাতে শোওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না বলে ইচ্ছা থাকলেও রোজ সেখানে যাওয়া চল্‌ত না। ঠাকুরমা সেদিন ছাতে শোওয়ার কথা তুলতেই রতন মার কথা ভুলে গিয়ে বল্লে—চল তা হোলে এক্ষুনি চল।

ছাতে গিয়ে মাদুরে শোবার একটু পরেই রতন আস্তে জিজ্ঞাসা করলে—মা কেন এল না ঠাকুরমা! রতনের গলায় কান্নার সুর তখনো জড়িয়ে রয়েছে।

ঠাকুরমা কোনো উত্তর দিলেন না দেখে রতন চুপ কোরে কি ভাবতে লাগল। টপ্‌ কোরে এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল তার হাতে পড়তেই সে মুখ তুলে দেখলে ঠাকুরমার চোখে জল টল্‌মল্‌ করছে। তাঁর চোখে রতনের চোখ পড়তেই তিনি মুখটা ফিরিয়ে চোখের জল মুছে বল্লেন—ঘুমোও তো লক্ষ্মী—

রতন কোনো কথা না বলে চোখ দুটো বুঁজিয়ে ফেল্লে। ঠাকুরমা তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে গুণগুণ কোরে গাইতে আরম্ভ করিলেন—আয় আয় চাঁদামামা—

ঠাকুরমার মুখে এই ঘুম-পাড়ানি গান সে আজন্ম শুনে আস্‌ছে কিন্তু আজ তাঁর কণ্ঠের করুণ সুর তার শিশু হৃদয় যেন তোলপাড় কোরে তুলতে লাগ্‌ল। তার মনে হোতে লাগ্‌লো এই সুরের সঙ্গে তার মার চলে যাওয়ার যেন অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসে বল্লে—চাঁদা মামার গান গেওনা ঠাকুমা—ভারী দুষ্টু ও —মাকে আসতে দেয় না।

ঠাকুরমা হট্টমালার গান সুরু করলেন। হট্টমালার পর ঘুমপাড়ানি; তারপর কখন যে আবার চাঁদা মামার গান ধরে ফেলেছেন তা নিজেই জানতে পারেন নি। হঠাৎ রতনের কথা মনে পড়তেই তিনি মাথা নীচু কোরে দেখলেন সে ঘুমিয়ে পড়েছে, তার চোখের একফোঁটা জল গাল বেয়ে ধীরে ধীরে বালিশের দিকে গড়িয়ে চলেছে।

রতনের মা তার পরের দিনও এলেন না, তার পরের দিনও না। মোট কথা তিনি আর কোনো দিনই এলেন না। রতন বড় হোতে লাগ্‌লো। মাতৃহীন এই পৃথিবীকে সে মনে মনে স্বীকার না করলেও সেটা তার সহ্য হোয়ে গেল। ক্রমে সে বুঝতে পারলে, তার মা যে মামার বাড়ীতে গিয়েছেন সে মামার বাড়ীতে একবার গেলে আর কোনো মা-ই ফিরে আসেন না। মার কথা তুলে আর সে ঠাকুরমাকে মারে না, জ্বালাতন করে না। প্রতিবেশিনীরা ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সেখানে মার কথা উঠলেই সেখান থেকে সে সরে যায়। তারপরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গ্রামের ধারে যে প্রকাণ্ড বিল আছে তারই ধারে গিয়ে বসে। মন তার চলে যায় বিলের ওপারে সেই না জানা না দেখা পল্লীর মধ্যে। সন্ধ্যা অবধি সেখানে বসে থেকে বাড়ীতে ফিরে আসে। ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলে না।

এমনি কোরে রতনের দিন কাটে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংসারে অনেক পরিবর্ত্তন হোতে লাগ্‌ল। তার ঠাকুরমা মারা গেলেন। তার মায়ের বদলে একজন নতুন মা এলেন। তাকে স্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হোতে হোল। সেখানে সে অনেক বন্ধু পেলে। কিন্তু সব সুখ দুঃখ হাসি অশ্রুর মধ্যে সেই তার ছেলেবেলার হঠাৎ পালিয়ে যাওয়া মার কথা মাঝে মাঝে তাকে আকুল কোরে তুল্‌ত।

ইস্‌কুলে রতন পড়াশুনা ভাল পারে না, সেখানে মাষ্টারেরা মারে। বাড়ীতে পড়ার জন্য বাবার কাছে বকুনি আর নতুন মার গঞ্জনা সইতে হয়। সে এত চেষ্টা করে কিন্তু পড়া দেবার সময় কিছু মনে থাকে না। এই দুঃখের মধ্যে থেকে থেকে যেন হারিয়ে যাওয়া মায়ের আহ্বান শুনতে পায়। কোথায় কোন্‌ অজানা দেশ থেকে মা যেন ডাকছে—সেখানে গেলে আর কোনো কষ্টই থাকবে না।

একদিন, সেদিন স্কুলে ও বাড়ীতে পড়ার জন্য রতনকে খুব মারধর করায় তার মনটা ভারী খারাপ হোয়ে আছে। বিকেলে সে খেলতে না গিয়ে গ্রামের পারে সেই বড় বিলের ধারে গিয়ে বস্‌ল। এইখানে বসে নানা কথা ভাবতে ভাবতে তার মাথায় এক খেয়াল চাপ্‌ল। সে ভাবতে লাগ্‌ল কারুকে না জানিয়ে যদি এখান থেকে সে সোজা কলকাতায় চলে যায় তাহোলে কেমন হয়। সেখানে পড়ার জন্য তাড়া দেবার কেউ নেই, স্কুলে মাষ্টারদের তাড়া নেই। বাবার প্রহার কিম্বা নতুন মার গঞ্জনা নেই। এই মুক্তির কল্পনাতেই সে বর্ত্তমানের সব দুঃখ ভুলে গেল। কিছুদিন আগে পৈতের সময় সে গোটা কয়েক টাকা পেয়েছিল। টাকাগুলো পাছে হারিয়ে যায় এই ভয়ে সেগুলো সে সঙ্গেই রাখ্‌ত। একবার পকেট থেকে টাকাগুলো বের কোরে দেখে নিয়ে সে সোজা ষ্টেশনের দিকে ছুটলো। তারপর একখানা কলকাতার টিকিট কিনে একেবারে গাড়ীতে চেপে বস্‌ল।

হুস্‌ হুস্‌ শব্দ কোরে রেলগাড়ী ষ্টেশন ছেড়ে দিতেই রতনের বুকের মধ্যে কে যেন হাততালি দিয়ে উঠল—মুক্তি,

কলকাতায় রতনের প্রায় দশ বছর কেটে গেল। এর মধ্যে কত জায়গায় সে কাজ করলে, কতদিন তার না খেয়ে কাট্‌ল, কতবার কত বিপদের মধ্যে পড়ে আবার সে বেঁচে গেল। শেষকালে একটী দয়ালু লোক তাকে রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আপিসে একটা চাকরী দিয়েছিলেন। অতি সামান্য কাজ থেকে উন্নতি কোরে এখন তার ত্রিশ টাকা মাইনে হয়েছে। সে আলাদা একটা ঘর ভাড়া কোরে থাকে, নিজেই রান্না কোরে খায়। এর মধ্যে একবারও সে বাড়ী যায়নি, বাড়ীর কোন খোঁজই সে রাখে না, বাড়ীতেও তার কোন

খোঁজ করে না। দশ বছর আগেকার পাড়াগাঁয়ে সেই কিশোর রতন আজ যুবক।

একদিন রতন আফিস থেকে দিন কয়েকের ছুটী নিয়ে তাদের বাড়ী-মুখো রেল গাড়ীতে চেপে বস্‌ল। কলকাতা থেকে তাদের বাড়ী বেশীর দূরে নয়। ঘণ্টা কয়েক পরেই গ্রামের কাছে ষ্টেশনে সে গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলে। বাড়ীর কাছে এক জায়গায় তাদের ছেলেবেলাকার বিজয়-কাকা গাছের তলায় বসে ডাব কাটছিলেন। তাঁকে দেখে রতন ডাক দিলে—বিজয়-কা—

বিজয়-কাকা অবাক হোয়ে বল্লেন—আরে রতন! এতদিন কোথায় ছিলে? চ' চ' বাড়ীর ভেতরে—।

রতনকে ধরে বিজয়-কাকা বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলেন। রতন বল্লে—আর এক সময় আস্‌ব কাকা—এখনো বাড়ী যাইনি—আগে দেখাটা কোরে আসি।

বিজয়-কাকা রতনের হাত ধরে জোর কোরে বসিয়ে বল্লেন—কার সঙ্গে দেখা করবি?

রতন শুনলে তাদের বাড়ীর কেউ আর নেই। কয়েক বছর উপরি উপরি ম্যালেরিয়ার মড়কে তার বাপ-মা দু'জনেই মারা গিয়াছেন। গ্রামের অধিকাংশ লোকই নেই! তার একটী বোন আছে। তুলসী মুখুজ্জেরা তাকে নিয়ে গিয়ে রেখেছে। পিতৃমাতৃহীনা নিরাশ্রয়া সেই মেয়েটাকে ভারী কষ্ট দেয় ওরা ইত্যাদি।

না জানা, না দেখা, এই নিরাশ্রয়া বোনটীর প্রতি মমতায় রতনের মন পূর্ণ হোয়ে উঠ্‌ল। সে বল্লে—আমার বোন্! কি নাম তার বিজয়-কা—?

বিজয় কাকা বল্লেন—তাকে খেন্তি বলে ডাক। নাম টাম হয়নি বোধ হয়।

বিজয়-কাকার ওখান থেকে রতন তখুনি তুলসী মুখুজ্জেদের বাড়ীতে ছুট্‌ল। তারা রতনকে চিন্‌তে পেরে বল্লে, তোমার বোনকে তুমি নিয়ে যাও বাবা—তুমি পয়সা রোজগার করছ, বোনটীকে পরের বাড়ীতে ফেলে রাখা উচিত হয় না।

রতন বল্লে—কোথায় সে, তাকে একবার ডাকুন না। মুখুজ্জে বাড়ীর মধ্যে সোরগোল পড়ে গেল—খেন্তী—খেন্তী—ওরে খেন্তী তোর দাদা এসেছে—

খেন্তী এসে তার দাদাকে প্রণাম করলে। রতন মুখ তুলে দেখলে বছর ছয় সাত বয়স তার, রংটা ফরসা বটে কিন্তু অযত্নে ও রোগে সে রং ফ্যাকাশে হোয়ে গেছে। চোখ দুটো অত্যন্ত করুণ। পরনে একখানা শততালি দেওয়া ময়লা শাড়ী; হাতে দুটো হলুদ বাটায় হল্‌দে হোয়ে আছে।

রতনকে দেখবার জন্য মুখুজ্জে বাড়ীর লোকেরা তার চারিদিকে ভিড় কোরে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারা সবাই সরে যেতে রতন তাকে কাছে ডাক্‌লে। খেন্তী অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এসে তার কাছে বস্‌ল। রতন জিজ্ঞাসা করলে—আমি তোমার কে হই জান?

খেন্তী ঘাড় নেড়ে জানালে যে সে জানে। রতন তাকে কি প্রশ্ন করবে ভাবছে এমন সময় খেন্তী তার ম্লান করুণ চোখ দুটি তুলে বল্লে, দাদাভাই, আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাবে?

সংসারে স্নেহের আহ্বান কাকে বলে সে কথা রতন এক রকম ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ এতদিন পরে তার এই দুঃখী অচেনা বোনটীর মুখে 'দাদাভাই' ডাক শুনে তার চোখে জল এসে গেল। তার মনে পড়্‌ল এই রকম বয়সেই সে তার মাকে হারিয়েছিল। মাকে হারালেও সে স্নেহ থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়নি। তার ঠাকুরমা ছিলেন, তার বাবা ছিলেন—কিন্তু এ বেচারীর কেউ নেই।

বোনটীকে সে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে বল্লে—নিয়ে যাব বৈকি ভাই। আমার বোন তুমি—তুমি কেন পরের বাড়ী থাকবে! এরা তোমায় বড় কষ্ট দেয়—না?

খেন্তি চারিদিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বল্লে—হ্যাঁ।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় রতন খেন্তিকে নিয়ে কলকাতায় চলে এল।

রতনের একলার অগোছান সংসার খেন্তি দু-দিনেই ধুয়ে মুছে ঝক্‌ঝকে কোরে তুল্লে। রতন বল্লে—খেন্তি কি বিচ্ছিরি নাম, তোমাকে রেবা বলে ডাক্‌ব।

রেবা নামটা খেন্তির অদ্ভুত লাগ্‌ল। সে জিজ্ঞাসা করলে—রেবা মানে কি দাদা ভাই?

—ও একটা নদীর নাম। পছন্দ হয়েছে নামটা?

খেন্তি ঘাড় নেড়ে জানালে—হয়েছে।

এতদিন পরে রতনের একটা অবলম্বন জুটল। আফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে রেবাকে নিয়ে সে পড়তে বসে। রেবা কি খেতে ভালবাসে, কোন জিনিষ তার সহ্য হয় না—কি পাড়ের শাড়ী তার পছন্দ। রতনের মনে হয় বোনটীকে অনেক রকমের গয়না দিয়ে সাজায় কিন্তু অল্প মাইনে, বাড়ী ভাড়া আর খেতেই কুলোয় না। তবুও সে ওরি মধ্যে পয়সা জমিয়ে দু-একখানা গয়না রেবাকে কোরে দিল। ছুটীর দিনে তাকে নিয়ে সে বেড়াতে বেরোয়। কোন দিন যাদুঘর, কোন দিন চিড়িয়াখানা। তাকে কত রকমের গল্প বলে।

রেবা রান্না করে, কাপড় কাচে। রতন একটু কম খেলে সে মুখ ফুলিয়ে বলে, এমন করলে কদিন শরীর টিঁকবে! রতন তার কথা শোনে আর মনে মনে হাসে, ভাবে, যেদিন না খেতে পেয়ে পথে পথে ঘুরে মরছিলুম সেদিন কোথায় ছিলি রে পাগ্‌লী। সবার অগোচরে এই দুটী ভাই বোনের মনের সুখে দিন কাটতে লাগ্‌ল।

রতন যাঁদের বাড়ীতে ঘর ভাড়া কোরে থাকৃত তাঁরা বড় ভাল লোক। দুটি ভাই বোনকে তাঁরা নিজের ছেলে মেয়ের মত স্নেহ করতেন। একদিন বাড়ীর কর্ত্তা রতনকে ডেকে বল্লেন—এবার রেবা-মা'কে বিয়ের ব্যবস্থা কর—কতদিন আর বিয়ে না দিয়ে রাখবে?

তাইত! তাকে ছেড়ে রেবাকে যে আর একজনের সংসার

করতে চলে যেতে হবে, এ কথা তার কল্পনাতে কখনো উদয় হয়নি। কথাটা ভেবে রতন একেবারে দমে গেল।

রেবার বিয়ে হোয়ে গেল। বিদেশে চাকরি করে সে, বেশ জোয়ান ছেলে। বিয়ের পরে কাঁদতে কাঁদতে রেবা স্বামীর ঘর করতে চলে গেল। রতন অতিকষ্টে চোখের জল চেপে তাকে বিদায় দিয়ে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ল।

আবার সেই পুরোনো দিনের মত অগোছান সংসার ঠেলে রতনের দিন কাটতে লাগ্‌ল। খাওয়া দাওয়া, নাওয়া শোয়া, আফিসে যাওয়া আসা কোনো কাজেই আর তার উৎসাহ নেই, প্রতিপদেই রেবার অভাব। কাজের ফাঁকে থেকে থেকে যেন সে রেবার ডাক শুনে চম্‌কে ওঠে—দাদাভাই। তখুনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে হতাশ হোয়ে ভাবে—কোথায় কতদূরে সে স্বামীর ঘর করছে, এখানে সে আসবে কি করে!

রেবা চলে যাবার পর প্রথম প্রথম তাকে সপ্তাহে দু-খানা কোরে চিঠি লিখ্‌ত। তার পরে মাসে একখানা, তার পরে তাও কমে এল—এখন দু মাসেও একখানা আসে না। রতন ভাবে চিঠি না লিখুক—সে ভাল থাকুক্‌, সুখে থাকুক—আহা বেচারা বড় কষ্ট পেয়েছে।

সেদিন কিসের একটা ছুটি ছিল। সকাল বেলা শরীরটা ম্যাজ্‌ ম্যাজ্‌ করছিল বলে রতনের আর বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছিল না। আফিসে যাবার তাড়া নেই, তাই আরও কিছুক্ষণ গড়িয়ে নেওয়া যাক মনে কোরে সে এপাশ ওপাশ করতে করতে ভাবছিল, রেবা থাকলে এতক্ষণ সে কত তাড়াই না লাগাতো। শরীর খারাপ লাগছে শুনলে তো আর কথাই নেই। কবে কি অনাচার করার ফলে শরীর খারাপ হয়েছে তাই নিয়ে সে বকাবকি সুরু কোরে দিত। রেবার সেই আদর আব্দার ও শাসনের কথা ভাবতে ভাবতে রতনের একটু তন্দ্রা এসেছে এমন সময় একটা অতি পরিচিত স্বর যেন তার কানে ভেসে এল—দাদাভাই।

রতন ধড়মড় কোরে বিছানা ছেড়ে উঠে বস্‌ল। একবার মনে হোলো হয়ত ভুল শুনেছে। কিন্তু তখুনি আবার সেই ডাক—দাদাভাই।

—কে রে রেবা!—বলে রতন বিছানা ছেড়ে দরজার দিকে ছুটে গিয়ে রেবাকে দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল।

রতন অবাক হোয়ে দেখতে লাগ্‌ল নিরাভরণা রেবা তার ছোট্ট ছেলেটীকে কোলে নিয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার অঙ্গে একখানা নরুণ পেড়ে শাড়ী, মাথায় সিঁদুর নেই, চুলগুলি রুক্ষ।

রতনকে দেখে এগিয়ে এসে সে প্রণাম করলো, তারপরে তার মুখের দিকে একবার চেয়ে ঘাড় নীচু কোরে রইল। রতনও কোন কথা তাকে জিজ্ঞাসা করলে না। শুধু ছেলেটীকে তার কোলে থেকে নিজের কোলে নিয়ে বল্লে—চল্‌ ভেতরে চল্‌।

সমস্ত দিন দুই ভাই বোনে কোন কথাই হোলো না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার পর রেবা সেই আগেকার মতন যখন রতনের কাছটিতে এসে চুপ কোরে বস্‌ল তখন রতন জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছিল রে?

রেবা বলে—কিছু হয়নি তার। কদিন থেকে সেখানে ভয়ানক মারপিট চলছিল। সেদিন বিকেলে অফিসের কাজ সেরে সে বেচারী বাড়ী ফিরছে—কোথা থেকে একটা গুলি এসে তার বুকে বিঁধ্‌ল—

রেবা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল। রতন আর কোনো প্রশ্ন করলে না।

খোকা তার মায়ের দেখাদেখি রতনকেও দাদাভাই বলে ডাকতে সুরু কোরে দিলে। রতনের অগোছাল ঘর দোর আবার পরিষ্কার তক্‌তকে হোয়ে উঠ্‌লো। আবার সময় মত খাওয়া, সন্ধ্যার সময় খোকাকে নিয়ে খেলা সুরু হোলো। তার হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলা খোকার মূর্ত্তিতে আবার তার কাছে ফিরে এলো। একদিন অসময়ে রেবাকে শুয়ে থাকতে দেখে রতন জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে রে?

রেবা বলে—কিচ্ছু না, এমনি।

কথাটা রতনের বিশ্বাস হেলো না। সে রেবার কপালে দেখলে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা কোরে জানতে পারলে এরকম তার প্রায়ই হয়।

রতন তখুনি ডাক্তার ডাকলে। ডাক্তার এসে অনেক-ক্ষণ ধরে পরীক্ষা কোরে মুখ বেঁকিয়ে চলে গেলেন—এ রোগ সারবার নয়।

কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদের মতন রেবা দিনে দিনে মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল। তার পরে একদিন সকালবেলা খোকাকে দাদাভাইয়ের হাতে সঁপে দিয়ে সবার কাছে বিদায় নিয়ে সে চলে গেল।

শ্মশান থেকে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে রতন দেখলে খোকা তার মার কাছে যাবার জন্য ভয়ানক কান্না জুড়ে দিয়েছে, কেউ তাকে ঠাণ্ডা করতে পারছে না। রতন তাকে কোলে নিতেই সে তাকে গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে—দাদাভাই, আমার মার কাছে নিয়ে চল।

রতন খোকাকে নিয়ে ছাদে উঠ্‌ল। চাঁদের আলোতে ছাত ভেসে যাচ্ছিল। খোকা কিছুতেই থামে না। রতন তাকে কোলে শুইয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। খোকার কান্নার সঙ্গে সুর মিশিয়ে সে গান ধরলে—আয় আয় চাঁদামামা—

গান গাইতে গাইতে বহুদিন বিস্মৃত আর এক রাত্রির কথা রতনের মনে পড়ে গেল। সে রাত্রেও জ্যোৎস্নায় এমনি কোরে তাদের ছাত ভেসে যাচ্ছিল। সদ্যমাতৃহারা রুদ্যমান রতনকে ঘুম পাড়াবার জন্য ঠাকুরমা এই গানই ধরেছিলেন—ভাবতে ভাবতে রতন বর্ত্তমান হারিয়ে ফেল্লে। তার কোলে যে খোকা শুয়ে আছে সে কথা সে ভুলে গেল। খোকার একটা হেঁচ্‌কীর আওয়াজ তার কানে যেতেই সে চম্‌কে উঠে মাথা নিচু কোরে দেখলে খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে—তার চোখের এক ফোঁটা জল গালের ওপরে পড়ে চাঁদের আলোতে ঝক্‌ ঝক্‌ করছে—।

[বৈশাখ, ১৩৩৮ শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

দোলা



খেলার সাথী

'কলকাতার গলিতে'

বিশ্বনাথ পাড়াগাঁয়ের ছেলে।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে দুপুর রাত্রে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে সে তিন ক্রোশ অনায়াসে বেড়িয়ে আসতে পারে। অমাবস্যায় গ্রামের সীমানার শ্মশান থেকে মড়া পোড়ান কাঠ সে কতবার বাজি ধরে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ভয় তার শুধু কলকাতা সহরকে।

যেখানে দু'পা এগুতে হলে মানুষের গায়ে ধাক্কা লাগে, ইলেক্‌ট্রিক আর গ্যাস লাইটের কল্যাণে যেখানে দিন কি রাত চেনবার জো নাই বল্লেই হয়, সেইখানেই একরাতে সে যা বিপদে পড়েছিল!

বিশ্বনাথ বলে—"না কলকাতা সহরে সন্ধ্যার পর বেরুন নিরাপদ নয়।"

আমরা হেসে উঠলে, বলে,না হে না, চৌরঙ্গী, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউএর কথা বলছি না। কলকাতাটা আগাগোড়া চৌরঙ্গী নয়। শোন তাহলে—"

"সেবার গাঁয়ের লাইব্রেরী জন্যে বই কিনতে কলকেতা গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম একদিন থেকেই বই পত্র সব কিনে রাত্রের ট্রেণে বাড়ী চলে আসব। কিন্তু কলকেতায় গেলে নতুন বায়স্কোপ থিয়েটার না দেখে কেমন করে ফেরা যায়। প্রথম দিনটা তাতেই কেটে গেল। দ্বিতীয় দিনে কলেজ ষ্ট্রিটে গিয়ে বই-টই সব কিনে ফেল্লাম। সঙ্গে বিছানা পত্রের বা তোরঙ্গ বাক্সের ঝঞ্ঝাট ছিল না। শুধু একটী সুটকেশ তাতে বইগুলো ভরে একেবারে সোজা শিয়ালদা ষ্টেশনে গিয়ে উঠলেই হ'ত।

কিন্তু হঠাৎ কি খেয়াল হল একবার অবিনাশের সঙ্গে দেখা করে যাই।

অবিনাশ আমাদের গ্রামের ছেলে। স্কুলে আমার সঙ্গেই পড়াশুনা করেছে। কলেজেও কয়েক বছর আমরা এক সঙ্গে পড়েছিলাম। অবিনাশ বেশী দিন অবশ্য কলেজে থাকে নি। অত্যন্ত খেয়ালী ছেলে—কোন কাজে বেশীদিন লেগে থাকবার মত ধৈর্য্য তার ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন তার উড়ু উড়ু ভাব। বাড়ী থেকে যে কতবার সে ছেলেবেলায় পালিয়ে গেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। বড় হয়েও তার সে স্বভাব কাটেনি। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, হঠাৎ একদিন হয়ত আমরা শুনলাম অবিনাশ হেঁটে সেতুবন্ধ যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর হয়ত দুমাস তার দেখা নেই। আমরা কোন রকমে প্রক্সি দিয়ে হয়ত সেবার তার কলেজের খাতায় কামাইএর সংখ্যা কমিয়ে রাখলাম। কিন্তু এমন করে কতদিন রাখা যায়? বছরের শেষে একজামিনেশনের সময়ে দেখা গেল অবিনাশ আমাদের প্রক্সি দেওয়া সত্ত্বেও কলেজে এত কম দিন এসেছে যে তার পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাওয়া অসম্ভব। আমরা দুঃখিত হলাম। ছেলেটা এত আমুদে মিশুক ছিল যে আমরা সবাই তাকে ভালবাসতাম। কিন্তু অবিনাশের যেন স্ফূর্ত্তিই হল। বল্লে, "তবে আর কি? ভাই! বর্ম্মাটা একবার ঘুরে আসি।"

তারপর অবিনাশের আর দেখা নেই। আমাদের চেয়ে তার ধাতই ছিল আলাদা।

পৃথিবীটা যে মস্ত বড় এই আনন্দেই তার মন ভরপুর হয়ে থাকত। পৃথিবীর এই বিশালতাকে দেশে দেশে নতুন পথে ঘুরে ঘুরে উপভোগ করে তার আশা আর মিটিতে চাইত না। যে সব দেশ সে এখনো দেখেনি তার আকর্ষণের কথা সে মাঝে মাঝে এমন তন্ময় হয়ে বলত যে আমাদেরও কখন কখন মোহ ধরে যেত—কেমন যেন মনে হত এই ছোট্ট সহরের ছোট্ট জানা কটি রাস্তায় দুবেলা যাওয়া আসায় জীবনের কোন সার্থকতাই নেই—পথ যেখানে অফুরন্ত, আকাশের যেখানে কুল-কিনারা নেই, এমন জায়গায় বড় করে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে না পারলে যেন বাঁচাই বৃথা।

কিন্তু আমাদের এ ক্ষণিক মোহ অবশ্য খানিক বাদেই কেটে যেত কিন্তু অবিনাশের এই মোহই ছিল সব।

মাস তিনেক আগে আমার গ্রামের ঠিকানায় এই অবিনাশের একটা চিঠি পেয়েছিলাম বহুদিন বাদে। একটা গলির ঠিকানা দিয়ে লিখেছিল যে অনেক যায়গা ঘুরে ফিরে সে কলকাতায় এই ঠিকানায় আপাততঃ আছে। আমি এসে তার সঙ্গে যেন দেখা করি। এতদিন বাদে তাকে সেই ঠিকানায় পাওয়া হয়ত যাবে না জেনেও একবার যেতে ইচ্ছে হল।

বাড়ীর নম্বরটা ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু গলিটা মনে ছিল। ভাবলাম কলেজ ষ্ট্রীট থেকে বেশী দূর হবে না। ট্রেণেরও এখন দেরী আছে। একবার দেখা করেই যাই যদি তাকে পাওয়া যায়।

একটু খোঁজাখুঁজির পর—একটা গলি রাস্তায় ঢুকে একজনাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম আর একটু গেলেই অবিনাশ যে গলিতে থাকে তা পাওয়া যাবে।

রাত তখন বেশী নয়। বড় জোর আটটা হবে। কিন্তু গলি দিয়ে খানিক দূরে হেঁটেই একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। গলিই হোক আর যাই হোক, কলকাতার পথ ত বটে। অথচ এই আটটা রাত্রে সেখানে একটী জন প্রাণী নেই।

ভেবেছিলাম খানিক দূর গিয়ে আবার কাউকে পথ জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু লোক কোথায়? তা ছাড়া গলিটাও ফুরোতে চায় না।

একবার সন্দেহ হল, হয়ত ভুল পথে এসেছি। কিন্তু যে লোকটা আমায় খবর দিয়েছে আমার ভুল পথ দেখিয়ে তার লাভ কি? নির্জ্জন রাস্তায় চুরি ডাকাতি? কিন্তু আমার কাছে কি এমন লাখ পঞ্চাশ টাকা আছে যে চোরদের ষড়যন্ত্র করতে হবে? আমার সাজপোষাক দেখেও বড়লোক বলে ভুল করবার কোন সম্ভাবনা নেই। তবে?

আরো খানিকটা এমনি করে এগিয়ে গেলাম। পথ তেমনি নির্জ্জন। বাতিগুলোও কি এ পথের মিটমিটে হতে হয়! একে গ্যাস-পোষ্টগুলো অত্যন্ত দূরে দূরে তার ওপর কি কারণে জানি না আলো তাদের এত ক্ষীণ যে রাস্তা আলো হওয়া দূরের কথা, সেগুলো যে জ্বলছে এই-টুকুই বুঝতে কষ্ট হয়।

খাস্ কল্‌কাতার ভেতর এমন রাস্তা আছে কে জানত! দুপাশের বাড়ীগুলো যেন মান্ধাতার আমলের তৈরী। কোন রকমে হাড় বেরুন ইট কাঠের জীর্ণ দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। না আছে কোন বাড়ীতে একটা আলো, না জন-মানুষের একটু শব্দ। সে রাস্তার পাশে সারের পর সার পোড়ো বাড়ীর মত সব সাঁ সাঁ করছে।

ক্রমশঃ মনে হল একটা কেমন যেন ভাপ্‌সা গন্ধ নাকে আসছে। বহুদিন আলো-বাতাস সেখানে ঢোকেনি, মানুষের বাস যেখানে বহুদিন ধরে নেই, এমনি ঘরে ঢুকলে যেমন গন্ধ পাওয়া যায়, গলিটায় ঠিক সেই রকম একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম।

লোকটা বলেছিল কিছু দূর গেলেই ডাইনে গলি পাওয়া যাবে। কিন্তু জন-মানুষহীন জীর্ণ বাড়ীর সারের ভেতর ডাইনে বাঁয়ে কোথাও কোন পথ নেই।

সামনের পথও খানিক দূর গিয়ে দেখলাম বন্ধ। যে পথে ঢুকেছি গলিটার ওই একটি মাত্রই তাহলে বেরুবার রাস্তা। আশ্চর্য্য ব্যাপার! লোকটা মিছিমিছি আমায় ভুল পথ দেখাল কেন?

সেখান থেকে ফিরলাম। গলিটা যেন আরো অন্ধকার মনে হচ্ছিল। এতক্ষণ যে গ্যাসগুলো মিটমিট করে জ্বলছিল তারই কটা একেবারে নিভে গেছে দেখলাম। মনে হল, এ গলি থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। ভীতু আমি নই কিন্তু কলকেতার সহরের ভেতর এমন অভাবনীয় ব্যাপার দেখে গা'টা কেমন ছম্ ছম্ করছিল।

সবে ত প্রথম রাত! কলকাতা সহরের সমস্ত রাস্তা এখন লোকজনে গাড়ী ঘোড়ায় মানুষের শব্দে গম্ গম্ করছে। অথচ এই পথটা কেমন করে এখন নির্জ্জন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মনে হল, আমি যেন বহুকালের প্রাচীন একটা সহরে এসে পড়েছি। সে সহরের লোকজন বহু-কাল আগে বাড়ী-ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কত বছর যে মানুষের পা সে সহরে পড়েনি কেউ যেন জানে না। আমিই যেন প্রথম সে সহরের নিস্তব্ধতা ভাঙলাম। খট্ খট্ খট্—আমার নিজের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ কোথাও নেই। সে শব্দ অদ্ভুত ভাবে নির্জ্জন অন্ধকার বাড়ীগুলোর দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আমার চোখের ওপরই কটা রাস্তার বাতি দপ্ দপ্ করে নিভে গেল। ভাপ্‌সা গন্ধটা ক্রমশঃ যেন বেড়ে গিয়ে অসহ্য মনে হচ্ছিল। না, এ গলি থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে পারি ততই মঙ্গল। কাজ নেই আর অবিনাশের খোঁজ করে। পরে একদিন আবার আসলেই হবে।

খানিক দূর গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এদিকেও গলির পথ যে বন্ধ। কিন্তু তা কেমন করে হতে পারে? আমি একটা পথে যে গলিতে ঢুকেছি এ বিষয়ে ত কোন সন্দেহ নেই। এ গলি দিয়ে এগুবার সময়ে আশ পাশে কোন পথই দেখতে পাই নি। তা হলে গলির দুমুখ বন্ধ কেমন করে হয়?

ভাবলাম, হয়ত আরো একটা পথ ছিল। যাবার সময় আমার দৃষ্টি কোন রকমে এড়িয়ে গেছে, এখন আসবার সময় ভুল করে সেইটেতেই ঢুকে পড়েছি। সেইটেরই মুখ এখানে বন্ধ। কিন্তু এরকম ভুলই বা হবে কেমন করে? আমি অন্যমনস্ক হয়ে ত ছিলাম না। আগাগোড়াই ত সজাগ হয়ে চলেছি। রাস্তায় লোক না থাক, একটা বাড়ীতে যদি একটা আলো দেখা যেত! না হয় ডেকেই জিজ্ঞাসা করতাম

যাই হোক্, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই জেনে আমি আবার ফিরলাম। গলি থেকে বেরুতে হবেই। আবার সেই নির্জ্জন অন্ধকার গলি দিয়ে শুধু নিজের পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে এগিয়ে চললাম। গলিটা যেন ক্রমশঃ দীর্ঘই হয়ে চলেছে। আমার অজান্তে কে যেন ইতি মধ্যে সেটা বাড়িয়ে আরো লম্বা করে দিয়েছে।

এবারেও যখন দেখলাম গলির মুখ বন্ধ, তখন সত্যই বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। একে আমরা পাড়া গাঁয়ের লোক। ফাঁকা আকাশ ফাঁকা মাঠের মধ্যে মানুষ হয়েছি। সহরে এলে অমনিই আমাদের হাঁফ ধরে। তার উপর এই ভাপসা গন্ধভরা অন্ধকার গলি—চারিদিক থেকে সে যেন আমাকে জেলখানার মত বন্দী করে ফেলবার ষড়যন্ত্র করেছে। ওপরে চেয়ে যে একটু আকাশ দেখতে পাবো তারও জো নেই। এমন একটা ধোঁয়াটে কুয়াশায় বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তার ভেতর দিয়ে একটা তারাও দেখা যায় না।

যত এই অদ্ভুত ব্যাপার ভাবছিলাম মাথাটা ততই গুলিয়ে আসছিল। কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। সুটকেশটা বইয়ের ভারে বেশ ভারীই ছিল। সেটা বয়ে বেশ ক্লান্তই নিজেকে মনে হচ্ছিল। এমনি করে আর খানিকক্ষণ ঘুরতে হলে ক্লান্তিতেই ত বসে পড়তে হবে।

হঠাৎ বুকটা ধড়াস্ করে উঠ্‌ল। দূরে একটা মিট্‌মিটে বাতির তলায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে না! তাড়াতাড়ি সেই দিকে এগিয়ে গেলাম—এই ত আমাদের অবিনাশ। এতক্ষণের ভয় ভাবনা নিমেষে ভুলে গেলাম।

আনন্দে চীৎকার করে তার নাম ধরে ডাকতেই সে চমকে ফিরে তাকাল। বল্লাম, "কি আশ্চর্য্য! তোর খোঁজ করতেই এই এক ঘণ্টা এই গলির ভেতর ঘুরে হয়রান হচ্ছি যে। বাবা! কি অদ্ভুত গলিতে থাকিস্ তুই। ঢুকে আর বেরুন যায় না!"

অবিনাশ একটু হেসে বল্লে, "এসেছিস্ তাহলে ঠিক।"

বল্লাম, "এসেছি আর কই! তোর দেখা না পেলে

এই গলির ভেতর তোর বাড়ী কি খুঁজে বার করতে পারতাম।"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে অবিনাশ বল্লে, "আমায় তা হলে তোর মনে আছে, ভাই!"

"মনে থাকবে না কেন রে?"

"না ভাই মনে থাকে না! অথচ মানুষ যেটুকু মনে করে রাখে তার ভেতরেই আমরা বেঁচে থাকি!"

আমি হেসে বল্লাম—"ছিলি ত ভূপর্য্যটক্, আবার দার্শনিক হলি কবে থেকে। যাক এখন তোর বাড়ী চল দেখি। তোর সব গল্প শুনতে চাই।"

অবিনাশ কেমন যেন একটু নিরুৎসাহ হয়ে বল্লে, "আমার বাড়ী। আচ্ছা চল। আমার চিঠি পেয়েছিলি।"

"হ্যাঁ, সেত তিন মাস আগে।"

"তোর জন্যে কতদিন অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম।"

"আবার? তা হলে ফিরলি কবে?"

অন্যমনস্ক ভাবে অবিনাশ বল্লে—"এই আজ।"

"এই আজ? এবারে গেছলি কোথায়?"

"বলছি চল।"

সেই নির্জ্জন গলি দিয়েই তখন আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু আর তখন আগের কথা কিছুমাত্র মনে ছিল না।

অবিনাশ বলতে লাগল,—"এবারে ভাই গেছলাম বহুদূর। খিদিরপুরের ডকে বেড়াতে বেড়াতে একদিন সুন্দর একটি জাহাজ দেখলাম। সুন্দর বলতে নতুন মনে করিসনি যেন। জাহাজটা অনেক পুরোনো। নোনা জল লেগে লেগে তার গায়ের রঙ চটে গেছে। মাস্তুলগুলো বহুদিনের পুরোনো। চিমনিগুলো ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। আগাগোড়া জাহাজটা দেখলেই মনে হয় বহুকাল ধরে পৃথিবীর কত সমুদ্রে সে যেন পাড়ি দিয়ে ঝুনো হয়ে গেছে। তার চেহারাতেই কেমন একটা ভবঘুরে রুক্ষ রুক্ষু ভাব। সেইটেই তার সৌন্দর্য্য। তার ওপর যখন শুনলাম যে এখান থেকে মাল নিয়ে যাবে যবদ্বীপে তখন আর লোভ সামলাতে পারলাম না।

যবদ্বীপ! নারকেল আর তালগাছের সার তার তীর পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছে সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করতে। বাতাসে আর জঙ্গলের মশলাগাছের গন্ধ! তার উপর গভীর বনের মাঝে তার বোরোবুদর!

একেবারে মেতে উঠলাম; যেমন করে হোক যেতেই হবে এই জাহাজে। জাহাজের ভাড়া দেবার মত পয়সা নেই। অনেক কষ্টে জাহাজের হেড্ খালাসীকে খোঁজ করে, তার সঙ্গে ভাব করে তাকে কিছু ঘুষ দিয়ে লুকিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করলাম। জাহাজের একধারে বিপদের সময় ব্যবহার করবার জন্যে ছোট ছোট তেরপল ঢাকা বোট টাঙ্গানো থাকে। ঠিক হল তারই একটির ভেতর আমি থাক্‌বো। কেউ তাহলে টের পাবে না। খালাসী কোন এক সময়ে লুকিয়ে এসে আমায় খাবার দিয়ে যাবে।

গভীর রাতে জাহাজে চড়ে সেই বোটের ভিতরে গিয়ে হেড্খালাসীর নির্দ্দেশ মত লুকিয়ে রইলাম। ভোর হবার আগে জাহাজ ছেড়ে দিল।

তারপর কদিন কি অদ্ভুত ভাবেই না কাটিয়েছি। সারাদিন তার ভেতর লুকিয়ে থাকি। তেরপল একটু ফাঁক করে আকাশ দেখি আর জাহাজের শব্দ শুনি। গভীর রাতে যখন সব নির্জ্জন হয়ে যায়, জাহাজের খোলে কজন ইঞ্জিনিয়ার আর ফায়ারম্যান আর ওপরে হাল ঘোরাবার হুইলে একজন নাবিক ছাড়া আর কেউ থাকে না, তখন একবার করে বেরিয়ে নির্জ্জন ডেকের একটি কোণ রেলিঙ ধরে দাঁড়াই।

এমনি করে কদিন বাদে জাভায় এসে পৌঁছোলাম। আগে ঠিক ছিল সবাই নেমে গেলে কোন এক সময়ে হেড্-খালাসী আমার নামার ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু বন্দরে জাহাজ ভেড়বার আগের রাত্রে সে এসে আমায় জানিয়ে গেল যে তা হবার উপায় নেই। এখানে মাল নামান হলেই জাহাজটাকে সটান ড্রাই ডকে রং করবার জন্যে পাঠান হবে ঠিক আছে। সুতরাং সে ভাবে নামা যাবে না।

তাহলে উপায়? খালাসী বল্লে উপায় আছে। সবাই যখন জাহাজ ভেড়বার সময় সেই কাজে ব্যস্ত থাকবে তখন যদি আমি জাহাজ থেকে জলে পড়ে একটুখানি সাঁতড়ে যেতে পারি তাহলেই হয়। তাতেই রাজী হলাম।

জাহাজ জেঠিতে লাগাবার আয়োজন চল্‌ছে, এমন সময় সন্তর্পনে আমি বোটের ঢাকনি সরিয়ে নেমে পড়লাম। পুঁটলিটা আমার পিঠে বাঁধাই ছিল। রেলিঙের ধারে গিয়ে জেটির উল্টো দিকে ঝাঁপ দিতে আর কতক্ষণ। কেউ দেখতেও পেল না।

ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম ঠিক, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে জাহাজটা জেটিতে ভেড়বার জন্যে পাশে সরতে আরম্ভ করল। জাহাজের বিশাল প্যাড্‌লের ঘায়ে জল তোলপাড় হয়ে উঠ্‌ল, কি ভীষণ তার টান। প্রাণপণেও আমি সে টান ছাড়িয়ে আসতে পারলাম না, সেই ঘূর্ণমান ভয়ঙ্কর প্যাড্‌লের দিকে তলিয়ে গেলাম।"

আমি শিউরে উঠে বল্লাম,—"তারপর?"

তারপর সেই প্যাডলের ঘা! কি ভয়ঙ্কর লেগেছে দেখবি।"

সামনে একটা গ্যাসের বাতি তখনও জ্বলছিল। অবিনাশ তার জামাটা তুলে দেখালে।

একি! জামার নিচে যে কিছুই নেই—একেবারে ফাঁকা, শূন্য!

ভালো করে আবার চেয়ে দেখলাম,—দেহ নেই, কিছু নেই; ওধারের গ্যাস পোষ্টটা সে জামার তলা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উপরের দিকে চাইলাম। সেখানে অবিনাশের মাথা নেই—শূন্য শূন্য সব শূন্য!

অস্ফুট চীৎকার করে সুটকেশ হাতে আমি দৌড়াতে সুরু করলাম। কিন্তু কোথায় যাব? যে দিকে যাই

নির্জ্জন গলির মুখ বন্ধ। চীৎকার করে একটা পোড়া-বাড়ীর দরজায় ঘা দিলাম। তার ভেতরের দরজা জানালা গুলো পর্য্যন্ত সে আঘাতের প্রতিধ্বনিতে ঝন্ ঝন্ করে উঠল। কিন্তু কারু সাড়া নেই। অন্ধকার গলি মনে হল আমার চারিধারে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। অসহ্য তার ভাপসা গন্ধ। তারপরে আমার আর মনে নেই।

* * *

যখন জ্ঞান হল তখন দেখি কে একজন আমায় বলছে,—"উৎরিয়ে বাবু, ইয়ে শিয়ালদা ষ্টেশন হ্যায়।"

শিয়ালদা ষ্টেশন! অবাক হয়ে দেখি আমি আমার স্যুটকেশ সমেত একটা রিকশ'য় বসে আছি। সামনে শিয়ালদা ষ্টেশন।

নেমে পড়ে তার ভাড়া চুকিয়ে দিলাম। কিন্তু কখন কেমন করে যে আমি রিকশ'য় উঠেছি কিছুই মনে করতে পারলাম না।

—হ্যাঁ, তারপর খোঁজ নিয়ে জেনেছি অবিনাশ দুমাস আগে জাভার বন্দরে অমনি করেই মারা গেছল।

[আশ্বিন, ১৩৩৮] শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

চণ্ডীচরণের গান

শোন বলি। লালপুরের বাজারে হলদিয়ার চণ্ডীচরণের মুদী দোকান আছে। অনেক দিনের দোকান, চণ্ডীচরণের বাবার আমলের। চণ্ডীচরণের বাবা খদ্দেরকে ঠকাত না কিনা, চণ্ডীচরণও বাবার কাছ থেকে খদ্দেরকে না ঠকিয়ে জিনিষ বেচে লাভ করার কায়দাটা ভাল করে শিখে নিয়েছে কিনা, দোকানটা তাই বেশ চলে।

লালপুর হোল মফস্বলের ছোট একটা সহর আর হলদিয়া হোল তার গায়ে লাগান একটা গ্রাম। লালপুরের বাজার ভেদ করে যে বাঁধান রাস্তাটা দক্ষিণ দিকে গেছে, সেটা ধরে চলতে চলতে ভাল করে পা ব্যথা হবার আগেই সহরের সীমানা পার হয়ে হলদিয়ায় পৌছান যায়। তবে সহরের সীমানাটা যে ঠিক কোনখানে সহরের লোকেও তা জানে না, গ্রামের লোকেও তা জানে না। ভারতবর্ষ আর আফগান রাজ্যের সীমানা তো নয়, রাস্তাটা তো খাইবার পাশ নয়, লালপুরের মিউনিসিপলিটীও তো আর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নয় যে সীমানায় নোটিশ টাঙ্গিয়ে রাখা দরকার মনে করবে। যার যখন খুসী, যতবার খুসী সীমানা পার হয়ে সহর থেকে গ্রামে আর গ্রাম থেকে সহরে যাতায়াত করতে কোন বাধাই নেই।

দোকান বন্ধ করে চণ্ডীচরণকে রোজ রাত প্রায় এগারটার সময় এই সীমানা ডিঙ্গিয়ে বাড়ী ফিরতে হয়। ফিরতে হয় একাই, সঙ্গী জোটে কদাচিৎ। মফস্বলের ছোট সহর তো, রাত এগারটা মানেই রাত দুপুর।

বাজার অঞ্চলটুকু পার হয়ে গেলেই চারিদিক নিঝুম, ঘুমন্ত। কোন বাড়ীর জানালায় যদি বা একটু আলো থাকে, বেশ বোঝা যায় আলোটা নিবু নিবু করে কমিয়ে ভেতরে সবাই ঘুমিয়েছে। এ রাস্তাটার ধারে কোন বাড়ীর ছেলে যেন পরীক্ষার পড়া পর্য্যন্ত করে না। যাতায়াত করে করে অভ্যাস হয়ে গেছে, তবু ভয় যে চণ্ডীচরণের একেবারে করে না, তা নয়। ডান হাতে একটা মোটা লাঠি নেয় আর অন্ধকার রাত্রি হলে বাঁ হাতে নেয় একটা লণ্ঠন, নিয়ে কোনদিন জোরে জোরে কোনদিন আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। কিছুদূর গেলেই দুপাশে বাড়ীঘর কমে আসে, আম কাঁঠালের বাগান, কলা বাগান, বাঁশবন, পুকুর ডোবা, পোড়ো জমি ডাইনে বাঁয়ে দেখা দিতে থাকে। মাঝে মাঝে এলো-মেলো ভাবে ছড়ানো কাঁচা পাকা বাড়ী নিয়ে ছোট বড় পাড়া। তখন চণ্ডীচরণ গলা ছেড়ে ধরে দেয় গান।

ঠিক যে ভয় চাপা দেবার জন্যেই গান ধরে দেয় তা নয়, কতকটা মনের আনন্দের গান করে। বয়স কম, স্বাস্থ্য ভাল, দোকানে বেশ লাভ হচ্ছে, বাড়ীতে মা, বৌ, ভাই, বোন সবাই ভালবাসে, সারাদিন খেটেখুটে নির্জ্জন পথ দিয়ে বাড়ী ফিরবার সময় গলা ছেড়ে গান ধরে দেওয়া আশ্চর্য্য কি?

গান অবশ্য চণ্ডীচরণ জানে না, কিন্তু গান না জানলে কি গাইতে নেই? রাত্রে হাঁক দেবার কম্পিটিশনে যে চৌকিদার মেডেল পাবে, চণ্ডীচরণের গলার আওয়াজ অবশ্য তার মতই হবে, কিন্তু গলা মিষ্টি না হলে কি গাইতে নেই? যতদিন গলা থাকে ততদিন মাঝে মাঝে সবাই গায়। গলা থাকার ওটা একটা প্রমাণ।

একদিন হয়েছে কি, পূর্ণিমার কাছাকাছি রাত বলে চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে। আর শরৎকাল বলে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে দুচারজন করে ম্যালেরিয়ায় ভাজা হচ্ছে। কেবল বাঁশের লাঠিটা হাতে নিয়ে চণ্ডীচরণ তিন চারটা শোনা গানের দু'চার লাইন যা মনে ছিল একত্র করে নিজের তৈরী সুরে গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরছিল। সহরের অজানা সীমানার কাছাকাছি যে পাকুইতলা বলে একটা পাড়া আছে, সেখানে পাড়ার সাত আট জন মানুষ তাকে ঘিরে ধরল। তারপর তলব করা হল তার কৈফিয়ৎ। হাজারবার বারণ করে দিলেও রাত দুপুরে গাধার মত চেঁচাবে, ঘাড়ে তার কটা মাথা শুনি?

এ পাড়ায় চণ্ডীচরণের খদ্দের নেই, সে তাই গাধার মত চেঁচায় কেন তার কৈফিয়তে বলল, 'দশটা মাথা। রাবন রাজার কটা মাথা ছিল বলুন তো?'

এ পাড়ার বিপিনবাবুর ছেলে নন্দ নাম করা ফুটবল খেলোয়াড়—কৌশলে অন্যপক্ষের খেলোয়াড়কে জখম

করতে তার মত ওস্তাদ কেউ নেই। চণ্ডীচরণকে প্রথম মারতে আরম্ভ করল সে-ই, এবং সাত আটজনে মিলে একজনকে মারতে পারার প্রলোভন সামলান মানুষের পক্ষে একরকম অসাধ্য বলে মার শেষ হতে হতে চণ্ডীচরণ হয়ে গেল প্রায় আধমরা। আবার যদি সে রাতদুপুরে গাধার মত চেঁচায় তাহলে তাকে একেবারে মেরে ফেলা হবে; এইজন্যই নাকি আজ তাকে আধমরা অবস্থায় রেহাই দেওয়া হল।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে চণ্ডীচরণ তাই ভাবতে লাগল, এর চেয়ে মরাই ভাল ছিল। এ পাড়ার লোক এত গান ভালবাসে, এ পাড়ার বিপিনবাবু গান হবে শুনলেই আসরে ভিড় জমে যায়, আর গান গাওয়ার জন্য এ পাড়ার লোকেরাই তাকে এমন করে মারল? এমন কি মন্দ গায় সে? বিপিনবাবুর গান শুনতে তার ভাল লাগে, নিজের গান শুনতেও তার ভাল লাগে, বিপিনবাবুর চেয়ে তার গানের তো কত বেশী খারাপ হওয়ার কথা নয় যে সবাই মিলে তাকে মারবে!

আধমরা অবস্থায় কত অদ্ভুত কথাই মানুষের মনে হয়! এবার চণ্ডীচরণের এ কথাটাও মনে হল, বিপিনবাবুর চেয়ে ভাল গান করে বলে হিংসায় পাড়ার লোকগুলি তাকে মারেনি তো? নইলে বিপিনবাবুর ছেলে নন্দই বা তাকে প্রথমে মারতে আরম্ভ করবে কেন? ভাবনাটা গায়ের ব্যথা আর মনের জ্বালা ভুলিয়ে দিয়ে চণ্ডীচরণকে বেশ নতুন জীবন দান করে। পাড়াশুদ্ধ লোককে ক্ষেপিয়ে দেবার মত গান তবে সে গায় না।

তারপর আবার আপশোষে সে ঝিমিয়ে যায়। গানের পদ জানে না, সুর জানে না, গাধার মত আওয়াজ, সে আবার গাইবে গান! এতকাল যে লোকে তাকে ধরে মারেনি এই তার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি।

বাঁ হাতের কব্জিটা ভেঙ্গে গেছে কিনা কে জানে? মাথাটা বোধ হয় পাকা নারকেলের মত একদম দুফাঁক হয়ে গেছে—অন্ততঃ ফেটে যে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। তা না হলে রক্ত পড়ছে কোথা থেকে? জামা কাপড় ধুলা মাখা। দুটো হাঁটুই যে কি করে ছড়ে গেল ভগবান জানেন। হায়, তুচ্ছ একটা মুদী দোকানের দোকানদার বলেই তো সবাই তার এ দশা করতে সাহস পেয়েছে। চাল ডাল তেল নুন বেচা কেনা করা ছাড়া আর তার কোন্ গুণ আছে! গান গাইলে পর্য্যন্ত লোকে তাকে ধরে মারে। বাড়ী গিয়ে সে কি বলবে? কালে যখন সহর গ্রামে কথাটা রটে যাবে, লোকের কাছে সে মুখ দেখাবে কি করে? তাকে নিয়ে কি হাসাহাসিটাই সবাই করবে। গান গাওয়ার জন্য পৃথিবীতে সে-ই বোধ হয় প্রথম মার খেল।

রাগে দুঃখে আর আপশোষে আর শরীরের ব্যথায় বাড়ীর কাছাকাছি এসে রাস্তার ধারে বটগাছতলায় চণ্ডীচরণ ধপ্ করে বসে পড়ল। বসে থাকতে থাকতে তার মনে এল গভীর বৈরাগ্য। মারপিঠের জন্য নালিশ করে কি হবে, তার চেয়ে সন্ন্যাসী হওয়াই ভাল বাকী জীবনটা হিমালয়ের গুহায় কাটিয়ে দেবে।

শেষ পর্য্যন্ত চণ্ডীচরণ সন্ন্যাসী হওয়ার বদলে প্রতিশোধ নেওয়াই ঠিক করল। মার খাওয়ার তিন দিন পরে পূর্ণিমার রাত্রে তার জ্বর এল, জ্বরের ঘোরে খেয়াল না থাকায় রাত এগারটার সময় গুন্ গুন্ গান ধরে দেওয়ায় তার বৌ ধমক দিয়ে বলল, 'হাজার বার বারণ করছি গান গেও না, ঘুমাও, কিছুতে কথা শুনবে না?'

ঘুম না আসাতেই চণ্ডীচরণ গান ধরেছিল, রেগে আগুন হয়ে সে বলল, 'না যদি শুনি, গাধার মত চেঁচাই বলে মারবে নাকি?'

বৌ ভয়ে কাঠ। 'তাই বলছি নাকি? অসুখ হয়েছে, রাতে না ঘুমিয়ে—'

'আমার গান শুনে নিজের ঘুম আসছে না তাই বল।'

'তোমার গা ছুয়ে দিব্যি করছি—'

বৌ দিব্যি করলে কি হবে, সেই মুহূর্ত্তে চণ্ডীচরণ স্থির করে ফেলল মামলা মোকদ্দমা না করে সে অন্য প্রতিশোধ নেবে—এমন গান শিখবে যে বিপিনবাবুকে কেউ আর ডেকেও জিজ্ঞাসা করবে না, পাকুইতলার সকলের মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

তিন দিন পরে ছোট ভাই বিষ্ণুচরণের হাতে সঁপে দিয়ে চণ্ডীচরণ বিশেষ কাজে সদরে রওনা হল। খবর পেয়ে পাকুইতলার সেই সাত আটজনের মুখ শুকিয়ে গেল। চণ্ডীচরণ গান শিখে এসে তাদের পাড়ার বিখ্যাত গায়কের মাথা হেঁট করিয়ে দেবে বলে নয়, অন্য কারণে। মামলা ছাড়া সদরে মানুষের আর কি কাজ থাকতে পারে? বিপিনবাবু নন্দর কান মলে দিয়ে বললেন, 'যা এবার জেলে। গোঁয়ার গোবিন্দ হনুমান তুই, মাথায় তোর গোবর ভরা। একি তোর খেলার মাঠ পেয়েছিস যে খুন জখম করে রেহাই পাবি?'

একমাস গেল, ছমাস গেল, চণ্ডীচরণ ফেরে না। বাড়ীতে খবর পর্য্যন্ত দেয় না। সদরে খবর নিয়ে জানা গেল, যদুনাথ দাসের গদীতে সে দিন দশেক ছিল, তারপর যে কোথায় কেউ তা জানে না। বাড়ীতে কাঁদাকাটা সুরু হয়ে গেল। আর পাকুইপাড়ার সেই সাত আট জনের মুখের শুকনো ভাব কেটে গিয়ে দেখা দিল বিস্ময়। চারিদিকে চণ্ডীচরণের আকস্মিক অন্তর্দ্ধান নিয়ে জবর আলোচনা-গবেষণা চলতে লাগল। শেষে রটে গেল যে সে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। সদরের রেল স্টেশনে নাকি একদিন তাকে দেখা গিয়েছিল। পরনে গেরুয়া, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় ইয়া লম্বা জটা—

চণ্ডীচরণের জটার যে রকম বর্ণনা শোনা যেতে লাগল, দু'মাস কেন দু বছরেও অত বড় জটা মানুষের মাথায় গজায় কিনা সন্দেহ। তবে যদি পরচুলা হয় তা হলে অবশ্য কথা কোন নেই।

আরও একমাস পরে একেবারে কলকাতা থেকে চণ্ডীচরণের চিঠি এল। বিশেষ কাজে তাকে, কলকাতা যেতে হয়েছে, বিশেষ কাজে তাকে কিছুকাল কলকাতা থাকতে হবে, টাকার তার বিশেষ প্রয়োজন। পত্রপাঠ যেন তাকে উপরের ঠিকানায় টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

টাকা পাঠিয়ে দেবার বদলে বিষ্ণুচরণ পত্রপাঠ টাকা সঙ্গে নিয়ে নিজেই কলকাতা চলে গেল। 'উপরের ঠিকানা' খুঁজে বার করে দেখা গেল সেটা একটা বস্তি। বেলা তখন প্রায় তিনটে। বস্তির একটা ঘরে প্রায় এগারজন উড়িয়া ঠাকুরের আড্ডা বসেছে আর একটা ভাঙ্গা হারমানিয়ম বাজিয়ে গান হচ্ছে। অন্য ঘরে আন্‌কোরা একটা হারমোনিয়ামে গলা সাধছে স্বয়ং চণ্ডীচরণ।

হারমোনিয়াম বন্ধ করে চণ্ডীচরণ বলল, 'তুই আবার নিজে আসতে গেলি কেন, টাকাটা পাঠিয়ে দিলেই হত।'

দাদার লাল লাল চোখ দেখে প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম করে বিষ্ণুচরণ বলল, 'মা বড় কাঁদাকাটা করছে দাদা, বাড়ী ফিরে চল। বৌঠান কিছু খায় না।'

চণ্ডীচরণ আশ্চর্য্য হয়ে বলল, 'মা কাঁদাকাটা করছে কেন?'

'তোমার জন্য।'

'বৌঠান কিছু খায় না কেন?'

'তোমার জন্য।'

চণ্ডীচরণ একটু ভেবে বলল, 'আচ্ছা, বলবি যা, আর খালি গলায় গাইব না—বিপিনবাবুর মত হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইব।'

বিষ্ণুচরণ ছেলেমানুষ, বুকের মধ্যে টিব টিব করতে থাকে। কি করবে ভেবে পায় না। শেষে তাই কাঁদ কাঁদ হয়েই সে আবার বলল, বাড়ী চল দাদা, তোমার জন্যে সবাই—'

চণ্ডীচরণ বলল, 'দাঁড়া, আরও একমাস শিখি, তবে তো বাড়ী যাব। ভূষণবাবু নিজে বলেছে, আর একমাস শিখলেই বাস্—আমার মত গাইয়ে আর থাকবে না। পঁচিশ টাকা করে মাইনে দিই কি অমনি। শোন তো রে, এ গানটা কেমন শিখেছি—'

তৎক্ষণাৎ হারমোনিয়ম বাজিয়ে চণ্ডীচরণ গান ধরে দিল।

বিকালে বিষ্ণুচরণ বলল, 'এখানে না থেকে একটা ভাল জায়গায় থাকবে চল।'

চণ্ডীচরণ বলল, 'কিছু জানিস্ না শুনিস্ না, কেন বক বক করিস্? কলকাতায় এখানে ছাড়া আর কোথাও গলা সাধতে দেয় না। মেসেই ছিলাম তো আগে, বৌবাজারের একটা মেসে। তিনদিন পরেই তাড়িয়ে দিল।'

বিষ্ণুচরণ কি আর করে, সমস্ত বিবরণ দিয়ে বাড়ীতে একখানা চিঠি লিখে দিল। দুদিন পরে চণ্ডীচরণের এক মামাকে সঙ্গে করে বাড়ীর সকলে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হ'ল কলকাতায়। চণ্ডীচরণের সঙ্গীত-শিক্ষক ভূষণবাবুকে আর এক মাসের মাইনে আগাম দেওয়ায় তিনি পরিতুষ্ট হয়ে সার্টিফিকেট দিলেন যে, আর চণ্ডীচরণের গান শিখবার দরকার নেই, যা কিছু শিখবার ছিল সব সে শিখে ফেলেছে। দেশে তার মত ওস্তাদ গায়ক আর নেই। গানের কি আশ্চর্য্য প্রতিভা তার, এমনটি তিনি কখনও দেখেন নি।

তখন খুসী হয়ে চণ্ডীচরণ সকলের সঙ্গে বাড়ী ফিরে যেতে রাজী হ'ল।

চণ্ডীচরণকে এখন মাঝে মাঝে লালপুর আর হলদিয়ার রাস্তায় গায়ে-বাঁধা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করে বেড়াতে দেখা যায়। সেদিন রাত্রে মার খাবার সময় তার কাপড় জামা ছিঁড়ে গিয়ে রাস্তার ধূলোয় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল, এখন সে প্রায় সেই রকম ধুলো মাখা ছেঁড়া জামা কাপড় পরে থাকে। সন্ন্যাসী না হলেও তার মাথার চুলে জটা পাকাবার উপক্রম হয়েছে। তবে চণ্ডীচরণের গান শুনে এখন আর কেউ বিরক্ত হয় না, দল বেঁধে তাকে মারে না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কেবল মাঝে মাঝে তার পিছু পিছু হাততালি দেয়, তার গায়ে ধূলো কাদা ছুড়ে মারে।

শুনলে?

[আশ্বিন, ১৩৪৫] শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যা

ছাগ-চরিত

বাড়ীতে দুটি মানুষ—আমার বন্ধু ও আমি। বড়ই ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। ভাবি একটি কুকুর পুষ্‌লে কেমন হয়। কিন্তু ছোট বেলায় আমার পোষা কুকুর হঠাৎ পাগল হয়ে আমাকে কামড়ে দিয়েছিল। তারপর লণ্ডনের সেই যে পোষা কুকুর 'ম্যাক্স'—যাকে নিয়ে অবসর সময়টাতে নানা আমোদ করা যেত—একদিন সকাল বেলা তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। হতভাগাটার একটা বদ্‌স্বভাব ছিল—যে তাকে আদর করে ডাকৃত, তারই সঙ্গে সে বোকার মত ছুট্‌ত। খুব সম্ভব কোন কুকুর-চোর তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। আমরা কত বিজ্ঞাপন দিলুম, কতদিন ও কত রাত তার পথ চেয়ে রইলাম, কতবার পরের কুকুরের গলার সুর শুনে লাফ দিয়ে উঠ্‌লুম, ভাব্‌লুম, "ঐ যে ম্যাক্স এসেছে।" অবশেষে একজন বল্লেন, লণ্ডনে একটি গুপ্ত স্থানে চোরাই কুকুর সস্তায় বিক্রী হয়। তিনি ঠিকানা দিলেন। সেখানেও ম্যাক্সকে বিক্রী হতে দেখা গেল না। তখন আমরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লুম, "যাক

মরে তো যায় নি মোটর চাপা পড়ে। মরলে সে খবর চাপা পড়ত না। ম্যাক্স যেখানেই থাকুক, বেঁচে থাকুক্।"

এই ঘটনার পর আর কুকুর পুষ্‌তে কার সাধ যায়, বলো। অথচ কিছু একটা পুষ্‌তে ইচ্ছা করে। বেঁজি কিম্বা বাঁদর পুষ্‌ব কিনা ভাব্‌ছি, একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে দেখি উঠানে এক কালো রঙের ছাগল বাঁধা রয়েছে।

আবু নামক আমাদের যে কনোজিয়া ব্রাহ্মণ পাচকটি ছিল সে গদ গদ ভাবে বল্লে, "হুজুর, এহি বক্‌রীকো এক আদ্‌মী ভুলাকে লে যাতা থা।"

—আবুর বিশুদ্ধ মুর্শিদাবাদী উর্দ্দু শুনলে তোমরাও উর্দ্দু ভাষার মৌলবী হতে পারৃতে, কিন্তু সে সুযোগ তো পাওনি, তাই ওর উর্দ্দু বক্তৃতার বাংলা সারাংশ দিই। ছাগলটাকে কে একটা লোক ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল দেখে আবুর মনে সন্দেহ হয়। আবু বলে, "এ বক্‌রী তুমার হোতে পারে না। তুমি ইকে সাথে লিয়ে যাচ্ছো কেনে?" লোকটা ভয় পেয়ে ছাগলকে ছেড়ে দৌড় দিয়ে বাঁচ্‌ল। আবু মিঞা সেটিকে সযত্নে বেঁধে তার সুমুখে কিছু ঘাস রেখে দিয়ে রান্না ঘরে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। সম্ভবতঃ সেটিকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দান করতেন এবং দিন কয়েক পরে আমাদের টেবিলের উপর পরিবেশন করতেন, কিন্তু রান্না ফেলে রেখে বাড়ী গেলে তাঁর চাকরী থাকত না। সম্ভবত তিনি ধরে রেখেছিলেন যে আমরা তাঁর বাহাদুরির তারিফ করে ছাগলটি তাঁকেই দিয়ে দেবো।

আমি ভাব্‌ছিলুম, ছাগল পুষলে তো মন্দ হয় না। খরচ কিছুই হয় না। ঘাস, কাগজ, ইট, কাঠ, হামামদিস্তা সবই তো ছাগলের খাদ্য। এক জায়গায় বেঁধে রেখে আমার ওয়েষ্ট-পেপার বাস্কেটের অসংখ্য ছেঁড়া চিঠি তার সামনে ঢেলে দিলে দেশলাই খরচাটাও বাঁচবে।

কিন্তু না জানি কোন গরীবের চোখের মণি এই ছাগল। আমরা তাকে বঞ্চিত করতে চাই নে। আমরা কাল সকালে এই ছাগল থানায় পাঠিয়ে দেবো। তবে এই নধর প্রাণীটিকে এর মালিকের হাতে পৌছে দেবে কি নিজেদের উদরে পৌছে দেবে সে বিষয়ে সংশয় জাগ্‌ছিল। খোঁয়াড়ে পাঠিয়ে দিলে হয় তো গরীবের দু'পয়সা লোকসান হবে, তবু ছাগলটিকে তো আস্ত পাবে।

আবুকে বল্লুম, "কাল ইস্‌কো পাউণ্ডমে জরুর ভেজ দেনা। জিস্‌কী বক্‌রী উও ছোড়ুআ লেগা।"

—এই দেখ, আমিও উর্দ্দু বিদ্যায় আবুর দোসর।

আবু ক্ষুণ্ণ হলো। প্রতিবাদ করলো না। আমাদের আহারাদির পরে ছাগলটির প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করতে করতে খাবার উদ্যোগ করল। এই সময় ছাগকণ্ঠের ভাষা প্রথম শুনলুম—"ব্যা।"

আবু বল্ল, "ও কিছু নয়। আপনি ওকে ঐখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র বাঁধতে যাচ্ছেন বলে ও আপত্তি জানাচ্ছে। ছাগলদের সহজেই একটা জায়গার উপর মায়া পড়ে যায়।"

আবু তার বাড়ী চলে গেল। বন্ধু গেলেন নিজের ঘরে ঘুমতে। আমি ঘুমুই উঠানের দিকে দরজা খোলা রেখে, তারাময়ী নিশীথের প্রায় নিম্নে। একটু তন্দ্রার ঘোর লেগেছে। অন্ধকার রাত্রি, হঠাৎ ছাগলটার চীৎকার শুনে চোখ মেলে দেখলুম তার আশে পাশে একটা শেয়াল। ছাগলের মতো সর্ব্বজনপ্রিয় প্রাণী কোথা থেকে এক শেয়ালকেও আকর্ষণ করে এনেছে।

অগত্যা উঠতে হলো। হুঙ্কার দিয়ে শেয়ালকে তাড়া করে নিয়ে গেলুম। শেয়ালটা টের পাক্ যে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর প্রাণী ভূ-ভারতে আছে। এদিকে ছাগলটা সেই যে "ব্যা"—"ব্যা—" করা সুরু করল, যতই তার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে অভয় দিই কিছুতেই থামে না। তার কাছ থেকে দু'হাত দূরে গেলে তার সুর সপ্তমে ওঠে! নিজের হাতে সেই অন্ধকার রাত্রে বাগান থেকে ঘাস তুলে আনি। খায় না। শুধু ডাকে "ব্যা—আ", "ব্যা—আ", "অর্‌র্", "বর্‌র্।" অল্প সময়ের মধ্যে আমি ছাগ ভাষাবিদ্ পণ্ডিত হয়ে উঠ্‌লুম।

তখন বোধ করি বারোটা বাজে। ছাগলটাকে ওখান থেকে খুলে নিয়ে এমন জায়গায় বাঁধলুম সেখান থেকে আমার বিছানা বেশী দূরে নয়। শেয়ালে ধরলে ছাগলের চীৎকারে চট্ ক'রে আমার ঘুম ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু তাতেও ফল হলো না। আমার বিছানার দিকে পা না বাড়াতেই ছাগলটা "ব্যা"—ব'লে কেঁদে ফেলে।

শেষকালে সেটাকে নিয়ে আমার খাটের পায়ায় বাঁধলুম। ভাবলুম এবার সেও ঘুমবে, আমাকেও ঘুমতে দেবে। শেয়াল মশাইও সাহস করে এত দূর এগোবেন না। মিনিট কয়েক তার চীৎকারটা থামল। ঘুম আমার চোখে সেই সুযোগে নামল। অমনি খাটের নীচ থেকে ফিস্ করে কে বল্ল, "ব্যা—।"

আমি বল্লুম "চুপ!" সে আর একটু উঁচু গলায় বল্ল, "ব্যা—আ।" আমি বিরক্ত হয়ে বল্লুম, "ব্যা—আ।" তখন দু'জনে মিলে পাল্লা দিয়ে কিছুক্ষণ "ব্যা—" করা চল্ল। ভেবেছিলুম ছাগলটা হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করবে। কিন্তু সে তেমন জানোয়ারই নয়। সে চার পায়ের হাই হীল জুতো দিয়ে মেমসাহেবদের মত খট্ খট্ করে খাটের নীচের মেজের উপর পায়চারি করা সুরু করে দিল। ছাগকণ্ঠের আর্ত্তরব একবার আমার মাথার দিকে আসে একবার আমার পায়ের দিকে যায়। হতভাগাটা খাটের তলায় টুঁ মারতেও ছাড়ে না।

অকৃতজ্ঞ অবাধ্য অভদ্র ছাগল! ঘুমের মায়া ত্যাগ ক'রে সেটার দুই শিং ধ'রে হিড় হিড় করে টেনে চল্লুম একটা খালি ঘরে। ইচ্ছা করছিল তাকে কেটে কুটে কাবাব বানিয়ে খাই। কিন্তু হাতের কাছে হাতিয়ার ছিল না এবং কাবাব বানাতে বিস্তর আয়োজন লাগে। তা ছাড়া ঘুমটা যে পেয়েছিল সে আর কী বলব। প্রায় একটা বাজে।

খালি ঘরে তাকে বন্দী ক'রে ফিরে এলুম। কিন্তু তার সেই ছাত-ফাটানো আয়োজখানাকে বন্দী করে কার সাধ্য। আমি বিছানায় শুয়ে দুই কান বন্ধ করে থাকলুম। কিন্তু অমন ক'রে থাকলে ঘুম আসবে কেন? গেলুম আবার সেই ছাগলের কাছে। পাঁচ মিনিট গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে চিন্তা করলুম। যদি গেট খুলে রাস্তায় ছেড়ে দিই তবে শেয়ালে তাকে ছাড়বে না। অথচ এমন দজ্জাল ছাগলকে এক মুহূর্ত্ত বাড়ীতে রাখতে নেই।

শেষে কী মনে করে তার গলা থেকে দড়ি খুলে নি তাকে বাগানে ছেড়ে দিলুম। এবার আর সে ডাকল না সকালে উঠে তাকে বিদায় করে দিয়ে অন্য কথা।

[কার্ত্তিক, ১৩৩৮] শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রা

চালিয়াৎ চন্দর

চালিয়াৎ চন্দর!

ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিল কলেজে পড়িতে; আমাদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব জন্মিল। কি ভাবে বন্ধুত্ব ঘটিল, তার একটু ইতিহাস আছে।

ক্লাসের মাঝামাঝি একটা বেঞ্চে সে বসে; ধুতি পরিয়া ক্লাসে আসে—হঠাৎ একদিন দেখি, তার বর্ম্মীজ সাজ। আমাদের তাক্ লাগিয়া গেল। লজিকের ক্লাস শেষ হইতে আমরা চার-পাঁচজনে গিয়া তাকে প্রশ্ন করিলাম,—হঠাৎ এ-সাজে কলেজে এসেছেন যে?

মৃদু হাসিয়া চন্দর কহিল—মানে, পোষাকটা বদলাবার সময় পাই নি। এক জায়গায় নিমন্ত্রণ গেছলুম,—দশটা বেজে গেল, কাজেই সেখান থেকে সোজা কলেজে এসেছি!

আমরা বিস্ময়ে পরস্পরের পানে চাহিলাম! মানে নিমন্ত্রণে আমরাও যাই, তা বলিয়া এমন বেশে? আমরা চন্দরের পানে তাকাইলাম, সপ্রশ্ন দৃষ্টি! চন্দর বলিল,—বর্ম্মার যুবরাজ এসেছেন না? গার্ডেন রীচে? আমার কাকা ছিলেন তাঁর টিউটর—ভারী খাতির করেন আমাদের। সেইখানে নিমন্ত্রণ ছিল!

শ্রদ্ধায় আমাদের চিত্ত ভরিয়া উঠিল। বর্ম্মার যুবরাজের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা! এ লোকের বন্ধুত্ব কাম্য! চন্দরের বন্ধুত্বের গর্ব্বে লোক-সমাজে আমাদেরো প্রতিপত্তির সীমা থাকিবে না।

এমন করিয়া আলাপ সুরু হইল!

দু' হপ্তা পরে ধর্ম্মতলার মোড়ে চন্দরের সঙ্গে দেখা। আমরা বায়স্কোপ দেখিয়া ফিরিতেছি—রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। চন্দরের গায়ে মুশলমানী পোষাক সিল্কের আচ-কান্, সরু পা-জামা, মাথায় ফেজ। চিনিতে পারিলাম না। সে নিজে আসিয়া পিঠ চাপড়াইয়া ডাকিল—কি রে শত্রুঘ্ন……।

আমি কহিলাম—চন্দর!

চন্দর কহিল—চলেছি খিদিরপুরে ওয়াজিদ আলি শার শালীর বিয়ে—আমার মামা তাদের ম্যানেজার—নিমন্ত্রণ!

আমি কহিলাম,—হেঁটেই?

চন্দর কহিল—এ পথটুকু ট্রামে যাবো। তারপর খিদিরপুরের পুলের কাছে নেমে একখানা টাক্সি করবো। তারা গাড়ী পাঠিয়েছিল—আমি বলেছি, সন্ধ্যার পর যাবো। কাজ কি তাদের গাড়ীতে গিয়ে! ভাববে ক্যাংলা! পেট ধুয়ে বসেছিল!……

শ্রদ্ধায় আমার মন এমন ভরিয়া উঠিল যে মুখে কথা ফুটিল না। চন্দর এক পয়সার মিঠা খিলি কিনিল একটু জর্দ্দাও সেই সঙ্গে, তার পর চট্ করিয়া মাঠের দিকে চলিয়া গেল।

পরের দিন কলেজে চন্দর আসিল তার নিত্যকার সাজে। তার পরণে ধুতি, গায়ে একটা টুইলের সার্ট। আমি প্রশ্ন করিলাম—কখন ফিরলে কাল?

চন্দর কহিল,—ওঃ, রাত প্রায় একটা……

আমার মনের মধ্যে এক প্রচণ্ড সমারোহের ছবি রঙ্গীন বর্ণে ফুটিয়া উঠিতেছিল। নবাবের গৃহে উৎসব—নাচ গান বাজনা!

চন্দর কহিল,—নাচ হচ্ছিল। এক রাশিয়ান ডান্সার এসেছিল—আনা পাবলোভার মামাতো বোন হয়, শুনলুম। কি নাচই নাচলে! oriental style! সেই অজন্তার ছবি দেখেছো?

আমি কহিলাম,—দেখেছি।

চন্দর কহিল,—তাহলে idea করতে পারবে! সুন্দর সেই ছবি! সঙ্গে বাজালে একজন বাঙ্গালী। তাঁর নাম নৃপেন মজুমদার। ইনি আমার মামার কাছে সাকরেদী করেছিলেন এককালে—এখন র‍্যাশিয়ায় থাকেন!

শ্রদ্ধার ভারে আমার মুখের কথা বুকের কোন্ গহন কোণে লুকাইল, তার পাত্তা পাওয়া গেল না!

পরের দিন হিষ্ট্রী ক্লাসে প্রফেসার আসেন নাই—আমরা তুমুল কলরব জাগাইয়া তুলিয়াছি, সত্য কহিল,—ওহে, চন্দরের গুণের পরিচয় পেয়েছি। কাল আমার পিশ্‌তুতো ভাইয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ গেছলুম, সেখানে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো। তার নাম অঘোর। অঘোর সেণ্ট সেভিয়রে পড়চে। অঘোর বললে চন্দরের কথা—বললে তার মত চালিয়াৎ ভারতবর্ষের পূর্ব্বে কখনো জন্মায় নি……

আমরা সকৌতূহলে সত্যর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। সত্য কহিল,—আগাগোড়া চাল! নবাব-বাদশার কথা ছাড়া মুখে আর কোনো কথা নেই। জঙ্গি সহরের নবাব, কোদালিয়ার রাজা ওদের ভারী দোস্ত।

আমি কহিলাম,—বর্ম্মার যুবরাজের গল্প তাহলে ভুয়ো?

সত্য কহিল,—বিচিত্র নয়। আমার ভাই গোড়া থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল।

আমরা অভিসন্ধি পাকাইতে বসিলাম—বিরাট কৌতুকের উদ্দেশ্যে।

বরুণ কহিল,—আমাদের ছাপাখানা আছে—আমি ব্যবস্থা করবো।

—বেশ!

চারদিন পরে একখানা খবরের কাগজ হাতে বরুণ আসিয়া ক্লাসে দেখাইল—তাহাতে একটা কলমে ছাপার অক্ষরে লেখা—"বর্ম্মার যুবরাজের গৃহে আজ সন্ধ্যায় মস্ত পার্টি—সেই পার্টিতে নাচ গান বায়োস্কোপ ম্যাজিক প্রভৃতি আসর বসিবে। এই আসরে গান গাহিবে শ্রীমান হরিসখা মিত্র। হরিসখার বয়স দশ বৎসর মাত্র। এ বয়সে কালোয়াতী গানে শ্রীমান আশ্চর্য্য পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।"

খবরটি চন্দরকে দেখানো হইল। চন্দর কহিল—ও! হাঁ, আজ পার্টি আছে বটে! আমি যাবো ঠিক করে রেখেছি—তবে ছোট বোনটার বড্ড অসুখ চলেছে······

বরুণ কহিল,—এই হরিসখাকে জানো? আমাদের সত্যসখার ছোট ভাই।

চন্দর শুধু কহিল,—ও!

কাগজখানা টানিয়া সে দেখিল। কাগজের নাম The Rangoon Charibari

সত্যসখা কহিল—এক কাজ করলে হয়—আমার ভাইকে ওরা নিয়ে যাবে সন্ধ্যার আগেই—আমি অত আগে থেকে যেতে চাই না, তা চন্দরবাবু আপনি কখন যাচ্ছেন?

চন্দর উদাস মনে কহিল,—আমায় পাঁচটায় যেতে বলেছে—তবে বোনটার অসুখ।

সত্য কহিল,—আমি মোটর নিয়ে যাবোখ'ন আপনার বাড়ী। Say, রাত আটটায়। হরির গান হবে সাড়ে আটটায়—তারপর নটায় নয় ফিরে আসবো।

চন্দর কহিল—আমি যাই যদি তো সন্ধ্যার আগেই যাবো। না হলে প্রিন্স দুঃখ করবেন। তবে মুস্কিল শুধু ঘটছে বোনের অসুখ নিয়ে। যদি কোন রকম complication হয়—ক'দিন ভারী সোরগোল যাচ্ছে কি না—

আমি কহিলাম,—বেশ তো, সত্যর সঙ্গে রাত্রে যাবেন। সেখানে বলবেন, বোনের অসুখের জন্য দেরী হলো।

চন্দর আমার পানে চাহিয়া কি ভাবিল, পরক্ষণে সত্যর পানে চাহিয়া কহিল,—বেশ, আসবেন—যদি অসুবিধা না ঘটে, একসঙ্গেই যাবো।

সেই বন্দোবস্তই রহিল।···এবং তার ফলে রীতিমত একটি অভিনয়। অর্থাৎ সত্য গিয়া চন্দরের দ্বারে হানা দিল, সন্ধ্যা ছ'টার পরে। আমি আর বিনোদ গলির মোড়ে পায়চারি সুরু করিলাম। এই পায়চারির অন্তরালে গিয়া চন্দরদের বাড়ীর বাহিরের ঘরে উঁকি দিয়া কখনো দেখি, সত্য একা বসিয়া আছে, কখনো দু' একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কহিতেছে, কখনো একটি ভৃত্য আসিয়া জলের গ্লাস আগাইয়া দিতেছে! সে যাহোক এক জায়গায় আরামে বসিয়া আছে, আমার আর বিনোদের পা টাটাইয়া উঠিল—এমন করিয়া কতক্ষণ মানুষ পায়চারি করিতে পারে!

একবার সত্যকে ইঙ্গিত করিলাম, রাত তখন সাড়ে আটটা! সত্য নিঃশব্দে পথে আসিল, আসিয়া কহিল,—চাকরটা বললে, চন্দর দাদাবাবু বেরিয়ে গেছেন। ডাক্তারের বাড়ী। ভারী বোখার! কিন্তু ঐ যে বাবু দুটিকে দেখ্‌লে, ওরা হলো চন্দরের মামাতো ভাই, অফিসে কাজ করেন—তাঁরা বলেন চন্দরকে বাড়ীতে দেখছি না তো—বাড়ীতে নেই!

আমি কহিলাম—তাঁকে বললে না কেন, প্রিন্স অফ বর্ম্মার ওখানে নিমন্ত্রণ আছে?

সত্য জবাব দিল—বলেছি বৈ কি! শুনে তাঁরা তো অবাক! বললেন, প্রিন্স অফ বর্ম্মা! যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তারপর বোনের অসুখের খপর জিজ্ঞাসা করতে তাঁরা বললেন, অসুখ তো কারো নেই বাড়ীতে। আর জানলুম, এটা হলো চন্দরের মামার বাড়ী।

আমরা বুঝলাম, চন্দর ভাগিয়া পড়িয়াছে। সত্য একদম্ মরিয়া হইয়া কহিল—আমি কোনো মতে নড়বো না, ও-বাড়ী থেকে। সে বাড়ী নেই এটা ঠিক। তবে ফিরবে তো? সত্যই কিছু বর্ম্মার যুবরাজ ওকে আটকে রাখবে না?

আমি কহিলাম,—আমি কিন্তু বিদায় নেবো। বেশী রাত হলে বাড়ীতে শেষে ঢুকতে পাবোনা। বড়দা ভারী strict.

বিনোদ বলিল,—কত রাত এমন পথে পথে ঘুরবো!··· তুমি মোদ্দা ওদের বাড়ীতে সারারাত থাকবে বলে?

সত্য কহিল—না নড়লে তাড়িয়ে দিতে পারবে না তো কেউ......

বাড়ী ফিরিতে হইবে—বুঝিতেছিলাম, তবু কৌতূহলও সীমাহীন হইয়া উঠিতেছিল। থাকিয়া গেলাম। মোড়ের মাথায় একা চায়ের দোকান। দুজনে দু পেয়ালা চা খাইলাম, দু'খানা করিয়া কাটলেট। তারপর দোকানদারের সঙ্গে আলাপ করিলাম—এমন চা কলিকাতার কোনো দোকানে খাই নাই। কাটলেটও বিলাতী হোটেলের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে।

দোকানদার কহিল, হবে না? আমি গ্র্যাণ্ড হোটেলে কিছুকাল কাজ করেছি।—তারপর ভালো লাগলো না—ভাবলুম, পরের নোক্‌রি ছেড়ে স্বাধীন ব্যবসা করবো। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী······

তারিফ করিয়া আমরা কহিলাম—বটেই তো।···রঙ-বেরঙের খরিদ্দার আসিতেছিল, কারবারটা প্রায় ধারেই

চলে দেখিলাম, নগদ পয়সার আমানত তেমন দেখিলাম না!···রাত্রি দশটায় দোকানদার বলিল, দোকান বন্ধ করিবে। অগত্যা উঠিতে হইল।······

উঠিয়া পথে আসিতে দেখি, মেঘ না চাহিতে জল! একখানা ট্যাক্সি হুড়মুড় করিয়া আসিতেছিল। আমরা পথ ছাড়িয়া দিলাম। ট্যাক্সি থামিয়া পড়িল। ট্যাক্সি হইতে কে ডাকিল,—হ্যালো—

চাহিয়া দেখি, চন্দর—সেই বর্ম্মীজ বেশ!

ট্যাক্সি হইতে নামিয়া চন্দর কহিল,—এসো শত্রুঘ্ন ··

আমি কহিলাম,—কোথা থেকে?

চন্দর কহিল—আর বলো কেন? খিদিরপুর যেতে হয়েছিল। কলেজ থেকে এসে দেখি, প্রিন্স টু-লঙের মামা স্বয়ং! এড়াতে পারলুম না! যত বলি, একটি বন্ধু আমার সঙ্গে যাবেন—তা বললে একবার চলুন। যেতে হোল। সত্য কি ভাবলে!

আমি কহিলাম—সত্য তোমার বাড়ীতে বসে—

এঁ্যা···বলিয়া চন্দর গৃহভিমুখে ফিরিল। ট্যাক্সি-ওয়ালা কহিল,—ভাড়া সাব·· ···

—দাঁড়াও ভাই—বলিয়া চন্দর মিটার দেখিয়া ড্রাই-ভারকে ভাড়া দিল।

চাহিয়া দেখি, বিনোদ ইতিমধ্যে ফেরার! অর্থাৎ উবিয়া গিয়াছে! রাগ ধরিল। তবু সত্যর সঙ্গে চন্দরের সাক্ষাতে কি ঘটে, দেখিবার লোভ সম্বরণ করা গেল না। চন্দরের সঙ্গে চলিলাম।

আসিয়া দেখি, সত্যর সামনে টেবিলে থালায় একরাশ লুচি, বিবিধ তরকারী এবং সত্য পরমানন্দে সে সবের সদ্ব্যবহার করিতেছে। চন্দরের এক মামা তাকে খাওয়াইতেছেন। চন্দরকে দেখিয়া মামা কহিলেন—তুই তো আচ্ছা ইয়ে? বন্ধুর সঙ্গে নিমন্ত্রণে যাবি বলে এঁকে এনে দিব্যি গা-ঢাকা দিয়েছিস্······

চন্দরের মুখের উপর যেন চাবুক পড়িল। চন্দর কহিল,—হাঁ্যা, হাঁ্যা—মানে হঠাৎ ভারী ইয়ে হয়ে গেল কি না! তা, তুমি যাও, আমি ব্যবস্থা করচি।

মামা কহিলেন—কিসের ব্যবস্থা করবি?··· কোথায় নিমন্ত্রণ ছিল তোদের, শুনি? বাড়ীর কেউ জানে না। মা ভেবে অস্থির! বলেন, পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, কল-কাতায় পড়তে! কোথায় গেল! গাড়ীচাপা পড়লো? না এই স্বদেশীর হুজুগে ধরা পড়লো...! Irresponsible ছোক্‌রা···

চন্দর কহিল—দিদিমা ভাবচে···কথার সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটিল অন্দরে। আমার রাগ ধরিল, সারাক্ষণ পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, আর সত্য এখানে পরম আরামে···! বাহির হইয়া আসিলাম। কৌতুকে যত আনন্দই থাকুক, তার একটা সীমা আছে। পথে আসিতে দেখি, বিনোদ। কহিলাম, কোথায় উবে গেছেন!

বিনোদ কহিল—ট্যাক্সিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করছিলুম? কোথা থেকে এলো? তা সে জবাব দিলে, হেদোর ধার থেকে ভাড়া উঠেছে আট আনা······

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, চন্দরের মামার বাড়ী গোয়াবাগানে—অর্থাৎ হেদুয়া হইতে দশ মিনিটের।... বিনোদ আর আমি গৃহে ফিরিলাম।

তারপর তিন দিন চন্দরের দেখা নাই!··· চতুর্থ দিন ইংলিশ লেকচার শেষ হইবামাত্র জনার্দ্দন আসিয়া সংবাদ দিল চন্দর চুপিচুপি ট্রান্সফার লইবার ব্যবস্থা করিতেছে। আমাদের কৌতুক তাহাতে বাড়িয়া উঠিল চতুর্গুণ! তখনি মিটিং এবং সকলে এক টাকা, আট আনা চাঁদা দিয়া খুলিলাম ফণ্ড; চাঁদা উঠিল, একষট্টি টাকা বারো আনা। এই অর্থ সম্বল করিয়া আমাদের নূতন রঙ্গাভিনয়ের ব্যবস্থা হইল।

দুদিনে রাষ্ট্র হইয়া গেল, জনার্দ্দন বিলাত যাত্রা করিতেছে এবং বিদায় অভিনন্দন উপলক্ষে সচ্চিদানন্দের বাগানে শনিবার আমাদের ঈভেনিং পার্টি। কার্ডে নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হইল এবং জনার্দ্দন চন্দরের মাতুলালয়ে গিয়া তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। তাকে লইয়া মোটরে করিয়া সচ্চিদানন্দর বাগানে আনিল। সে কি আসিতে চায়? জনার্দ্দন নাছোড়বন্দা!

চা, পান, ভোজ—আসর বেশ জমাট। হঠাৎ এক মোটর হইতে নামিল বর্ম্মীজ বেশ-ধারী এক তরুণ সুপুরুষ! সকলে লাফাইয়া ছুটিয়া তাঁর অভ্যর্থনা করিল, Welcome Prince Tu Long of Burmah!

প্রিন্স টু লঙ্ আসিলেন—আসিয়া সকলের সঙ্গে হাসিয়া আলাপ সুরু করিলেন। বর্ম্মার সাদা হাতীর কথা আমি পাড়িয়া বসিলাম! তিনি জবাব দিলেন,—সেগুলো সাদা ইন্দুরের জাত যে গুলো একটু বড় হয় ইন্দুরের চেয়ে; সেগুলো বর্ম্মার হাওয়ায় থেকে হাতী হয়ে পড়েছে। একবার একটা হাতী কলকাতায় এনেছিলুম—তা এখানকার হাওয়ায় সেটা দেখি গিনি-পিগ্ হয়ে গেছে।

বিনোদ প্রশ্ন করিল,—শুঁড়টা?

প্রিন্স কহিলেন—কুঁক্‌ড়ে থ্যাবড়া নাকে পরিণত হয়েছে। এইটুকু বলিয়া প্রিন্স লাফাইয়া উঠিলেন, কহিলেন—হ্যালো ব্রাদার সুন্দর......

দেখি, চন্দর চুপি চুপি সরিবার উদ্যোগ করিতেছিল। প্রিন্স তাকে দেখিয়া বীর বিক্রমে তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। প্রিন্সের কবলে চন্দর কুঁকড়াইয়া যেন কেঁচো। প্রিন্স কহিলেন—ওহো সুন্দর—I have graced the party for you. তারপর তিনি বহু কথাই বলিলেন, সুন্দরকে না লইয়া তিনি বর্ম্মায় ফিরিবেন না! সেখানে স্পোর্টিং সীজন্ সুরু হইতে বিলম্ব নাই। বড় লাটসাহেব যাইবেন, তারপর নেপালের মন্ত্রী, তবে লর্ড উইলবার-ফোর্শ······

চন্দর একেবারে স্পীক্-টিনট্···! আমি কহিলাম—চন্দরের মুখে কথা নেই যে।

চন্দর কহিল—ভয়ঙ্কর মাথা ধরেছে……

প্রিন্স কহিলেন,—আমার গাড়ীতে নেংটি ইঁদুরেরও আচার আছে, খাসা জিনিষ…মাথা ধরায় জেনাস্‌প্রিনের চেয়েও উপকারী… ‥

আমাদের উচ্চ হাস্য এ কথায় গগনভেদী হইয়া উঠিল। চন্দর মিনতি করিল, আমায় যেতে দাও—মামার অসুখ।

প্রিন্স কহিলেন, না না ভালো। মামাবাবুকে দেখে আমি এখানে আসছি……

এমন 'ব্যাভ্রমের' মধ্যেও চন্দর চোরা প্রিন্সের পানে চাহিতে পারে নাই। প্রিন্স কহিলেন—আমায় চিনতে পারচো না, ফ্রেণ্ড! সন্দেহ হচ্ছে? Well, see……

বলিতে বলিতে প্রিন্স মাথার ফ্যাটা খুলিয়া চুলগুলা ধরিয়া টান দিলেন, অমনি রবারের পাৎলা খোলস মুখ হইতে অন্তর্হিত। অন্তর্হিত হইতে দেখি, মুখোসের আবরণে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্রের মুখ!

বিনোদ কহিল—আমার দাদা ফিল্মে অভিনয় করে, লন্ চ্যানির বই পড়ে মেক্‌আপ্ শিখলে আমি তারি মুখোস চুরি করে প্রিন্স টুলঙ সেজেছিলুম। চিনতে কষ্ট হয়নি চন্দরবাবু?

আর চন্দরবাবু! চন্দরবাবুর মুখ মরার মত সাদা!……

বেচারী চন্দর পরের দিন ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইয়া কলেজ ছাড়িয়া দিল। তার মাতুলালয়ে সংবাদ লইয়া জানিলাম, সে হাজারিবাগের কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হইয়াছে।

তারপর পাঁচ বছর কাটিয়া গিয়াছে। জানিনা, চন্দর আজ কোথায়! তবে মৌচাকের পাঠকপাঠিকার মধ্যে কেহ যদি তার দেখা পাও তো একটু মমতা করিয়ো, তাকে এমন নির্ম্মম কৌতুকে দেশত্যাগী করিয়ো না! বেচারী মিথ্যা কথায় কাহারো ক্ষতি করে না, নিজেই শুধু কৌতুকের ফোয়ারা হয়! কাজেই সে একান্ত কৃপার পাত্র।

[বৈশাখ, ১৩৩৯]　　শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

চন্দর

ঠাকুর মশাইয়ের সংসারে আপনার লোক বলতে আর কেউ নেই। সেবার গ্রামে কি একটা মহামারী দেখা দিল, দেখতে দেখতে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা একে একে ইহলীলা সংবরণ করলেন। দুর্য্যোগ আসে দরিদ্রেরই সংসারে, সুতরাং দুঃখ করবার আর কিছুই নেই। আত্মীয় পরিজন সবাই-ত গেলই, উপরন্তু দেনার দায়ে ঠাকুরমশাইকে বাস্তুভিটাটি পর্য্যন্ত মহাজনের হাতে ছেড়ে দিতে হোলো। এবার তিনি পথে বসলেন।

রইল কেবল একজন; সে বাড়ীর পুরানো চাকর। নাম চন্দর। বহুকাল থেকে এই পরিবারে সে মানুষ। লোকটা অত্যন্ত বিনয়ী এবং নিরীহ। তাকে দেখলে মনে হতে পারে জীবনে কোন দিন রাগ করেনি। তার ঠিক বয়সটা অনুমান করা কঠিন, কেউ বলে তিরিশ, কেউ বলে পঞ্চাশ। কিন্তু বয়স তার যাই হোক, সে যথেষ্ট পরিশ্রমী এবং শান্ত। সাত চড়ে রা নেই।

ঠাকুরমশাই বললেন, তোরই মরবার কথা চন্দর, কিন্তু তুই রইলি বেঁচে। আমি এখন তোকে খাওয়াই পরাই কি উপায়ে বল্‌ত?

সুবিনয়ে হেসে হাত দু'খানা কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে চন্দর বললে, এজ্ঞে, আমি আপনার পায়ের জুতো, কর্ত্তা। আমাকে মারবেন মারুন, কাটবেন কাটুন, আমি আপনাকে ছেড়ে যেতে পারবো না।

ঠাকুরমশাই বললেন, এখন তবে কি নিয়ে থাকবি, আমি ত আর তোকে আগেকার মতো মাইনে-পত্র দিতে পারবো না?

চন্দর বললে, আপনার কত খেয়েছি, কত নিয়েছি, মাইনে যদি আর না-ই দেন্ তাহলেই কি আর চলে' যেতে পারবো?

একেবারে প্রভুভক্ত জীব। ঠাকুরমশাইয়ের ব্যবহারের জন্য জল তুলে আনে, পূজোর ফুল তুলে দেয়, অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে বসে প্রভুর পদসেবা করে।

একদিন ঠাকুরমশাই বললেন, হ্যারে চন্দর, আগে তোর যে বদ্ অভ্যেসটা ছিল আজকাল সেটা সেরে গেছে ত?

চন্দর বললে, এজ্ঞে সে কি কথা, চুরি ত আর আমি করিনে? আপনার ঘরে চুরি করলে আমার যে সাত জন্ম নরক-বাস হবে ঠাকুর!

ঠাকুর মশাই হেসে বললেন, তোর চুরি বরং সহ্য হবে চন্দর, কিন্তু তুই ধর্ম্মের কথা বলিসনে বাবা।

চন্দর হাত কচ্‌লে বললে, হেঁ হেঁ!

গ্রামে বারোয়ারী তলায় একটি শিবের মন্দির ছিল, ঠাকুর মশাই তার পূজারি! পুরাণো মন্দিরটির পাশের ঘরটিতে তিনি থাকেন, ঘরের আসবাব তাঁর যৎসামান্য—ঘরের বাইরের জায়গাটুকুতে থাকে চন্দর। ঠাকুর মশাইয়ের মতো সংসারে তারো কেউ নেই। ঠাকুর মশাই রাঁধেন, আর সে তাঁর প্রসাদ পায়।

গ্রামের সেই মহামারীতে অনেক লোকে গ্রাম ছেড়ে নানা দেশে পালিয়েছে, মন্দিরে আর বিশেষ কেউ পূজো দিতে আসে না। নিজেরাই খেতে পায় না, শিব ঠাকুরকে আর খাওয়াবে কেমন ক'রে? মন্দিরের অবস্থা দিনে দিনে

অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠলো। ঠাকুর মশাইয়ের দিন চলা ভার। নগদ পয়সাকড়ি ত দূরের কথা, খাবার জিনিসপত্রও আসা বন্ধ হোলো।

ঠাকুর মশাই একদিন অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। বললেন, তুই অপয়া হতভাগা, তোর জন্যেই আমার এত দুঃখ, তুই দূর হয়ে যা। আমিও চলে যাচ্ছি যে দিকে দু চোখ যায়।

চন্দর বললে, কোথা যাবো কর্ত্তা?

সে আমি কি জানি। আমার সবাই যে চুলোয় গেছে, তুইও যা সেইখানে।

চন্দর বললে, আফিংয়ের পয়সা দিন কর্ত্তা, আমি বিষ খেয়ে মরবো!

ঠাকুর মশাই রাগে একখানা চালা কাঠ নিয়ে তাকে তাড়া করলেন। বললেন, বেরো হতভাগা!

অতঃপর তিনি এই দুঃখের দেশ ত্যাগ ক'রে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। আর তিনি কোনদিন এ গ্রামে ফিরবেন না। ঘরের জিনিসপত্র অতি সামান্য, সঙ্গে কিছুই নেবার নেই। ঘটি বাটি সব দেনার দায়ে আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। ছোট একটি বাক্সে সামান্য ক'খানা কাপড় চাদর ছিল। বাক্সের তালা-চাবি খুলে তিনি দেখলেন, একখানা পুঁথি পড়ে আছে কিন্তু কাপড় চাদরের চিহ্নমাত্র নেই। কি হোলো? আবার তিনি বাইরে এসে চন্দরকে ডাকলেন। চন্দর কোথাও যায়নি, ডাক শুনে কাছে এসে দাঁড়ালো। তিনি বললেন, হতভাগা, তালা চাবি বন্ধ, ভেতর থেকে কাপড় চোপড় গেল কোথায়?

চন্দর বললে, তলায় হয়ত ফুটো ছিল, কর্ত্তা।

তাইত, এ কথাটা কিন্তু ঠাকুর মশাইয়ের আগে মনে হয়নি, তিনি আবার ঘরে ঢুকে বাক্স পরীক্ষা করে দেখলেন, সত্যই বটে, ছোট্ট একটা ছিদ্র রয়েছে! ওই ছিদ্র দিয়েই সব বেরিয়ে গেছে।

যাক্ গে, তিনি আবার প্রস্তুত হতে লাগলেন। একটা মাটির হাঁড়িতে অনেকদিন আগেকার গোটাকয়েক পয়সা জমা ছিল,—শিবের নামের পয়সা,—হাঁড়িটা নাড়াচাড়া ক'রে দেখা গেল, পয়সাগুলি নেই। আবার তিনি চীৎকার ক'রে চন্দরকে ডাকলেন। বললেন, হারামজাদা, চোর, আমি হলপ ক'রে বলতে পারি, এ তোর কাজ!

চন্দর জিব কেটে চোখ কপালে তুলে বললে, এজ্ঞে সে কি কথা, কোথায় রেখেছিলেন পয়সা, কর্ত্তা?

ঠাকুর রাগে হাঁড়িটা তার দিকে গড়িয়ে দিলেন। চন্দর বললে, এই হাঁড়িতে? তবে ত হারাবেই কর্ত্তা! এত ইঁদুর বেড়ালের উৎপাত, পয়সা থাকবে কেমন ক'রে?

তা বটে, এ কথাটা কিন্তু ঠাকুর মশাইয়ের আগে মনে হয় নি। তাঁর রাগ পড়ে গেল, নিরস্ত হয়ে আবার তিনি বিদেশ যাত্রার জন্য আয়োজন করতে লাগলেন।

গ্রামের পরে মাঠ, মাঠের পথ দিয়ে কিছুদূর গেলে নদী। সেই নদী পার হয়ে গেলে ঠাকুর মশাইয়ের পৈতৃক যজমানদের গ্রাম পড়ে। তিনি স্থির করলেন, যজমানদের কাছে তিনি কিছু কিছু অর্থসাহায্য নিয়ে তীর্থযাত্রা করবেন। জ্যোতিষ বিদ্যা তাঁর অল্প অল্প জানা ছিল, তাই দিয়ে তিনি দিন যাপন করবেন। সংসারে একজন মানুষের আর ভাবনা কি?

একটি ঝুলি কাঁধে নিয়ে একাকী সেদিন দুপুর রোদে তিনি পথে বেরিয়ে পড়লেন। মাঠের পথ ধরে কিছুদূর গিয়ে তিনি পিছন ফিরে দেখেন, চন্দর।

আবার যে তুই ভূতের মতন পিছু নিয়েছিস?

হাত কচলে চন্দর বললে, এজ্ঞে!

আমাকে তুই ছাড়বিনে, হতভাগা?

এজ্ঞে, আপনিই কি আমাকে ছাড়তে পারেন? আমি আপনার পায়ের জুতো যে!

আর কোনো উপায় নেই, অগত্যা ঠাকুর মশাই চন্দরকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হলেন।

নদী পার হয়ে যজমানদের গ্রাম। কিন্তু তারাও দরিদ্র। ঠাকুর মশাই একে একে কয়েকদিন তাদের বাড়ী অতিথি হলেন কিন্তু নগদ বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। লোকে এক মুঠো খেতে দিতে পারে কিন্তু পয়সা কড়ি তাদের কাছে পাওয়া বড়ই কঠিন। ঠাকুর মশাইয়ের ঝুলিতে কয়েকটি মাত্র পয়সা জমা হোলো। একদিন ঝুলিতে সে পয়সাগুলিও খুঁজে পাওয়া গেল না। ঠাকুর মশাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। চন্দর তাঁকে পাখার বাতাস ক'রে বললে, কি হোলো কর্ত্তা?

ঠাকুর মশাই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন, কোথায় গেল পয়সা ক'টা?

চন্দর চুপি চুপি তাঁর কানের কাছে মুখ এনে বললে, আমি জানি কর্ত্তা, বলতে সাহস হয় না কিন্তু আমি জানি কে নিয়েছে!

ঠাকুর মশাই দাঁতের ওপর দাঁত চেপে বললেন, শিগগির বল্ নৈলে তোকে এখুনি ব্রহ্মশাপ দেবো।

হাত যোড় ক'রে চন্দর বললে, রাগ করবেন না কর্ত্তা, এরা সবাই দুঃখী গরীব......আহা! কে নিয়েছে জানেন, ওই আপনার যজমান, ওই লম্বা লোকটা—

সে কি, ওই ত দিয়েছিল পয়সা!

সেই কথাই ত বলছি কর্ত্তা, এমনই দিনকাল পড়েছে। গরীবলোক কিনা, দিনের বেলা প্রণামী দিয়ে রাতের বেলা হাত সাফাই ক'রে নেয়!

তা বটে, এই সামান্য কথাটা ঠাকুর মশাইয়ের এতক্ষণ মনেই হয়নি। সত্যিই ত, দিনকাল ভারি খারাপ,— বেচারা যজমানদের জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। আর কিন্তু এখানে থাকা ভালো দেখায় না। বললেন, কিছু মনে করিসনে বাবা চন্দর, তোকে অনেক কটু কথা বলেছি। চল্ আজই আমরা এখান থেকে চ'লে যাই।

পরদিন প্রভাতে উঠে চাকর এবং মনিব আবার দেশ-ত্যাগ ক'রে গেলেন। বন পার হতে হোলো, পার হতে হোলো প্রান্তর, ছোট ছোট নদী ও খাল, তারপর গ্রাম,

গ্রাম পার হয়ে দুজনকে আসতে হোলো ইস্‌লামপুর রেল ষ্টেশনে।

গাড়ী ভাড়া নেই সুতরাং ষ্টেশনের ধারে ঝুলি এলিয়ে ঠাকুর মশাই জ্যোতির্বিদ্যার পুঁথি খুলে পথে বসে গেলেন। একটু দূরে চন্দর হাত জোড় ক'রে ব'সে গেল ভক্ত হনুমানের মতো।

হ্যাঁ, বেশ কিছু রোজগার হোলো বটে। ঠাকুর মশাই অনেক পথিকের হাত দেখে দেখে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে দিলেন। অনেকে খুসি হয়ে পয়সা দিয়ে গেল। চন্দর হাত জোড় ক'রে চক্ষু বুঁজে ভক্তি গদগদচিত্তে বসে রইল, পয়সার শব্দ হোলেই কেবল সে এক একবার মিট মিট ক'রে তাকাচ্ছিল।

দিন তিনেক কাটলো সেই ষ্টেশনের ধারে। কিছু পয়সা জমিয়ে ঠাকুর মশাই তাঁর অনুগত ভৃত্যটিকে নিয়ে সেদিন সকাল বেলায় শহরগামী একখানা ট্রেণে চড়ে বসলেন। বললেন, নিজের কপাল যেমনই হোক, পরের কপাল নিয়ে মাথা ঘামালে কপাল কিছু ফিরে যায়, বুঝলি বাবা?

চন্দর হাত কচ্‌লে বললে, তাইত, এজ্ঞে!

ঠাকুর মশাই চলন্ত ট্রেণের ভিতরে ব'সে খুসি মনে অনেক কথা ব'লে গেলেন। তারপর কিঞ্চিৎ জলযোগ করবার পূর্ব্বে পয়সার থলিটা বার ক'রে বললেন, চন্দর, তুই আমার বড় বিশ্বাসী বাবা, এই নে, রাখ্, পয়সা কড়ি এবার থেকে তোরই কাছে থাকবে! ওসব আমি সামলাতে পারিনে।—পয়সার থলিটা তিনি চন্দরের হাতে গুঁজে দিলেন।

আজ চন্দর স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে অনুগত ভৃত্য, সে সেবক, কিন্তু বিশ্বাসী সে নয়। জীবনে কোনোদিন পয়সার থলি হাতে দিয়ে কেউ তাকে বিশ্বাস করে নি। ঠাকুর মশাইয়ের ঘরে যত চুরি আজ পর্য্যন্ত হয়েছে, সবই তার কাজ। সে মিথ্যাবাদী, সে চোর, সে অবিশ্বাসী,—নিজের অসৎ স্বভাবের জন্য কোনোদিন সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু জীবনে আজ এই প্রথম অনুতাপে তার চোখে জল এসে দাঁড়ালো। এই বিশ্বাসের ভার সে বইবে কেমন করে? কেমন ক'রে বইবে সে স্নেহের এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান?

কিন্তু তার মুখে আর একটি কথাও ফুটলো না। কেবল নিঃশব্দে ঠাকুর মশাইয়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে সে নীরবে জান্‌লার বাইরে প্রশান্ত প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইলো।

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১] শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

গঙ্গাধরের বিপদ

অনেকদিন আগের কথা। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলে। সে সময় মসলা-পোস্তায় গঙ্গাধর কুণ্ডুর ছোটখাটো একখানা মসলার দোকান ছিল।

গঙ্গাধরের দেশ হুগলী জেলা, চাঁপাডাঙ্গার কাছে। অনেকদিনের দোকান, যে সময়ের কথা বলচি, গঙ্গাধরের বয়েস তখন পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু শরীরটা তার ভাল যাচ্ছিল না। নানারকম অসুখে ভুগতো প্রায়ই। তার ওপর ব্যবসায়ে কিছু লোকসান দিয়ে লোকটা একেবারে মুস্‌ড়ে পড়েছিল। দোকান ঘরের ভাড়া দুমাসের বাকী, মহাজনের দেনা ঘাড়ে—দুপুরবেলা দোকানে বসে থেলো হুঁকো হাতে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাব্‌ছিল। আজ আবার সন্ধ্যার সময় গোমস্তা আসবে ভাড়া নিতে বলে শাসিয়ে গিয়েচে— কি বলা যায় তাকে!

এক পুরাণো পরিচিত মহাজনের কথা তার মনে পড়ে গেল। তার নাম খোদাদাদ খাঁ, পেশোয়ারী মুসলমান, মেটেবুরুজে থাকে। আগে গঙ্গাধরের লেনদেন ছিল তার সঙ্গে। কয়েকবার টাকা নিয়েচে, শোধও করেচে—কিন্তু সুদের হার বড় বেশী বলে ইদানীং বছর কয়েক গঙ্গাধর সেদিকে যায় নি।

ভেবে চিন্তে সে মেটেবুরুজেই রওনা হোলো। সুদ বেশী বলে আর উপায় কি? টাকা না আনলেই নয় আজ সন্ধ্যার মধ্যে।

মেটেবুরুজে গিয়ে খোদাদাদ খাঁয়ের নতুন বাসা খুঁজে বার করতে, টাকা নিতে, গল্পগুজব করতে দেরী হয়ে গেল। খিদিরপুরের কাটিগঙ্গা পার হয়ে এসে ট্রাম ধরবে, হন্ হন্ করে হেঁটে আসচে—এমন সময়ে একজন লোক তাকে ডেকে বল্লে—এ সাহেব, ইধার শুনিয়ে তো জরা—

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েচে। যেখান থেকে লোকটা তাকে ডাকলে সেখানে কতকগুলো গাছপালায় বেশ একটু অন্ধকার। স্থানটা নির্জ্জন, তার উপর আবার তার সঙ্গে রয়েছে টাকা। গঙ্গাধরের মনে একটু সন্দেহ যে না হোল এমন নয়। কিন্তু উপায় নেই, লোকটা এগিয়ে এল। ওই গাছগুলোর তলায় সে যেন তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

লোকটা খুব লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ঘাড়ের ওপর পড়েচে, মুখটা ভাল দেখা যাচ্চে না। পরণে ঢিলে ইজের ও আলখাল্লা। সে কাছে এসে স্বর নীচু করে

হিন্দীতে ও ভাঙা বাংলায় মিলিয়ে বল্লে—বাবু সস্তায় মাল কিন্‌বেন ?

গঙ্গাধর আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—কি মাল ?

লোকটা চারিদিকে চেয়ে বল্লে—এখানে হবে না বাবু, পুলিশ ঘুরচে, আমার সঙ্গে আসুন।

ঝুপ্‌সি গাছের তলায় এক জায়গায় অন্ধকার খুব ঘন। সেখানে গিয়ে লোকটা বল্লে—জিনিষটা কোকেন। খুব সস্তায় পাবেন। ডিউটি-ছুট্‌ মাল—লুকিয়ে দেবো।

গঙ্গাধর চম্‌কে উঠ্‌ল।

সে কখনো ও ব্যবসা করেনি। ডিউটি-ছুট্ কোকেন—কি সর্ব্বনেশে জিনিষ! ভাল লোকের পাল্লায় পড়েচে! না—সে কিন্‌বে না।

লোকটা সম্ভবতঃ পাঞ্জাবী মুসলমান। বাংলা বল্‌তে পারে—তবে বেশ একটু বাঁকা। সে অনুনয়ের সুরে বল্লে—বাবু, আপনি নিন্। আপনার ভাল হবে। সিকি কড়িতে দেবো—আমার মুস্কিল হয়েচে আমি মাল বিক্রীর লোক খুঁজে পাচ্চিনে। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি কত জায়গায়—আবার সব জায়গায় তো যেতে পারিনে, পুলিশের ভয় তো আছে। কেউ কথা কইচে না আমার সঙ্গে, সেই হয়েচে আরও মুস্কিল। হঠাৎ সহরে এত পুলিশের ভয় হোল যে কেন বাবু তা বুঝিনে—আগে যারা এ ব্যবসা করতো, তাদের কাছে যাচ্চি। তারা আমার দিকে চেয়েও দেখ্‌চে না। আপনি গররাজি হবেন না বাবু—মাল দেখুন, পরে দামদস্তুর হবে।

লোকটার গলার সুরে একটা কি শক্তি ছিল, গঙ্গাধরের মন খানিকটা ভিজ্‌ল। কোকেনের ব্যবসাতে মানুষে রাতারাতি বড় মানুষ হয়েচে বটে। বিনা সাহসে, বিপদ এড়িয়ে চলে বেড়ালে কি লক্ষ্মীলাভ হয়? দেখাই যাক না।

হঠাৎ গঙ্গাধর চেয়ে দেখ্‌লে যে লোকটা নেই সেখানে। এই তো দাঁড়িয়ে ছিল, কোথায় গেল আবার? পাছে কেউ শোনে, এই ভয়ে বেশী জোরে ডাকৃতেও সাহস পেল না। চাপা গলায় বাঙ্গালী হিন্দিতে ডাকৃলে—কোথায় গিয়া ও খাঁ সাহেব? এদিকে ওদিকে চাওয়ার পর সাম্‌নে চাইতেই দীর্ঘাকৃতি আলখাল্লাধারী খাঁ সাহেবকে দাঁড়িয়ে থাকৃতে দেখা গেল। গঙ্গাধর বল্লে—জলদি বলো, রাত হো গিয়া। অনেক দূর যানে হোগা।

কি একটা যেন ঢাকৃবার জন্য লোকটী প্রাণপণে চেষ্টা করচে। বল্লে—আমার সঙ্গে এসো মাল দেখাবো।

দুজনে কাটিগঙ্গার ধারে ধারে অনেকদূর গেল। যে সময়ের কথা বল্‌চি, তখন ওদিকে অত লোকজন ছিল না। মাঝে মাঝে জোয়ার নেমে যাওয়াতে বড় বড় ভড় ও নৌকা ডাঙায় কাদার ওপর পড়ে আছে, দু একটা করাতের কারখানা, তাও দূরে দূরে—জলের ধারে নোনা চাঁদা কাঁটার বন, পেছনে অনেকদূরে খিদিরপুর বাজারের আলো দেখা যাচ্চে।

পথে যেতে যেতে খাঁসাহেব একটা বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করলে। গঙ্গাধরের দিকে চেয়ে বল্লে—আমায় দেখ্‌তে পাচ্চ তো?

—কেন পাবো না? এমন বয়েস এখনও হয়নি যে এই সন্দেবেলাতেই চোখে ঠাওর হবে না।

একবার গঙ্গাধর জিগ্যেস করলে—তোমার ডেরা কোথায় খাঁসাহেব?

লোকটা চকিতে পিছন ফিরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—কেন সে তোমার কি দরকার? পুলিশে ধরিয়ে দেবে ভেবে থাকো যদি, তবে ভাল হবে না জেনো। মাল দেবো, তুমি টাকা দেবে—মাল নিয়ে চলে যাবে—আমার বাসার খোঁজে তোমার কি কাজ?

লোকটার চোখের চাউনি কি অদ্ভুত! গঙ্গাধর অস্বস্তি বোধ করলে। মুখ ভালো দেখা যায় না—কিন্তু ওর দুই চোখে যেন ইস্পাতের ছুরি ঝল্‌সে উঠল। না, সঙ্গে তার টাকা রয়েচে, এ অবস্থায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাত-কুলশীল লোকের সঙ্গে একা এই সন্ধ্যাবেলাতে সে এতদূর এসে পড়েচে? লোভে মানুষের জ্ঞান থাকে না—তার ভেবে দেখা উচিৎ ছিল: কিন্তু যখন এসেইচে, তখন আর চারা নেই। বিশেষতঃ সে যে ভয় পেয়েচে এটা না দেখানই ভালো। দেখালে বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে বই কম্‌বে না! ছুরি বার করে বসলে তখন আর উপায় থাকবে না।

অনেক দূরে গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা গুদাম ঘর। একটী গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে, গুদাম ঘরের দরজা থেকে একটু দূরে। তার ওপর গঙ্গাধরকে বসতে বলে লোকটা কোথায় চলে গেল। গঙ্গাধর বসে চারিধারে চেয়ে দেখ্‌লে গুদাম ঘরের আশে পাশে সর্ব্বত্র আগাছার অনুচ্চ জঙ্গল, নিকটে কোথাও লোকজনের সাড়াশব্দ নেই।

অন্ধকার হোলেও মাঠের মধ্যে বলে অন্ধকার তত ঘন নয়—সেই পাৎলা অন্ধকারে চেয়ে দেখে গঙ্গাধরের মনে হোল গুদামঘরটা পুরানো এবং যেন অনেককাল অব্যবহার্য্য হয়ে পড়ে আছে। বাঁশের বেড়া খসে পড়েচে, জায়গায় জায়গায় চালের খোলা উড়ে গিয়েচে, মাঝে মাঝে সাম্‌নের দোরটা উই ধরা, ভেঙে পড়তে চাইচে যেন।……

গঙ্গাধরের কেমন একটা ভয় হোল। কেন সে এখানে এল এই সন্ধ্যায়? এরকম জায়গায় একা মানুষে আসে বিশেষ করে এতগুলো টাকা সঙ্গে ক'রে? সে আসত না কখনই, সে কলকাতায় আজ নতুন নয়, তার ওপরে ঝুনো ব্যবসাদার, বাঙ্গাল দেশ থেকে নতুন আসেন নি। কিন্তু ওই লোকটার কথার সুরে কি যাদু আছে, গঙ্গাধরকে যেন টেনে এনেচে, সাধ্য ছিল না যে সে ছাড়ায়। একথা এখন তার মনে হোল।…

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে খাঁ সাহেবের মূর্ত্তি দেখা গেল। লোকটার যাওয়া আসা এমন নিঃশব্দ ও এমন অদ্ভুত ধরণের যেন মনে হয় অন্ধকারে ওর চেহারা মিলিয়ে গিয়েছিল;

আবার ফুটে বেরুল। কোথাও যে চলে গিয়েছিল, এমন মনে হয় না। পাকা ও ঝুনো খেলোয়াড় আর কি!

খাঁ সাহেব দোর খুলে গুদাম ঘরে ঢুকল। গঙ্গাধরকেও যখন পেছনে পেছনে আসতে বলল তখন ভয়ে গঙ্গাধরের হাত পা ঝিম্ ঝিম্ করচে, বুক ঢিপ ঢিপ করচে। এই অন্ধকার গুদাম ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঠিক ও লোকটা ওর ওই লম্বা হাতে গলা টিপে ধরবে কিংবা ছুরি বুকে বসাবে—সেই ফন্দিতে এতদুর ভুলিয়ে এনেচে। লোকটা নিশ্চয়ই জানত যে তার কাছে টাকা আছে সন্ধান রেখেছিল। কে জানে খোদাদাদ খাঁয়ের দলের লোক কিনা? গঙ্গাধরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলে। একবার সে ভাবলে দৌড়ে পালাবে? কিন্তু সে বুড়ো মানুষ, এই জোয়ান পাঞ্জাবী মুসলমানের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় তার পক্ষে পেরে ওঠা অসম্ভব।

কলের পুতুলের মত গঙ্গাধর গুদামের মধ্যে ঢুকল। আশ্চর্য্য! গুদামের ওদিকের দেওয়ালটা যে একেবারে ভাঙা! গুদামের সর্ব্বত্র দেখা যাচ্চে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে। এক জায়গায় দুটো খালি পিপে ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মাকড়সার জাল সর্ব্বত্র, অন্ধকারে দেখা যায় না বটে কিন্তু নাকে মুখে লাগে। একটা কি রকম ভ্যাপ্‌সা গন্ধ গুদামের মধ্যে, মেজেটা স্যাঁৎসেঁতে, কতকাল এর মধ্যে যেন মানুষ ঢোকে নি।

এদিকে আবার খাঁ সাহেব কোথায় গেল? লোকটা থাকে থাকে যায় কোথায়?

অল্পক্ষণ···মিনিট দুই হবে...কেউ কোথাও নেই, শুধু গঙ্গাধর একলা···আবার সেই ভয়টা হোল। কেমন এক ধরণের ভয়...যেন বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্চে। এই বা কি রকম ভয়? আর গুদাম ঘরটার মধ্যে কন্‌কণে ঠাণ্ডা হাওয়ার যেন একটা স্রোত বইচে মাঝে মাঝে।

মিনিট দুই পরেই খাঁ সাহেব—এই তো আধ অন্ধকারের মধ্যে সামনেই দাঁড়িয়ে।···

হঠাৎ আবার একটা অদ্ভুত কথা বল্লে খাঁ সাহেব। বল্লে—তুমি কালা না কি? এতক্ষণ কথা বল্‌চি, শুন্‌তে পাচ্চ না? কথার উত্তর দিচ্চ না কেন? কোকেন যে জায়গায় আছে বল্লাম—তা দেখ্‌তে পেয়েচ? সাবলের চাড় দিয়ে তুলতে বল্লাম—পিপে দুটা।

হাঁ করে সঙের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? বারে! এত কথা কখন বলেচে লোকটা? পাগল নাকি? গঙ্গাধর কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েচে, মূঢ়ের মত দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—কখন তুমি দেখালে কোকেনের জায়গা—কই কোথায় সাবল? কথা বল্‌তে বল্‌তে গঙ্গাধর সম্মুখস্থ খাঁ সাহেবের মুখের দিকে চাইলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হোল তার বিভ্রান্ত, বিমূঢ় আতঙ্কাকুল দৃষ্টির সামনে খাঁ সাহেবের মুখ, গলা, বুক, হাত-পা সারা দেহটা যেন চুর চুর হয়ে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পড়েচে···সব যেন ভেঙে ভেঙে বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্চে···খাঁ সাহেব প্রাণপণে দাঁতমুখ খামুটি করে বিষম মনের জোরে তার দেহের চূর্ণায়মান অণুগুলো যথাস্থানে ধরে রাখবার জন্যে চেষ্টা করচে! কিন্তু পেরে উঠচে না...তার চোখের সে বিজিত, হতাশ দৃষ্টি গঙ্গাধরের হৃদয় স্পর্শ করলে। দেখতে দেখ্‌তে অত বড় দীর্ঘাকৃতি দেহের আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না···সব ভেঙে গেল, গুঁড়িয়ে গেল, উড়ে গেল···এক...দুই...তিন ···চার···

আর কোথায় খাঁ সাহেব? চারি পাশের অন্ধকারের মধ্যে সে মিলিয়ে গিয়েচে···একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের ঝাপ্‌টা এল কোথা থেকে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাধর আর্ত্তরবে চীৎকার করে গুদাম ঘরের স্যাঁতসেঁতে মেজের ওপর হত হয়ে প'ড়ে গেল।

একটা দিশী ভড় কাছে কোথায় বাঁধা ছিল, তার মাঝিরা এসে গঙ্গাধরকে অচেতন অবস্থায় তাদের ভড়ে নিয়ে যায়। তারাই তাকে দোকানে পৌছে দেয়। গঙ্গাধরের টাকা ঠিক ছিল, কাণাকড়িও খোয়া যায় নি। তবে শরীর শুধরে উঠতে সময় নিয়েছিল, অনেকদিন পর্য্যন্ত অন্ধকারে সে একা কিছুতেই থাকতে পারত না।

মাস দুই পরে মেটেবুরুজের খোদাদাদ খাঁর কাছে টাকা শোধ দিতে গিয়ে গঙ্গাধর, টাকা নিয়ে যাবার দিন কি ঘটেছিল সেটা বল্‌লে। খোদাদাদ গল্প শুনে গম্ভীর হ'য়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে—সাহজী, ও হোলো আমীর খাঁ। চোরাই কোকেনের খুব বড় ব্যবসাদার ছিল। আজ বছর পনের আগেকার কথা, রমজান মাসে বেশ কিছু মাল হাতে পায়। তক্তাঘাটের কাছে একখানা জাহাজ ভিড়েছিল, সেখান থেকে রাতারাতি সরিয়ে ফেলে, জাহাজের লোকের সঙ্গে সাড় ছিল। কোথায় সে মাল রাখ্‌ত কেউ জানে না। সেই মাসের মাঝামাঝি সে হঠাৎ খুন হয়। কেন বা কে খুন করলে জানা যায়নি, কেউ ধরাও পড়ে নি। তবে দলের লোকেই তাকে খুন করেছিল এটা বোঝা কঠিন নয়। এই পর্য্যন্ত আমীর খাঁর ঘটনা আমি জানি। আমার মনে হয়, আমীর খাঁ সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মাল বিক্রী করবার জন্যে, ওর লুকানো কোকেনের বাক্স হয়েছে দোজখের বোঝা। তা বাবু, সে গুদামঘরটা কোথায় তুমি দেখাতে পারবে?

গঙ্গাধর অন্ধকারে কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে সেখানে গিয়েছিল তা তার মনে নেই, মনে থাক্‌লেও সে যেত না।

পথে আস্‌তে আস্‌তে গঙ্গাধরের মনে পড়ল, পুরানো ভাঙা গুদাম ঘরটার অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে আমীর খাঁয়ের মুখের সেই হতাশ ও অমানুষিক চেষ্টা করেও হেরে যাবার দৃষ্টিটা। হতভাগ্য কি এতদিনেও বোঝেনি সে মারা গিয়েছে?···কে উত্তর দেবে? ভগবান্ তার আত্মাকে শান্তি দিন।

[কার্ত্তিক, ১৩৪১] শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কচুরি-পানা

'তুই যাবি না বাঘাটে বিলে ?'

'যাবো বৈ কি।' উৎফুল্ল হয়ে বললাম। 'তুই ?'

'নিশ্চয়। এ জঞ্জাল দূর করে দেব সবাই।' সুখেন তার ডান হাতের মাস্‌ল্‌ ফুলিয়ে বললে।

কিন্তু বাবা রাজি হন না। বলেন, 'ওখানে হচ্ছে সাপের আড্ডা। নামবি কি ছোবল মারবে।'

'কী যে তুমি বলো।' তাচ্ছিল্যসূচক হাসি হাসলাম। বললাম, সেদিন খেলার মাঠ থেকে এমন এক লম্বা কিক মেরেছিলাম যে বল গিয়ে পড়লো বিলের মধ্যে। সবাই বললে যে ফেলেছে ঐ বল, তাকেই গিয়ে নিয়ে আসতে হবে। বিলের জল তখন বড় জোর এক বুক। দু' হাতে কচুরি-পানা সরিয়ে দিব্যি ঐ বল তুলে আনলাম। কই, সাপ কোথায়, একটা জোঁকও দেখতে পেলাম না।'

বাবা হাসলেন। বললেন, 'কি বুদ্ধি তোর! সেদিন কামড়ায় নি বলে আজো কামড়াবে না!'

'তুমি কী যে বলো! কত লোক আমাদের তা জানো?'

'সদর থেকে খোদ বড়-সাহেব আসছেন। সঙ্গে তাঁর কত লোক! স্কাউটরা আসছে। ফটোগ্রাফার আসছে। ব্যাণ্ড-পার্টি আসছে। তা ছাড়া, এখানে আমরা ইস্কুলের ছেলেরা আছি, মাষ্টাররা আছে, এখানকার সব অফিসাররা আছে, পুলিশ দারোগা আছে—'

'তবে আর কী! সাপখোপ সব পালিয়ে যাবে তোমাদের দেখে! আর, যদি যায়ও, এমন জায়গায় যাবে যেখানে দেবে তোমরা হাত।'

'অত ভয় করলে কি চলে? স্বয়ং সাহেব পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে জলে নামবেন।'

বাবা অবাক হলেন। বললেন 'বলো কী ?'

'বা, তাঁর জন্যেই তো এত সব কাণ্ড হচ্ছে। তিনি তো সবাইর আগে জলে নামবেন। নেমে ষ্টার্ট দেবেন। আর ষ্টার্ট পেয়েই আমরা দলে দলে নেবে যাব চারদিক থেকে। সব এলাকা ভাগ করা আছে—ইস্কুল, থানা, সিভিল, ক্রিমিন্যাল, মুন্সিপার্ণিট, পাব্লিক—একসঙ্গে তিন শো লোক লেগে যাবে, বাবা। দেখো, দেখতে দেখতে সবুজ বিল সাদা হয়ে যাবে।'

বাবা পোষ্টাপিসে কাজ করেন বলে হয়তো খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন। বিজ্ঞের মতো সুক্ষ্ম রেখায় হেসে বললেন, 'সাহেবেরো মাথা-খারাপ হলো নাকি ?'

উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম। বললাম, 'তুমি একে মাথাখারাপ বলছ ? তোমার মতে এটা খুব ভালো কাজ নয়, বাবা ?'

বাবা চুপ করে রইলেন।

'কী-একটা সুন্দর ফুল দেখে সখ করে কে নিয়ে এসেছিলো এদেশে, ছেড়ে দিয়েছিলো তার পুকুরে, ভেবেছিলো পদ্মের মতোই বুঝি এ শোভাবিস্তার করবে। সেই ফুল আজ বাংলা দেশের নদী-নালা খাল-বিল সব ভরে দিয়েছে, বাবা, ঢুকে পড়েছে চাষার ক্ষেতে, তাদের ধান-পাট সারশস্য সব নষ্ট করে দিচ্ছে। তুমিই বলো, এই শত্রু এই জঞ্জাল সমূলে তুলে ফেলা উচিত নয় ?'

বাবা শুধু হাসলেন। বললেন, 'কত বার, কত বছর তোমরা তুলবে ?'

আরো কী বলতে যাচ্ছিলাম, মা ধমক দিয়ে উঠলেন: 'যা, তোর আর বক্তৃতা দিতে হবে না।' শেষকালে খাওয়া আছে তো ?'

'নিশ্চয়ই! খাওয়া না থাকলে কাদা ঘাঁটবে কে শুধু শুধু ?' চরম উত্তর দিয়ে সোজা ছুট দিলুম স্টেশনের দিকে।

কালো হাফ-প্যাণ্ট আর হাত-কাটা গেঞ্জি—এই হোলো আমাদের, স্কুলের ছেলেদের পোষাক। দল বেঁধে মার্চ করে সবাই চল্লাম স্টেশনে, সাহেবকে অভ্যর্থনা করতে। সাহেব আমাদের সঙ্গে জলে নামবেন—মনে হলো, আর কি, আমরাও সবাই সাহেবেরই মতন একেক জন। কী উৎসাহ, কী উন্মাদনা আমাদের! যেন থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহের এক কোণে না বসে চলে এসেছি সবাই গ্রীনরুমে।

ঝকঝক পিতলের চাকতিওয়ালা অনেক সব লোক লস্কর নিয়ে সাহেব যখন নামলেন ট্রেণ থেকে, তখন তাঁর দামী কোট-প্যাণ্ট আর মুখের পাইপ দেখে কারুর বিশেষ ভরসা হলো না যে তিনি বাঘাটে বিলের জলে নামবেন বা নামতে পারেন কখনো। এ মনে করবার কারু সাহস নেই যে তিনি জীবনে পা থেকে জুতো বা গা থেকে জামা খুলেছেন।

বেলা তখন প্রায় পাঁচটা, বাঘাটে বিল ইষ্টিশান থেকে আধঘণ্টার রাস্তা।

হোমরা-চোমরা কে একজন জিগগেস করলে সাহেবকে, 'সোজা কি বিলেই যাবেন আগে, না—'

'না, না, ফার্ষ্ট কচুরি-পানা। ষ্ট্রেইট বিলেই যাবো। আলো বিশেষ নেই আর। অন্যান্য ফাঙ্কশুন পরে হবে।' সাহেব পাইপ কামড়াতে-কামড়াতে বললেন।

কে আরেকজন বললে, 'আপনি নামবেন নাকি জলে ?'

সাহেব চিবুকটা শূন্যে উঁচু করে দিয়ে বললেন, 'সার্টেনলি। জলে নামবো না তো এসেছি কেন? যদিও আই হ্যাভ এ টাচ অফ কোল্ড, আই ডোণ্ট মাইণ্ড।' বলে পেণ্টেলুনের পকেট থেকে রুমাল বের করে সাহেব সদর্পে নাক ঝাড়লেন।

অনেক গাড়ি-ঘোড়া ছিল মজুত, কিন্তু সাহেব পায়ে হাঁটার পক্ষপাতী। আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন সেনাপতির ভঙ্গিতে; 'নিজের পায়ে দাঁড়াও।'

এক সঙ্গে আমরা সুর করে বলে উঠলাম :

নিজের পায়ে দাঁড়াও,
উর্দ্ধে হাত বাড়াও।
যদিও খুঁটি হারাও
নিজের পায়ে দাঁড়াও।

যেন দেশ জয় করতে যাচ্ছি এমনি সবার অনুপ্রাণনা। কাজ তুচ্ছ হোক কি বড় হোক, সকলে মিলে কাজ করার মধ্যেই রয়েছে আনন্দ।

আমাদের স্কুলের যে মাঠ তারই পূবে কিছুটা দূরে বাঘাটে বিল। যেমন শুনতে, তেমন দেখতে নয় বিলটা। বর্ষার সময় যদিও এটা নদীর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়, এখন, এই চৈত্র মাসে, খরার দিনে, এটার আয়তন খুব বিস্তৃত নয়। শত্রুর তুলনায় আততায়ীর আয়োজন তাই অনেক বেশী।

বিলের কাছে পৌঁছুনোমাত্র যার-যার এলেকায় সে-সে আলাদা হয়ে গেল। বাঁশ দিয়ে ঘিরে টিকিট ঝুলিয়ে এলেকা ভাগ করা হয়েছে—কোনটা মোক্তার, কোনটা উকিল, কোনটা মাদ্রাসা, কোনটা গুরুট্রেনিং। একেক খোপে বিশাল একেকটা জনতা। যাদের পরণে হাফ-প্যান্ট নেই, তাদের সব হাঁটুর উপর কাপড়-তোলা, কেউ-কেউ বা অতি-উৎসাহে খালি-গা।

সাহেব বললেন, 'আমি ইণ্টারন্যাল ষ্টুডেণ্ট, তাই আমি ছাত্রদের দলে' বলে তিনি আমাদের ঘোপরিতে চলে এলেন।

গায়ের কোটটা ফেললেন খুলে। অমনি ব্যাণ্ড বেজে উঠলো মেঘনিনাদে।

হাত তুলে ব্যাণ্ড থামিয়ে তিনি বললেন, 'জলে নামবার আগে ছেলেদেরকে আমি য্যাড্রেস করতে চাই। ওরা—ওরাই হচ্ছে দেশের ফিউচার।' পরে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন লাউড-স্পিকারের কোনো বন্দোবস্ত নাই। ইলেকট্রিসিটিই যে দেশে নেই সে দেশে কীই বা বক্তৃতা জমবে—এমনি একটা সঘৃণ তাচ্ছিল্যের ভাব তাঁর মুখে ফুটে উটলো। তবু, সংক্ষেপে—

সাহেবের কৈশোর আমাদেরই মতো আমাদেরই দেশের জলে-রোদে গড়ে উঠলেও পরবর্তী জীবনে বহু বৎসর বিলেতে থাকার দরুণ বাংলা ভাষাটা তাঁর তেমন সড়গড় নেই। কথায় কথায় তিনি হোঁচট খান আর ইংরিজির আশ্রয় নেন। আর, বাংলাটা যে তাঁর ভাল আসে না; এটা তাঁর কাছে খুব একটা মজার ব্যাপার বলে মনে হয়। সেটা যেন খানিকটা তাঁর কৃতিত্বের ফল, তার বড় হওয়ার প্রমাণ।

আমাদের সম্বোধন করে তিনি বললেন :

'ইউনিটি, মানে একতা—একতাই হচ্ছে স্ট্রেঙ্‌থ। স্ট্রেঙ্‌থ—ষ্ট্রেঙ্‌থের মানে কী?'

আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম : 'শক্তি।'

'হোপলেস।' সাহেব নিষ্পাপ সারল্যে হেসে উঠলেন : 'শক্তি—সবই শক্তি। ফোর্স মানে শক্তি, পাওয়ার মানে শক্তি, এনার্জি মানে শক্তি; strength মানেও শক্তি। কথাই নেই মোটেই বাঙলা ভাষায়, কী করে তবে আমরা শক্তিমান হবো? নিরাশ! নিরাশ! হোপলেস! থাক গে।' একটু থেমে গলায় একটা খাঁখরি দিয়ে তিনি ফের সুরু করলেন :

'সেল্‌ফ? সেল্‌ফ মানে কী?'

কেউ কেউ বলে উঠলো : 'তাক। যাতে বই রাখা হয়।'

'শেলফ নয়, সেল্‌ফ।' সাহেব তাঁর জিভটা মুখের তালু থেকে দাঁতের গোড়ায় আনলেন।

সবাই সমস্বরে বলে উঠলাম : 'স্বার্থ।'

'হ্যাঁ, এই সেল্‌ফ হেল্‌প, মানে স্বার্থ-সাহায্য ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই হবার নয়।' সাহেব একটা ঢোক গিললেন। এর পরে তাঁর 'পার্সিভিয়ারেন্স' কথাটা মনে এসেছিলো বোধ হয়, এবং নিশ্চয়ই তিনি অনুমান করলেন এমন শক্ত কথাটার নিশ্চয়ই কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই। তাই তিনি নিরাশ হয়ে বক্তৃতায় ইতি দিলেন। বললেন, যে দুটো উচ্চ উপদেশ তোমাদের দিলাম আজ তাই মনে রাখলেই এনাফ্‌। হ্যাঁ, আলো আর বেশী নেই, এবার আরম্ভ করে দেওয়া যাক।'

ব্যাণ্ড বেজে উঠলো শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দে।

সাহেব তার সার্টের লিঙ্কস্ খুলে হাত গুটোলেন। নীচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে যাবেন, একজন খয়ের খাঁ তাঁর কাছে এসে বিনীত ভঙ্গিতে বললে, 'আপনার সর্দি হয়েছে, আপনি কেন কষ্ট করে মিছি মিছি জলে নামবেন? আপনি পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকুন, ছেলেরা তুলে-তুলে এনে আপনার হাতে দিক, আপনি তাই ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলে দিন দূরে। তাইতেই চমৎকার হবে।'

'আর ইউ ম্যাড?' সাহেব ঝাঁপিয়ে উঠলেন : 'আমি এতদূর এসেছি শুধু পণ্ডশ্রম করতে? টু প্লে ট্র্যান্ট? ককখনো না। আমি নামবো বই কি জলে।' বলে তিনি জুতো-মোজা খুলে ফেললেন।

আমরা সমনেত্রে তার দুর্লভ-দর্শন পদযুগের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

এ তো আর ধুতি নয় যে হাঁটু পর্য্যন্ত অক্লেশে তুলে নিলেই হলো। তাই সাহেব পেন্টেলুনের পা দুটো অতি কষ্টে একটু তুলে ক্লিপ দিয়ে আটকে নিলেন। পেন্টেলুন বলেই জলের মধ্যে বেশী দূর তাঁর নামতে হলো না। তাতে কিছু এসে যাবে না, কেননা পাড়ের কাছেও প্রচুর কচুরি-পানা স্তূপীকৃত হয়ে আছে।

সাহেবকে জল ছুঁতে দেখে চতুর্দিক থেকে বিপুল জনতা মত্ত বিক্রমে বিলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ব্যাণ্ড বেজে উঠলো বৃংহিতধ্বনিতে, সিংহ-আস্ফালনে।

সাহেব এক আঁজলা কচুরিপানা তুলে ধরে পিছন দিকে তাকালেন ঘাড় বেঁকিয়ে। কিন্তু তেপায়ার উপরে কালো

পর্দা কোথাও দেখতে পেলেন না। সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন, বিস্মিত ক্রুদ্ধ গলায় প্রশ্ন করলেন: 'তার মানে? ফটোগ্রাফার কই?'

সেই খয়ের খাঁ ব্যক্তিটি দীনহীনের মতো মুখ করে বললেন, 'তার এই ট্রেনে সদর থেকে আসবার কথা ছিল, স্যর। কিন্তু সে আসেনি দেখছি। তার সঙ্গের লোক বলছে যে, সে নাকি ট্রেনে মিস করেছে।'

'হোয়াট্ ডু ইউ মীন?' সাহেব মুখিয়ে উঠলেন: 'ফটোগ্রাফার ছাড়া এই সব আয়োজনের মানে কী? কী হবে তবে আমার জলে নেমে?' সাহেব অপরিসীম রাগ করে হাতের কচুরি-পানা জলের মধ্যেই ফেলে দিলেন। চোখ-মুখ পাকিয়ে বললেন, 'হ্যামলেট্ ছাড়াই আপনি হ্যাম্‌লেট নাটক করাতে চান? দু'-দিন আগে থেকে ফটো-গ্রাফার জোগাড় করে রাখেন নি কেন?' বলে তিনি হাতের জল না মুছেই, জুতো পায়ে না দিয়েই বড় বড় পা ফেলে সোজা চলে গেলেন ডাক-বাংলোয়।

দুঃশাসনের রক্ত পান হয়ে গেল এমন একখানা বিবর্ণ মুখ করে রইলেন সেই খয়ের খাঁ বাবুটি।

যেন বিয়ের সভা থেকে বর গেল উঠে এমনি শোকাবহ ব্যাপার ঘটে গেল। জিন আর চাবুকেরই খুব সমারোহ হয়েছে, আসল যে ঘোড়া তারই দেখা নেই! ফটোগ্রাফার নেই তো কে দেখবে এই সাহেবের কীর্তি? গ্রামের এই ক'টা শুধু লোক দেখ্‌লে তৃপ্তি কোথায়?

ভীষণ দমে গেলাম আমরা, কিন্তু কাজে নেমে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করার শিক্ষা আমাদের নয়। ব্যাণ্ডে তখন বাজছে বিসর্জনের বাজনা, তারি মধ্যে আমরা বাঘাটে বিলে নেমে যার-যার এলেকা মতো কচুরি-পানা তুলতে লাগলাম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাঘাটে বিল তার শুভ্র স্বমূর্তি ধারণ করলো।

ভাবলাম কাজ যখন উদ্ধার হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই সাহেবের মান ভাঙবে। কিন্তু ডাক-বাংলোয় এসে দেখি সাহেব ফিরতি ট্রেনে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। এমন কারু সাধ্য নেই যে তাঁর সামনে এগোয় বা একটাও কথা কয়।

সাহেবের ফিরে যাবার দৃশ্য দেখে ফিরে এসে দেখি খাবারের জায়গায় তুমুল ওলোট-পালোট চলেছে। কোথাও আর কোনো শাসন নেই, শৃঙ্খলা নেই, যে যা পারছে মুখে ঠাসছে, পকেটে পুরছে, রুমালে বাঁধছে। সে একটা হরির লুট চলেছে বলা যায়।

ম্লানমুখে ঘুরঘুর করছিলাম, সুখেন্দু এক কাপ চা আমার হাতে দিয়ে বললে, "পানা।" আর একটা কচুরি আমার মুখে দিয়ে বললে, 'কচুরি।'

[আশ্বিন, ১৩৪৮] শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কর্ত্তার বাড়ীর যাত্রা

কর্ত্তা ভারি বদ-মেজাজী। কেউ যদি তাঁর কথা না শোনে, কিংবা তাঁর মুখের উপর কেউ কোনো কথা বলে তাহলে তিনি অগ্নিশর্ম্মা হয়ে ওঠেন; তখন যা কাণ্ড করে বসেন তা আর বলবার নয়! সেই জন্যে বাড়ির সবাই, পাড়া-প্রতিবেশী সকলে কর্ত্তার সঙ্গে একটু হিসেব কোরে সমঝে চলে।

কর্ত্তার বাড়ি যাত্রা হচ্ছে—সীতাহরণের পালা। বাড়ির উঠোনে লোক থৈ থৈ করছে। কর্ত্তা আসরের মাঝখানে বসে একেবারে তন্ময় হয়ে যাত্রা শুনছেন আর মাঝে-মাঝে বাহবা দিচ্ছেন। তাঁর মুখের বাহবা শুনে ছোট্ট ছোট ছেলের দল মহা ফুর্ত্তিতে চটাপট চটাপট হাততালি দিয়ে উঠছে। কর্ত্তা তাতে ভারি খুসি। মাঝে-মাঝে ফোগলা দাঁত বেরিয়ে পড়ছে। যাত্রা খুব জমে উঠেছে।

পঞ্চবটী বন। রাম-সীতা-লক্ষ্মণ তিন জনে উপস্থিত। জুড়ির দল সবেমাত্র গান শেষ করেছে, এমন সময় দর্শকদের ভিড়ের পিছন থেকে পোকায় কাটা একখানা হরিণের ছাল মুড়ি-দিয়ে একটা লোক আসরের মধ্যে তড়াক্-কোরে লাফিয়ে পড়লো। সীতা অমনি বলে উঠলেন—"দেখ, দেখ আর্য্যপুত্র, কি সুন্দর হরিণ! কেমন সোণার মত রং! আমায় ঐ হরিণটি ধরে দাওনা।"

রামচন্দ্র কি বলতে যাচ্ছিলেন, তাকে বাধা দিয়ে কর্ত্তা সজোরে ধমকে উঠলেন—"এই, হরিণ চাস্‌নে!"

কর্ত্তার সেই গম্ভীর গলা শুনে রাম-সীতা দু-হাত পিছিয়ে গেল; শ্রোতারা অবাক্ হয়ে কর্ত্তার দিকে চাইলে। দেখা গেল কর্ত্তা সীতার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে ফ্যাল্-ফ্যাল্ কোরে চেয়ে আছেন। কেউ কিছু বুঝতে পারলে না। যাত্রা আবার চলতে লাগলো।

সীতা বলতে লাগলেন—"ঐ দেখ আর্য্যপুত্র, সোণার হরিণ পালিয়ে যায়। চলে গেলে আর পাব না। তুমি এখুনি ওটাকে ধরে নিয়ে এসো;—তোমার দু'টি পড়ি, ঐ হরিণটা আমায় এনে দাও।"

সীতার কথা শেষ না হতেই কর্ত্তা আবার ধমকে উঠলেন—"ফের বলছি, হরিণ চাস্‌নে!" বোধ হয় কর্ত্তার সেই ধমকেই সোনার হরিণটা প্রাণপণে ছুটে পালালো; আর রামচন্দ্রও ধনুর্ব্বাণ-হাতে তার পিছনে-পিছনে ছুটলেন। তারপর সমস্ত আসর কাঁপিয়ে দূর থেকে মোটা গলায়

চীৎকার উঠলো—"ভাই, লক্ষ্মণ! ভাই লক্ষ্মণ! আমি মলুম, আমায় রক্ষা কর; আমায় বাঁচাও।" আচমকা সেই বিকট শব্দ শুনে ছেলের দল একেবারে হতভম্ব! কর্ত্তা কেমন হতাশ-ভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন।

সীতা হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগলেন—"লক্ষ্মণ! আর্য্যপুত্র বিপদে পড়েছেন, ঐ শোনো তোমায় ডাকছেন, তুমি যাও, এখুনি গিয়ে তাঁকে উদ্ধার কর!"

কর্ত্তা বল্লেন—"চুপ কর পোড়ারমুখী!"

লক্ষ্মণ বল্লেন—"না দেবী, কোনো ভয় নাই, দাদার কোনো বিপদ হয় নি। ও কোন্ মায়াবীর মায়া হবে!"

সীতা কান্নার সুরে বল্লেন—"না গো না,—ঐ শুনছ না, ঐ যে আর্য্যপুত্রের গলার স্বর।"

কর্ত্তা বল্লেন,— হ্যাঁ, তুই তো ভারি জানিস্!"

লক্ষ্মণ বল্লেন—"দেবী, আপনার ভ্রম হয়েছে, ও আর্য্যপুত্রের কণ্ঠস্বর নয়।"

সীতা এবার রেগেছেন; মনে করছেন লক্ষ্মণ প্রাণের ভয়ে কুটীর ছেড়ে যেতে চাইছে না। তাই তিনি বলছেন, —"কাপুরুষ! কুলাঙ্গার! কদাচারী! ভীরু!'

গালাগালি শুনে লক্ষ্মণ আর থাকতে পারলেন না, তিনি বল্লেন—"আচ্ছা, আমি যাচ্ছি দেবী! কিন্তু যদি বাঁচতে চান তাহ'লে কিছুতেই এই গণ্ডী পার হবেন না।" বোলে ধনুকের আগা দিয়ে একটা দাগ টেনে তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জুড়ির দল গান ধরলে "হায় হায় হায়"—খানসামা এসে কর্ত্তার তামাক দিয়ে গেল।

গান থামতেই জটাজুটধারী কমণ্ডল-ত্রিশূল-হাতে এক সন্ন্যাসী এসে হাজির—"জয় হোক, দুটি ভিক্ষা পাই।"

সীতা তাড়াতাড়ি কুটীরের ভিতর থেকে গোটাকতক রং করা মাটীর ফল নিয়ে এসে গণ্ডীর ভিতর থেকে বল্লেন, —"এই নাও ভিক্ষা।"

সন্ন্যাসী বল্লেন—"বেরিয়ে এসে ভিক্ষা দাও।"

সীতা এগিয়ে আসছিলেন, হঠাৎ গণ্ডীর দিকে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়ালেন; সেইখান থেকে বল্লেন—"এই নাও ভিক্ষা।"

কর্ত্তা তাকিয়া ছেড়ে হঠাৎ একবার সোজা হয়ে বসেই আবার হেলান দিয়ে তামাক টান্‌তে লাগলেন।

সন্ন্যাসী বল্লে—"কাছে এসে ভিক্ষা না দিলে ভিক্ষা নেব না।"

কর্ত্তা বল্লেন—হ্যাঁ, ভারি আবদার! না নিবি তো চলে যা!"

সন্ন্যাসী ভিক্ষা না নিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে সীতা কাতর স্বরে বল্লেন—"না, সন্ন্যাসী, ভিক্ষা না নিয়ে যেওনা, আমাদের অকল্যাণ হবে।—গৃহস্থের ঘর থেকে কি অতিথি ফিরতে আছে।"

সন্ন্যাসী ফিরে বল্লে—"তবে গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসো।"

সীতা বল্লেন—"দেবর লক্ষ্মণ যে বারণ কোরে গেছেন এখান থেকে বার হোতে। একটু অপেক্ষা করুন, তিনি এলেই আপনাকে ভিক্ষা দেব।"

লক্ষ্মণের নাম শুনে সন্ন্যাসী রেগে গটগটিয়ে চলে যেতে লাগল।

কর্ত্তা বল্লেন—"যা ব্যাটা যা।"

সীতা দেখলেন, অতিথি ভিক্ষা না নিয়েই চলে যায়—কি সর্ব্বনাশ! তিনি কাতর স্বরে বল্লেন—"দাঁড়ান, চলে যাবেন না। আমি ভিক্ষা দিচ্ছি। আমার অদৃষ্টে যাই থাক্, অতিথিকে বিমুখ হ'তে দেব না। অতিথি বিমুখ হয়েছে শুনলে আর্য্যপুত্র বলবেন কি!"

কর্ত্তা বল্লেন—"থাক্, অত ধর্ম্মজ্ঞানে কাজ নেই!"

সীতা তখন গান ধরলেন—"হে মা মঙ্গলচণ্ডী! আমার অমঙ্গল না হয়! আমি গণ্ডী পার হচ্ছি—নইলে অতিথি বিমুখ হয়ে যায়! তুমি আমার মুখ চেয়ো মা!" সীতা এক-এক লাইন গাইছেন আর এক-এক-পা গণ্ডীর দিকে এগিয়ে আসছেন; আর কর্ত্তা একটু একটু কোরে তাকিয়া ছেড়ে সোজা হ'য়ে উঠে বিড় বিড় করে বল্‌ছেন—"খবরদার গণ্ডী পার হস্‌নে! খবরদার গণ্ডী পার হস্‌নে! পার হলেই মরবি!"

দর্শকরা তখন গান শোনা ছেড়ে সবাই কর্ত্তার কাণ্ড-কারখানা দেখছেন—ব্যাপার কি! এদিকে সীতা যতই গণ্ডীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন, কর্ত্তা ততই ধীরে ধীরে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠতে লাগলেন। তারপর সীতা যেই গণ্ডী পেরিয়ে সন্ন্যাসীর ঝুলিতে ভিক্ষে দিয়েছে, অমনি সন্ন্যাসী টান-মেরে জটাজুট খুলে ফেলে রাবণের মূর্ত্তি ধারণ কোরে সীতার চুলের মুঠি ধরেছে। সীতা তখন কেঁদে-কেঁদে বলছেন—হা রাম! হা লক্ষ্মণ! আমায় রক্ষা কর।"

কর্ত্তা তখন রাগে ঠক্-ঠক্ কোরে কাঁপতে-কাঁপতে এগিয়ে এসে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলছেন—"রক্ষে কর। কে তোকে রক্ষে করে। তখন বল্লুম, হরিণ চাস্‌নে—হরিণ চাস্‌নে, সে-কথা শোনা হল না। এখন রাবণের বাড়ি দাসীবৃত্তি কোরে মর্‌গে যা।" বোলেই ঠাস্ করে তার গালে এক চড়! ছেলেমানুষ একটি ছেলে সীতা সেজেছিল, কর্ত্তার হাতে সেই প্রকাণ্ড চড়-খেয়ে ভ্যাঁ কোরে কেঁদে ফেল্লে।

কর্ত্তা বল্লেন—"এখন কাঁদলে কি হবে! তখন যে বলেছিলুম গণ্ডী পেরুসনি!" বলেই কর্ত্তা আর একটা চড় তুল্লেন। সীতা সেই চড়ের ওজন দেখেই রাবণের হাত থেকে চুলের মুঠি ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে যাবে, কর্ত্তা ফস্ কোরে তার হাত ধরে বল্লেন—"পালাবি কোথা? দাঁড়া!" বলেই বল্লেন—"রাবণ! লে যাও বেটীকে ধরে!"

কিন্তু রাবণ তখন কোথায়? সে গতিক দেখে সীতাকে ফেলে আসর ছেড়ে সাজ-ঘরে সেঁধিয়েছে। কর্ত্তা নিজেই সীতাকে হিড়-হিড় কোরে টান্‌তে-টান্‌তে সাজ-ঘরের দিকে নিয়ে চল্লেন।

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩] শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শতফুটি-সহস্রফুটি দাদাঠাকুর

এক যে ছিল গ্রাম। নিতান্তই চাষার গ্রাম। কেবল এক ঘর বামুন। তা সে বামুনের অবস্থা তথৈবচ। কোনো রকমে প্রথম ভাগ শেষ ক'রে শত জায়গায় তিলক-ফোঁটা কেটে শতফুটি দাদাঠাকুর হ'য়ে ব'সেছে। গ্রামের চাষাদের ধারণা—এত বড় পণ্ডিত ও-তল্লাটে আর নেই। তাদের ক্ষেতে যা কিছু হয়, আগে দাদাঠাকুরকে না দিয়ে ঘরে তোলে না। এমনি ক'রে দাদাঠাকুরের দিন বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই চলে যায়।

অনেকদিন পরে গ্রামের চাষীরা একদিন সকালে চণ্ডী-মণ্ডপের দাওয়ায় ব'সে গল্প করছিল। এমন সময় দেখলে, বহুলোক ভারে ভারে নানা জিনিষ নিয়ে যাচ্ছে,—ঘড়া, ঘটি, তৈজসপত্র এবং আরও কত কি।

চাষীরা জিজ্ঞেসা করলে, কে যায়?

দলের মধ্যে থেকে একজন উত্তর দিলেন, মধ্যম গ্রামের সার্ব্বভৌম মহাশয়। চাষীরা সসব্যস্তে দাওয়া থেকে নেমে এসে সার্ব্বভৌম মশায়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে।

জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় গিয়েছিলেন মশাই?

সার্ব্বভৌম তাদের আশীর্ব্বাদ ক'রে হেসে বল্লেন, রাজ-বাড়ীতে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করতে গিয়েছিলাম।

—তা এই সব জিনিসপত্র?

সার্ব্বভৌম সবিনয়ে বল্লেন, তাঁকে তর্কে পরাস্ত ক'রে এই সব পেলাম।

—তাই নাকি? তাহ'লে তো আজ এখানে পায়ের ধুলো দিয়ে যেতে হ'বে?

সার্ব্বভৌম মশায় বিস্মিত ভাবে বল্লেন, কি ব্যাপার?

—আজ্ঞে, আমাদের এখানেও এক ভীষণ পণ্ডিত আছেন তাঁর সঙ্গে তক্ক ক'রে যেতে হ'বে।

এখানে যে একজন বড় পণ্ডিত আছেন, সে খবর সার্ব্বভৌম মশায় এর আগে কখনও শোনেন নি। বললেন, তা তো জানতাম না বাবা। কি তাঁর নাম?

—শতফুটি দা' ঠাকুর।

এ নাম তিনি জীবনে শোনেননি। ভাবলেন, তা হ'বে। হয় তো সম্প্রতি কোন বড় পণ্ডিত এখানে এসে বাস করছেন। তিনি আর আপত্তি করলেন না। বললেন, বেশ, তাই হ'বে।

চাষীরা বল্লে, শুধু হবে নয় ঠাকুরমশাই। আপনি যদি জেতেন, তাহ'লে দাঠাকুরের যা আছে সব পাবেন। আর যদি হারেন, তা হ'লে যা নিয়ে যাচ্ছেন সব রেখে যেতে হ'বে।

সার্ব্বভৌম মশায় তাতেও আপত্তি করলেন না। তাঁর আর ভয় কি? অত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে যিনি হারিয়ে এসেছেন, এ অঞ্চলে তাঁকে হারাবে কে?

ভারীরা সেইখানেই জিনিসপত্র সব নামালে। সে সব দেখে চাষাদের তাক লেগে গেল। কত সোনা-রূপোর বাসন, কত পাটের কাপড়, কত টাকা মোহর। জীবনে তারা এসব দেখেনি। পরম সমাদরে তারা সার্ব্বভৌম মশায়ের জন্য চণ্ডীমণ্ডপে থাকবার জায়গা ক'রে শতফুটি দাদা-ঠাকুরকে গেল খবর দিতে। দাদাঠাকুর সমস্ত শুনে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একবার হাসলে। জিজ্ঞেস করলে, আমার মতো লম্বা চওড়া?

চাষীরা বল্লে, কোথায় পাবেন? আপনার আধখানা। যেমন বেঁটে, তেমনি রোগা। আর কথা কয়, যেন ছ'মাস খায়নি। দেখে আমাদের ভক্তি হ'ল না মশায়। শ্রীচৈতন্যটিও আপনার আধখানা।

দাদাঠাকুর আশ্বস্ত হ'য়ে আর একেবার হাসলেন। বল্লেন, বেশ। পাঁচ খানা গাঁয়ে ঢোল দে। আমি বিকেলে যাব।

বিকেল হ'তে না হ'তে চণ্ডীমণ্ডপের উঠানটা একেবারে ভর্ত্তি হয়ে গেল। তিল ধরবার আর জায়গা রইল না। এ সময়টা চাষের কাজ নেই। কাজেই পাঁচখানা গ্রামের যত চাষী সবাই এসে জুটল।

সার্ব্বভৌম মশায় চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় একখানা আসনের উপর চোখ বন্ধ ক'রে যেন ধ্যানস্থ হয়ে ব'সে। তাঁর সামনের আসনখানি খালি রয়েছে, শতফুটি দাদাঠাকুর তখনো আসেনি।

একটু পরে হেলতে দুলতে সে এলো। মিশকালো, লম্বা-চওড়া চেহারা। তার উপর শত স্থানের তিলক চিহ্ন যেন জ্বল জ্বল করছে। উঠানের জনতা সসম্ভ্রমে তাকে পথ ছেড়ে দিলে।

প্রথা মত সার্ব্বভৌম মশায়ও উঠে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার জানালেন। ব্রাহ্মনেভ্যো নমঃ। কিন্তু দাদাঠাকুর নমস্কারও ফিরিয়ে দিলে না, একটা কথাও কইলে না। আসনে ব'সেই বজ্রকণ্ঠে বল্লে—বলুন তো,'ফুন ফুনাফুন?'

ফুন ফুনাফুন? সার্ব্বভৌম মশায় যেন বিশ বাঁও জলে পড়লেন। আকাশ-পাতাল হাতড়াতে লাগলেন, কিন্তু 'ফুন ফুনাফুন' ব'লে কোনো শব্দ কোথাও পড়েছেন বলে মনে পড়ল না। এ জীবনে যত পুঁথি তিনি পড়েছেন সব তন্ন তন্ন ক'রে ভাববার চেষ্টা করলেন। না, ও একেবারে নতুন।

শতফুটি দাদাঠাকুর আবার ধমকে দিলে, বলুন।

সার্ব্বভৌম মশায় ঘামতে লাগলেন। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। চক্ষে অন্ধকার দেখলেন। লজ্জায়, ধিক্কারে তাঁর চোখ ফেটে জল আসবার মতো হ'ল। অত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে হারিয়ে এসে শেষে এইখানে হারতে হ'ল!

সমুদ্র পার হ'য়ে এসে গোষ্পদে ভরাডুবি? কি আশ্চর্য্য! এত শাস্ত্র পড়েছেন, কিন্তু এমন অদ্ভূত শব্দ তো কোথাও পাননি! 'ফুন ফুনাফুন'?

কিন্তু শতফুটি আর ভাবতে সময় দিলে না।

উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, কিছুই না প'ড়ে আমার সঙ্গে এসেছে তর্ক করতে? চালাকির আর জায়গা পাওনি? এই, কে আছিস!

চাষারা হৈ হৈ ক'রে উঠে দাঁড়াল। দা'ঠাকুর জিতেছে, তাদের আর পায় কে?

শতফুটি হুকুম দিলে, এর যা কিছু আছে, সব নিয়ে আমার বাড়ী তোল। আর একে গাঁ থেকে বার ক'রে দে।

তাই হ'ল। ঠাকুর কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী চললেন। কান্নার আর দোষ কি? তাঁর ধন গেল, সম্পদ গেল, এমন কি সম্মান পর্য্যন্ত গেল। এরপরে গ্রামে গিয়ে মুখ দেখাবেন কি ক'রে? সার্ব্বভৌম মশায় কাঁদতে কাঁদতে চললেন। তাঁদের গ্রামের ধারে তাঁর ছোট ভাই তখন একটা গাছের উপর থেকে পাতা ভেঙ্গে ভেঙ্গে নীচে ফেলে দিচ্ছিল, আর গরুগুলো নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই খাচ্ছিল।

সার্ব্বভৌমের এই ভাইটি লেখাপড়ার ধারে দিয়ে যায় না। বাড়ীতে চাষ-বাস ক্ষেত-খামার দেখে। দাদার উপর তার অচলা ভক্তি। গাছের উপর থেকে দাদাকে কাঁদতে কাঁদতে আসতে দেখে সে তাড়াতাড়ি নেমে এল। ছুটে গিয়ে দাদার পায়ের ধূলো নিয়ে জিজ্ঞেসা করলে, দাদা, তুমি কাঁদছ কেন?

সার্ব্বভৌম সেইখানে বসে পড়ে বললেন, ভাইরে, আমি চললাম। এ মুখ আর দেশে দেখাব না।

—কেন? কি হল? দিগ্বিজয়ীর কাছে হেরে এলে? তা অমন হার জিত কত হয়?

—না রে ভাই, হেরেছি বটে, কিন্তু দিগ্বিজয়ীর কাছে নয়। তাঁকে হারিয়ে ভারে ভারে জিনিস-পত্র নিয়ে আসছি, পথে এক শতফুটির পাল্লায় প'ড়ে···

সার্ব্বভৌম সব কথা ভাইকে খুলে বললেন।

ভাই তো হেসেই অস্থির, বললে, কি জিজ্ঞেস করলে? ফুন ফুনাফুন?

—হ্যাঁ।

ভায়ের হাসি আর থামে না। বললে, ও সব তোমার শাস্তরে নেই দাদা। আমার শাস্তরের কথা তুমি জানবে কি ক'রে? দাও তোমার চাদরখানা।

সার্ব্বভৌম তাড়াতাড়ি ভায়ের হাত চেপে ধরলেন। বললেন, পাগল! আমি তার সঙ্গে পারলাম না, আর তুই গণ্ডমূর্খ, তুই যাবি!

কিন্তু ভাই কিছুতেই শুনলে না। বললে, দাও না চাদরখানা। বাড়ী গিয়ে কাউকে পাঠিয়ে দেবে। সে এসে গরুগুলো নিয়ে যাবে। দেখই না আমি কি ক'রে আসি!

সার্ব্বভৌম ভাইকে আটকে রাখতে পারলে না। তাঁর কাছ থেকে চাদরখানা এক রকম কেড়ে নিয়েই সে চ'লে গেল। দাদার অপমানে সে বেজায় চ'টে গেছে। পথে কোথাও থামল না, থামল একেবারে ময়না নদীর ধারে গিয়ে। এই নদীটির ধারেই শতফুটির গ্রাম।

নদীর জলে নেমে বেশ ক'রে সে হাত পা ধুয়ে ফেললে। তারপরে সারা দেহে নানা জায়গায় তিলক কেটে গ্রামের মধ্যে ঢুকল। তখন চণ্ডীমণ্ডপে সার্ব্বভৌম মশায়ের লাঞ্ছনা নিয়ে চাষাদের মধ্যে খুব হাসাহাসি চলছিল। তিলককাটা ব্রাহ্মণকে দেখে তারা বললে, কে যায়?

সে বুক ফুলিয়ে উত্তর দিলে, আমি সহস্রফুটি দাদাঠাকুর।

ওরে বাবা! ওদের দাদাঠাকুর শতফুটি, এ আবার সহস্রফুটি! সবাই একটু দমে গেল। পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি ক'রে বললে, কি চান?

সহস্রফুটি জোর গলায় বললে, তোমাদের এখানে শুনেছি একজন বড় পণ্ডিত আছে। আমি তার সঙ্গে তর্ক করতে চাই।

শুনেই চাষারা হো হো করে হেসে উঠল। বললে, সে বড় সহজ পণ্ডিত নয় ঠাকুর। তুমি পালাও। এখনই এক দিগ্‌গজ পণ্ডিত তার কাছে হেরে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী গেল। সহস্রফুটি সগর্ব্বে বললে, ডাক তোমাদের দাদাঠাকুরকে। তাকে না হারিয়ে আমি ফিরছি না।

অগত্যা চাষারা গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এল। শতফুটি হেলতে দুলতে এল। এসেই জিজ্ঞাসা করলে, বল দেখি ফুন ফুনাফুন?

সহস্রফুটি প্রশ্ন শোনা মাত্র হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শতফুটির গালে বিরাশী সিক্কা ওজনের প্রকাণ্ড এক চড় বসিয়ে দিলে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে, বেল্লিক! ফুন ফুনাফুন? আগে টুক টাক টুক, তারপর গুন গুনাগুন, তারপর ফুন ফুনাফুন।

প্রচণ্ড চড় খেয়ে শতফুটি তখন চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে বসে পড়েছে। তার আর কথা বলবার শক্তি নেই। সহস্রফুটি তার হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিতেই যন্ত্রণায় হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে। কারণ সহস্রফুটির গায়ে ভীষণ জোর, তার চেয়ে অনেক বেশী। না কেঁদে উপায় কি?

চাষারা সার্ব্বভৌমের বেলায়ও কিছু বোঝেনি। এখনও তর্কের কিছু বুঝল না। কিন্তু তাদের দাদাঠাকুরকে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়ে অঝোরে কাঁদতে দেখে তাদের বুঝতে বাকী রইলো না যে, এবারে শতফুটির হার হয়েছে।

সহস্রফুটি ঘুরে ফিরে সকলকে বুঝিয়ে দিতে লাগল:

—এসব তুলো-ধোনা শাস্তরের কথা। আগে তুলো-গুলো টুকটুক করে বেছে নিতে হয়। তারপর জোরে জোরে গুণ গুণ করে ধুনতে হয়। ধোনা হয়ে গেলে ফুনফুন করে হালকা ঘা দিতে হয়। বেল্লিকটা সেই কথা

আমাকে বোঝাতে এসেছে! ওরে বাবা! আমার কি আর শাস্ত্র পড়তে বাকি আছে?

শুনে চাষারা জয়ধ্বনি ক'রে উঠল, জয় সহস্রফুটি দাদাঠাকুরের জয়! সবাই তার পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিতে লাগল। আর শতফুটিকে ঢাক বাজিয়ে গ্রাম থেকে বার করে দিলে। সার্ব্বভৌমের কাছ থেকে যত জিনিস সে পেয়েছিল, সব তারা সহস্রফুটিকে দিয়ে দিলে। সহস্রফুটি কয়েকদিন সেখানে থেকে তারপর খুব ধুমধাম ক'রে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ী গেল।

দাদাকে গিয়ে সব কথা বলতেই তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আমারই ভুল হয়েছিল ভাই! পণ্ডিতের সঙ্গে পণ্ডিতের তর্ক হয়। মূর্খের সঙ্গে তর্কে পণ্ডিতরা পারবে কেন ওর সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়াই আমার অন্যায় হয়েছিল তা বেশ হয়েছে! ওরা যখন ধরেছে, তখন তুই ওদের গাঁয়েই দাদাঠাকুর হয়ে বসবাস কর বরং। কিন্তু দেখিস, যেন আমার মত নিরীহ কোন পণ্ডিত পেয়ে তাকে ঠকাসনে।

তারপর সহস্রফুটি দাদাকে প্রণাম করে মনের আনন্দে ওদের গ্রামে বাস করতে চলে গেল।

[পৌষ, ১৩৪৪] শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

তিন মূর্ত্তি

একটা ভারি মজার গল্প বলি শোনো।

নেই গ্রামের নাম শুনেছ? এ হ'লো সেই নেই-গ্রামের গল্প। মস্ত বড় গ্রাম। গ্রামে কত রকমের কত লোক। তাদের মধ্যে মাত্র তিনজনের কথা বলবো। তিনজনেই ভগবানের সৃষ্টি— অতি অদ্ভুত জীব।

একজন দিবারাত্রি শুধু চোখ পিট্ পিট্ করে, চোখের পাতায় তার কি যে হয়েছে কে জানে। এক মুহূর্ত্ত সে চোখ না কচ্‌লে থাকতে পারে না। হরদম দেখা যায়, হাত দিয়ে সে চোখ কচ্‌লাচ্ছে।

আর একজনের সর্ব্বাঙ্গে দাদ। কত রকমের কত ওষুধ যে ব্যবহার করেছে কিন্তু দাদ কিছুতেই সারেনি। চব্বিশ ঘণ্টা তাকে দাদ চুলকোতে হয়।

আর একজনের মাথা ভরা টাক্। মাথায় তার চুলের নাম গন্ধ নেই।

গ্রীষ্ম কালটাকে এদের ভারি ভয়। মাথার ওপর সূর্য্য ওঠে, রোদ্দুরে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে, টেকোর টাক যায় জ্বলে, ঘন-ঘন মাথায় জল দিতে হয়। এদিকে রোদ্দুর লাগলেই দেদোর দাদ পিট্ পিট্ করে, চুলকে চুলকে হয়রাণ হয়ে ওঠে। চোখের পাতার ব্যারাম যার, তার ত কথাই নাই। চোখে রোদ লাগতেই চোখ দুটো সে কচলাতে আরম্ভ করে, দেখে মনে হয় চোখ দুটো যেন সে উপড়ে ফেলতে পারলে বাঁচে।

কাজেই রোদ্দুরে তারা বড় একটা বেরোয় না।

অথচ মিথ্যা কথা বলতে তিনজনেই ওস্তাদ!

যে-লোকটার চোখ পিট্ পিট্ করে, তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—'হাঁ হে, চোখে তোমার কোনও ব্যারাম-ট্যারাম হয়েছে নাকি?' তৎক্ষণাৎ বলবে, 'কই না! ত' হয় নি। ও এমনি।'

সর্ব্বাঙ্গে যার দাদ, তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, 'ও কিছু না। কিছুদিন আগে একটুখানি চুলকানি হয়েছিল, কবে সেরে গেছে।'

গ্রামের একজন লোক একদিন জিজ্ঞাসা করলে, 'না চুল্‌কে তোমরা থাকতে পার?'

দেদো বললে, 'নিশ্চয় পারি।'

চোখে যার ব্যারাম সেও বললে, 'আমিও পারি।'

মাথায় যার টাক, তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'লো, সে বল্লে, টাক নেই কার বলুন ত? আজকাল অনেকেরই দেখবেন মাথার চুল উঠে যাচ্ছে। টাক থাকলে টাকা হয়।'

লোকটা বললে, 'তা বলিনি। দুপুরের রোদ্দুরে তোমার কষ্ট হয় কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

টেকো অম্লান বদনে বলে বসলো, 'কষ্ট কেন হবে? কোনও কষ্ট হয় না।' তাদের এই মিথ্যা কথা শুনে লোকটার ভারি রাগ হ'লো। বললে, 'দাঁড়াও তোমাদের একদিন পরীক্ষা করবো।'

চোখ, দাদ আর টাক—তিনজনেই বলে' উঠলো,—'শুধু শুধু পরীক্ষা করলে ত' চলবে না দাদা, বাজি রাখো। আমরা প্রমাণ করে' দেবো—রোদ্দুরে আমাদের কোনও কষ্ট হয় না।'

'আচ্ছা রাখলুম বাজি।' বলে সে একটা ভারি মজার ফন্দী করলে। বৈশাখ মাস। দুপুরের রোদ্দুর একেবারে আগুন বললেই হয়।

বললে, 'আয় তোরা তিনজনেই আয় আমার সঙ্গে। মিছে কথা বলা তোদের বের করছি।'

এই ব'লে গ্রামের পাশে যে নদীটা ছিল সেইখানে তাদের নিয়ে যাওয়া হ'লো। বললে, 'ঘণ্টাখানেক ধরে' নৌকায় চড়ে আমরা এই নদীর ওপর ঘুরে বেড়াব। তোমরা তিন জনে যদি চুপ ক'রে বসে থাকতে পার ত' তোমাদের আমি পুরস্কার দেবো পাঁচ টাকা।'

মাথার উপর তখন রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। তিনজনেই একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে, চোখ পিট্ পিট্ যে করতো সে একবার জিজ্ঞেস্ করলে 'গল্প করতে পাব ত?'

'হ্যাঁ, তা পাবে।'

'বাস্, তবে আর-কি, চলে এসো! পাঁচটা টাকা বলে কথা।' এই বলে আগেই সে নৌকায় চড়ে বসলো। তার দেখাদেখি শ্রীদুর্গা বলে' দেদোও উঠলো, টেকোও উঠলো। লোকটা নৌকো দিলে ছেড়ে।

খানিক্ যেতে না যেতেই খালি গায়ে রোদের তাত্ লেগে দেদোর দাদ উঠলো চিড়্ বিড়্ করে। চোখ যে চুলকোয় তার তখন হয়ে এসেছে। আর টাকের ত' কথাই নেই। প্রতি মুহূর্ত্তেই তার মনে হতে লাগলো—মাথার খুলিটা বু'ঝি ফেটে গেল!

সর্ব্বনাশ! সবাই ভাবছে, মিথ্যে কথাটা না বললেই হ'তো। কাজ নেই বাবা পাঁচ টাকায়। তার চেয়ে একবার চুলকে নিলে বাঁচি।

টেকো একদৃষ্টে নদীর জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো—দেবে নাকি ঝাঁপিয়ে? মাথাটা তবু ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, গল্পে যখন বাধা নেই, যে-লোকটার চোখ চুলকানো রোগ, সে তখন গল্প আরম্ভ করলে। খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে সময়টা তবু কাটবে ভাল।

সে বলতে লাগলো: 'ছাখ্ ভাই, আমার মামার একটা ভেড়া ছিল বুঝলি! ওরে বাবা, সে কী ভেড়া! তার শিং দুটো কিরকম ছিল জানিস? এই—এমনি!'

বলেই সে তার দুটো হাত দিয়ে দেখাতে লাগলো: 'এই মাথার ওপর থেকে বেরিয়ে, চোখ বরাবর ঘুরে' এমনি করে' পাক্ দিয়ে দিয়ে, এমনি করে' পাক্ দিয়ে দিয়ে, এমনি করে' পাক্ দিয়ে দিয়ে, এমনি করে' পাক্ দিয়ে দিয়ে—ঘুরে' ঘুরে' এই এমনি! বুঝলি?'

পাক দেওয়া দেওয়া ভেড়ার শিং দেখাতে গিয়ে—নিলে ব্যাটা চোখদুটো আচ্ছা করে' কচ্‌লে!

দেদো তখন অস্থির হ'য়ে উঠেছে। ব্যাটা ত' নিলে কাজটা কোন রকমে সেরে'। এখন আমি করি কি!

দেদো ত' কিছুতেই থাকতে না পেরে ব'লে উঠলো: 'আরে রেখে দে তোর মামার ভেড়া! আমার দাদা ছিল বুঝলি? সে যখন এম্‌নি করে' তাল ঠুকে' সারা গায়ে এম্‌নি করে'—বুঝলি? এমনি করে মাটি মেখে, এম্‌নি করে' রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে মাটি মেখে বুক ফুলিয়ে গিয়ে দাঁড়াতো তখন কার বাবার সাধ্যি তার কাছে এগোয়! বুঝলি?'

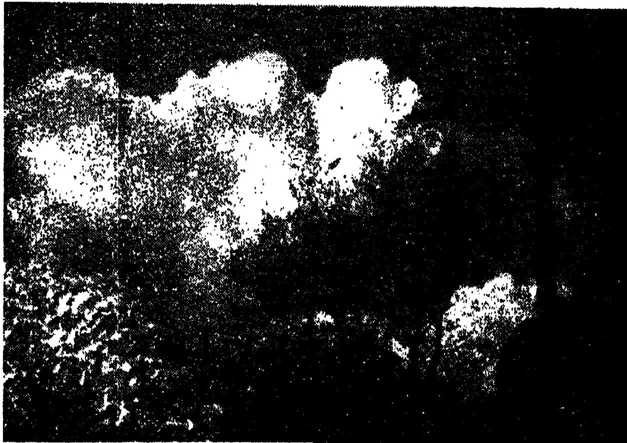
টেকো একধারে চুপটি ক'রে বসে ছিল। বল্‌লে, 'বুঝলুম!' কিন্তু হে ভগবান! মাথা যে গেল! এখন তার কি উপায় হবে?

সে তখন কি আর করে, বল্‌লে, 'ছাখ ভাই আমার মামাও নাই, আমার দাদাও নাই—'

বলেই সে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে নদী থেকে অঞ্জলি ভরে' জল নিয়ে তার টেকো মাথায় দিয়ে বল্‌লে, 'এই তোর মামার চরণে পেন্নাম।' আর এক অঞ্জলি নিয়ে বল্‌লে, 'এই তোর দাদার চরণেও পেন্নাম!'

বাজি রেখে যে নৌকো চালাচ্ছিল এদের কাণ্ড দেখে সে ত' অবাক!

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪] শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়



মেঘ

লালু

ছেলেবেলায় আমার এক বন্ধু ছিল তার নাম লালু। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে—অর্থাৎ, সে এত কাল পূর্ব্বে যে তোমরা ঠিক মতো ধারণা করতে পারবে না—আমরা একটি ছোট বাঙ্‌লা ইস্কুলের এক ক্লাসে পড়তাম। আমাদের বয়স তখন দশ এগারো। মানুষকে ভয় দেখাবার, জব্দ করবার কত কৌশলই যে তার মাথায় ছিল তার ঠিকানা নেই। ওর মাকে রবারের সাপ দেখিয়ে একবার এমন বিপদে ফেলেছিল যে, তিনি পা মচ্‌কে প্রায় সাত আট দিন খুঁড়িয়ে চলতেন। তিনি রাগ করে বললেন—ওর একজন মাষ্টার ঠিক করে দিতে। সন্ধ্যে বেলায় এসে পড়াতে বসবেন, ও আর উপদ্রব করবার সময় পাবে না।

শুনে লালুর বাবা বললেন, না। তাঁর নিজের কখনো মাষ্টার ছিল না, নিজের চেষ্টায় অনেক দুঃখ সয়ে লেখা-পড়া করে এখন তিনি একজন বড় উকিল। ইচ্ছে ছিল, ছেলেও যেন তেমনি করেই বিদ্যা লাভ করে। কিন্তু সর্ত্ত হ'লো এই যে, যে-বার লালু ক্লাসের পরীক্ষায় প্রথম না হতে পারবে তখন থেকে থাকবে ওর বাড়ীতে পড়ানোর টিউটার। সে-যাত্রা লালু পরিত্রাণ পেলে, কিন্তু মনে মনে রইলো ও মা'র পরে চটে। কারণ, উনি তার ঘাড়ে মাষ্টার চাপানোর চেষ্টায় ছিলেন। সে জানতো বাড়ীতে মাষ্টার ডেকে আনা আর পুলিশ ডেকে আনা সমান।

লালুর বাপ ধনী গৃহস্থ। বছর কয়েক হলো পুরাণো বাড়ী ভেঙ্গে তেতালা বাড়ী করেছেন, সেই অবধি লালুর মায়ের আশা গুরুদেবকে এ বাড়ীতে এনে তাঁর পায়ের ধূলো নেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ, ফরিদপুর থেকে এতদূরে আসতে রাজী হন না, কিন্তু এইবার সেই সুযোগ ঘটেছে। স্মৃতিরত্ন সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কাশী এসেছেন, সেখান থেকে লিখে পাঠিয়েছেন—ফেরবার পথে নন্দরাণীকে আশীর্ব্বাদ করে যাবেন। লালুর মা'র আনন্দ ধরে না—উদ্‌যোগ আয়োজনে ব্যস্ত—এতদিনে মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, গুরুদেবের পায়ের ধূলো পড়বে। বাড়ীটা পবিত্র হয়ে যাবে।

নীচের বড় ঘরটা থেকে আসবাব পত্র সরানো হলো, নতুন ফিতের খাট, নতুন শয্যা তৈরী হয়ে এলো,—গুরুদেব শোবেন। এই ঘরেরই এক কোণে তাঁর পূজো আহ্নিকের যায়গা হলো, কারণ তেতালার ঠাকুর-ঘরে উঠতে নামতে তাঁর কষ্ট হবে।

দিন কয়েক পরে গুরুদেব এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কি দুর্য্যোগ! আকাশ ছেয়ে কালো মেঘের ঘটা, যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি—তার আর বিরাম নেই।

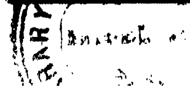
এদিকে মিষ্টান্নাদি তৈরী করতে, ফল মূল সাজাতে লালুর মা নিশ্বাস নেবার সময় পান না। তারই মধ্যে স্বহস্তে ঝেড়ে ঝুড়ে মশারি গুঁজে দিয়ে বিছানা করে গেলেন। নানা কথাবার্ত্তায় রাত হয়ে গেল, পথশ্রমে ক্লান্ত

গুরুদেব আহারাদি সেরে শয্যা গ্রহণ করলেন। চাব
বাকর ছুটি পেলে। সুকোমল শয্যার পারিপাট্যে প্রা
গুরুদেব মনে মনে নন্দরাণীকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

কিন্তু গভীর রাতে অকস্মাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল
ছাদ চুইয়ে মশারি ফুঁড়ে তার সুপরিপুষ্ট পেটের উপর জ
পড়ছে।—উঃ কি ঠাণ্ডা সে জল! শশব্যস্তে বিছান
বাইরে এসে পেটটা মুছে ফেললেন, বললেন, নতুন বা
করলে নন্দরাণী কিন্তু পশ্চিমের কড়া রোদে ছাতটা এ
মধ্যেই ফেটেছে দেখ্‌চি। ফিতের খাট, ভারী নয়, মশা
শুদ্ধ সেটা ঘরের আর এক ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে আব
শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আধ মিনিটের বেশি নয়, চোখ দু
সবে বুঁজেছেন, অমনি দু-চার ফোঁটা তেমনি ঠাণ্ডা জ
টপ টপ্‌ টপ্‌ টপ্‌ করে পেটের ঠিক সেই স্থানটির উপরে
ঝরে পড়লো। স্মৃতিরত্ন আবার উঠলেন, আবার খ
টেনে, অন্য ধারে নিয়ে গেলেন, বললেন, ইঃ—ছাত
দেখচি এ-কোণ থেকে ও কোণ পর্য্যন্ত ফেটে গেছে
আবার শুলেন, আবার পেটের উপর জল ঝরে পড়ল
আবার উঠে পেটের জল মুছে খাটটা টেনে নি
আর এক ধারে গেলেন কিন্তু শোবা মাত্রই তেমনি জলে
ফোঁটা। আবার টেনে নিয়ে আর এক ধারে গেলেন কি
সেখানেও তেম্‌নি। এবার দেখলেন বিছানাটাও ভিজেছে
শোবার যো নেই। স্মৃতিরত্ন বিপদে পড়লেন। বুড়ো
মানুষ, অজানা জায়গায় দোর খুলে বাইরে যেতেও ভয় ক
আবার থাকাও বিপজ্জনক। কি জানি ফাটা ছাত ভে
হঠাৎ মাথায় যদি পড়ে। ভয়ে ভয়ে দোর খুলে বারান্দা
এলেন, সেখানে লণ্ঠন একটা জ্বলচে বটে কিন্তু কে
কোথাও নেই,—ঘোর অন্ধকার।

যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝোড়ো হাওয়া! দাঁড়াবার
কি! কোথায় চাকর বাকর, কোন্‌ ঘরে শোয় তারা-
কিছুই জানেন না তিনি। চেঁচিয়ে ডাকলেন, কিন্তু কার
সাড়া মিললো না। একধারে একটা বেঞ্চি ছিল, লাল
বাবার গরীব মক্কেল যারা, তারাই এসে বসে। গুরুদে
অগত্যা তাতেই বসলেন। আত্ম-মর্য্যাদার যথেষ্ট লাঘ
হলো অন্তরে অনুভব করলেন, কিন্তু উপায় কি! উত্তরে
বাতাসে বৃষ্টির ছাঁটের আমেজ রয়েছে—শীতে গা শির্‌ শি
করে—কোঁচার খুঁটটি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, পা দুটি যথ
সম্ভব উপরে তুলে যথা সম্ভব আরাম পাবার আয়োজন ক
নিলেন। নানাবিধ শ্রান্তি ও দুর্বিপাকে দেহ অবশ, ম
তিক্ত, ঘুমে চোখের পাতা ভারাতুর, অনভ্যস্ত গুরু ভোজ
ও রাত্রি জাগরণে দু-একটা অম্ল উদ্গারের আভাস দিলে-
উদ্বেগের অবধি রইল না। হঠাৎ এমনি সময় অভাবনী
নতুন উপদ্রব। পশ্চিমের বড় বড় মশা দুই কানের পা
এসে গান জুড়ে দিলে। চোখের পাতা প্রথমে সাড়া দিে

শরতের প্রভাতে





নবাগত

চায় না, কিন্তু মন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল—কি জানি এরা সংখ্যায় কত। মাত্র মিনিট দুই—অনিশ্চিত নিশ্চিত হলো; গুরুদেব বুঝলেন সংখ্যায় এরা অগণিত। সে বাহিনীকে উপেক্ষা করে বিশ্বে এমন বীরপুরুষ কেউ নেই। যেমন তার জ্বলুনি তেমনি তার চুলকুনি। স্মৃতিরত্ন দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন কিন্তু তারা সঙ্গ নিলে। ঘরের মধ্যে জলের জন্য যেমন, ঘরের বাইরে মশার জন্য তেমন। হাত-পায়ের নিরন্তর আক্ষেপে, গামছার সঘন সঞ্চালনে কিছুতেই তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায় না। স্মৃতিরত্ন এপাশ থেকে ওপাশে ছুটে বেড়াতে লাগলেন, শীতের মধ্যেও তাঁর গায়ে ঘাম দিলে। ইচ্ছে হলো ডাক ছেড়ে চেঁচান্ কিন্তু নিতান্ত বালকোচিত হবে ভেবে বিরত রইলেন। কল্পনায় দেখলেন নন্দরাণী সুকোমল শয্যায় মশারির মধ্যে আরামে নিদ্রিত, বাড়ীর যে যেখানে আছে পরম নিশ্চিন্তে সুপ্ত—সুধু তাঁর ছুটোছুটিরই বিরাম নেই। কোথাকার ঘড়িতে চারটে বাজলো, বললেন, কাম্‌ড়া ব্যাটারা, যত পারিস কাম্‌ড়া,—আমি আর পারিনে। বলেই বারান্দার একটা কোণে পিঠের দিকটা যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন। বল্‌লেন, সকাল পর্য্যন্ত যদি প্রাণটা থাকে ত এ দুর্ভাগা দেশে আর না। যে গাড়ী প্রথমে পাবো সেই গাড়ীতেই দেশে পালাবো। কেন যে এখানে আসতে মন চাইত না তার হেতু বোঝা গেল। দেখতে দেখতে সর্ব্বসন্তাপহর নিদ্রায় তাঁর সারা রাত্রির সকল দুঃখ মুছে দিলে,—স্মৃতিরত্ন অচেতন-প্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

এ দিকে নন্দরাণী ভোর না হতেই উঠেছেন,—গুরুদেবের পরিচর্য্যায় লাগতে হবে। রাত্রে গুরুদেব জলযোগ মাত্র করেছেন—যদিচ তা গুরুতর—তবু মনের মধ্যে ক্ষোভ ছিল, খাওয়া তেমন ভালো হয় নাই। আজ দিনের বেলা নানা উপচারে তা ভরিয়ে তুলতে হবে।

নীচে নেমে এলেন, দেখেন দোর খোলা। গুরুদেব তাঁর আগে উঠেছেন ভেবে একটু লজ্জা বোধ হলো। ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখেন তিনি নেই, কিন্তু এ কি ব্যাপার! দক্ষিণ দিকের খাট উত্তর দিকে, তাঁর ক্যাম্বিশের ব্যাগটা জানলা ছেড়ে মাঝখানে নেমেছে, কোশাকুশি, আসন প্রভৃতি পূজা আহ্নিকের জিনিসপত্রগুলো সব এলোমেলো স্থান ভ্রষ্ট,—কারণ কিছুই বুঝলেন না। বাইরে এসে চাকরদের ডাকলেন, তারা কেউ তখনও ওঠেনি। তবে একলা গুরুদেব গেলেন কোথায়? হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো—ওটা কি? এক কোণে আলো অন্ধকারে মানুষের মতো কি একটা বসে না! সাহসে ভর ক'রে একটু কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখেন তাঁর গুরুদেব। অব্যক্ত আশঙ্কায় চেঁচিয়ে উঠলেন,—ঠাকুর মশাই! ঠাকুর মশাই!

ঘুম ভেঙ্গে স্মৃতিরত্ন চোখ মেলে চাইলেন, তারপরে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসলেন। নন্দরাণী ভয়ে, ভাবনায়, লজ্জায় কেঁদে ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর মশাই, আপনি এখানে কেন?

স্মৃতিরত্ন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সারারাত দুঃখের আর পার ছিলনা যে মা।

কেন বাবা?

নতুন বাড়ী করেছ বটে মা, কিন্তু ছাত কোথাও আর আস্ত নেই। সারারাতের বৃষ্টি বাদল বাইরে ত পড়েনি, পড়েছে আমার গায়ের উপর। খাট টেনে যেখানে নিয়ে যাই সেখানেই পড়ে জল। পাছে ছাত ভেঙ্গে মাথায় পড়ে, পালিয়ে এলাম বাইরে, কিন্তু তাতেই কি রক্ষে আছে মা, পঙ্গপালের মতো ডাঁশ-মশা ঝাঁকে ঝাঁকে সমস্ত রাত্রি যেন ছুবলে খেয়েছে,—এধার থেকে ছুটে ওধার যাই, আবার ওধার থেকে ছুটে এধারে আসি। গায়ের অর্দ্ধেক রক্ত বোধ করি আর নেই মা।

বহু প্রয়াস বহু সাধ্য-সাধনায় ঘরে আনা বৃদ্ধ গুরুদেবের অবস্থা দেখে নন্দরাণীর দু চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠলো, বল্‌লেন, কিন্তু বাবা, বাড়ীটা যে তেতালা, আপনার ঘরের উপর আরও যে দুটো ঘর আছে, বৃষ্টির জল তিন-তিনটে ছাত ফুঁড়ে নামবে কি করে? কিন্তু বলতে বলতেই তাঁর সহসা মনে হলো এ হয় তো ঐ সয়তান লালুর কোন রকম সয়তানি বুদ্ধি। ছুটে গিয়ে বিছানা হাত্‌ড়ে দেখেন মাঝখানের চাদর অনেকখানি ভিজে এবং মশারি বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিয়ে দেখতে পেলেন ন্যাকড়ায় বাঁধা এক চাঙড় বরফ, সবটা গলেনি, তখনও এক টুকরো বাকি আছে। পাগলের মতো ছুটে বাইরে গিয়ে চাকরদের যাকে সুমুখে পেলেন চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন,—হারামজাদা লেলো কোথায়? কাজকর্ম্ম চুলোয় যাক্‌গে, বজ্জাতটাকে যেখানে পাবি মারতে মারতে ধরে আন।

লালুর বাবা সেই মাত্র নীচে নামছিলেন, স্ত্রীর কাণ্ড দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন,—কি কাণ্ড করচো? হলো কি?

নন্দরাণী কেঁদে ফেলে বললেন, হয় তোমার ঐ লেলোকে বাড়ী থেকে তাড়াও, না হয় আজই আমি গঙ্গায় ডুবে এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করবো।

কি করলে সে?

বিনা দোষে গুরুদেবের দশা কি করেছে চোখে দেখোসে। তখন সবাই গেলেন ঘরে। নন্দরাণী সব বললেন, সব দেখালেন। স্বামীকে বললেন, এ দস্যি ছেলেকে নিয়ে ঘর করবো কি ক'রে তুমি বলো?

গুরুদেব ব্যাপারটা সমস্ত বুঝলেন। নিজের নির্বুদ্ধিতায় বৃদ্ধ হাঃ হাঃ করে হেসে ফেললেন।

লালুর বাবা আর একদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চাকররা এসে বললে, লালুবাবু কোঠি মে নহি হ্যায়। আর একজন এসে জানালে সে মাসিমার বাড়ীতে বসে খাবার খাচ্চে মাসিমা তাকে আসতে দিলেন না।

মাসিমা মানে নন্দর ছোট বোন। তার স্বামীও উকিল, সে অন্য পাড়ায় থাকে।

এর পরে লালু দিন পনেরো আর এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় পা দিলে না।

[চৈত্র, ১৩৪৪] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নকুড়বাবুর অনিদ্রা-দূর !

নকুড়ের মত ঘুমোবার ওস্তাদ্ দুটি ছিল না। ওর ন্যায় একনিষ্ঠ 'ঘুমিয়ে' ভূ-ভারতে বিরল। ওরকম মুহূর্মুহু আর অত প্রগাঢ় নিদ্রা বড় একটা দেখা যায় না। যে কোনো সময়ে, যে কোনো অবস্থায়, এমন কি যে কোনো দুরবস্থায় ওকে একেবারে ঘুমোতে বলো না! অবশ্য, না বল্‌লেও চলে,—বলবারও অপেক্ষা রাখে না সে।—মোষের মত ঘুম দিতে বাহাদুর আমাদের এই নকুড়! চাই কি, মোষকেও হারিয়ে দ্যায় মোশাই!

ঘুমোনোর বিষয়ে কোনো খুঁৎখুঁতেপনা ওর কোনো দিন দেখি নি। যে কোন জায়গায়—স্থানে অস্থানে—কেবল একটু শুতে পেলেই হোলো। ইঁটের বালিশ হলে তো কথাই নেই, বেঞ্চির হাতলে মাথা দিয়ে ওর তো সুখশয্যা,—ষ্টীলট্রাঙ্ক মাথায় ওকে অকাতরে ঘুমোতে দেখেছি। বল্‌ব কি, চলন্ত বাসে গাদাগাদি যাত্রী, দাঁড়াবার জায়গা নেই, এমন কি ভীড়ের চাপে পাটাতনে পা রাখবার ঠাঁই হয় না—ঠেকানো দূরে থাক্, পা ছোঁয়ানোর যো নেই পর্য্যন্ত—সেই ঠাসাঠাসির ভেতরে স্রেফ্ আকাশে দাঁড়িয়ে সে বেশ আরামে ঘুমিয়ে চলেছে, এমনও দেখা গেছে।

এমন যে আমাদের নকুড়বাবু, শুন্‌লে তোমরা অবাক্ হবে, তারও কি না একদিন,—দিনেও যার নিদ্রার সীমা ছিল না—এক রাত্রে অনিদ্রা দেখা গেল। সারা রাত ওর দুচোখের পাতা এক হোলো না—এমন কি শেষ অবধি সে বিস্ফারিত নেত্রে মোরগের ডাক শুন্‌তে পেলে। মোরগের ডাক আর ভোরের কা-কা-ধ্বনি! উৎকর্ণ হয়েই শুন্‌লে, তার জীবনে এই প্রথম। তার চোখের সাম্‌নেই, জানালার ফাঁক্ দিয়ে, কালো আকাশকে ক্রমশঃ ফিকে হয়ে—ফাঁকা হয়ে—সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যেতে দেখ্‌লে। আস্তে আস্তে সবই তার চোখে পড়ল। আর মুহ্যমান্ হয়ে পড়ল আমাদের নকুড়। এই বিরাট বিশ্বে এমন দৃশ্যও যে তার জীবনে অপেক্ষা করছিল তা সে কোনো দিন ভাবতে পারেনি।

এই ব্যাপারে যারপরনাই বিস্মিত হোলো নকুড়ের—বিস্ময়ের চেয়েও বেশী হোলো অসোয়াস্তি। এরকম তো হয় না! এরকমটা তো কদাচ হয়নি!—কেমন অদ্ভুত একটা অনুভূতি নিয়ে নকুড় ছট্‌ফট্ করতে লাগল।

সেদিন সকালেই নকুড় আমাদের আড্ডায় এসে তার এই বিস্ময়কর—বিস্ময়কর আর বিরক্তিজনক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিল। চোখে ঘুম না এলে প্রতিটি পল প্রত্যেক দণ্ড কি রকম এক এক যুগ বলে মনে হয়—এ রাত যেন কাটবে না বলে মনে হতে থাকে—তার বিস্তারিত কাহিনী চোখ বড় বড় করে' শোনালো সে। ভোরের মোরগ কি রকম ক'রে ডাকে—কাকের ভোরাই ঐক্যতানই বা কি ধরণের হয়—সমস্ত বিবরণ শুন্‌তে হোলো আমাদের। একে একে সব কিছু সে শুনিয়ে ছাড়ল—কাকস্য পরিবেদনা! শুন্‌লে মনে হয়, ধরিত্রীতে সে-ই যেন প্রথম এই তথ্য আবিষ্কার করেছে। আদ্যোপান্ত জানিয়ে অবশেষে সে জানাল, নিশ্চয়ই ভাগ্য বিরূপ, গ্রহরা সবাই তার বিপক্ষে গেছেন, তার জীবনের অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চিতরূপে দারুণ এক বিপর্য্যয় আস্‌ছে—সেই অবধারিত আসন্নতার কথা ব্যক্ত করে' সে আমাদের সকলের সহানুভূতি আকাঙ্ক্ষা করল।

"এরকমটা কক্ষণো হয়নি এর আগে।" মুখ ভার করে বল্ল নকুড়: "কিছু এর মানে বুঝ্‌চি নে!"

আমাদের তরফ থেকে উপদেশ প্রদানের কোনো কার্পণ্য হোলো না; অনিদ্রাব্যাধি বিদূরিত করার প্রত্যেকেই আমরা এক একটা উপায় বাৎলে দিলুম। কেউ যাচ্ঞা করলে তো কথাই নেই, অযাচিত ভাবে পরামর্শ-দানের সুযোগ থাকলেও, পেছপা হওয়া মানুষের স্বভাব নয়। সবগুলো ব্যবস্থাপত্র মন দিয়ে শুনে নিয়ে গম্ভীর ভাবে নকুড় মাথা নাড়ল। তার ধারণায় তার ব্যারাম এতদূর এগিয়েছে যে এসবে আর শানাবে কি না সন্দেহ। এ রোগ আরোগ্যের বাইরেই এখন—তাকে সারানো না, দূরীভূত করা নয়—আদপে তাকে আস্‌তে না দেয়াই হচ্চে এর উপযুক্ত দাওয়াই। প্রতিষেধক হিসেবে যদি কিছু থাকে তাই এখন নকুড়ের দরকার। জীবনের বাকী কটা দিন (এবং রাতও ধর্ত্তব্যের মধ্যে) বিনিদ্র দশাতেই তাকে কাটাতে হবে—এর মধ্যেই এই বিশ্বাস তার বদ্ধমূল হয়েছে। চিরনিদ্রার এধারে, বাদবাকী রাত (এবং দিনও ইনক্লুডেড্) না ঘুমিয়েই তাকে অতিবাহিত করতে হবে এই অদৃষ্ট-লিপিতে আস্থা পোষণ করে' ফোঁস্ ফোঁস্ করছে নকুড়।

নকুড় বল্‌ছে: "কী আশ্চর্য্য বলবো ভাই, মোরগের

ডাক শুনতে পেলুম। কোকর কোঁ—কোকর কোঁ—! এখনও যেন কানের কাছে শুনতে পাচ্ছি!—" বল্‌ছে আর শিউরে উঠছে নকুড়। বারম্বার।

অগত্যা আমাকেই ও-রোগের চিকিৎসায় এগুতে হোলো।—বিজ্ঞাপনের পেটেণ্ট্ আর টোট্‌কা ওষুধের ব্যবস্থায় আমার খ্যাতি ছিল—আগেকার যশ অম্লান রাখতে —পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার খাতিরেই নিজের ফর্দ্দ নিয়ে অগ্রসর হতে হোলো আমায়। আমি অবশ্যি ওকে একটা বিলিতি পেটেণ্টই বাৎলে দিলাম—বিনিদ্রা রোগের যেটি চিরাচরিত দাওয়াই—ভ্যাড়া গোণার দস্তর। ঘুম না এলে, ভ্যাড়াদের এক দুই করে' গুণ্‌তে হবে, আর কিছু না! ভ্যাড়ারা একটা বেড়া টপ্‌কে আস্‌ছে—একে একে তাদের গুণে যাও—দেখ্‌বে ন'—দশ গুণ্‌তে না গুণ্‌তেই তুমি বেহুঁস্ হয়ে পড়েছ। উক্ত অব্যর্থ আর একমাত্র মহৌষধের এক মাত্রা ওকে দিয়ে দিলাম।

আমাদের পাঁচ জনের পঞ্চাশ রকমের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনের মধ্যে, আমারটাই নকুড়ের মনঃপুত হয়েচে ব'লে মনে হোলো। আমার ব্যবস্থাটাই আজ রাত্রে বাজিয়ে দেখ্‌বে বল্ল নকুড়।

"তোমার অষুধটায় খরচ কম।" এই কথা বল্ল নকুড়।

"টোট্‌কা ওষুধের মজাই তো ওই!" আমি জবাব দিলুম: "চট্ করে' লেগে যায়, অথচ খর্চা নেই! স্বচ্ছন্দে তুমি পরীক্ষা কোরো, ফলেন পরিচিয়তে।"

"তাছাড়া, ভ্যাড়াদের আমি ভালবাসি। খুব গুণ্‌তে পারব। বিস্তর খেয়েছি কি না!"

এই বলে' সকৃতজ্ঞ চক্ষে আমার দিকে তাকিয়ে থাক্‌ল নকুড়।

তার বাঞ্ছিত দৃষ্টিলাভ করে' আমি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলুম। এখন থেকে আর এখান থেকেই সে গণনা সুরু করবে এতটা আমার হুকুম তামিলের প্রত্যাশা আদৌ ছিল না। আমি ওর কৃতজ্ঞতার বোঝাটা হাল্‌কা করবার মানসে জানালুম: "গুণে দেখো না রাত্রে! রাত্রেই গুণে দেখো—এর গুণ দেখ্‌তে পাবে।"

বুক ফুলিয়ে বল্ল নকুড়: "ভ্যাখো, গর্ব্ব আমি করতে চাইনে; চালমারা আমার অভ্যেস নয়। মুখে মুখে বড় বড় যোগ কষতে পারি এমন ওস্তাদিও আমি করব না। কিন্তু এও তোমাদের বলে দিচ্ছি, আমার গণনার ভেতর থেকে একটা ভ্যাড়াও যে কোনো ফাঁক দিয়ে ফস্‌কে বেরিয়ে যাবে সেটি হতে দেব না! আমার সেন্সাস্ এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে একজনও যদি যেতে পারে তাহলে জান্‌ব যে—সে বাহাদুর! তা সে ভ্যাড়াই হোক্, মেষই হোক্, আর দুম্বাই হোক্!···"

সারাদিন আমাদের আড্ডায় কাটিয়ে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যার মুখে নকুড় বিদায় নিল। ঘুমে তার চোখ বুঁজে আস্‌ছে, এম্‌নি তার অবস্থা তখন, শুতে পার্‌লেই বাঁচে।

"বাড়ী যাই। তোমার সেই ভ্যাড়া গোণা রয়েছে আবার।" দু চোখ ভারী, গা দুল্‌ছে, টল্‌তে টল্‌তে বলে' গেল নকুড়।

বাড়ী গিয়ে বিছানা পাক্‌ড়ে, বালিশ আশ্রয় করতে না করতেই তার সারা দেহ ঘুমে আর ক্লান্তিতে ঝিম্ ঝিম্ করে' এলো। আধ-ঘুমন্ত অবস্থায়, কালকের ঘুম না হবার কারণ সে ভাব্‌তে চেষ্টা কর্‌ল। এখন তার মনে হোলো, গত রাত্রের গুরু-ভোজন—বেশ রাত্তির করে' বেশি রকম খাওয়াই ওর জন্যে দায়ী। বিশেষ করে' গুরুতর চর্ব্বি-ওয়ালা সেই মাটন চপ্ কটা! আর মাটনের কথা মনে আসতেই—তার পূর্ব্বপুরুষ—ভ্যাড়ার কথা তার মনে পড়ে গেল।

"ঐ যাঃ! ভ্যাড়াদের গুন্‌তে হবে না?" আপন মনে বলে' উঠ্‌ল নকুড়: "গোণবার কাজ শেষ না করেই ঘুমোতে যাচ্ছি—বেশত!"

পরের সকালে নকুড়কে দেখে আগের নকুড় বলে কিছুতেই চেনা যায় না। কতোদিনের রুগী বলে' মনে হয়! সারা রাত্রে কাল মুহূর্ত্তের জন্যেও চোখের পাতা বুজ্‌তে পারেনি নকুড়। নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় যেই না সেই মেষ-গণনার কথা তার মনে উদয় হয়েছে তার পর থেকে তার চোখের ঘুম কোথায় যে পালালো তার পাত্তা নেই। তবে পঁয়তাল্লিশ হাজারের ওপর ভ্যাড়া গুণে সে সমাধা করেছে—এই টুকুই তার সান্ত্বনা! সেই পঁয়তাল্লিশ হাজারের মধ্যে একটা আবার যে বেয়াড়া! সেটা কিছুতেই বেড়ার ওপর দিয়ে উপ্‌চে আস্‌তে রাজি হয়নি। বেড়ার তলায় কোথায় একটা ফাঁক ছিল তাই দিয়ে গুটি সুটি মেরে কোনো গতিকে এসেছে। তার যথারীতি না আসার কথাটা এখনো নকুড় ভুলতে পারেনি। সেই অসৌজন্যের কথা স্মরণ করতেই নকুড়ের হাই উঠ্‌ছে।

"এরকম কাণ্ড কখনো দেখিনি!" আমাদের আড্ডায় এসে পাংশু মুখে নকুড় প্রকাশ করল: "যেই না মনে কর্‌ছি এইবার খতম্, গোণাগাঁথা সব ফিনিশ্ হোলো, ঘুমোবো এবার—ও মা। আবার দেখি কোথ্ থেকে আরেক পাল ভ্যাড়া লাফাতে লাফাতে আস্‌তে সুরু করে' দিয়েছে এবং—"

এবং আর কি? সেই লম্ফমানদের সেন্‌সাস্ না নিয়ে কন্‌সেন্‌সাস্ আমাদের নকুড় কী করে? এইভাবে দলের পর দল—নব নব দলবলে আগুয়ান্‌দের তালিকাভুক্ত করতেই বেচারার গোটা রাত কাবার হয়ে গেল!

"কী বল্‌বো ভাই, এতখানি পরিশ্রম করলুম!" নকুড় আপ্‌সোস্ করে: "কিন্তু পরিশ্রমের পুরস্কার-স্বরূপ একটু-খনি যে বিশ্রাম করব তার ফুরসৎ পেলুম না!"

"কিস্‌সু ভেব না।" আড্ডার সবাই ওকে উৎসাহ দিয়ে বল্ল: "সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি গুণতে থাকো। ঘুমোবার পক্ষে ওর চেয়ে মোক্ষম ওষুধ আর নেই। চকরবরবুতি বাৎলালে কি হয়, আমরা সবাই ওই দাওয়াইয়ের কথা জান্‌তুম্। ঘুম না এলে আমরাও তো

তাই করি হে! সকলেই করে, সবাই জানে। তুমি কেবল গুণে যাও, দেখ্‌তে পাবে খুব শীগ্‌গিরই তুমি আঁতুড়ের শিশুর মতো অকাতরে ঘুম দিচ্ছ।"

"কালকেই দিতুম্।" হাই তুলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌লে নকুড়: "যদি না ওই সব বদ্‌ বিচ্ছিরি ভ্যাড়ার পাল না গুণ্‌তে হোতো আমায়। তার মধ্যে একজন আবার এমন বেয়াড়া যে তার ভদ্রতা বলে' কোনো জ্ঞান নেই। ভ্যাড়া হয়ে জন্মেছিস্, ভ্যাড়ার মতো থাক্—সবাই যা করছে তাই ফলো কর্! সবাই লাফাচ্ছে তুইও লাফা! তা না,—কোথায় বেড়ার তলায় সামান্ত একটু ফাঁক্ রয়েছে, কখন থেকে পড়ে আছে—বোঁজাবার কথা মনেও ছিল না,—সত্যি কথা বল্‌তে কি, আগে ওটা চোখেই পড়েনি আমার—আর সে ব্যাটা করেছে কি, সেই গর্ত্ত গলে' হামাগুড়ি দিয়ে—ছি ছি ছি! সেই মেষ-শাবকের কাণ্ডতেই আরো বেশি আমাকে কাহিল করে দিয়েছে।"

তোমরা বিশ্বাস করবে কি না জানিনে, ওই ভ্যাড়ারাই নকুড়কে সারা সপ্তাহ ধরে' বিব্রত করে' রাখ্‌ল। নকুড় চোখ বুঁজ্‌তে গেলেই তারা এসে হাজির হয়। দলে দলে, পালে পালে, কাতারে কাতারে। চোখ বুঁজেও রেহাই নেই—চেষ্টা না করতেই সেই মেষপাল তার বুজন্ত অনিমেষ দৃষ্টির সাম্‌নে অত্যন্ত স্পষ্টাকারে বারে বারে দেখা দেয়।

এক সপ্তাহের মধ্যেই নকুড় আধখানা হয়ে গেল। নকুড়কে দেখলে নকুড় না মনে হয়ে নকুড়ের ছায়া বলেই মনে হয়। নাদুস্ নুদুস্ নিদ্রায় ঢল-ঢল আমায়িক নকুড়ের একি প্রেতমূর্ত্তি? নকুড় বলে, বল্‌ব কি ভায়া। পৃথিবীর যত ভ্যাড়া ছিল সব আমি গুণে সারা করেছি! এ বিষয়ে তার অনড় বিশ্বাস। তবে তারা এখনো ফুরোচ্ছে না কেন? তার কারণ তার এই মনে হয় ভ্যাড়ারা নকুড়ের সঙ্গে ছলনা করতে আরম্ভ করেছে। নিশ্চয় তারা অন্য ধার দিয়ে ঘুরে ফিরে আরার তার সাম্‌নে এসে হাজিরা দিচ্ছে। এর তলায় কোনো সাম্প্রদায়িক সমস্যা নেই তো?—নইলে এই ভাবে সেন্সাসে গোলমাল বাধিয়ে তলে তলে সংখ্যা বাড়ানোর এই 'অপচেষ্টা' কেন? নকুড় আমাকে জিজ্ঞেস করে—আমাকেই জিজ্ঞেস করে। ওদের মৎলব আমার কাছে জানতে চায়।

আমি এর কী জবাব দেব? সাতদিন যে ঘুমোতে পায়নি তার মাথা কি ভাবে নিজেকে ঘামায় আমার জানা নেই। ঘুমোনোর ব্যাপারে, অতটা না হলেও, প্রায় নকুড়ের সগোত্রই আমি। তবে সুখের বিষয় আমাকে কদাপি ভ্যাড়া গুণ্‌তে হয় না। ঘুম না এলে আমি প্রিয়জনদের কথা ভাবি—তাদের গণনা করার চেষ্টা পাই—আর তাতেই আমার ঘুম এসে যায়—চক্ষের পলকেই বল্‌তে গেলে।

নকুড় নিজেই তার প্রশ্নের সমাধান করে দিল। পৃথিবী গোলাকার বলেই সম্ভব হচ্ছে নাতো? বার বার পৃথিবী পরিক্রম করে' এই পরাক্রমী ভ্রমণকারীর দল ঘুরে ঘুরে আবার দেখা দিচ্ছে। পার্থিব গোলত্ব, পৃথিবীর যাবতীয় গোলমালের মত—এই গণ্ডগোলের মূলে নেই তো?

"নিশ্চয় তারা ঘুরে ঘুরে আসছে! আলবৎ।" নকুড় সুদৃঢ় কণ্ঠে আমায় বল্ল: "একথা আদালতে গিয়ে আমি হলপ্ করে' বল্‌তে পারি। একটা কানকাটা দুম্বাকে আমি সাতবার গুণেছি। এক হাজার দুম্বার মধ্যে দেখ্‌লে তাকে চেনা যায়। কক্ষনো আমার ভুল হতে পারে না।"

আমিই ওকে দাওয়াই দিয়েছিলাম—আমাকেই বাধ্য হয়ে প্রেস্‌ক্রপ্‌সন্ পাল্‌টাতে হয়: "দিন কতো ওষুধ এখন বন্ধ থাক্। তুমি আপাতক্ দুম্বা গোণা ছেড়ে দাও।" কাতর কণ্ঠে আমি বলি।

"ছাড়ব তার যো কি!" বিষণ্ণ ভাবে নকুড় ঘাড় নাড়ে: "না গুণে আমার নিস্তার আছে? এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ওরা কি স্বস্তি দিচ্ছে আমায়?"

এইবার একেবারে উপসংহারে আসা যাক্। যদিও লম্বা গল্পকে খাটো করে' বলা আমার অভ্যাস নয়, স্বভাব-বিরুদ্ধই আমার, তবু এক্ষেত্রে তার অন্যথা করে' এইখানেই এর দাঁড়ি টান্‌ব।...দিন কয়েক আগে নকুড়ের সাথে দেখা হয়েছিল। দেখে নকুড়ের ছায়ার চেয়ে নকুড় বলেই বেশি সন্দেহ হোলো। শুষ্ক বিবর্ণ গালে ফের রক্তমাংস দেখা দিয়েছে। প্রেত মূর্ত্তির বদলে তার অভিপ্রেত মূর্ত্তি ফিরে এসেছে আবার, দেখে খুশিই হলাম। ঘুমোনোর পুরনো ক্ষমতা আবার সে লাভ করেছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। কি করে' কর্‌ল, আমি জানতে চাইলাম।

"আশ্চর্য্য একটা উপায় বের করেছি ভাই!" লম্বা একখানা হাসি হেসে জানাল নকুড়: এক হপ্তা আগেই কেন যে এটা বের করতে পারিনি তাই ভেবেই আমি অবাক্ হচ্ছি। গালে চড় মারতে ইচ্ছে করছে আমার।" এই বলে' দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বহস্তে নিজেকে পুনঃ পুনঃ চর্চ্চড়িত করে নকুড় বল্ল: "আর যাই হই, আমি যে একজন চালাক্ লোক এটাতো তুমি মানবে-?"

"নিশ্চয়! অঙ্কে যে তুমি সোমেশ বোস্ একথা তো মানতেই হয়।" আমি মুক্ত কণ্ঠে সায় দিই: "আর যোগ-বলে ত্রৈলঙ্গ স্বামী!" ওর চাতুর্য্যের প্রশংসাপত্র না দিয়ে পারা যায় না।

"ঠিক বলেচ। ঐ যোগবলে!—যোগবলেই আমি অদ্বিতীয়। মাত্তর কাল রাত্তিরে এই যোগ-সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি ভায়া! মাথার তলে বালিশ দিয়ে চোখ বুঁজেছি কি বুঁজিনি এমন সময়ে সেই বিচ্ছিরি বেড়াটা আমার চোখের ওপর ভেসে উঠ্‌ল—আর তার পর মুহূর্ত্তেই সেই ভ্যাড়ার দল! লক্ষ লক্ষ ভ্যাড়া! এক আধটা না!—সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তাড়া করে' তারা ছুটে আসছে দেখতে পেলাম। সকলের চক্ষে সেই এক ক্ষুধিত দৃষ্টি—সেন্‌সাসের তালিকায় ভর্ত্তি হবার সকরুণ আবেদন! দলে দলে পালে পালে—রেজিমেণ্ট আফ্‌টার রেজিমেণ্ট—

ীরবেগে অগ্রসর হচ্ছে। দেখেই তো আমার চক্ষুস্থির! চার মধ্যে সেই কান কাটাটাও রয়েছে আবার,—হামাগুড়ি দেয়াটাকেও দেখতে পাওয়া গেল। এই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে? তক্ষুনি আমি করলাম কি, আমার কুকুরটাকে তাদের পাহারায় দাঁড় করিয়ে দিলাম। আর সেই ফাঁকে বেড়ার তলাকার ফাঁকটা বন্ধ করে' ফেল্লাম—সেই বাচ্চা মেষটি না তার তলা ঘেঁষে ফের আমাকে কলা দেখায়! এদিকে সেই কানকাটা দুষ্টাটার ওপরেও নজর রেখেছি—ব্যাটা ভারী হুঁসিয়ার, কেবল ঘুরে ঘুরে আসে, পাছে সে কোনো পাশ দিয়ে কেটে পড়ে—তীব্র লক্ষ্য রেখেছি তার ওপর। তারপর এদিকে কি করলাম শোনো—!"

আমি দারুণ আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয়ে তার এই রোমাঞ্চকর বার্ত্তা শুনি।

সুচতুর নকুড় ব্যক্ত করে' যায়: "এদিকে করলাম কি, বেড়ার দু'ধারে দুটো গেট্ না করে দিয়ে তার সামনে শেয়ালদা আর হাওড়ার মতো বড়ো বড়ো দুটো ইষ্টিশন্ খাড়া করে' ফেল্লাম। সব চট্‌পট্। তারপর ভ্যাড়াদের সার বেঁধে দিয়ে—সারবন্দী করে'—সেই দুই পথে একে একে ছাড়বার ব্যবস্থা করলাম। আর ইষ্টিশনে ঢুকলেই টিকিট কেনো—তা তুমি যেখানেই যাওনা কেন—ভাগলপুর কি মধুপুর—আর না গেলেও প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম টিকিট তো তোমায় কিনতেই হবে। টিকিট কেনবার কড়াক্কড়ি নিয়ম করে' দিয়ে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে' দিলাম। দিয়ে ভেড়াদের পথ মুক্ত করে' নিশ্চিন্ত মনে আমি ঘুমোতে গেলাম। তারপর—"

দম নিতে একটুখানি থামল নকুড়: "তারপর আর কি? সকালে উঠেই আমার ইষ্টিশনের কর্ম্মচারীদের জিজ্ঞেস করে' সর্ব্বসমেত কতগুলো টিকিট বিক্রি হয়েছে, জেনে নিয়েছি। কতো জান্‌তে চাও? কাল এক রাত্তিরেই পাঁচ লাখ ভ্যাড়া পার হয়েছে। নিখুঁৎ সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ লাখ সাত হাজার চার শো পঁচাত্তর।"

নকুড়ের অপূর্ব্ব কাহিনী শুনে বিস্ময়ে আমি হতবাক্।

"একটু মাথা ঘামালেই, বুঝলে কিনা, যাবতীয় সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। এমন কি, তোমার ওই অনিদ্রা-ব্যামোরও। দেখলে তো, ভ্যাড়া গোণা আর ঘুম আনার কেমন খুব সহজ উপায় বার করে' ফেলেচি। আমি যে খুব চালাক্, এটা তোমাকেই মানতেই হবে।" নকুড়ের মুখে হাসি আর ধরে না।

[বৈশাখ, ১৩৪৯] শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

গানের গুঁতো

গান আমাকে শিখতেই হবে। তানসেন না হ'তে পারি গানসেন ত হবই। সেই নেশায় মশগুল হ'য়ে হারমোনিয়াম্ নিয়ে রাতদিন সারগম সাধি। পাড়ার লোকেরা গাল দেয়—ছেলেরা পিছনে ঢিল ছোঁড়ে—বাড়ীওয়ালা নোটিশ দিয়েছে—তবু গলা সেধে চলেছি। বড় যার লক্ষ্য তার পক্ষে ছোটখাট বাধাকে উপেক্ষা করতেই হবে।

ভোরে উঠে গলা সাধা উচিত। তাই রাত থাকতে উঠি। তারপর হারমোনিয়ামটার দু'কান পাকড়ে বাক্সের মধ্যে থেকে হিঁচড়ে টেনে এনে তার ঘুম ছুটিয়ে দিই—তারপর তার গলা টিপে সুর বার করি—

সা রে গা মা রে ——

বেচারা যেন নাকী সুরে কাঁদে "আরে মামারে"—আর আমি বিজয়ী বীরের মত গলা খুলে গিট্‌কিরী ঝাড়ি।

মাঝে মাঝে দু'একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী আমাকে দমিয়ে দেবার জন্যই আসে বোধ হয়। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি সব গজ্ গজ্ করে—আমি ভ্রূক্ষেপও করি না। ভীষণ শব্দে হারমোনিয়াম্ বাজিয়ে যাই—সা রে গা রে গা মা গা মা পা—সে শব্দ-ঝটিকায় জগতের সমস্ত শব্দ কোথায় উড়ে যায়। তার কথা শোনাও যায় না।

এমনি করে শীতের সকালটা বেশ মজাসে কালোয়াতি অভ্যাস করি।

তারপর এক কাপ চা ও কোকিলের ডিমের মামলেট খাই। আমাদের দরোয়ান হতভম্ব সিং রোজ দুটো করে কোকিলের ডিম সংগ্রহ করে দেয়। কোকিলের ডিম খেলে গলার সুর কোকিলের ডাকের মত মিষ্টি হয়—এ কথা আমি যার কাছ থেকে শুনেছি তার পিস্‌তুতো ভাইয়ের খুড়তুতো মামা মস্ত গায়ক ছিলেন।

সময় আমি মোটে নষ্ট করি না। যখন চান করবার জন্য তেলের বাটী নিয়ে বসি তখন তাল দিয়ে তেল মাখি। এক ঢিলে তেল মাখা ও তাল দেওয়া দুইই হয়। মাঝে মাঝে উৎসাহের মাথায় একটা দুটো মাছিও তাল চাপা পড়ে মরে। তেল মাখি আর তাল দিই—

ধা ধা ধিন্ তা—কৎ তেটে ধিন্ তা
(কিবা চিন্‌তা—যায় কেটে দিন্‌টা)

এক ঝাঁক কাক খোলার চালে এসে বসে যায়। ভাইপো বাবলু বেচারাদের ওপর তার 'এয়ার গানের' তাক্ পরীক্ষা করতে যায়। আমি বারণ করি—আহা বসুক, বসুক—গান শুনতে এসেছে বৈত না! বেচারা! মিষ্টি সুর ত' শোনেনি কখনো। তারা অবাক্ হ'য়ে শোনে। তাদের গলা দিয়ে সুর বেরোয় না। বেরোবে কি করে?

এমন মিঠে সুরের কাছে কিনা কাকের হেঁড়ে গলা—ভাবতেও মন শিউরে ওঠে।

চানটান করে ফের হারমোনিয়াম্। আধ ঘণ্টাটাক সুরের কসরৎ করে যখন অসুরের মত ক্ষিদেতে নাড়ি চুঁই চুঁই করে তখন খেতে বসি।

খেয়ে দেয়ে ফের গলা সাধা। দুপুরের নিস্তব্ধ পাড়ায় আমার গলার সুর যেন অপূর্ব্ব ছন্দে ধ্বনিত হয়। টিকেন্দ্রজিৎবাবুর দিবানিদ্রা ছুটে যায়। তিনি তাঁর নাতি পটলাকে বলেন, "দিয়ে আয় ত ওর হারমোনিয়ামে আগুন লাগিয়ে।"

বাড়ীতে কে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে—"এ বাড়ীতে তানসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ইনসেন (Insane) কালোয়াত থাকে।" লোকগুলো কি হিংসুক দেখেছ? তানসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হবি ত' তোরা হ'না বাপু! আমি কি তোদের গলা টিপে চুপ করিয়ে রেখেছি—না হারমোনিয়মের দোকানে যাওয়া বন্ধ করবার জন্য পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি।

বাড়ীর সামনে কে নোটিশ ঝুলিয়ে রেখেছে—"Danger ahead—সামনে বিপদ।"

কিন্তু এসব বাধা আমি তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করি। জগতে যারা বড় হয়েছে সকলকেই কত বাধা বিপত্তি উত্তীর্ণ হ'তে হ'য়েছে। বড় হবার রাস্তা কণ্টকাকীর্ণ। গান শেখার রাস্তাও তেমনি নোটিশাকীর্ণ। কিন্তু পেছুলে চলবে না—

"গেয়ে চল্ গেয়ে চল্ ভাই
বোবা হ'য়ে পিছে
পড়ে থাকা মিছে
গেয়ে গেয়ে নেচে চল ভাই।"

সত্যি কথা বলতে কি আমার গানের সুর কিন্তু ক্রমশঃ যেন হেঁড়ে থেকে হেঁড়েতর হচ্ছে। এর যে একটা বিহিত করা দরকার।

একজন বন্ধু বল্লে—"দুপুর রাতে মিছরির জল খাবি—ঠিক আধ সের পরিমাণ—বরফ দিলে আরো ভাল।" তাই করলাম। ভীষণ সর্দ্দিতে গলা বুঁজে এল। সাতদিন গলা দিয়ে টুঁ শব্দ বার হ'ল না। আট দিনের দিন বন্ধুর বাড়ী বয়ে গালাগালি দিয়ে মৌনব্রত ভঙ্গ করে এলাম। গলাটাও যেন কতক সুস্থ হ'ল। কিন্তু সেই কর্কশ মোটা সুর সরু হ'ল না। এর কারণ কি?

নিয়মিত কোকিলের ডিমের মামলেট খাই তবু গলা কাকের মত হ'ল কেন? তবে কি—ভাবতেই মুখ শুকিয়ে এল।

হতভম্ব সিংকে ডাক দিলাম। "জী হুজুর"—ব'লে সেলাম করে সে সামনে দাঁড়াল। তারপর জেরা করে জানা গেল যে হতভাগা এতদিন ধরে আমাকে কাকের ডিম খাইয়ে এসেছে।

হা ভগবান্! এতদিনে বুঝেছি খোলার চালে কাকের ভীড় কিসের জন্যে। আমার গলার সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য তারা গোড়া থেকেই টের পেয়েছিল। ওঃ এমনি করে গলার দফাটা শেষ করলুম—ইদানীং আবার চারটে ক'রে ডিম খেয়েছিলাম।

এখন আমার ডাক শুনলে কোলের ছেলে আঁৎকে ওঠে—ঘুমন্তলোকের ঘুম ছ্যাৎ করে ভেঙ্গে যায়—ফিস্ ফিস্ করলে মনে হয় ঝড় বইছে। মনের দুঃখে গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

হারমোনিয়াম্টা পড়ে রয়েছে। বন্ধুবান্ধব কেউ তাতে সুর তুলতে পারে না—"বলে এর আর কোন পদার্থ নেই।"

"হায় আজ শিবের মহাধনু পরিত্যক্ত গাণ্ডিবী ভিঃ কে তাহাতে জ্যা আরোপন করিবে?"

[মাঘ, ১৩৪১] শ্রীবিমল দত্ত





এ্যাটাচি কেস

একটা চাকরি পেয়ে সেবার প্রথম দিল্লী যাচ্ছি।

আজকাল যে-রকম ট্রেনে ভিড় যেন সে-রকম মোটেই হলো না। তা ছাড়া বার্থ রিজার্ভ করলে কলকাতা থেকে দিল্লি এই দীর্ঘ পথ বেশ আরামে শুয়ে-বসে যাবার ঠিক প্রতিশ্রুতি পাওয়া যেতো। তুফান মেলে একটি সেকেণ্ড ক্লাস কাম্‌রার বার্থ রিজার্ভ করে আমি এক রকম নিশ্চন্তই ছিলুম। তবু যখন ষ্টেশনে পৌঁছুলুম গাড়ি ছাড়্‌তে তখনো প্রায় ঘণ্টা খানেক দেরি। দেখলুম আমি যে সেকেণ্ড ক্লাস কাম্‌রায় বার্থ পেয়েছি সেটাতে অন্য কারুর নাম নেই। কামরাটাও ফাঁকা ছিলো। আমিই প্রথম যাত্রী সেই কাম্‌রায় ঢুক্‌লুম এবং ফাঁকা গাড়ি দেখে মনটাও বেশ ফাঁকা-ফাঁকা হাল্‌কা-হাল্‌কা লাগ্‌লো।

কুলিকে দিয়ে নীচের বার্থে আমার বিছানাটা ভালো করে পাড়ালুম, যে-সামান্য জিনিসপত্র ছিলো সেগুলো সাজিয়ে রাখালুম, তারপর তাকে একটা সিকি বক্‌শিস্ দিয়ে যখন বিদেয় করলুম তখনো গাড়ি ছাড়্‌তে চল্লিশ মিনিট বাকী আছে। কর্‌বার আর কিছু না থাকায় জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্লাটফর্মে কোনো পরিচিত লোক আছে কিনা দেখতে লাগলুম এবং সে-রকম কাউকেই দেখতে না পেয়ে এক চা-ওলাকে ডেকে এক ভাঁড় চা খেলুম এবং পকেট থেকে একটা পেঙ্গুইন সিরিজের ডিটেকটিভ বই বার করে সিগারেট ধরিয়ে পেছনে ঠেস দিয়ে পড়তে বসলুম।

খুব গোলমালের মধ্যেও আমি যে-বই মন দিয়ে পড়তে পারি তা হচ্ছে এই ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। বিশেষ করে সেদিন যে-বইটি পড়েছিলুম সেটি লিখেছিলেন আমার অত্যন্ত প্রিয় এক বিলেতের একজন বিখ্যাত লেখক। প্রথম তিন পাতার মধ্যেই উপন্যাস জমাবার কায়দা তিনি জানেন এবং সে-কপাতা পড়বার পর কাছিমের কামড়ের মতো তাঁর বই পেয়ে বসে, ছাড়া যায় না। আমার মনের মধ্যে যে-সব বিচ্ছিন্ন ভাবনা ছিলো, প্রথম কয়েক পাতা পড়বার পর একে একে কোথায় যেন তারা অদৃশ্য হোলো আর আমি যে জগতে এসে পৌঁছুলুম সেখানে শুধু মৃত এক কোটিপতি, যার মৃত্যু নিশ্চিত কোনো জটিল হত্যা রহস্যে আবৃত ; তাকে হত্যা করতে পরে তার এক নিকট বন্ধু কিংবা স্ত্রী কিংবা মেয়ে কিংবা তার ভাবী জামাই। অথচ বর্ত্তমানে কাউকেই সন্দেহ করা যায় না। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে আমার প্রিয় ডিটেক্‌টিভ আবির্ভূত হয়েছে। মাঝে মাঝে সে পাইপে কড়া তামাক টানছে, আর ক্বচিৎ আপাতদৃষ্টিতে নিরর্থক মৃদু হাসছে কিংবা একটা পোড়া দেশলাই-এর কাঠি ও পাপোষের ওপরকার শুক্‌নো একটু কাদা সযত্নে সিল্কের রুমালে জড়িয়ে সবাইকার অলক্ষিতে বুক পকেটে রাখছে। জানি আমার প্রিয় ডিটেক্‌টিভের ভুল কখনো হয় না এবং শেষ পাতায় এই কাদা আর পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি দিয়েই নিশ্চিতভাবে তিনি অপরাধীকে ধরবেন এবং আশ্চর্য্য বিশ্লেষণ শক্তি দিয়ে অপরাধ প্রমান করবেন।

ইতিমধ্যে সময় অনেকটা এগিয়ে গেছে। কয়েকজনে আমার কামরাতেই যেন উঠলো। আবছা আবছা তাদের ছায়া আমি অনুভব করেছি। কিন্তু মুখ তুলে দেখবার প্রয়োজন বোধ করি নি। যখন মুখ তুললুম তখন দিল্লিযাত্রী এঞ্জিন ট্রেনে ধাক্কা দিয়েছে। চোখ তুলে দেখলুম প্ল্যাটফর্মের জনতা এখন চঞ্চল, ঘড়িতে ট্রেন ছাড়তে সাত মিনিট মাত্র বাকী এবং কালো পোষাক পরা গার্ড লাল-নীল ফ্ল্যাগ নিয়ে দ্রুতপায়ে এঞ্জিনের দিকে এগিয়ে চলেছে। তখন শীতকাল। গোধুলি শেষ হয়ে প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে।

আমার কামরার মধ্যে দেখি তিনজন ভদ্রলোক ইতিমধ্যে উঠেছেন। মাঝের ও ও-পাশের বেঞ্চিতে তাঁরা বসেছেন। একজন বিছানা পাতছিলেন, একজন খবরের কাগজ পড়ছিলেন, আর একজন দরজার রেলিঙ ধরে চা-ওয়ালাকে ডাকছিলেন। আমি আবার বইতে মন দিলুম এবং বই থেকে চোখ যখন তুললুম তখন গাড়ি দুলে উঠেছে, গার্ড বাঁশি বাজিয়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কালো স্যুট্‌পরা এক ভদ্রলোক দর্‌জার হাতল ঘুরিয়ে আমাদের কামরাতেই উঠলেন। সঙ্গে জিনিসপত্র কিছুই নেই। মনে হোলো কাছাকাছি কোথাও যাবেন।

ট্রেন প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে যাবার পর আবার আমি বইতে মন দিলুম। মিনিট পাঁচেকও পড়ি নি, হঠাৎ এক গম্ভীর গলার শব্দে চম্‌কে উঠলুম এবং বই থেকে চোখ নামিয়ে চাইলুম। দেখলুম সেই দীর্ঘকায় কালো স্যুটপরা ভদ্রলোকটি তখনো বসেন নি, কামরার দেয়ালে ঠেস দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের সবাইকার মুখের দিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন। আমাকে চাইতে দেখে আবার তিনি গম্ভীর গলায় বল্‌লেন, "দ্যাখো গোবর্দ্ধন, ওরফে শ্যামসুদ্দিন, আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না। আজ তুমি হাতে-হাতে ধরা পড়েছো। ছদ্মবেশ ছেড়ে বেরিয়ে এসো।"

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। অন্য তিনজন যাত্রীও আমারি মতো সমান অবাক হয়ে তাঁর দিকে চাইলো।

আমাদের কাউকে কোনো উত্তর দিতে না দেখে

ভদ্রলোক তাঁর মাথার ওপরকার হ্যাট্‌র্যাকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌লেন, "এই এ্যাটাচি কেসটা কার ?"

আমরা চারজনেই একসঙ্গে চেয়ে দেখলুম সেখানে একটি কালো রঙের ছোটো এ্যাটাচি কেস রয়েছে, তার ওপর শাদা অক্ষরে লেখা। সেটা আমার নয়। অন্য তিন জনের মুখ দেখে মনে হলো তাঁদেরও নয়।

এতোক্ষণ আমরা কেউ কোনো কথা বলি নি, সবাই অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলুম। ব্যাপারটা যে ঠিক কি কেউই বুঝতে পারি নি। কিন্তু এবার ওপাশের বেঞ্চিতে যে-ভদ্রলোক বিছানা পাতছিলেন তিনি কথা বললেন। ভদ্রলোককে ভালো করে এই প্রথম দেখলুম। বয়স চল্লিশের বেশী নয়। মারাঠীদের মতো কাপড় পরা, গায়ে কালো গরম পার্শী কোট, মাথায় কালো টুপি, চোখে রিমলেশ চশমা বেশ চালাক বলে মনে হয়। পরিষ্কার বাংলায় তিনি বললেন, "মশাই, আপনি কি বল্‌ছেন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় এই তিনজন ভদ্রলোকের অবস্থাও আমারই সমান। আপনি যা বল্‌ছেন স্পষ্ট করে বলুন।"

স্যুট্‌পরা ভদ্রলোক বললেন, "ভালো কথা। আমি যা বলছি তা তা আপনাদের চারজনের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। অবশ্য কে যে বুঝতে পেরেছেন এখনো আমি সে-কথা ভালো করে বুঝতে পারছি না।—যাই হোক, বাকী তিনজনের জন্যে আমি সব কথা বলছি।" এই বলে ভদ্রলোক এ্যাটাচি কেসটি ওপর থেকে নামিয়ে বললেন, "প্রথমে আবার জিগগেস্ করছি এটি কার ?"

আমরা চারজনে বললুম আমাদের কারুরই নয়। স্যুট-পরা ভদ্রলোক বল্‌লেন, "ভালো কথা। এটি যে আমারও নয় সে-কথা স্পষ্ট করে প্রমাণ করতে পারি। কিন্তু এটি তো আর কামরায় উড়ে আসতে পারে না। নিশ্চয়ই কেউ এনেছে। এখন কথা হচ্ছে কে এনেছে ?" বলেই আমাদের চার জনের মুখের দিকে ভদ্রলোক আবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন।

পার্শী কোটপরা ভদ্রলোকটি এবার বিরক্ত হয়ে বল-লেন, "মশাই, হেঁয়ালি রাখুন। এ্যাটাচি কেসটি কে এনেছে তা জানা যাচ্ছে না, সত্যি। কিন্তু তাতে কী এসে গেল ?"

স্যুটপরা ভদ্রলোক বললেন, "অনেক এসে গেল মশাই, পাঁচ শো টাকা এসে গেল! এই যে এ্যাটাচি কেস দেখছেন এতে লেখা রয়েছে I.B., অর্থাৎ India Bank. আজ দুপুর বারোটায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ওই টাকা আনিয়ে রেখেছিলেন, পঞ্চাশটা দশটাকার নোট। কিন্তু ঠিক সাড়ে বারোটার সময় কলিকাতার বিখ্যাত গুণ্ডা গোবর্দ্ধন ওরফে শ্যামসুদ্দিন সেই ব্যাঙ্কে একা এসে হঠাৎ রিভালভার দেখিয়ে এ্যাটাচি কেসটা নিয়ে পাড়ি দেয়। আমরা খবর পাই একটার সময়......"

মাঝের বেঞ্চিতে আধবুড়ো এক ভদ্রলোক তুলো: আলোয়ান মাথায় মুড়ি দিয়ে বসেছিলেন। তিনি বাধ দিয়ে বললেন, "আপনারা কারা ? অর্থাৎ আপনি কে ?

স্যুটপরা ভদ্রলোক বললেন, "নিশ্চয়ই সে-ক জিগগেস করতে পারেন। আমি একজন সরকারে: ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টের লোক। আমার না: রঘুনাথ দাস।"

"অর্থাৎ ডিটেক্‌টিভ ?"

"হাঁ, ডিটেক্‌টিভ।"

গুজরাটি ভদ্রলোক বললেন, "প্রমাণ ?"

"এই যে," বলে রঘুনাথ বুক পকেট থেকে একটা খা বার করে দিলেন। গুজরাটি ভদ্রলোক খাম থেকে কাগজ গুলো বার করে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, "হুঁ। কাগজ থেকে তাই প্রমাণ হচ্ছে।"

রঘুনাথ কাগজগুলো ফিরিয়ে নিয়ে খুশি হয়ে বল্‌লেন "আমার ওপর এই তদন্তের ভার এসে পড়ে। নান কারণে গোবর্দ্ধনকে আমি সন্দেহ করি। এবং তার পিছু নেই। সে-সব দীর্ঘ কাহিনী। কোর্টে পুরো গল্পট শুনতে পাবেন। গোবর্দ্ধনকে ফলো করে আমি ষ্টেশ পর্য্যন্ত আসি। লোকটা বেজায় চালাক—হ্যাঁ, তোমা সামনেই তোমাকে চালাক বল্‌ছি, গোবর্দ্ধন," বলে রঘুনাথ আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবাইকার মুখের দিবে চাইলেন। কিন্তু কারুর মুখেই বিস্ময় ছাড়া অন্য কোনে চমক দেখতে পাওয়া গেল না যাতে অপরাধী সনাক্ত হতে পারে। তাই রঘুনাথ আবার বলে চল্‌লেন, "গোবর্দ্ধ বুঝতে পেরেছিলো তাকে ফলো করা হচ্ছে। তাই ষ্টেশনে ঢুকেই আবার কোনদিক দিয়ে সে বেরিয়ে যায়। ছদ্মবেশ ধরতে লোকটা বেজায় পটু। চক্ষের নিমেষে তুমি নিজে চেহারা বদল করে ফেল্‌তে পারবে। কিন্তু এ-বারে তুমি একটা মুশকিলে পড়েছিলে গোবর্দ্ধন। এই এ্যাটাচি কেসটাই ধরিয়ে দিলো। এর চেহারা তুমি পালটাতে পারলে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তুমি আজকে গাড়িতেই দিল্লি পালাবে। এবং আমার ভরসা ছিলো তুমি এই এ্যাটাচি কেসটাকে তাড়াতাড়ি কোথাও সরাতে পারবে না। তুমি পালাবার পর আমি ট্রেণের প্রত্যেক কামরায় উঠে সবাইকার মালপত্রই পরীক্ষা করেই এসেছি শুধু এই কামরাটাই বাকী ছিলো। এটাতে উঠেই দেখলুম চোখের সামনে রয়েছে এই এ্যাটাচি কেসটা।—তাই তুমি ধরা পড়ে গেলে গোবর্দ্ধন।"

সেই বুড়ো ভদ্রলোকটির পাশে মাথায় লাল ফেজ পরা এক মুসলমান ভদ্রলোক বসেছিলেন। এতক্ষণ তিনি অবাক হয়ে এই সব কথাবার্ত্তা শুনছিলেন। এইবার তিনি প্রথম কথা বললেন, "মিঃ দাস, এই এ্যাটাচি কেসটাকে উপলক্ষ্য করে আপনি আমাদের চার জনের একজনকে আসামী বলে মনে করছেন। কিন্তু তার আগে কি উচিত নয় এটা খুলে পরীক্ষা করে দেখা যে এর মধ্যে

সত্যিই পঞ্চাশটা দশ টাকার নোট আছে কিনা? নোট যদি না থাকে তাহলে তো আপনার চার্জ প্রমাণ করবার কোনো উপায় নেই। ট্রেনে এ রকম কত জিনিস পাওয়া যায় যার মালিক খুঁজে পাওয়া যায় না।"

সত্যিই তো! এই সোজা কথাটা এতক্ষণ কেন আমাদের মাথায় আসেনি। রঘুনাথ একটু যেন বিচলিত হয়ে পড়লেন, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন "ঠিক কথা বলেছেন। গোবর্দ্ধন অতিশয় সয়তান। হয়তো সে নোটগুলো সরিয়েছে ইতিমধ্যে। দেখাই যাক কি আছে।"

আমরা চার জনে উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলুম। রঘুনাথ সবাইকার সামনে এ্যাটাচি-কেসটা খুলে ফেললেন। আর সবাই আমরা স্পষ্ট দেখলুম তার মধ্যে রয়েছে পাঁচ বাণ্ডিল দশ টাকার নোট। রঘুনাথ গুনে দেখলেন প্রত্যেক বাণ্ডিলেই দশটা করে নোট রয়েছে।

এবারে রঘুনাথের মুখ যে পরিমাণে উজ্জল হয়ে উঠলো আমাদের চারজনের মুখ সেই পরিমাণেই যেন নিভে গেল। এ্যাটাচিকেসটা ভালো করে বন্ধ করে তিনি বললেন, "দেখলে গোবর্দ্ধন। আমি জানি এখন টাকার তোমার ভীষণ দরকার। অনেকদিন পুলিশ তোমার পিছু নিয়েছে সে খবর তুমি জানো, তাই একটা বড় রকম দাঁও মেরে কলকাতা থেকে গা ঢাকা দেবার মৎলবে তুমি ছিলে। কিন্তু অল্পের জন্যে পারলে না।—আর লুকিয়ে থেকে লাভ নাই। অনর্থ তুমি ক'জনকে হায়রান করছো কেন? তোমার জন্যে আর তিনজন ভদ্রলোককেই আমার সঙ্গে বর্দ্ধমানে পুলিশ ষ্টেশনে যেতে হবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বাকীর তিন জনকে নির্ভুলভাবে সনাক্ত করা যায় ততক্ষণ আটক থাকতে হবে।

এই কথা শুনেই তো আমার চক্ষু চড়কগাছ! আমি প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললুম, "এ্যাব্সার্ড, মশাই! পরশুই দিল্লীতে আমার নতুন চাকরির জয়েনিং ডেট। কাল রাতের মধ্যে আমাকে পৌঁছুতে হবেই। লেটার অফ এ্যাপয়েন্টমেন্ট সঙ্গেই আছে। দেখাচ্ছি। তা' হলে তো ছেড়ে দেবেন?"

রঘুনাথ বললেন, "অসম্ভব। কোনো উপায় নেই মশায় আপনাকে ছেড়ে দেবার। গোবর্দ্ধন দারুণ জালিয়াত। সে যে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার জাল করতে পারবে না, তাই বা কে বলতে পারে?

গুজরাটি ভদ্রলোক এবারে বেশ উত্তেজিত হয়েই বললেন, "আমাকেও আপনার জুলুমে নামতে হবে নাকি, মশাই? জানেন কলকাতা বোম্বাই আর দিল্লীতে আমার কত বড় কারবার আছে। কোটি কোটি টাকা খাটচে। পরশু দিল্লীতে আমারও একটা জরুরি কন্‌ফারেন্স আছে। আমার নাম মিঃ মিরানি। জুটের বাজারে আমাকে চেনে না এমন লোক খুব কম আছে।"

মুসলমান ভদ্রলোকটি সসম্ভ্রমে বলে উঠলেন, "আপনিই মিঃ মিরানি! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!"

"দেখলেন তো।" সগর্ব্বে মিরানি বললেন, "এই দেখুন, এই কামরাতেই আমাকে চেনেন এমন এক ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।"

রঘুনাথ বললেন, "কিছুই প্রমাণ হোলো না মশাই! ক্ষমা করবেন, কিন্তু কে বলতে পারে আপনি গোবর্দ্ধন নন এবং ইনি আপনার সাকরেদ নন? চটবেন না। মিঃ মিরানি যে একজন বিজনেস্‌ম্যান সে খবর আমিও জানি। কিন্তু যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে আপনি আসল মিঃ মিরানি ততক্ষণ আপনাকে ছেড়ে দিতে পারবো না।"

মুসলমান ভদ্রলোকটি বললো, "কি বিপদেই পড়েছি মশাই। আমিও একজন বিজনেস্‌ম্যান। কলকাতার নানা জায়গায় আমার ছোটবড় মনোহারি দোকান আছে। তা ছাড়া মাল চালানও আমি করে থাকি। এই দেখুন আজ তার পেয়েছি কানপুর থেকে। আমার মেয়ের প্রায় শেষ অবস্থা। টাইফয়েডে ভুগছে। ডাক্তার এক রকম জবাব দিয়ে গিয়েছে। যদি কাল না পৌঁছুই তাহলে হয়তো শেষ দেখা দেখতে পাবো না।" শেষের দিকে ভদ্রলোকের গলা ভেঙে এলো। তিনি টেলিগ্রামটা পকেট থেকে বার করে রঘুনাথের হাতে দিলেন কিন্তু তিনি সেটা পড়েই ফেরৎ দিয়ে বললেন, "দেখুন মিঃ আহমেদ। আপনার জন্যে আমার সত্যিই খুব দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ না পুলিশের লোক আপনাকে আসল মিঃ আহমেদ বলে সনাক্ত করছে ততক্ষণ আপনাকে আটকে রাখতে আমি বাধ্য।"

আধবুড়ো ভদ্রলোকটি বললেন, "কার মুখ দেখে যে তীর্থ করতে বেরিয়েছিলুম তা বাবা বিশ্বনাথই জানেন! ভাবলুম একবার কাশী ঘুরে দশাশ্বমেধঘাটে একটা ডুব দিয়ে আসি। কোন দিন আছি কোন দিন নাই—তা গোড়াতেই এই বিপদ! কত পাপই যে করেছি কে জানে!" এই বলে তিনি বেঞ্চির এক কোনে ঠেস দিয়ে ঢুলতে লাগলেন।

মিরানি খানিক পরে বললেন, "ভালো কথা, এই কামরায় প্রথম কে ঢুকেছিলেন?"

সভয়ে আমি বললুম, "কেন বলুন তো? আমিই ঢুকেছিলুম।"

"আপনি কি ঐ এ্যাটাচি-কেসটা দেখেছিলেন?"

সত্যি কথা বলতে কি, আমি খুব খুঁটিয়ে দেখি নি, ঠিক মনেও পড়লো না দেখেছিলুম কিনা। বললুম, "ঠিক তো মনে পড়ছে না। তবে যতদূর সম্ভব মনে হচ্ছে কিছুই দেখি নি।"

রঘুনাথ একটু বাঁকা হেসে বললেন, "যতদূর সম্ভব?" তারপর তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। আহ্‌মেদ ও

মিরানি আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। আধবুড়ো ভদ্রলোকটীও ঢুলতে ঢুলতে একবার চোখ বড় করে আমার দিকে চেয়ে আবার ঢুলতে লাগলেন। আমারও ভীষণ অশান্তি হতে লাগল। কে জানতো একদিন লোকে আমাকে গোবর্দ্ধন বলে ভুল করবে। কোনো কথা ঠোঁটে জোগালো না। নতুন চাকরি আর নতুন দেশ দেখতে যাবার আনন্দ অনেকক্ষণ উবে গেছে। এবারে একটা অবর্ণনীয় অস্বস্তিতে ভেতরে ঘেমে উঠতে লাগলুম। পুলিসের অসাধ্য কিছু নেই। কে জানে বিচারে হয়তো আমাকেই আসল গোবর্দ্ধন বলে প্রমাণ করে ছাড়বে। অন্য উপায় না দেখে আমিও একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরের কালো হিম রাত্রির দিকে চেয়ে রইলুম।

তুফান মেল হাওড়া থেকে এক দৌড়ে বর্দ্ধমান গিয়ে থামে। প্রায় ঘণ্টা দুই লাগে। ঘড়ি দেখলুম বর্দ্ধমান পৌছুতে এখনো প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট বাকী। এমন সময় মিরানি হঠাৎ বললেন, "ঠিক হয়েছে, মিঃ দাস। কত টাকা জামিন দিতে পারলে আমাকে ছেড়ে দিতে পারেন? কাল আমাকে যেমন করেই হোক দিল্লী পৌছুতেই হবে।"

"জামিন?" রঘুনাথ খানিক ভেবে বললেন, "বেশ; জামিনে আপনাকে ছাড়তে রাজী আছি। কিন্তু এই এ্যাটাচি-কেসে যত টাকা আছে তত টাকা জামিন দিতে না পারলে আপনাকে বর্দ্ধমানে নামতেই হবে। পাঁচ শো টাকা জামিন। কিন্তু চেকে দিলে চলবে না। নগদ দিতে হবে।" তারপর একটু হেসে বললেন, "নগদ পাঁচশো দিতে পারবেন আশা করি!" (অর্থাৎ আপনার কাছে নিশ্চয়ই নগদ পাঁচ শো টাকা নেই, এবং আপনাকে নামতে হবে বর্দ্ধমানে।)

এইবার মিরানি হো হো করে হেসে উঠে বললেন, "মিঃ দাস! আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা খুব উঁচু বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু যাই হোক, আপনাকে এবারে কিন্তু হতাশ হতেই হবে।" এই বলে তিনি তাঁর পার্শি কোটের ভেতর থেকে একটা বড় মনিব্যাগ বার করে খুললেন। সবিস্ময়ে দেখলুম সেটার আকণ্ঠ নোটে ঠাসা।

মিরানি বললেন, "আমার কাছে উপস্থিত মাত্র বার শো টাকা ও কয়েকটা গিনি আছে। আপনি পাঁচ শো টাকার একটা রসিদ লিখে দিন। আপনাকে পঞ্চাশটা দশ টাকার নোট গুনে দিচ্ছি।" এই বলে আমাদের সামনে তিনি পঞ্চাশটা নোট গুনে রঘুনাথের হাতে দিলেন; রঘুনাথ খানিকটা লজ্জিত খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পকেট থেকে রসিদ বই বার করে ঘাড় হেঁট করে একটা রসিদ লিখে দিলেন। মিরানি রসিদটা ভালো করে পরীক্ষা করে মানিব্যাগে পুরে সবাইকার দিকে বিজয়ী ভঙ্গীতে চেয়ে বেশ প্রাণ খুলেই হাসলেন। রঘুনাথ দাসকে অপ্রস্তুত হতে দেখে মনে মনে বেশ খুসি হয়ে উঠলুম।

মিরানির নিশ্চয়ই রোখ চেপে গিয়েছিলো। খানিক পরে তিনি আমার ও আহমেদের দিকে চেয়ে বললেন, "দেখুন, এইভাবে একা পুলিশের হাত এড়িয়ে দিল্লী যেতে নিজেকে খুব স্বার্থপর বলে নিজের কাছে মনে হচ্ছে। আমার কাছে এখনো যে টাকা আছে তাতে আমি আপনাদের তিনজনের এক জনের জামিনের টাকা দিতে পারি। যাঁর টাকা আমি দেবো তিনি আমাকে একটা পাঁচ শো টাকার চেক লিখে দিলেই চলবে। আমি মশাই বিজনেস্‌ম্যান, আনন্দেই আপনাদের চেক্ নেবো। এইখানে আমার সঙ্গে পুলিসের কিছুটা তফাৎ আছে। কি বলেন মিঃ দাস?" মিঃ দাস অপমানিত বোধ করে জানলার বাইরে চেয়ে রইলেন, কথাটি বললেন না। মিরানি আবার বলে চল্লেন, "কিন্তু তার আগে আপনাদের সঙ্গে যে পরিচয়পত্র আছে সেগুলি ভালো করে পরীক্ষা করতে চাই এবং যার পরিচয় আমার কাছে বেশী কন্‌ভিনিসিং বলে মনে হবে তাঁর জামিনের টাকাই দেবো।

তাঁর কথা শুনে আমি ও আহমেদ খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম। কিন্তু আধবুড়ো তীর্থযাত্রীটি খুব উৎসাহ প্রকাশ না করে বল্লেন, "আমার কাছে তো নিজের পরিচয় দেবার কোন কাগজপত্র নেই। তা ছাড়া ব্যাঙ্কে আমার পাঁচশো টাকাই নেই তো পাঁচ শো টাকার চেক্! নাঃ মশাই, দেখছি বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছে বর্দ্ধমানে আমাকে এক রাত আটকে রাখেন। তাই-ই হবে।"

বুড়োর দিকে আমরা ক'জন এবার বেশ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতেই চাইলুম। কিন্তু তিনি বেশ নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁর আলোয়ানটা মুড়ে গুটিশুটি হয়ে ঢুলতে লাগলেন। আমি নিজের কয়েকটী পরিচয় পত্র এবং আপিসের চিঠি মিরানিকে দিলুম। আহমেদ দিলেন কানপুর থেকে আসা টেলিগ্রাম ও আরো কয়েকটী চিঠিপত্র। মিনিট পাঁচেক খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করে কাগজপত্রগুলি আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মিরানি বললেন, "মুস্কিলে পড়া গেল তো মশাই! আপনাদের দু'জনকেই আমার সমান সঠিক লোক বলে মনে হচ্ছে। আমার উচিত আপনাদের দু'জনেরই জামিনের টাকা দেয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এবারে বেশী টাকা সঙ্গে নেই। আপনাদের একজন কাউকে আমি টাকা দিতে পারি। কিন্তু কাকে দিই?" তারপর একটু থেমে তিনি বললেন, "এক কাজ করা যেতে পারে। আমি পকেট থেকে একটা টাকা বেঞ্চিতে রাখবো। মিঃ আহমেদ, আপনি বলুন হেড না টেল কি হবে। যদি ঠিক বলতে পারেন তা হলে টাকা আপনি পাবেন। নইলে এই ভদ্রলোককে দেবো।

আহমেদ একটু ভেবে বললেন, "টেল্।" মিরানি টাকা বের করে বেঞ্চিতে রাখলেন। দেখলুম হেড।

"সরি মিঃ আহমেদ", মিরানি বললেন, "আপনাকে দিতে পারলুম না।—মিঃ দাস, কষ্ট করে আর একটা পাঁচ শো টাকার রসিদ লিখে দিন।"

রঘুনাথ নিঃশব্দে আর একটি রসিদ লিখতে লাগলেন। চেক্ বই বার কোরে মিরানিকে আমি পাঁচশো টাকার একটি চেক্ লিখে দিলুম।

আহমেদ "সবই আল্লার ইচ্ছে" বলে ছল ছল চোখে জানলার বাইরে চেয়ে রইলেন। আর সেই আধবুড়া ভদ্রলোক ঢুলতে ঢুলতে আর একবার চোখ বড় বড় করে আমার দিকে চেয়ে আবার ঢুলতে লাগলেন। মিনিট দশেক পরে বর্দ্ধমান ষ্টেশন এলো। এ্যাটাচি-কেস হাতে এবং আহমেদ ও সেই আধবুড়া তীর্থযাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নেমে যাবার সময় রঘুনাথ বললেন, "আশা করি সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই আপনারা টাকাগুলো সরকারের কাছ থেকে ফেরৎ পাবেন।"

তাঁরা নেমে গেলে মিরানি গম্ভীর হয়ে বললেন, "যাই বলুন মশাই, আমার কিন্তু ওই বুড়োকে খুব সুবিধের মনে হোলো না।"

আমিও সায় দিয়ে বললুম, "আমারো কি রকম যেন লাগলো।"

দিন দশেক পরে নতুন দিল্লীর কফি হাউসে আমার এক কলকাতার বন্ধুর সঙ্গে দেখা।

খুসি হয়ে তার পাশে বসে বললুম, "কী ব্যাপার হে? কবে এলে?"

"কাল এসেছি, ভাই। একটা ইণ্টারভিউ দিতে আসতে হয়েছে। ঘোড়ার ডিমের চাকরি তো হয় না, কেবল ইণ্টারভিউই দিচ্ছি। পরের মুহূর্ত্তেই কি যেন মনে পড়ায় তার চোখমুখ জলজল করে উঠলো। বললো, "জানো, পরশু ট্রেনে সে এক দারুণ ইণ্টারেষ্টিং ব্যাপার! ···কল্‌কাতার বিখ্যাত জালিয়াৎ আর গুণ্ডা গোবর্দ্ধন ছদ্মবেশে আমার কামরায় উঠেছিলো। এক ডিটেক্‌টিভ তাকে ফলো করে আমাদের কামরায় ওঠে। আমাদের চারজনকেই সে সন্দেহ করে···"

অবাক হয়ে বললুম, "চারজন? মানে?"

"আমি, এক আধবুড়ো তীর্থযাত্রী, এক মুসলমান ভদ্রলোক ও মিঃ মিরানি। মিঃ মিরানিকে চেনো না, কল্‌কাতার বিখ্যাত বিজ্‌নেস্ ম্যাগ্‌নেট? ভাগ্যিস্ তিনি ছিলেন, তাই আমার জামিনের পাঁচ শো টাকা এ্যাডভান্স করলেন। নইলে সে পুলিসের পাল্লায় বর্দ্ধমানে আটকাই পড়ে গিয়েছিলুম।"

আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো, মাথা ঘুরতে লাগলো। নিশ্চয়ই মুখের রঙ্‌ও বদলে গিয়েছিলো। তাই বন্ধু আমার দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে বল্‌লো, "ওকি? কি হোলো তোমার?"

"নাঃ, বিশেষ কিছু নয়।" চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললুম, "বেয়ারাকে আরো দু' কাপ হট্‌-কফি দিতে বল। গল্পের শেষটা বল্‌ছি। শুনে খুব খুসি হবে না!"

[ফাল্গুন, ১৩৪৯] শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়



ভারতের কৃষি-সম্পদ—তুলা

বুনো

তিস্তার জল যেখানে রূপালী রেখার মত ব'য়ে গিয়েছে তারি গা ঘেঁষে পশ্চিমে ভুতখণ্ডের জঙ্গলে পাহাড়; খাড়া উঠে গেছে আকাশের দিকে। পুব-চরের গায়ে উপল-বন্ধুর সমতল ভূমি; সেখানে ছাড়াছাড়া কপি ও কমলার চাষ। কয়েক ঘর পাহাড়ী চাষী এখানে সংসার পেতেছে বহুদিন থেকে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বন্য মহিষের উৎপাতে তাদের চাষবাস কিছুতেই আর বাস বাঁধতে পাচ্ছে না। যেই কপির চারাগুলি পাতা ছাড়ল, একটির পর একটি নিরেট টাইট হয়ে গোলাকার সবুজে ক্ষেত ভরে উঠল, অমনি একদিন অতর্কিতে কোত্থেকে মারাত্মক এই বন্য মহিষের দল, পঙ্গপালের মত পড়ে, ক্ষেতকে ক্ষেত উজাড় করে দিল। বুকের রক্ত দিয়ে পাহাড়ে মাটির বুক চষে, ফসল ফলিয়ে, এই পরিণতি কার সহ্য হয়! কিছুদিন থেকে চাষীরাও মরিয়া হয়ে উঠেছে। কাঁটার বেড়া দিয়ে, জাল ঘিরে, ফাঁদ পেতে। আজকাল তারা এর প্রতিবিধানের নানান ব্যবস্থা করেছে বটে, কিন্তু বৃথাই—কিছুতেই তাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাচ্ছে না। বনের মধ্যে মাচান বেঁধে, তীর কাঁড় নিয়েও রাতের পর রাত জেগেছে তারা, কিন্তু সে সব রাতে তাদের দেখা মেলেনি; তারা এসেছে নিঃসাড়ে, সবার অলক্ষ্যে, এমন ফাঁক ফুঁক দিয়ে, যে দিকে তাদের বিপদের সম্ভাবনা কম—এসেছে গভীর অন্ধকার রাত্রে, কৃষ্ণ পক্ষে। অদ্ভুত শয়তান এই বন্য মহিষের দল।

এই পালের গোদা ছিল বুনো। কালো মিশমিশে রঙ, বর্শার ফলার মত ধারাল দুই মজবুত শিং, ধনুকের মত বেঁকে এসেছে সামনের দিকে। বয়স ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে মুখে এনে দিয়েছে এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য আর চোখের দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা। তার দিকে চাইলেই মনে হত যেন কোন দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে জয়ের গৌরবে এক বুক ফুলিয়ে। হ্যা, সেদিক থেকে দলপতি হবার উপযুক্তই বটে; কয়েকবার কি ফাঁকিটাই না দিল! দলকে দল নিয়ে সবার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে কেটে পড়ল বেমালুম। এমনি না হলে কি দলের সর্দ্দার!

আগেকার যুদ্ধের সেনাপতিদের মত বুনো থাকত সবার সামনে আর তার পিছনে থাকত বাকী সৈন্যবাহিনী। সবশুদ্ধ দলে ছিল তারা পঞ্চাশ ষাট জন। এই পঞ্চাশ ষাটটির মধ্যে বুনো কি করে যে দলপতি হয়ে উঠল তা বলা শক্ত। তবে বয়সে সে ছিল প্রবীন এবং তার প্রত্যুৎপন্নমতিও ছিল অনন্যসাধারণ। আজ দশ বারো বছরের মধ্যে বিপদে ধৈর্য্য হারাতে কেউ কোনদিন দেখেনি তাকে! এই সব গুণেই সবাই মিলে তাকে যে এই পদে স্থায়ী আসন দিয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়। বুনোও এতদিনের মধ্যে একদিনের জন্যেও নিজের সুবিধা খুঁজে দলকে ফাঁকি দেয়নি, ঘুণাক্ষরেও দলের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেনি। বিশ্বস্ত, ক্ষমতাশালী, মাননীয় দলপতি হিসাবেই এতদিন নিজের পদমর্য্যাদা বজায় রেখে সে এই দলকে পরিচালনা করেছে। দলের সঙ্গীদের প্রতি অসাধারণ আকর্ষণ ছাড়া এ ভাবে একনিষ্ঠ থাকা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব।

দিন এই ভাবেই কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু একদিন বুনো লক্ষ্য করল, দলের মধ্যে যেন বেশ কিছু পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। তার প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব আজকাল প্রায়ই প্রকাশ পাচ্ছে নানান ব্যাপারে। অনেকদিনের ঘাগি সে, তার চোখে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। কিন্তু দুঃখ এই যে, তারই অনুগত, তারই হাতে গড়া গাঁগারই কিনা এই কারসাজি! গাঁগা আজকাল তাকে এড়িয়ে চলে, কথায় কথায় তর্ক জুড়ে দেয়; তাকে ডাইনে যেতে বল্লে সে বাঁয়ে যায়। এ শুধু সে বলে নয়, অনেকেই তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে এখন; তারাও গাঁগার সঙ্গে সুর ভিড়িয়ে আগের মর্য্যাদা আর দিতে চায় না বুনোকে। এমনি একটা পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে বড় অপমানিত মনে হতে থাকে বুনোর। কিন্তু উপায় কি! তারই দলের সবাই যদি তাকে ছেড়ে যেতে চায়, পদচ্যুত করে, তাহলে কি করতে পারে সে! কিন্তু এমন কি তার অপরাধ, কেনই বা তাকে চায় না তারা, নিজেকে নিজে সে প্রশ্ন করে। কিন্তু কোন সদুত্তরই মেলে না নিজের কাছে। বুনো ঠিক করে গাঁগাকে স্পষ্টই সে সব জিজ্ঞাসা করবে।

গাঁগার আজকাল দেমাক বেড়েছে; যৌবনের দেমাক আর কি! বয়স্কদের প্রতি সম্ভ্রম নেই, বুক চিতিয়ে, শিং বাঁকিয়ে জগৎটাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেই যেন আজকাল বেড়ায় সে, কারুকেই কেয়ার করে না! মাথা কাটা যায় বুনোর তার সঙ্গে এই প্রসঙ্গ তুলতে। কিন্তু কথা না তুলেই বা উপায় কি! দলে এখন ভাঙন ধরেছে, ছোকরার দল সব এককাট্টা! এমন ভাবে খুব বেশিদিন থাকায় আরও বেশী মান-সম্ভ্রম খোয়ানোর সম্ভাবনা। এর চেয়ে একটা বোঝা-পড়া হয়ে যাওয়া ভাল।

বুনো গাঁগাকে সেদিন ডেকে নিয়ে যায় ভুতখণ্ডের উত্তরে যেখানে এই সময়টা পাহাড়ের গায়ে কচি কচি সবুজ ঘাসের অজস্র সন্ধান মেলে। সারা পথ গাঁগা গুম্ হয়েই থাকে, বুনোও কোন কথা বলে না। তারা কখনও যায় পরস্পরে পাশাপাশি, কখনও বুনো সামনে, গাঁগা পেছনে। পাশাপাশি চলার সময় বুনো যখনই গাঁগার দিকে চেয়েছে, কথা বলার জন্যে, তখনই গাঁগা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অন্য দিকে।

কচি ঘাস খেতে খেতে বুনো বলে, 'গাঁগা, তোমার

কি ইচ্ছে খুলেই বল না কেন?' গাঁগা কোন উত্তর করে না, চুপ করে, মুখ ফিরিয়ে, ঘাসে মুখ বুলোয় কেবল। বুনো আবার মুখ খোলে, বলে, 'তোমার কি ইচ্ছে আমি সরে দাঁড়াই?' শিং বেঁকিয়ে উদ্ধত ভাবেই উত্তর দেয় গাঁগা, 'তোমার বুঝি ইচ্ছে, এখনও তুমি এই গদি আঁকড়ে পড়ে থাক। বলিহারি তোমার সাধ, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে এখনও মোড়লি করতে চাও—তোমারও হয়ে এসেছে।' কথাগুলোয় বুনোর রক্ত মাথায় উঠে যায়। এই সেদিনের ছেলে গাঁগা, আর তার কিনা এই উত্তর! বয়স্কদের প্রতি না আছে এতটুকু সম্মান-বোধ, না আছে কথার সৌজন্য। বুনো গাঁগার কাছ ঘেঁষে এগিয়ে যায়, বেশ গম্ভীর ভাবেই বলে, 'জানো এখনও আমি তোমাদের দলপতি, ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্ত্তে আমি তোমায় দল থেকে দূর করে দিতে পারি, শুধু তাই নয় এছাড়া আরও কঠিন সাজা দিতে পারি তোমায়।'

'তুমি দেবে কঠিন সাজা,—মন্দ বটে! পাঁচ বছর আগে বল্লেও কথাগুলো মানাত, এখন তুমি এক গুঁতোর ওয়াস্তা!'

কথাটায় পায়ের খুর থেকে মাথার শিং পর্য্যন্ত রি রি করে ওঠে বুনোর, অসহ্য এই দম্ভ! 'তবে রে বেয়াদপ, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন!' বুনো তার ধারাল বাঁকা শিং দিয়ে মারলে সজোরে গাঁগার পেটে এক গুঁতো। মাথায় তার খুন চেপে গেছে, চোখে হিংস্র দৃষ্টি।

অপ্রত্যাশিত আঘাতে প্রথমটা গাঁগা ভড়কে গেলেও পরমুহূর্ত্তে নিজেকে সে সামলে নিয়ে রুখে দাঁড়াল। মাথাটাকে নিচু করে, পিছনের পা দুটোকে উঁচুতে তুলে, লাফ মেরেই সে বুনোর ঘাড়ে এসে পড়ল। রাগে গর্দ্দানটা তার ফুলে উঠেছে, পায়ের পেশীগুলো উত্তেজনায় থরথর করছে। আর একটু হলে বুনোর চোখেই সে একটা শিং ঢুকিয়ে দিয়েছিল আর কি! কিন্তু প্যাঁচ করে বুনো সেটা কাটিয়ে নিয়ে, আবার মারলে গাঁগার থুতনির উপর শিংয়ের এক তীক্ষ্ণ খোঁচা। বাজখাঁই গলায় গাঁক করে উঠল গাঁগা। থুতনিটায় বেশ ঘা খেয়েছে সে।

এমনি ঘাত-প্রতিঘাত চলতে লাগল বহুক্ষণ ধরে। ফোঁস ফোঁস শব্দে বেগে নিঃশ্বাস পড়ছে দুজনেরই। কখনও এ ওকে, কখনও ও একে আক্রমণ করছে মারাত্মক ভাবে। আঘাতের তীব্রতা গাঁগার দিক থেকে বেশি আসলেও—কায়দায় বুনোর তুলনা হয় না। প্যাঁচ করে তীব্র তীব্র আক্রমণ যেমন সে প্রতিহত করছে, তেমনি কায়দা করে এমন সব মার দিচ্ছে যা গাঁগার চোখে ফুটিয়ে তুলছে সরষে ফুল।

নিস্তব্ধ নির্জ্জন পাহাড়ের বুকে সে এক ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্য! খুরের দ্রুত সঞ্চরণে নীরস শিলার বুক ক্ষত বিক্ষত হয়ে চলেছে, উভয়ের মুখের লালায় কঠিন পাষাণেও এনে দিয়েছে সিক্ততা; দর দর করে ঘাম পড়ছে দুজনেরই গা থেকে। একজন লড়ছে যৌবনের মত্ততায়, নূতন রক্তের তেজে, আর একজন লড়ছে বিগত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জেদে। কিন্তু এমন ভাবে কতক্ষণ এই বুড়ো হাড়ে জোঝা সম্ভব! ক্রমেই বুনোর দম ফুরিয়ে আসতে লাগল। আক্রমণের তীব্রতাও গেল কমে। গাঁগার তখনও পুরো দম; আক্রমণের পর আক্রমণে বুনোকে সে হিমশিম্ খাইয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে দুতিনবার টাল রাখতে না পেরে পড়েও গিয়েছিল সে। হটাৎ গাঁগার একটা আক্রমণ কাটাতে গিয়ে উভয়ের শিঙে শিঙে জড়িয়ে গেল। দুজনকে দুজনে ঠেলে কাবু করাই হল সে সময়ের একমাত্র উপায়। মাথায় মাথা রেখে, শিঙে শিঙ দিয়ে প্রথমটা দেহের ভারে বুনো গাঁগাকে খানিকটা ঠেলে নিয়ে গেলেও, তারপর থেকে ক্রমাগত গাঁগাই তাকে পিছিয়ে চলেছে। কখনও পাথরের চাঁইতে পা আটকে সে একটু দম নেবার যেই চেষ্টা করছে, অমনি গাঁগা ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্য দিক থেকে সজোরে দিচ্ছে ঠেলা। টাল রাখতে না পেরে বুনো আবার খানিকটা যাচ্ছে পিছিয়ে। এমনি করতে করতে গাঁগা বুনোকে এমনি একটা জায়গায় এনে ফেলেছে যে, এখান থেকে আর একটু হটলেই, ব্যাস, একেবারে তিনশ ফুট নিচে। বুনোর সেদিকে হুঁস্ ছিল না। আর এমন অবস্থায় পিছন ফিরেই বা দেখার অবসর কোথা! গাঁগা দেখলে, বুনোকে জন্মের মত শেষ করার এই পরম সুযোগ। সমস্ত শরীরের ভর দিয়ে সে মারলে বুনোকে সজোরে এক ধাক্কা। সে বেগ সামলানো আর সম্ভব নয়; আত্ম-রক্ষার সকল উপায়ই নিঃশেষ হয়েছে তখন—অসীম শূন্যে লাট খেয়ে পড়লো বুনো।

একবার নিচের দিকে চেয়ে নিল গাঁগা। এতক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্তে তাকেও টের পেতে হয়েছে; হাঁস ফাঁস করতে করতে অবসন্ন শরীরে, ক্ষতবিক্ষত দেহে ফিরল সে। কিন্তু তবুও জয়ের গৌরব, দলপতি হবার উদগ্র বাসনা, শত্রুর বিলোপসাধন প্রভৃতি সব মিলিয়ে মিশিয়ে তার মনে ও শরীরে জাগিয়ে তুলেছে এক অপূর্ব্ব সাড়া! সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই দলে ফিরে এল গাঁগা।

যেখানে পাহাড়ে ঝর্ণার গা থেকে জল বয়ে তিস্তাকে অপেক্ষাকৃত বেগবতী করেছে, তারই পাড়ে পড়েছে বুনো! পড়েছে উলু ঘাসের গাদার উপর। তাই এত উঁচু থেকে পড়েও, প্রাণে বেঁচে গেছে সে। কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলেও একটা শিং তাকে হারাতে হয়েছে। উপর থেকে টাল খেয়ে পড়বার সময় মাঝ পথে পাহাড়ের বেরুনো একটা খণ্ডাংশে ঘা খেয়েই কাণ্ডটা ঘটেছে। রক্ত ভেসে গেছে তার সর্ব্বাঙ্গ, চাপ বাঁধা রক্তে একটা চোখই ত' ঢাকা পড়েছে বলতে গেলে। কিন্তু তাতে তার দুঃখ নেই, সে শুধু ভাবছে তার মরণ হল না কেন! কোথা থেকে সে এখন কোথায়! সামর্থহীন, বিজিত, নিঃসঙ্গ, পদচ্যুত একাকী!

কুঁড়ের চালে গোঁজা দেবার জন্যে পাহাড়ীরা জঙ্গলে

নদীর ধার থেকে এই উলু ঘাস কেটে এক জায়গায় টাল দিয়েছিল। কিছুদূরেই তাদের বাড়ী ঘর আর চাসবাস। ভোরের দিকে চাষীরা উলু টানতে এসে দেখে, এক বিরাটকায় বন্য মহিষ উলুর গাদার মধ্যে রক্তাক্ত দেহে পড়ে। প্রথমটা তারা মোষটাকে মরাই ভেবেছিল।

সারারাত যন্ত্রণায় ও শারীরিক অবসাদে বুনো মরা না হ'লেও আধমরা হয়ে পড়েছিল ; তাকে দেখে মরা ভাবাটা চাষাদের কিছু অন্যায় হয় নি।

ফুকুন লাফিয়ে উঠে বল্লে, 'যাক মাত্‌লা, এতদিন ত' একটাকেও শিকার করতে পারি নি, আজ এই মরাটাকেই নিয়ে গিয়ে গাঁয়ে খুব একটা সোরগোল ফেলে দেব। বলব এটাকে আমরাই ঘায়েল করেছি।' ফুকুনের কথায় চিক্‌না, ভারমো প্রভৃতি সবাই উৎসাহিত হ'ল। মাত্‌লা বল্লে, 'কিন্তু এটাকে নিয়ে যাওয়া যাবে কি ক'রে?' সমস্যা বটে! বিপুলকায় এই বন্যমহিষ। দেহের আয়তনে এদের ওজন অনুমান করা কঠিন।

'সামনের দুটো আর পেছনের দুটো ঠ্যাঙে ঘাসের দড়ি বেঁধে, মাঝখানে কাঠ দিয়ে ঝুলিয়ে নেব আমরা।' ভারমো বল্লে।

'কিন্তু ভদ্রলোক আমাদের চার পাঁচ জনের কাঁধে কি যাবেন?'

'খুব যাবেন।' বলে যেই ফুকুন এগিয়ে তার মুখের কাছাকাছি গিয়েছে, অমনি দেখে কিনা চোখ পিটপিট করছে মোষটার। 'ওঃ বাবা, এযে দেখছি জ্যান্ত!' বলে এক লাফে পিছিয়ে আসে সে।

'বলিস্ কিরে, তাহ'লে ত' ভালই আরো, একেবারে জীবন্ত শিকার! দেখ, দেখ সত্যিই বেঁচে কিনা।' চিক্‌না উৎসাহিত হ'ল।

ফুকুন, ভারমো, চিক্‌না প্রভৃতি সবাই এবার এক সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে দেখল,—হ্যাঁ, সত্যিই ত' পেটটা ওঠা-নামা করছে, নিঃশ্বাস বইছে তাহ'লে, তাহ'লে বেঁচে বৈ কি!'

'তাহ'লে গুঁতোবে নাকি রে?' কে যেন প্রশ্ন করল।

'আর গুঁতোবার অবস্থা নেই বাছাধনের, তার ওপর ত' একশিঙে। চল এখন বেঁধে ফেলা যাক।'

সেদিন ভোরের দিকে তেমন কুয়াশা নেই। কুয়াশা না থাকলেই শীত কম। কিন্তু শীত কম ও কুয়াশা না থাকলেও,—সূর্য্যের আলো তখনও এখানে এসে পৌঁছায় নি। টাইগার হিল থেকে ভোরের দিকেই যে সূর্য্যোদয় দেখা যায়, এখানে তার দর্শন মেলে অনেক দেরীতে। জায়গাটা অত্যন্ত নীচু ; চারধারে আকাশচুম্বি পাহাড় ঘেরা ছোট একটা উপত্যকা এটা। তিস্তা নদী গিয়াছে এরই পাশ ঘেঁসে। ঝর্ণার জল পাহাড়ের গা-বেয়ে আশ-পাশ দিয়ে এই উপত্যকায় প'ড়ে কঠিন পাহাড়ে মাটিকেও উর্ব্বর করেছে অপেক্ষাকৃত। এইখানেই চাষীদের বাস। কেউ কেউ কপি ও কমলার চাষ করে, আবার কেউ কেউ বন থেকে কাঠ ভেঙে, ধুনো কুড়িয়ে, দক্ষিণের ভূজচূড় থেকে শিলাজুত, সালবমিসিরি সংগ্রহ ক'রে অতি কষ্টে দু'পয়সার মুখ দেখে তারা। কিন্তু সেই চাষবাস সবই গয়বাতে যেতে বসেছিল যে বন্য মহিষের উৎপাতে, তাদেরই একজনকে জীবন্ত ধ'রে আনতে পারা কম আনন্দের কথা নয়।

ফুকুন, ভারমো, চিক্‌না, ঝামরু পাহাড়ী গান গাইতে গাইতে গাঁয়ের মধ্যে এসে ঢুকল। বহুবার কাঁধ বদলাতে হয়েছে তাদের, নামাতেও হয়েছে কয়েকবার। বাঁশের চোঙা থেকে দু'একবার জলও দিয়েছে বুনোর মুখে তারা। জীবন্ত নিয়ে যাওয়ার গৌরব ত নেওয়া চাই; তারপর তাকে দিয়ে গাঁ সুদ্ধ লোকের ভোজই হোক আর যাই হোক।

সারা রাস্তায় চোখ দিয়ে জল পড়েছে বুনোর। কপি ক্ষেত, কমলার চাষ প্রভৃতির আশপাশ দিয়ে যেতে যেতে অনেক কথাই মনে পড়েছে তার। কতবার এইখানেই এসেছে সে শত্রুপুরীর মধ্যে, বিপুল বিক্রমে, দল নিয়ে, তাদের দলপতি হয়ে। কত বুদ্ধি বিচক্ষণতা, শক্তি প্রতাপের চিহ্ন তার এই সব জায়গায় রয়ে গেছে ; আর আজ সে চলেছে সেই শত্রুপুরীর মধ্যেই বন্দী, অসহায় মৃতপ্রায় অবস্থায়। ভাঙা শিংটার যন্ত্রণার সঙ্গে এই সব যন্ত্রণাও তার কম হচ্ছিল না।

গাঁয়ের মধ্যে ঢুকতেই ছেলে বুড়ো মেয়ে অনেক জড়ো হ'য়ে গেল। সবার মুখেই উল্লাসের হাসি। কেউ বল্লে: এটা দিয়ে ভোজ হোক ; কেউ বল্লে: ব্যাটা ম'লে, ঐ চামড়া দিয়ে মোষ ক'রে ক্ষেতের ধারে দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে, তাহ'লে বুনো মোষের দল আর ভয় পেয়ে এদিকে ঘেঁষবে না। ফুকুনের বুড়ো বাবা কিন্তু বল্লে অন্য রকম। সে বল্লে, আগে এটাকে বাঁচিয়ে তোল, তারপর যা করা যায় ঠিক করব।'

পাহাড়ীদের সেবা শুশ্রূষায় বুনো গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। শিং-এর ক্ষত বেমালুম মিলিয়ে গেছে। এখন সে লাঙল টানে, কাঁধে জোয়াল নিয়ে। কখা পাহাড়ে মাটির বুক চিরে লাঙল চালানোয় বেশ জোরের দরকার। এতটুকু গাফিলতি হলেই চাষীর কড়া চাবুক তার পিঠে পড়ে—পরাধীন, বদ্ধ সে। সে বোঝে, এ চাবুক পরাধীনতার চাবুক, পিঠে তার পড়বেই স্বাধীনতা না পাওয়া পর্য্যন্ত। ফুকুনের বাবা তাকে দেশী মোষের সঙ্গে চাষে লাগিয়েছে।

এই সময় মারকুর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। মারকু মারাত্মক, দুর্দ্দান্ত ও বলশালী। গায়ে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল আর পায়ে থাবাগুলো ধারাল নখের স্পষ্টতায় ভয়াবহ। মুখটাতেও ছিল তার ভীষণ হিংস্রতা। এই জীবটির সঙ্গে ভালই বন্ধুত্ব হয়ে গেল বুনোর। মারকু বুনোর অসহায়তায় কেমন যেন অভিভূতই হয়েছিল।

সমস্ত চাষবাসের রক্ষক এখন এই মারকু। তীর্ব্বত থেকে তাকে এনেছে চাষীরা তাদের ক্ষেতখামারের পাহারা-দার হিসাবে। তার কাছে টুঁ-ফা করার উপায় নেই—দারুণ

কারী সে। এতটুকু আওয়াজেই তার কান খাড়া হয়ে ওঠে, সমস্ত শরীরে খেলে যায় প্রতিহিংসার দারুণ উৎসাহ। তার আসার সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। গত মাসের হিসাব থেকেই দেখা যায়; সে দুটো খেঁকশিয়াল, ছ'টা খরগোস, তিনটে উদ্‌বেড়ালকে ঘায়েল করেছে, তাছাড়া তার আসার সঙ্গে সঙ্গে বন্য মহিষের উৎপাতও গেছে একেবারে কমে।

দিনের বেলা মারকু থাকে গাঁয়ের দিকে, আর সন্ধ্যা হইলেই চলে যায় কপি ক্ষেতের সীমানা যেখানে শেষ হয়েছে জন-মানবহীন চত্বরে—তার ঘাঁটিতে। সেখানে তার জন্যে কুঁড়ে বাঁধা আছে। সেই কুঁড়েয় ব'সে জঙ্গুলে পাহাড়ের পথে সে চৌকি দেয়। সাধারণত এই দিকটাই বন্য মহিষদের আসার প্রচলিত পথ।

দিনান্তে যখন কাজ থাকে না, মধ্যে মধ্যে আজকাল মারকুর সঙ্গে বুনোও চলে যায় তার কুঁড়েতে। নানান গল্পগুজবে সময় কাটে তাদের। বনের মধ্যে সে কি ভাবে ছিল,—স্বাধীন চলা-ফেরার আনন্দ, কারুর তাঁবে নয়, যা ইচ্ছে তাই কর, যেথা ইচ্ছে সেথা যাও, কেউ বলবার নেই; সেটা ছিল তার নিজের রাজত্ব—পরম আনন্দের দিন! আর এখানে পরাধীন, সব সময় লাথি ঝাঁটা খেয়ে শঙ্কিত চিত্তে বাস, অসহ্য! এ-সব কথা ভাল লাগে না মারকুর। তার মত হ'ল, যার নুন খাবে প্রাণ দিয়ে তার করতে হবে। নিমকহারাম মহা অপরাধ। প্রভু-ভক্তির কথা কইতে কইতে তার মুখে জল গড়িয়ে আসে। শুয়ে শুয়ে এই ভাবে নানান গল্পগুজব করতে করতে মারকুর গা চেটে দেয় বুনো, আবার কখনও বুনোর গা-থেকে ডাঁশ-মাছি শিকার করে মারকু।

দিন চলে এই ভাবেই।

এদিকে গাঁগা তার দলকে এদ্দিন বেশ জমিয়েই তুলেছিল সর্দ্দারি ক'রে। কিন্তু সম্প্রতি প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে অনেক ওলট-পালট হ'য়ে গেছে। ভীষণ ঘূর্ণি হাওয়া ও জল ঝড়ের মধ্যে বনের গাছপালা উজাড় হয়ে ধুয়ে পুঁছে গেছে ঐ চত্বরে। পাহাড়ী শ্যাওলাও পচ ধরে অখাদ্য হয়েছে। পচাপাতা আর ডালপালা চিবিয়ে কদ্দিন বাঁচা সম্ভব। দলের কয়েকজনের ইতিমধ্যেই উদরাময় দেখা দিয়েছে, নধরকান্তি সব চেহারা কৃশ হয়ে আসছে। বেঁচে থাকতে গেলে খাবার প্রয়োজন সবার আগে!

দলের মধ্যে কে যেন একটু রাগত ভাবেই বল্ল, 'চলনা একবার নিচেয় যাওয়া যাক, কপি ক্ষেতের দিকে, খাদ্যের সন্ধানে; তা নাহ'লে আর ত' বাঁচা অসম্ভব!'

বুনোর অবর্ত্তমানতার পর গাঁগা এদিকে পা-বাড়াতে আর সাহস করে নি। এ-পথের ঘাঁৎ ঘোঁৎ জানত' বুনোই। তাছাড়া এদিকের চাষীরা যে ভাবে সজাগ হয়ে ছিল, তা'তে ওখানে গেলেই তাকে হয় প্রাণ হারাতে হবে; না হয় মারধোর খেয়ে অকৃতকার্য্য হয়ে দলপতিত্ব হারাতে হবে। ভয়ে সেই থেকেই গাঁগা আর ওপথে পা বাড়ায় নি।

কিন্তু এখন নিরুপায় হয়েই সে নিচেয় নামতে রাজী হ'ল।

শুক্লপক্ষের চাঁদ আকাশে তখন ফিকে হয়ে এসেছে, কৃষ্ণপক্ষের মাত্র আর দু'একদিন বাকী। শেষ রাতের দিকে আলো-আঁধারের আবছার মধ্যে গাঁগা যাত্রা করল নিম্ন উপত্যকার পথে।

তাদের অবস্থান থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় পাঁচ ছ'মাইল পথ অতিক্রম ক'রে নিচে নামলে তবে এখানে পৌছান যায়। গাঁগা দল নিয়ে সংশয়চিত্তে এগুতে লাগল।

রাস্তা সবই তার চেনা। দু'ঘণ্টারও কম সময়ে তারা এসে পৌছল এমন জায়গায়, যেখান থেকে আর একটা পাহাড়ে ব্যাঁক পেরুলেই একেবারে তিস্তার ধারে এসে পড়বে তারা। তারপর কোন রকমে এই শীর্ণা নদীটুকু পেরুতে যা সময়। নদীর গায়েই কমলার বন, তারপরই কপির ক্ষেত। দলের সকলেই আশান্বিত হ'ল। জঙ্গুলে ঘাস আর পাতা চিবিয়ে বহুদিন থেকে অরুচি ধরে গেছল সবার; তাছাড়া বর্ত্তমানে ত' অনাহারই বলতে গেলে! কাজেই, দূরে জীয়ন্ত তারকারির সন্ধান মিলবে ভেবে জিবে সবার জল এল।

সামনে গাঁগা পিছনে তার দল। আর দল! দলে এখন কজনই বা! তবু সে দলপতি, তাকে সামনে থাক্‌তেই হবে।

নদীতে জল এখন একটু বেশীই। গাঁগা গা-ভাসিয়ে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্যান্যরাও। কমলার জঙ্গলের পাড়ে এখন এসে উঠেছে গাঁগা, আর হাত পঞ্চাশ পেরুলেই কপি ক্ষেত। কিন্তু বিপদ এইখানেই! কপি ক্ষেতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু সময় বিপদ এসেছে বুনোর, সে কথা মনে আছে গাঁগার। চাষীরা কোন বিপদের ব্যবস্থা ক'রে সজাগ আছে কিনা এই খানেই তার পরীক্ষা। দলের অন্যান্যদের পিছনে রেখে এগিয়ে গেল গাঁগা।

দূরে কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে না! বড় গাছের ঝোপ? আর একটু এগুলেই নজরে পড়বে। গাঁগা আরও খানিকটা এগিয়ে যায়, মনে মনে প্রশ্ন করতে করতে।

মারকু ও বুনোর ঘাঁটি ঐ ঝোপ। ঠিক ঝোপ নয়, ছোট একটা কুঁড়ে, গাছের ডাল পালায় লুকিয়ে রাখা।

দু'জনেই তারা রাত্রে এসেছে এখানে। গল্প-গাছির পর বুনো শেষ রাত্রের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রভুভক্ত মারকুর চোখে ঘুম নেই। বাইরের দিকে মুখ রেখে সে চেয়ে ছিল, কান ছিল তার মাটিতে। সামান্য একটু খুরের ঘস্‌টানিতেই কান তার খাড়া হয়ে উঠল;

নদীর দিকে চাইতেই তার নজরে পড়ল, কি যেন ছায়ার মত এগুচ্ছে একটির পর একটি পা ফেলে অত্যন্ত নিঃসাড়ে।

বুনোর মুখে লেজের ঝাপটা মারলে মারকু। বুনোর মুখটা ছিল তার নাগালের মধ্যে। চমকে উঠল বুনো।

'ঘাব্‌ড়োনা! চুপ! শত্রু পড়েছে, কিন্তু দল কই!'

'দল আছে পেছনে; আগে যেটা এগুচ্ছে ওটাই দলের চাঁই।' এসব জানা বুনোর।

'আর দেরী নয়, চলো বেরিয়ে আক্রমণ করি এই সময়।'

'একটু কাছে আসতে দাও, তা নাহলেই পালাবে।' আর একটু কাছে এলেই বুনো আন্দাজ পায় জন্তুটা কে।

মারকুর তর সয় না। শত্রুকে দূর থেকেই বিদূরিত করা নয়, ঘায়েল করার সে পক্ষপাতি। নিজের ঘরের কাছে তাকে এগুতে দেওয়ায় বিপদ আছে। বুনোর কথায় কর্ণপাত না করেই তীর বেগে ছুটে গিয়ে, চক্ষের পলকে গাঁগার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ঘটে গেল যে, কিছু ভাববার পূর্ব্বেই, বুনো কুঁড়ে ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই অনতিদূরে দেখল ভীষণ ঝটাপটি। আরও খানিকটা এগিয়ে গেল সে। ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এখন।

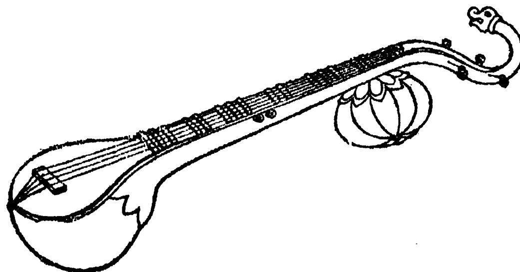
ইতিমধ্যেই ধুঁক্‌ছে গাঁগা। আক্রমনের প্রথম চোটেই একটা চোখ তার উপড়ে ফেলেছে মারকু। নৃশংস আক্রমণের তীব্রতায় দেহ তার ক্ষতবিক্ষত। মাঝে মাঝে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সে। সবই লক্ষ্য করছিল বুনো! এক একবার মারকু ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর তার ধারাল তীক্ষ্ণ দাঁতের কামড়ে তুলে আনছে খানিকটা মাংস। আক্রমণ করার ক্ষমতা গাঁগার বিলুপ্তই হয়েছে বলতে গেলে। মারকুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে ইতস্ততঃ মাথা চালছে সে, আর খানিকটা ক'রে যাচ্ছে পেছিয়ে।

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গিছল বুনো, হঠাৎ মনে হ'ল, এ যেন তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে মারকু। নিদারুণ প্রতিশোধ! কিন্তু মারকু নেবে কেন? গাঁগাকে সে হাতে পিঠে ক'রে বড় করেছে, তারই দলের গাঁগা সে কিনা আজ এই ভাবে এখানে শত্রুর হাতে প্রাণ হারাবে আর সে তার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে! না, কখনও না। সমস্ত 'রক্তে তার বিদ্যুত প্রবাহ খেলে গেল। দলের গৌরব অক্ষুন্ন রাখার জিদে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলো না বুনো। দারুণ মহিষাশুর বিক্রমে সে গিয়ে পড়ল মারকুর উপর। পেছন থেকে এই অতর্কিত আঘাতের জন্যে মারকু মোটেই প্রস্তুত ছিল না, বাগে পেয়ে বুনো তার সেই ভয়াল শিং সম্পূর্ণ বিদ্ধ ক'রে দিল মারকুর পেটে। একবার একটা করুণ আর্ত্তনাদ ক'রে মারকু শেষ হয়ে গেল, পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে তার।

মুমূর্ষু গাঁগা এতক্ষণে চিনতে পেরেছে বুনোকে। আরও পূর্ব্বে হয়ত সে চিনতে পারত, কিন্তু একটা চোখ তার একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। লজ্জিত, অপমানিত ও কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি তার চোখে। কৃতপূর্ব্ব অপকর্ম্মের গ্লানিতে ও ক্ষতের জ্বালায় সে জর্জ্জরিত। দলের অন্যান্য মহিষরা কমলার বন থেকে কপির ক্ষেতে নেমে পড়েছে তখন। নিজেদের বুভুক্ষিত জঠরে টাট্‌কা কপিপাতা ভর্ত্তি করতেই তারা ব্যস্ত ছিল এতক্ষণ।

তখন আকাশ বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। দূরের মালভূমিতে, পাহাড়ের চূড়ায়, সূর্য্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে এসে। পাহাড়ী কৃষাণেরা ভোরের দিকে ক্ষেতের মধ্যে ঢুকেই একেবারে হতভম্ব। খুরের আঘাতে আঘাতে সারা ক্ষেতের মাটি ওলট-পালট হয়ে গেছে, ফসলের গন্ধবাষ্প নেই! টাট্‌কা জীয়ন্ত কপিগুলির ভুক্তাবিশিষ্ট ডাঁটাগুলি প'ড়ে আছে কেবল বিক্ষিপ্ত ভাবে। আর পড়ে আছে দূরে রক্তাক্ত বীভৎস দেহে মৃত মারকু। বুনোর কোন পাত্তাই নেই। চাষীদের মধ্যে কে যেন ইঙ্গিত করল: অদ্ভুত শয়তান এই বন্য মহিষের দল।

[পৌষ, ১৩৫০] শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়



শরতের শোভা



শরতের আহ্বান

লোভী ভ্রমর

যে দেশের গল্প বলছি, সেই ভারতবর্ষে ভ্রমরকে বলে মধুকর, কারণ ফুল থেকে মধু এনে তারাই মৌচাকে মধু তৈরী করে। সেই ভ্রমরের দলের একটীর গল্প এখানে তোমাদের বলছি। তার নাম তারা রেখেছিল লোভী, কারণ তাদের দলে তার মত মৌ-লোভী আর কেউ ছিল না।

কিন্তু একদিন তার সব লোভ দূর হয়ে গেল, আর সব ভাল ভ্রমরের মত সে-ও হয়ে উঠলো ভাল। তারি কাহিনী বলি শোন।

তখন বর্ষা সুরু হয়েছে। সে দেশে দারুণ গ্রীষ্মের পর যখন বর্ষা নামে, তখন তার দুরন্ত জলের ঝাপটে বনে বনে মৌ-ভরা সব মিষ্টি ফুল ঝরে টুটে পড়ে যায়। তখন ভ্রমরেরা খাদ্যের অন্বেষণে বাধ্য হয়ে বন ছেড়ে সব দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

লোভীর জীবনে এলো এই প্রথম বর্ষা। লক্ষ লক্ষ ভ্রমরের জীবনে যেমন ভাবে বর্ষা এসেছে, গিয়েছে, তারও জীবনে তেমনি এলো দুঃখ-ভরা বর্ষা। অন্য সকলের মত সে আশ্রয় নিলো মৌচাকের ভেতরে, যেখানে পৌছতে পারেনা বৃষ্টির জল। সেখানেই থেকে সে অপেক্ষা করতে লাগলো, কবে আবার আসে আলো-ঝলমল দিন। তবে অন্য সকলের মত তাকেও কাজ করতে হতো; সেই কাজের মধ্যে সে ভুলতে চেষ্টা করতো অফুরন্ত বর্ষার সেই ভিজে অন্ধকারকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, ক্রমাগত এক সপ্তাহ ধরে চলে অরণ্যে বৃষ্টি-পড়ার অবিশ্রান্ত ধ্বনি। তার মধ্যে একটীও প্রাণী বেরুতে সাহস করে না। এমন কি যার ভয়ে অরণ্য শঙ্কিত, সেই শার্দ্দূলও আজ বর্ষার জল-বাণে ভীত হয়ে তার বিষণ্ণ বিবরে চুপটী করে বসে আছে। বাইরে বর্ষার তীক্ষ্ণ আঁচড়ে গাছের গোড়া পর্য্যন্ত, এমন কি পাহাড়ের মূল পর্য্যন্ত নড়ে নড়ে উঠছে, কিন্তু অরণ্যবাসী প্রাণীদের কাণে তার কোন সাড়া পৌছচ্ছে না; যেন ভিজে কাপড়ের মত ভিজে নীরবতা কে তাদের কাণে আর চোখে থাকের পর থাক দিয়ে চলেছে। সে নিরবতায় তারা সবাই শঙ্কিত। এমন কি ছোট্ট ভ্রমরেরাও সে নীরবতার আঘাত মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছিল। তবে মানুষের মত খাদ্যের অভাবে তারা কাঁদে না, মানুষের মত তৃষ্ণার জ্বালায় ছটফট করে না! তাদের মনের সহজ প্রবৃত্তি তাদের যা শিখিয়েছে, তাই তারা মেনে চলে। তারা জানে এই বর্ষা চিরস্থায়ী নয়, সময় হলেই তা চলে যাবে এবং ততক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

অবশেষে সাত দিনের দিন বর্ষার জল-ধারা থামলো। মৌচাকে বসে লোভী সহসা বাতাসে বহু দূর-থেকে-আসা কিসের যেন ক্ষীণ সুবাস পেলো। সে আর থাকতে পারলো না মৌচাকে। বাতাসে বেরিয়ে পড়লো নতুন মধুর সন্ধানে। তার পাখার শব্দে ভ্রমরেরাও সচকিত হয়ে উঠলো এবং তারাও তার পেছনে পেছনে উধাও হলো। দেখতে দেখতে নিমেষের মধ্যে মৌচাক হয়ে গেল খালি।

যেখানেই যায়, যতদূরে যায়, তারা দেখে সমস্ত অরণ্য ভিজে; শুধু ভিজে নয়, কুসুমবিহীন। বিন্দু বিন্দু করে বৃষ্টি পড়ে সমস্ত শালের কুসুম ঝরিয়ে দিয়েছে, করবীর শাখায় নেই করবী, বাদামের গাছে নেই একটিও ফুল। ক্ষুধার তাড়নায় ক্ষিপ্ত হয়ে লোভী চারিদিকে পাগলের মত উড়ে বেড়াতে লাগলো।

ক্ষুধার জ্বালা যখন উদগ্র হয়ে উঠেছে, এমন সময় সহসা লোভী আবার বাতাসে পেলো সেই দূর-থেকে আসা কিসের যেন ক্ষীণ সুবাস। বাতাসে সে দেয় নাক ডুবিয়ে! সেই কিসের যেন মধুর সুবাস! কিসের এ সুবাস? কিছুক্ষণ পরে, কেউ না বলে দিলেও, সে আপনা থেকে বুঝলো কিসের এ সুবাস! বনের বাইরে, ছিল পদ্মদীঘি, কে যেন আপনা থেকে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্লো সেই দিকে; গুণ্ গুণ্ করে সে সংবাদ সে তার বন্ধুদের দিল জানিয়ে; তারাও বাতাসে পেয়েছিল সেই পাগল-করা সুবাস, তারাও ক্ষেপে উঠেছিল জগতে অতুল সেই পদ্মমধুর আশায়। লোভী আগে আগে চলতে লাগলো, তারা দল বেঁধে তার পিছু পিছু চল্লো, বন ছাড়িয়ে, মুক্ত প্রান্তরের দিকে। সেখানে তখনো বইছে এলোমেলো ঝড়ো হাওয়া—তা ঠেলে যাওয়া কি সোজা!

বন পেরিয়েই কিছুদূর এগিয়ে তারা দেখে, তাদের সামনে একি অপরূপ দৃশ্য! যেখানে আগে ছিল একটা পচা জলা, বর্ষার কৃপায় সেখানে জেগে উঠেছে এক অথই জলের দীঘি, পদ্মের ভীড়ে দেখা যায় না তার জল, রক্ত-কমল, নীল-কমল, স্বর্ণ-কমল, মধুতে টই-টুম্বর! কিন্তু কি বাতাস! যতই তারা এগুতে যায়, বাতাসে ধাক্কা খেয়ে তারা বারে বারে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। সেই হাওয়ার সাগর ঠেলে তারা কেউ পৌছতে পারলো না পথের কাছে! সবাই ফিরলো কিন্তু ফিরলো না শুধু লোভী!

বাতাসে মধুর গন্ধ আরও হয়ে উঠেছে তীব্র। তার মধু-লোভী মন কোন বাধা মানলো না। বাতাসে তার ডানা ছিঁড়ে যাবার মত হলো। তবুও সে বাতাসে ডুবে এগুতে লাগলো। এগুতে এগুতে বাতাসে ধাক্কা খেয়ে সৌভাগ্যবশত সে পড়ে গেল একটা পদ্ম-পাতার ওপর।

সামনেই রয়েছে নীল আর শ্বেত-কমল। নীল আর শ্বেত-কমলের মধু ভ্রমরের সবচেয়ে প্রিয়; তাই তারা

সকলের চেয়ে বেশী আকর্ষণ করে ভ্রমরদের। মধুর নেশায় লোভী তখন উন্মাদ! শ্বেত, নীল, রক্ত কে আর বাছে? তার সামনেই ছিল এক রক্ত-কমল। তার মধু-গন্ধী সুবাসের আকর্ষণে অন্ধ হয়ে লোভী তার বুকে গিয়ে বসলো, মধুর পাত্রে নিজেকে দিল ডুবিয়ে। তাজা মধুর সেই প্রথম আস্বাদ, তার মধুরতার তুলনা কোথায়? স্পর্শে তার সমস্ত ক্ষুধার্ত্ত দেহ তৃপ্তিতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো...আনন্দের আবেশে তার ডানাগুলো পর্য্যন্ত আপনা থেকে নেচে নেচে উঠতে লাগলো......

আকণ্ঠ সে মধুপান করলো, তার সর্ব্বদেহ তখন মধুময়। তখনও বাতাস তেমনি উতলা বইছিল। সে ভাবলো, বাতাস থেমে গেলে, সে যাবে। তাই সে সেইখানে বসে বাতাস থামবার অপেক্ষায় রইলো। ক্রমশঃ সূর্য্য তখন মাথার ওপরে উঠেছে...চারিদিকে প্রখর রোদ...সে ঠিক করলো, সেইখানে সে ঘুমিয়ে নেবে, সে মধুর পাত্রের এক ধারে!

যখন সে ঘুম থেকে উঠলো, তখন অপরাহ্ণ হয়ে এসেছে। চোখ চেয়ে দেখে, তার আবার ক্ষিদে পেয়েছে! তখন অপরাহ্ণ শেষ হয়ে আসছে, বিলম্বে বিপদ আছে, তবুও সে সেই মধু-র আয়োজন ছেড়ে চলে যেতে পারলো না। এক ফল থেকে আর এক ফলে উড়ে উড়ে সে মধু খেতে লাগলো। যত খায়, তত যেন তার আশা বেড়ে বেড়ে যায়।

এধারে আকাশে সূর্য্য ধীরে ধীরে তখন অস্ত-অচলে নামছিলেন। একটি দুটি করে পদ্মের দল ক্রমশ বুঁজে আসছিল। কিন্তু সেদিকে লোভীর দৃষ্টিই ছিল না—সে তখন মধুপানে মত্ত!

সহসা তার দৃষ্টি এক শ্বেত-পদ্মের ওপর পড়লো, হিমালয়ের গিরি-শৃঙ্গের তুষারের মত শুভ্র তার দল! তার অঙ্গ থেকে বেরুচ্ছে মহাপদ্মের গন্ধ, মধু-র চাইতে মধুর!

মধু-ভারে টলতে টলতে সে তার বুকে গিয়ে বসলো। প্রথম আস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ যেন ভারে অবশ হয়ে এলো...ক্রমশ তার পাখাগুলো পর্য্যন্ত ক্রমশ মধু-ভারে অচল হয়ে এলো...তখন বাইরে রাত্রির ছায়া ঘনিয়ে আসছিল...ধীরে ধীরে কাঁপতে কাঁপতে মহাপদ্মের শ্বেত-দলগুলি বুঁজে আসছিল...মধু-লোভে সে দিকে তার দৃষ্টিই ছিল না...তখনও সে মধুপানে মত্ত। সে ভুলে গিয়েছে যে সূর্য্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মের দল আপনা থেকে যাবে বুঁজে।

ক্রমশঃ রাত্রির ছায়া গভীর হয়ে এলো—চারিদিক থেকে নীরবতা নীরব মিনতির মত ছেয়ে এলো। তখনও চলেছে মধু-ভোজ, নিঃশ্বাসে মধু, রসনায় মধু, মধুমত্ত সে তখন। হায়, সে দেখলো না তাকে ঘিরে মৃত্যু-শুভ্র পদ্মদল সব বুঁজে আসছিল...পাথরের দ্বারের মত একে একে একটি দল বুঁজে এলো...সেই সর্ব্ব-গ্রাসী কবর থেকে উড়ে চলে যাবার কোন লক্ষণ তখনও তার নেই... তখন সে তেমনি মধু-পান করে চলেছে আপনার মনে। সহসা শেষ দলটি বুঁজে গেল, বাইরের শেষ হাওয়াটুকু গেল বন্ধ হয়ে।

হঠাৎ লোভীর তখন চমক ভাঙ্গলো। অতি কষ্টে তখন তাকে নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছে। চারিদিকে মধু, তার দম পর্য্যন্ত আটকে ফেলার উপক্রম করেছে। যেদিকে সে নড়তে চায়, সে দিক থেকেই মধুময় পরাগ তাকে আচ্ছন্ন বিবশ করে ফেলে। তখন সে বুঝতে পারলো সে কি অবস্থায় নিয়ে এসেছে। পাগল হয়ে সেই প্রস্তর-শুভ্র পদ্ম-দলে সে পাখার ঝাপট দেয়, কিন্তু হায়, পাথরে প্রতিহত হয় তার সব চেষ্টা। তখন একবার তার মনে পড়লো, তার বন্ধুরা হয়তো বাইরে কোথাও তার জন্যে অপেক্ষা করছে, যদি তাদের কানে পৌঁছায়, সে তার স্বরে গুঞ্জন করে উঠলো। কিন্তু সে গুঞ্জনে শুধু বদ্ধ পদ্মের পরাগগুলো নীরবে ঝরে পড়লো পদ্মের ভেতরে। সে বুঝলো, আর মুক্তি নেই, মৃত্যু ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে, তখন সে নিজেকে মুক্ত করবার সব চেষ্টাই ছেড়ে দিল।

মৃত্যুর স্বপ্ন থেকে মানুষ যেমন সহসা জেগে উঠে জীবনে, তেমনি লোভী চোখ মেলে দেখে, সে এক বিচিত্র শুভ্রতার মধ্যে জেগে উঠেছে! তার দিকে এক অপূর্ব্ব শুভ্র নীরবতা। কোথায় সে? সে জীবিত, না মৃত? ক্রমশঃ সে নিঃশ্বাসে বাতাসের স্পর্শ পেলো! হাঁ, সত্যিই বাতাস! ক্রমশঃ সে একটু একটু করে নড়ে উঠলো! ধীরে ধীরে পদ্ম-পরাগ মাড়িয়ে সে হাঁটতে আরম্ভ করলো... তার মনে হলো যেন সে আবার ওপরে উঠেছে...চোখ চেয়ে ভাল করে সে দেখলে...

দেখলে, চারিদিকে, দু' একটী ছাড়া, পদ্মের পর পদ্ম, জলের মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে আছে...শুধু দু' একটি শ্বেত পদ্ম শুভ্রদল মেলে দিয়ে আকাশের চাঁদের দিক চেয়ে আছে...নীরবে তাদের বুকে এসে চাঁদের আলো পড়েছে ...মুগ্ধ নীরবতায় তারা সেই চাঁদের আলো পান করে চলেছে...আকাশের দিকে চেয়ে লোভী বুঝতে পারলো কার জন্যে এ যাত্রা সে বেঁচে গেল...যদি সেদিন চাঁদ সময়ে না উঠতো, যদি শ্বেতপদ্মেরা তার আলোর আশায় বুকের কপাট না খুলে দিত...!

সেদিনের অভিজ্ঞতা লোভী জীবনে আর ভোলেনি!

[কার্ত্তিক, ১৩৪৬] রচনা—ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়

অনুবাদ—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সারণ দেব

সারণ দেব সম্পর্কে—খুব দুঃসম্পর্কেই আমার ভাই হয়। সে আমার কাছ থাকে—আমার উপর খায়, দায়, ঘুমায়—আবার বইও পড়ে। সিনেমা থিয়েটার পর্য্যন্ত সে আমার ঘাড়েই দেখে। অথচ, আমার লেখা গল্প উপন্যাসকে বলে অখাদ্য, রাবিশ, বটতলার চেয়েও খারাপ।

তোমরা ভাবছ সারণ দেব আমার গলগ্রহ! সে আমায় ছাড়লে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কিন্তু মোটেই তা নয়! সেই বরং মাঝে মাঝে চলে যেতে চায়—আমিই তাকে যেতে দিই না। বহু কাকুতি-মিনতি করে তাকে আমি ধরে রাখি—যেন সে আমার কাছে থাকলে আমি কৃতার্থ হয়ে যাব।

সত্যিই তাই। সারণ দেবকে ছাড়া আমার এক মুহূর্ত্ত চলে না। সে কাছে না থাকলে আমি আমিই থাকি না। সে আমার একাধারে ভাই, বন্ধু, প্রাইভেট্ সেক্রেটারী, মন্ত্রণাদাতা···সব—কি নয়? তা ছাড়া ওকে বন্ধু হিসাবে আমি পছন্দ করি খুব-ই।

আমার সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে সারণ দেব প্রায়ই আমার কাছ থেকে টাকাকড়ি আদায় করে—সেজন্য অবিশ্যি আমি বিশেষ দুঃখিত নই। টাকাকড়ির দরকার হলে সে সোজা এসে দাঁড়ায় আমার সামনে, 'আমি চললাম'—।

'কোথায়—মেট্রোতে সিনেমা দেখ্‌তে?—না,—শিল্ড্ ফাইনালে চেঁচাতে?'—আমি ভুলেও সারণ দেবের দিকে তাকাই না।

'কোনটাতেই না—যাচ্ছি বোম্বে'—

'বোম্বে?'—আমি চমকে উঠি, তারপর হাসি আসে আমার—'ও, বোম্বে ক্রাউন-এ, খেতে বুঝি! আমি ভেবেছিলাম হিল্লী, দিল্লী, বোম্বেতে বুঝি'—।

'আমি তাই যাচ্ছি'—

'সে কি?'—এবার আমি সত্যি সত্যিই চমকে উঠি, 'বোম্বেতে কেন?'

'চাকরী করতে'—

'চাকরী! তুই চাকরী করবি কোন দুঃখে?'—দুঃখ যেন আমার-ই হয়?

'যে দুঃখে সবাই করে—টাকার জন্য'—

'ও, টাকা! টাকার দরকার তোর'—আমি উদার হয়ে পড়ি, 'তা আমায় বললেই পারিস—কত? কত দরকার তোর?'

'এই পঞ্চাশ'—সারণ দেব একটু থামে, 'আপাততঃ'—

চেক্ বই বার করে সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ টাকার চেক্ কেটে আমি নিশ্চিন্ত! সারণ দেব এমনি প্রায়-ই করে। আমিও খুসী মনেই ওকে টাকা দেই।

রবীন্দ্রনাথের যেমন বিশ্ব-ভারতী, শরৎচন্দ্রের গুরুদাস—আমারও তেমনি নিস্ব-ভারতী। আমার একখানা বই বের হচ্ছে নিস্ব-ভারতী থেকে। প্রকাশক সুধাংশুবাবুকে বইখানা গছাবার সময় বহু চাল-ই চেলেছিলাম—কিন্তু সে সব চাল যে এমন বেচাল হয়ে যাবে কে জানত? গল্পে গল্পে সুধাংশুবাবু-ই সব গোলমাল বাধালেন, 'আচ্ছা, রবিবাবুর কাছ থেকে আপনার বইটার একটা সমালোচনা আনানো যায় না? তিনি ত' আপনার লেখার খুব সুখ্যাতি করেন—শুনেছি!—"

ওটি আমার-ই একটা চাল—চাল-ই বজায় রাখি, 'তা আনানো যায়'—কথাটাকে হেলাফেলা করি, আনালেই হয় আর কি! উনি ত' ওই করবার জন্যই আছেন'—।

'তা আনান না! বইয়ের মলাটের উপর ছেপে দিলে বিক্রি বাড়বে'—। 'বেশ'—দুরু দুরু বক্ষেই বলি, 'ফাইল কপি দেবেন—সঙ্গে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেব'খন——সমালোচনা চলে আসবে এক হপ্তার মধ্যে'—।

পরের দিন রোববার। ভোর সকালেই সুধাংশুবাবু ফাইল কপি নিয়ে এসে হাজির। ফাইল কপি দিয়ে তিনি শাসিয়ে যান, 'আসছে রোববার সমালোচনা নিতে আসব'—।

আমার অবস্থা হয়ে এসেছে তখন। অন্য কোন উপায় না দেখে কথামত কাজ করলাম। খুব বিনয়ের সঙ্গে একটা চিঠি লিখলাম রবিবাবুকে। 'বাঙ্গলা, তথা ভারতবর্ষ, তথা এসিয়া, তথা পৃথিবী, তথা সৌর জগতের শ্রেষ্ঠ কবি—বরাবরেষু'—এই রকম চিঠির আরম্ভটা—যদি তাতে ভদ্রলোকের মন একটু গলে আর সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা বেরিয়ে আসে কলম থেকে—।

যাক, চিঠি পোষ্ট্ করা গেল। উত্তর এল, এল শনিবারের মধ্যেই। বুকে আশা নিয়ে চিঠি পড়তে লাগলাম—কিন্তু সমালোচনা দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। এ যা সমালোচনা এসেছে দেখলে সুধাংশুবাবু আর জীবনে আমার বই ছাপবেন না। এটারও যতদূর ছেপেছেন মণ দরে বিক্রি করে দেবেন 'শিশি-বোতল বিক্রির' কাছে। চিঠিখানি বড়—সব কড়াকথায় ভর্ত্তি। তার মধ্যে এগুলিও তো ছিল—'

'তোমার বইটির কিছু কিছু পড়বার সৌভাগ্য (!) আমার হয়েছে। সমালোচনার কথা লিখেছ; সমালোচনাই করি।—আলোচ্য বইখানি একটি উপন্যাস। উপন্যাসটি মৌলিক নয় বলেই আমার সন্দেহ। লেখার ভঙ্গী ভাল না, লেখাও পাকা হাতের নয়। বইটি কিছুই হয়নি। লেখক নবীন—কিন্তু তবুও তাকে ক্ষমা করা যায় না—লেখকের

উচিৎ লেখা ছেড়ে দিয়ে লাঙল ঠেলা, তাতে উন্নতি হবে।' ইত্যাদি বহু কড়া কথা।

কি করব ভেবে পেলাম না—সুধাংশুবাবু কাল-ই আসবেন এটার জন্য। চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলাম।

'আমি চললাম'—কার গলা শুনলাম! চেয়ে দেখলাম সারণ দেব। ব্যাপার সব বুঝলাম, আমার পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে গেল, 'আচ্ছা যাও—হ্যাঁ আরেকটা কথা শুনে যাও' —রাগ তখন আমার মাথায় চড়েছে, 'জীবনে আর এ-মুখো হয়ো না'—।

সারণ দেব অবাক হয়ে গেল। সে মোটেই চলে গেল না। আস্তে আস্তে আমার সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর আমার দিকে তাকাল।

'কি ব্যাপার শুনি ?'—

আমি চুপ করে থাকি। ওকে বলে আর কি হবে!

'বল না, কি ব্যাপার'—

'কিছু না'—

'বল-ই না'—

ওকে বলে আর কি হবে। তবু ডুবন্ত লোক যেমন খড়কুটা আশ্রয় করে আমিও তেমনি সব বলে ফেলি।

'আগে বল হাসবে না, কাউকে বলবে না'—

'আচ্ছা, আচ্ছা'—।

সব বললাম, রবিবাবুর চিঠিখানা দেখালাম। চিঠিখানা পড়ে একটু হাসলে ও, বহুক্ষণ ধরে কি ভাবলে যেন, 'হুঁ, হয়েছে'—

'কি হয়েছে ?' লাফিয়ে উঠলাম।

'কাগজ, কলম দেখি,'—সারণ দেবের মুখ থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে কাগজ, কলম এনে হাজির করলাম। সারণ দেব বহুক্ষণ ধরে কি সব লিখল কাগজখানায়, তারপর সেটা আমার হাতে দিল। লেখা পড়ে চমকে উঠলাম। অদ্ভুতকর্ম্মা সারণ দেব। দিনকে রাত করেছে—বাহারে সারণ দেব!

কাগজখানায় লেখা ছিল এই,—

'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বইখানা পড়িয়া উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়া লেখককে একটি চিঠি লিখিয়াছেন। বইখানির সমালোচনা করিয়া আমরা তার কয়েক লাইন তুলিয়া দিলাম— * * তোমার বইটি পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সমালোচনার কথা লিখেছ, সমালোচনাই করি- আলোচ্য বইখানি একটি উপন্যাস......উপন্যাসটি মৌলিক ......লেখক নবীন..... লেখার ভঙ্গী ভাল......লেখা পাকা হাতের.........লেখকের উচিৎ—লেখা.........উন্নতি হবে

পড়ে লাফিয়ে উঠলাম। পকেটে যা ছিল সব—টাকা পনেরো হবে—দিয়ে দিলাম সারণ দেবকে, 'রসগোল্লা খাবি'—।

পরের দিন সুধাংশুবাবু এসে হাজির, 'কই, সমালোচনা এল।'

'হ্যাঁ মশাই, সে একটা বিরাট চিঠি—'

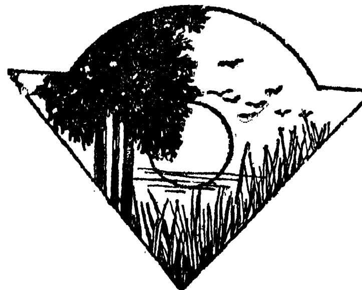
'কই, কই'—

'চিঠি কি আর আছে! পাশের বাড়ীর মেয়েটি এসে অটোগ্রাফের জন্যে নিয়ে গেছে'—চালেই চলি, 'তা অতবড় চিঠি ত' আর ছাপা যাবে না, আপনি এ ক'লাইন ছেপে দেবেন'—সারণ দেবের লেখা সেই কাগজখানা দেই।

সুধাংশুবাবু ওই ক'লাইন পড়তে পড়তে বলেন 'আমিও আজকে পড়ছিলাম বইটা—অদ্ভুত লিখেছেন—যেমন প্লট তেমনি ষ্টাইল্—রবিবাবুও দেখি তাই বলছেন' —ভাবখানা যে সমালোচক হিসাবে তিনি রবিবাবুর সমকক্ষ! থাক্, বিপদ কাটল।

হ্যাঁ, আরেকটা কথা—আমার বইখানির দু'মাসে প্রথম সংস্করণ ফুরিয়েছে—দ্বিতীয় সংস্করণও শেষ হয়ে এল সারা দেশ—দু'জন বাদে—আমাকে স্বীকার করে 'যাকে বলে প্রতিভা।' স্বীকার করেনি রবীন্দ্রনাথ আর সারণ দেব। তাতে আমার ভারী বয়েই গেল।

[আশ্বিন, ১৩৪৬] শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু



সত্যব্রতর মিথ্যা ব্রত

সত্যব্রতর একটা প্রধান গুণ ছিল সে কখনো সত্য কথা বল্‌ত না। নাম তার সত্যব্রত হ'লেও মিথ্যাকেই সে যেন জীবনের ব্রত করেছিল।

এমন অনায়াসে, স্বচ্ছন্দে, অনর্গল মিথ্যা কথা বল্‌তে কেউ পারে কি না সন্দেহ। অনর্থক চাল মারাই ছিল তার স্বভাব। ধরা পড়ে' যেত সে কথায় কথায়, তবু ঘাব্‌ড়াতো না একরত্তিও। বিশ্ব দুনিয়ার যত বড় লোক সত্যব্রতর আত্মীয়। সত্যব্রত বয়সে আমাদের চেয়ে কিছু বড় ছিল। আমরা স্কুলে এক ক্লাসেই পড়তাম।

আমাদের বাংলার মাস্টার হেমাঙ্গবাবু ছিলেন একটু কবি প্রকৃতির। কবিতা পড়্‌তে আর পড়াতে তিনি খুব ভালো বাস্‌তেন।

একদিন তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কবিতা লিখতে পার?"

সত্যব্রত ধাঁ করে' উঠে বল্লে "স্যার, আমার জ্যাঠামশাই পারেন।"

হেমাঙ্গবাবু বল্লেন, "তোমাদের কথাই জিজ্ঞাসা করছি; খুড়ো জ্যাঠামশায়ের কথা আমি তুলছি না। তোমরা কে পার—তাই বল।"

আমরা সবাই চুপ করে' রইলাম—কারণ বাস্তবিকই কবিতা আমাদের মধ্যে কেউ-ই লিখতে পারত না।

হেমাঙ্গবাবু তখন সত্যব্রতকে বল্লেন—"তোমার জ্যাঠা-মশাই বুঝি কবিতা-টবিতা লিখ্‌তে পারেন? কাগজ পত্রে ছাপান্‌ কি?"

সত্যব্রত হেমাঙ্গবাবুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লে, "হ্যাঁ স্যার, তাঁর বিস্তর কবিতা কাগজপত্রে বের হয়; তাঁর অনেক বইও আছে।

হেমাঙ্গবাবু বল্লেন "বটে? কি তাঁর নাম!"

সত্যব্রত বুক্‌ টান করে বল্লে—"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পর্কে তিনি আমার জ্যাঠামশাই।"

হেমাঙ্গবাবু যেন বোকা বলে গেলেন। তিনি ভড়্‌কে গিয়ে বল্লেন—"তাই নাকি। রবীন্দ্রনাথের ভাইপো তুমি—তা তো জান্‌তাম্‌ না—।"

পরদিনই সত্যব্রতর মিথ্যা কথা ধরা পড়ে' গেল। হেমাঙ্গবাবু ক্লাশে এসেই সত্যব্রতর খোঁজ করলেন,—কিন্তু সত্যব্রতর আর কয়েকদিন দেখা নাই।

কয়েকদিন স্কুল কামাই করে' যেদিন সে ক্লাশে এলো হেমাঙ্গবাবু জিজ্ঞাসা করলেন "কি হয়েছিল তোমার, জ্যাঠামশায়ের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলে বোধ হয়।"

মাথা চুল্‌কে সত্যব্রত বল্লে,—"না স্যার, পেটের অসুখ হয়েছিল।"

—"বাজারের তেলেভাজা ফুলুরি খেয়েছিলে বুঝি?"

—"না স্যার, চীন দেশ থেকে আমার বড় মামা দেড়শো বছরের পুরাণো হাঁসের ডিম পাঠিয়েছিলেন। সেই ডিমের কালিয়া খেয়ে পেট খারাপ হয়েছিল।"

হেমাঙ্গবাবু সত্যব্রতকে ভালো করেই চিন্‌তে পেরেছেন, গম্ভীর হয়ে তিনি বল্লেন, "হুঁ, দেড়শো বছরের পুরাণো হাঁসের ডিম না ঘোড়ার ডিম্‌। তোমার মাথা আর মুণ্ডু। ফাজিল ফক্কড় কোথাকার। তোমার নাম 'সত্যব্রত' কে রেখেছিলেন?

সত্যব্রত মুখ কাচু মাচু করে বল্লে, "স্যার,—পিসীমা।"

হেমাঙ্গবাবু বল্লেন—"তিনি কে?"

সত্যব্রত বল্লে—"সরোজিনী নাইডু।"

আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম। হেমাঙ্গবাবু বল্লেন—"দাঁড়াও, তোমার বাবার সঙ্গে আজই দেখা করতে হচ্ছে। তোমার ডেঁপোমী ভাঙ্গতে হবে। তিনি কখন বাড়ী থাকেন?"

সত্যব্রত বল্লে,—"স্যার, তিনি এখানে নেই;—বর্দ্ধমান গেছেন তাঁর ফ্রেণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে।"

হেমাঙ্গবাবু এতক্ষণ দস্তুর মত চটে' গেছেন। তিনি তেড়ে বল্লেন—"কে তাঁর ফ্রেণ্ড্‌?"

সত্যব্রত বেশ কৃতিত্বের ঢোক গিলে বল্লে—"বর্দ্ধমানের মহারাজা।"

একদিন সত্যব্রতর পকেটে একটা রংচঙে রুমাল দেখা গেল। আমাদের ক্লাশের জনার্দ্দন বল্লে— "বাঃ, বেশ রুমালটা তো!"

ব্যস্‌ আর যায় কোথায়! সত্যব্রত বল্লে—"যাঃ, যাঃ,—এ রুমালের মর্ম্ম তোরা কি বুঝবি! বিষ্ণু দিগম্বরের নাম শুনেছিস্‌? সেই যে—যাঁর জোড়া গায়ক সারা ভারতে আর ছিল না—। সেই বিষ্ণু দিগম্বর ছিলেন আমার কাকার সাগ্‌রেদ্‌। আফগানিস্থানের রাজা আমানুল্লা যখন বোম্বাইয়ে এসেছিলেন, তখন সেই বিষ্ণু দিগম্বরের মুখে দরবারী কানাড়া শুনে খুসী হয়ে তিনি তাঁর মাথার পাগড়ী খুলে তাঁকে উপহার দেন। সেই পাগড়ীর আধখানা দিগম্বর মশাই কাকার কাছে পাঠিয়েছিলেন। কাকা তাই দিয়ে বালাপোষ বানিয়েছেন। এক টুক্‌রো বেঁচেছিল তাই দিয়ে আমি এই রুমাল তৈরি করেছি।"

আর একদিন সত্যব্রত কোথা থেকে একটা ভোঁতা ভাঙ্গা চোরা Fountain pen এনে হাজির। আমরা ঠাট্টা করে বল্লাম "এটা বুঝি তোর ঠাকুর্দ্দাকে জার্ম্মানীর কাইজার উপহার দিয়েছিলেন?"

সত্যব্রত মুখ গম্ভীর করে' বল্লে "এর অর্থ তোরা কি বুঝবি! তোরা তো শিখেছিস্‌ খালি জ্যাঠামি আর ফক্কুড়ি করতে—আর কথায় কথায় দাঁত বের করে হাস্‌তে।

এই Fountain pen দিয়ে বিদ্যাসাগর মশাই 'আখ্যান মঞ্জুরী' লিখেছিলেন। তাঁরপর, তাঁর কাছ থেকে পান মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' লিখতে লিখতে এই কলমটি চুরি যায়। আমার ঠাকুর্দ্দা পুলিশে বড় কাজ করতেন। তিনি চোরাবাজার থেকে এটিকে যখন উদ্ধার করলেন তখন বিদ্যাসাগর মশাইও নেই—মাইকেলেরও মৃত্যু হয়েছে। কাজেই সেই থেকে ওটা আমাদের বাড়ীতেই আছে।"—

সত্যব্রতর এই মিথ্যা গল্পগুলি শুনতে আমাদের বেশ মজাই লাগত।

সত্যব্রত কি না জানে! ঘোড়ায় চড়তে তার মত ওস্তাদ নাকি দুটি নেই, সে নাকি মাছের চেয়েও বেশী ভালো সাঁতার জানে, চোখ বুঁজে দেড়শো মাইল স্পীডে" সে যে কোনো মোটর যে কোন রাস্তায় চলাতে পারে।

তার মোটর চালানো, কি ঘোড়ায় চড়া আমরা পরীক্ষা করবার সুযোগ পাইনি। তবে স্কুলের পুকুরে তার সাঁতার কাটবার কেরামতি আমরা নিজের চোখে দেখেছি।

প্রথমে সে তো কিছুতেই জলে নামবে না :—"এ ভারী বিদ্‌ঘুটে এঁদো পুকুর,—এতে নামাও যা আর একটা ডোবার জলে ডিগ্‌বাজী খাওয়াও তা, তোদের যা 'টেষ্ট্'। থাকত আমার মামার বাড়ীর পুকুর—তবে দেখতিস সাঁতার কাকে বলে।"

কিন্তু জনার্দ্দন তা মানবে কেন, সে মারলে পিছন দিক থেকে এক পেল্লাই ধাক্কা।

ঠিকরিয়ে গিয়ে সত্যব্রত পড়ল পুকুরের গভীর জলে। আর তার দেখা নাই। আমরা ভাবছি সত্যব্রত বুঝি ডুব সাঁতারে একেবারে ওপারে গিয়ে উঠবে।

কিন্তু সত্যব্রত কই? আমাদের মুখ শুকিয়ে আম্‌সী হোয়ে গেল।

আমরা সবাই অল্প বিস্তর সাঁতার জানতাম। সকলে মিলে অল্প করে পুকুরের তল থেকে যখন সত্যব্রতকে তুললাম তখন সে খাবি খাচ্ছে।

তিন চার দিন পরে সত্যব্রত ক্লাসে আসতেই জনার্দ্দন টিট্‌কারী দিয়ে বল্লে—"জলের মাছের খবর কি?"

সত্যব্রত বল্লে—"যত সব ভালকানা, আনাড়ি, নূতন একটা কায়দা দেখাবার মতলব করছিলাম হতভাগারা তখন সব 'প্ল্যান' মাটি করে দিল।"

আমরা সবাই মুখ টিপে হাসতে লাগলাম।

জনার্দ্দন বল্লে—"ভাগ্যিস প্ল্যানটা মাটি করে' দিয়েছিলাম।"

অনেকদিন পর সে দিন বহুবাজারের মোড়ে সত্যব্রতর সঙ্গে দেখা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে চীনাবাদাম খাচ্ছিল।

চেহারার কিছু পরিবর্ত্তন দেখলাম। সত্যব্রত বেশ একটু বাবু ধরণের লোক ছিল। এবার দেখলাম তার মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা—গায়েও খুব সাধারণ জামা কাপড়।

জিজ্ঞাসা করলাম "কি হে সত্যব্রত, খবর কি? কোথায় ছিলে এতদিন? রোগা হয়ে গেছ যে!"

চীনাবাদাম চিবুতে চিবুতে সত্যব্রত বল্লে—"মেশোমশাইয়ের আশ্রমে কিছুদিন কাটিয়ে এলাম।"

"—মেশোমশাইয়ের আশ্রম? সে আবার কোথায়? মেশোমশাই বুঝি সাধু টাধু কেউ হবেন?"

গম্ভীর ভাবে সত্যব্রত বল্লে—"না সবরমতী আশ্রম।" বল্লাম—"সেখানে বুঝি তোমার মেশো থাকেন, তাঁর নাম কি?"

সে আরো গম্ভীর হয়ে বেশ অহঙ্কারের সঙ্গেই বল্লে—"মহাত্মা গান্ধী।"

সোডার বোতল খুল্‌লে যে রকম ভস্ করে' সশব্দে গ্যাস বেরিয়ে পড়ে, আমার হাসিও তেমনি বুক্ ঠেলে বেরিয়ে আস্‌তে চাইল। অনেক কষ্টে তা চেপে বল্লাম—"তুমি বাঙ্গালী,—মহাত্মা গান্ধী তোমার মেশোমশাই হলেন কি করে?"

সত্যব্রত বল্লে—"মহাত্মাজীর স্ত্রী আমার মায়ের মামাতো বোন। মায়ের এক মামা গুজ্‌রাটী মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। কস্তুরি বাই—অর্থাৎ গান্ধীজীর স্ত্রী আমার সেই গুজরাটী দিদিমার সম্পর্কে বোনঝি। তা' হলেই কস্তুরি বাই হচ্ছেন আমার মাসীমা আর 'অটোমেটিকেলি' গান্ধীজী আমার মেশোমশাই।"

ঢং ঢং করতে করতে একটা ট্রাম এসে মোড়ের মাথায় থাম্‌তেই আমি তাতে চড়ে বসলাম।

সত্যব্রত বল্লে—"কোথায় চল্লে হে?"

আমি বল্লাম—"পিসেমশাইয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে?"

সে বল্লে—"তোমার পিসেমশাই কে?"

ট্রাম তখন চল্‌তে আরম্ভ করছে। আমি চেঁচিয়ে বল্লাম—"লাট্ সাহেব।"

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১] শ্রীসুনির্ম্মল বসু

লাল কম্বল

সেদিন সন্ধ্যার দিকে শীতটা একটু বেশী পড়িয়াছিল। দেয়াল থেকে ছেঁড়া পুরু প্লাকার্ডের কাগজখানির উপর বসিয়া বসিয়া হাবু কাঁপিতেছিল। এক একটা দমকা হাওয়ার মুখে ছেঁড়া জামাটা সে কোন রকমেই বাগ্ মানাইতে পারিতেছিল না। এই জামাটা গায়ে দিয়া কি করিয়া আজ রাত্রে ঘুমাইবে তাহাই হইতেছিল তাহার দুর্ভাবনা।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। পিছন থেকে হন্ হন্ করিয়া দুটী ছেলে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হাবু যাবি?

কথা শুনিয়া হাবু মুখ ফিরাইল। দেখিল ননী ও পঞ্চু তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিল—কোথায়?

—মল্লিক বাড়ী থেকে আজ আড়াইশো কম্বল বিলাবে, এখ্খুনি খবর পেলুম।

হাবু বিশ্বাস করিতে পারিল না। এমনি কথা বলিয়া কতদিন তো তাহারা তাহাকে কত ঘুরাইয়াছে, শেষে পেটের জ্বালায় সারা রাত ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারে নাই। জিজ্ঞাসা করিল—সত্যি? না, ওই বলে আমায় খানিকটা ঘুরিয়ে আনবি?

—বেশ, সত্যি নয় তো নয়। যাবার সময় তোকে দেখিয়ে নিয়ে যাব'খন—বলিয়া ননী পঞ্চুর হাত ধরিয়া বলিল—চল্‌রে পঞ্চু চল, ও যাবে না!

পঞ্চুর কিন্তু হাবুকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা ছিল না, বলিল—যাবি না কি রে? ওই ছেঁড়া জামাটা গায়ে দিয়ে আজ রাত্তিরে ঘুমোতে পারবি তো?

তথাপি হাবু যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না, বলিল—সত্যি, দিচ্ছে?

—সত্যি সত্যি! কতবার বলবো? ইচ্ছে হয় চল্, না হয় থাক্ বসে!

এইবার হাবুকে উঠিতে হইল। উঠিয়া পড়িয়া বলিল—তবে চল্ যদি একখানা কম্বল পাওয়া যায়, জামাটা সত্যি ছিঁড়ে গেছে!

—তোর তো তবু ভাল আমার গেঞ্জিটা দেখ্ দেকি—বলিয়া পঞ্চু গায়ের গেঞ্জিটা একহাতে টানিয়া ধরিয়া হাবুকে দেখাইল। হাবু দেখিল সত্যই তাহার জামার সঙ্গে এই গেঞ্জিটার তুলনাই চলে না। কোনখানে দু ইঞ্চি কাপড় আস্ত আছে বলিয়া তো হাবুর চোখে পড়িল না। ইহাতে পঞ্চু কি করিয়া শীত ভাঙায় ভাবিয়া হাবু অবাক হইয়া গেল।

ননী এইবার নিজের কথা তুলিল, বলিল—তোদের তো তবু জামা গেঞ্জি একটা কিছু আছে, আমি তো কোঁচার কাপড়টাই গায়ে দিয়ে আছি।

নিজেদের অবস্থায় হাবুর দুঃখ হইল। সত্যই তো তাহাদের একখানি করিয়া কম্বল দরকার, না হইলে এই শীতে তাহারা তো মারা পড়িবে।

মল্লিকবাড়ী বেশী দূরে নয়। কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে কোন ফাঁকে তাহারা ফটকের সামনে আসিয়া পড়িল। ফটকের সামনে তখন শতাধিক ভিখারীর ভীড় জমিয়া গেছে। অতগুলি লোক তাহাদের আগেই খবর পাইয়া আসিয়া জুটিয়াছে দেখিয়া পঞ্চু চটিয়া উঠিল, বলিল—দেখেছিস্, এ-ব্যাটারা আমাদের আগেই এসে জুটেছে!

ননী বলিল—তা জুটুক, তা বলে তো আর এদের পিছনে আমরা পড়ে থাকবো না। এদের পিছনে পড়ে থাকলে আমাদের একখানা কম্বলও জুটবে না, তা আমি আগে থেকেই বুঝতে পারছি! তা দেখ্ পঞ্চু, আমি ভীড় ঠেলে এগোই, তুই আর হাবু আমার পিছনে আয়।

ধাক্কাধাক্কি করিয়া অনর্থক হাঙ্গামা সৃষ্টি করার ইচ্ছা হাবুর ছিল না, বলিল—মিছে ধাক্কাধাক্কি করে লাভ কি! যার পাবার হবে সে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও পাবে।

ননী এবার রাগিল। খাইবার কোনও ঠিক ঠিকানা না থাকিলেও প্রতিদিন সকালে দুশো ডন বৈঠক দিয়া শরীরটাকে সে মজবুত করিয়াছে। দাঙ্গাহাঙ্গামাকে সে হাবুর মত ভয় করিবে নাকি! বলিল—বেশ, থাক্ তবে তুই এখানে দাঁড়িয়ে, তুই কেমন পাস্ আমি দেখবো। চল্ পঞ্চু, আমরা এগোই, ও থাক এখানে দাঁড়িয়ে—বলিয়া পঞ্চুর হাত ধরিয়া সে আগাইয়া যাইতেছিল; এমন সময় ওধারে কাঙালীদের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ননী থামিয়া পড়িল। ব্যাপারটা কি দেখিয়া লইবার জন্য পঞ্চুর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া লাফাইয়া উঁচু হইয়া একবার দেখিয়া লইল: ফটকের সামনে মল্লিক বাড়ীর দারোয়ান দুটো কম্বল বিলি করিতে শুরু করিয়া দিয়াছে। চারিপাশে কম্বল লইবার জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেছে। সেই জন্যই এত গণ্ডগোল। ননীর আর দেরী সহিল না, পঞ্চু ও হাবুর হাত ধরিয়া ভীড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।···

কতক্ষণ বাদে ভীড় কমিতে শুরু করিলে হাবু, ননী ও পঞ্চু এক একখানি করিয়া কম্বল লইয়া ভীড়ের বাহির হইয়া আসিল। হাবু একখানি লাল কম্বল পাইয়াছিল। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একবার সে দেখিল। টক্‌টকে লাল রংটা তাহার ভারী মনে ধরিল। আলোয়ানের মত করিয়া কম্বলখানি গায়ে জড়াইয়া পঞ্চুর পানে ফিরিয়া বলিল—দেখতো পঞ্চু আমায় কেমন দেখাচ্ছে?

পঞ্চু দেখিল হাবুর ফরসা চেহারায় লাল কম্বলখানি সুন্দর মানাইয়াছে, বলিল—বেশ?

ননীও দেখিল। নিজের কালো কম্বলখানা তাহার পছন্দ হয় নাই, সোজাসুজি বলিয়া বসিল—তোর কম্বলখানা আমার সঙ্গে বদ্‌লি করবি, হাবু ?

—বাঃ রে, তা কেমন করে হবে ?

—কিন্তু আমার কম্বলের রংটা কেমন কালো দেখ্‌ছিস্ তো ? কখ্‌খনো নষ্ট হবে না, আর তোর লাল রং, একটু ধূলো লাগলেই নষ্ট হয়ে যাবে।

—তা হোক্, আমার কম্বলের রংটা কিন্তু তোদের সকলের চেয়ে ভাল, এমন লাল রংয়ের মত রং আছে, তুই-ই বল ?

—বদ্‌লাবি কিনা তাই বল্ ?

—না, তোর ওই কালো কম্বলের সঙ্গে বদলাবো না।

—আমার জন্যেই কিন্তু কম্বলখানা পেলি !

—তাই বলে তোকে দিয়ে দিতে হবে নাকি ? আমি না এলে কি দিত ?

—আচ্ছা, একদিনের জন্যে বদল কর ?

—জোর করিয়া ঘাড় নাড়িয়া হাবু বলিল—না।

—আচ্ছা—বলিয়া ননী শসাইল। কিন্তু অত সহজে ভয় পাইবার ছেলে হাবু নয়। বয়স না হয় তাহার কমই হইল, কিন্তু বুদ্ধি তো ননীর চেয়ে কম নয়। তবে ননী যদি জোর করিয়া কম্বলখানা কাড়িয়া লয় এই ভাবিয়া সে ভীড়ের মধ্যে সরিয়া পড়িল।

কতক্ষণ বাদে গাড়ী বারান্দার নীচে ফিরিয়া আসিয়া পুরু কাগজখানি পাতিয়া হাবু শুইয়া পড়িল। কম্বলখানি গায়ে দিয়া তাহার বেশ গরম বোধ হইতেছিল। ইলেক্‌ট্রিকের আলো পড়িয়া লাল রংটা ঝল্‌মল্ করিতেছে, চোখ ঠিকরাইয়া যায়। যাহারা এমন কম্বলখানি দান করিল তাহাদের কত দয়া। কিন্তু ফুটপাতে শুইয়া এমন কালো কাপড় আর ছেঁড়া জামার উপর এই কম্বলখানি গায়ে দেওয়া মানায় না। কাল যেমন করিয়া হোক একখানা সাবান কিনিয়া লইয়া কাপড় জামাটা কাচিয়া ফরসা করিয়া লইবে। এবার সে একটু ভদ্র হইবার চেষ্টা করিবে। কাঙালীবৃত্তি আর ফুটপাতে শোয়া সে ছাড়িয়া দিবে। কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটা চাকরী জুটাইয়া লইয়া দু'পয়সা উপায় করিয়া সে ভদ্র হইবে। আজ তো সে নিজেকে ভদ্র বলিয়াই পরিচয় দিত, দামোদরের বন্যার সব ভাসিয়া গেল বলিয়াই না! মায়ের কথা হাবুর মনে পড়িল। মনে পড়িল ছোট ভাইটীর সঙ্গে পুকুরের জলে চোর চোর খেলার কথা ·····ভাবিতে ভাবিতে কোন এক সময় হাবু ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া হাবু স্বপ্ন দেখিল। দেখিল—একজন ষণ্ডামার্ক লোক তাহার কম্বলখানা কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। এক হাত দিয়া হাবুর হাত দুইটা সে মুচড়াইয়া ধরিয়াছে, করিবার মত কিছুই নাই।

স্বপ্ন দেখিয়া হাবুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখে সকাল হইয়া গিয়াছে, কম্বলখানা গায়ে ঠিকই আছে। হাবুর মুখে হাসি ফুটিল। উঠিয়া পড়িয়া কম্বলখানি একবার ভাল করিয়া ঝাড়িয়া লইয়া হাবু গায়ে জড়াইল। তারপর রাস্তার কল হইতে মুখ হাত ধুইয়া সে চলিল ননী ও পঞ্চুর সন্ধানে। সাবান কিনিবার জন্য তাহাদের কাছ হইতে সে আজ দু'পয়সা ধার লইবে। এখন কাচিয়া দিলে কাপড় জামাটা দুপুরের মধ্যেই শুকাইয়া যাইবে তারপর সে বাড়ী বাড়ী ঘুরিবে চাকরার সন্ধানে।

কতটুকুই বা পথ। কিন্তু এইটুকু আসিতেই কম্বলখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তিনবার সে গায়ে জড়াইল। ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া প্রতিবারই মনে হয় বুঝি ঠিক করিয়া জড়ানো হয় নাই। আবার খুলিয়া ফেলিয়া নতুন রকমে সে কম্বলখানি গায়ে জড়াইবার চেষ্টা করে। কিন্তু পরণের ময়লা কাপড় জামাটার জন্য ততবারই তাহার মন খুৎ খুৎ করিয়া ওঠে।

ঠিকানায় আসিয়া ননী কি পঞ্চু কাহাকেও হাবু দেখিতে পাইল না। এত সকালে আর কোথায় যাইবে নিশ্চয়ই লাহাবাড়ীতে জিলাপী খাইতে গিয়াছে ভাবিয়া ফিরিবার পথে সে লাহাবাড়ীর সামনে আসিল। ফটকের সামনে ফুটপাতের উপর দু সারি কাঙালী বসিয়া আছে কিন্তু ননী কি পঞ্চুকে দেখিতে পাইল না। দেখিল সকলেই তাহার কম্বলখানির পানে চাহিতেছে। ইচ্ছা হইল ইহাদের দলে ভিড়িয়া জিলাপী খাইয়া যায়, এমন কতদিন তো খাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ এমন কম্বলখানা গায়ে দিয়া ইহাদের মাঝে বসিতে তাহার ইচ্ছা করিল না। সে তো ঠিক করিয়াই ফেলিয়াছে আজ হইতে কাঙালীবৃত্তি ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবার জন্য সাবান কিনিবার পয়সা দুটী সে কোথায় পাইবে তাহাই ভাবিতেছিল, হঠাৎ পাশ দিয়া একজন ভদ্রলোককে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার একটা কথা মনে পড়িল। তাড়াতাড়ি লোকটীর কাছে ছুটিয়া গিয়া হাত পাতিল—বাবু একটা পয়সা, কাল সকাল থেকে কিছু খাইনি।

না-খাওয়ার কথাটী মিথ্যা, কিন্তু না বলিলে তো উপায় নাই, সাবান কিনিব বলিলে তো আর কেহ পয়সা দিবে না।

বাবুটী মুখ ফিরাইয়া একবার চাহিয়া দেখিল। তারপর একটী কথাও না বলিয়া গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল। হাবু কিন্তু ইহাতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হইল না, এমনি ব্যবহার তো সে কতবার পাইয়াছে। তাড়াতাড়ি সাম্‌নের আরেকজন বাবুর কাছে গিয়া সে হাত পাতিল—বাবু, একটা পয়সা ?

লোকটী দাঁড়াইয়া একটা সিগারেট ধরাইতেছিল বলিল—পয়সা কি হবে রে ? বিড়ি খাবি তো ?

—না বাবু, কাল সকাল থেকে কিছুই খাইনি !

—খাস্‌নি তো কম্বল কেনার পয়সা পেলি কোত্থেকে

—ওটা মল্লিকবাড়ী থেকে দিয়েছে বাবু।

—সেখানে গিয়েই খা'গে যা না ?

—সেখানে তো বাবু ছুটো তিনটের আগে কাঙালী বিদায় হয় না, এখন গেলে বসে থাকতে হবে।

—বেশ তোর কম্বলখানা বিক্রী করে দে'না, অনেক পয়সা পাবি!

—না বাবু, রাত্তিরে ভয়ানক শীত করে, ফুটপাতে শুয়ে থাকি।

—ফুটপাতে শুয়ে থাকিস কেন? কেউ নেই—বাপ-মা?

—বাবাকে তো দেখিনি, আমি যখন খুব ছোট, তখন তিনি মারা গেছেন। মা আর একটা ছোট ভাই ছিল, ও বছর দামোদরের বন্যায় ভেসে গেছে, তারপর কলকাতায় চলে এসেছি।

দেশে কেউ নেই বুঝি?

—আপনার জন আর কেউ নেই বাবু।

লোকটার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে হাবু, অনেকটা পথ আসিয়া পড়িয়াছিল, বলিল—দিন্ বাবু, একটা পয়সা?

ভদ্রলোক মনিব্যাগ খুলিয়া একটা পয়সা হাবুর হাতে দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—দেখিস্ বিড়ি খাসনে কিন্তু!

হাবু সে কথার জবাব দিল না। পয়সাটা ট্যাঁকে গুঁজিল। আরেকটা পয়সা হইলেই সে সাবান কিনিবে। তাড়াতাড়ি আরেকজন পথিকের সামনে গিয়া সে হাত পাতিল—বাবু, একটা পয়সা!

কিন্তু ছু'ঘণ্টা ধরিয়া লোকের পিছনে পিছনে ঘুরিয়াও আর কাহারও কাছ হইতে আরেকটা পয়সা হাবু আদায় করিতে পারিল না, শেষে সে ঠিক করিয়া ফেলিল এক পয়সা দিয়াই যেমন হৌক একখানি সাবান সে কিনিবে। কাপড়খানাই হয়তো তাহাতে ভাল পরিষ্কার হইবে না, তা না হৌক উপায় কি, আর পয়সা যখন পাওয়া গেল না। ভাবিয়া হাবু ফিরিল।

আসিতেছিল একটা গলির মধ্য দিয়া। আসিতে আসিতে দেখে একটা ছোট ছেলে একখানি সাবান ও আরো কয়েকটা সওদা লইয়া এদিকে আসিতেছিল। ছেলেটা কাছে আসিলে হাবু বলিল—সাবানটা আমায় দেবে খোকা, একটা পয়সা দোব?

—বাঃ রে, এর দাম যে চার পয়সা!

—আরো তিনটে পয়সা এখুনি তোমায় এনে দিচ্ছি!

—না। এখানা দিলে মা বকবে, তুমি মুদীর দোকান থেকে আর একখানা কিনে নাওগে না?

হাবু দেখিল এ সুযোগ হারাইলে চলিবে না। একবার দেখিয়া লইল গলির মধ্যে কেহই নাই। সরিয়া পড়িতে বেশীক্ষণ লাগিবে না। চট্ করিয়া ছেলেটির হাত হইতে সাবানখানি ছোঁ মারিয়া সে ছুটিল।

খোকার গলা পাইয়া খোকার বাবা পাশের বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ব্যাপার দেখিয়া সে হাবুর পিছনে তাড়া করিল—চোর—চোর!

গলির মোড় পার হইয়া কিছুদূর যাইতে না যাইতেই হাবু ধরা পড়িয়া গেল। চারিপাশে লোক জমিয়া হাবুকে প্রহার করিতে সুরু করিয়া দিল। মার খাইতে খাইতে হাবু বসিয়া পড়িল। হাতের সাবানখানা কোথায় ছিটকাইয়া গেল। জামাটা ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়িল। নতুন কম্বলখানা কখন যে কে কোন দিক দিয়া টানিয়া লইল হাবু জানিতেও পারিল না। মার খাইয়া খাইয়া তখন তাহার ঠোঁট কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে।

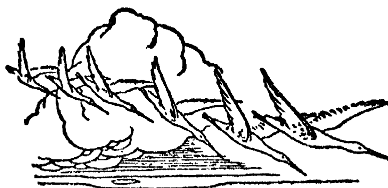
একজন পাহারাওলা গোলমাল দেখিয়া এদিকে আসিল। একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল একটা চোর ধরা পড়িয়াছে। শুনিয়া ভীড় সরাইয়া সে ভিতরে ঢুকিল, হাবু কাঁধ ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া বলিল—চল্ বেটা থানামে!

সামনের ভীড় সরিয়া গেল। সহসা একটা দমকা হাওয়ায় হাবুর শীত করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কম্বলখানি গায়ে জড়াইতে গিয়া দেখে কম্বলখানি নাই। কম্বল নাই দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। পিছনে তাকাইয়া পথের উপরেও কম্বলখানি পড়িয়া নাই দেখিয়া বিহ্বলভাবে পাহারাওলাটার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—আমার কম্বল?

হাবু থামিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া পাহারাওলাটা তাহার হাতে জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। হাবুর কোন কথাই সে শুনিল না।

হাবু কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার চোখের জলে, ঠোঁটের রক্তে এক হইয়া গেল।

[পৌষ, ১৩৪১] শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর



চন্দনপুরে

এক টাকা সাড়ে তিন আনার গোলমাল !

'আপ' ও 'ডাউন' ট্রেণে টিকিট বিক্রয় পাওয়া যাচ্ছে, ছাপ্পান্নখানা ; কিন্তু মাশুল বাবদ রয়েছে মোট একষট্টি টাকা দশ আনা।

নতুন বদলি হয়ে এসেই গুণোগার ! ষ্টেশনটি আবার এমন যে উশুল করবার যো নেই। পান আর মাছে কি হবে ? তা ছাড়া এখন খাবার লোকও ত—

খাতা থেকে মুখ না তুলেই 'ছোটবাবু' শ্রীরঞ্জন চৌধুরী হাঁকলেন—"এই ফত্রিঙ্গা—ফত্রি—উঃ ! যেমন মশার ডাক, তেমনই ডাকছে বেটার নাক।"

ছোটবাবুর তামাকের অভ্যাস আছে।

পিছনে তার-ঘরের দরজায় ফত্রিঙ্গা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। একে শীতকাল ; তার ওপর রাত তখন দুটো। কিছুক্ষণ আগে ডাকগাড়ী 'পাস্' হয়েছে, মালগাড়িখানাও বিঘাটি ষ্টেশন ধরে-ধরে। কাজেই ফত্রিঙ্গা নিশ্চিন্ত।

ছোটবাবু একবার ভাবলেন, নিজেই তামাকটুকু সেজে নেন। কিন্তু ইচ্ছাটা প্রবল হ'ল না। আবার খাতায় ঠিক দিতে আরম্ভ করলেন।

"এই ত টিকিটের হিসেব দিব্যি মিলে যাচ্ছে।" সহসা ছোটবাবুর শুষ্ক মুখের ওপর দিয়ে একটু বিষাদের হাসি খেলে গেল। মনে মনে বল্লেন—"তখন কি জানতাম, একদিন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ ষ্টেশন মাষ্টার হয়ে চন্দনপুর ষ্টেশনেই বদলি হয়ে আস্ব। ওঃ! সে কত বছর আগেকার কথা। তখন এখানে এমন বাঁধানো প্ল্যাটফরম্, পাকা ষ্টেশনঘর, ওয়েটিংরুম—কিছুই ছিল না। মাঠের মাঝখানে একখানা ছোট খড়ের ঘর, তার চাটাইয়ের বেড়া। পিছনদিকে পাশাপাশি দুটো খাদ জলে ভরা। তাদের মধ্যে কল্মি আর হেলঞ্চ বন। পাড়ের ওপর কাশের ঝাড়। খাদের ওপারে কোয়াটারস্ ;—দুটো খাদের মাঝ দিয়ে সেদিকে যাতায়াতের পথ। তার শেষে একটা বাঁকা নিম গাছ। প্ল্যাটফরম্টা ছিল এত নীচু—ট্রেণ থেকে নামবার সময় কয়েকবার ত পড়তে পড়তে রয়ে গেছি। সে সব দিন আর নেই ! হাঃ—হাঃ—অক্ষয় আর আমি—"

ফত্রিঙ্গা কম্বলটা গায়ে-মাথায় জড়িয়ে নিতে নিতে বললে—"কি বলছেন ? ইস্পিশ্যাল আস্ছে ?"

শ্রীরঞ্জনবাবুর চমক ভাঙল ; বল্লেন "না। একটু তামাক দিবি বাপ ?"

ষ্টেশন থেকে একটা কাঁচা-পাকা সড়ক চলে গেছে সোজা উত্তরে। সড়কটার দুপাশে ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল। তার মাঝে মাঝে চারা খেজুর, শিমুল, আম ও বাব্লা গাছ নানা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। সড়কের মাঝে দুটি খাল, গরুর গাড়ীর চাকায় তৈরী হয়েছে। দুপাশে মাঠ, মাঠের শেষে গ্রাম। সড়ক ধরে ক্রোশ দেড়েক ভাঙলেই চন্দনপুরের বিল। বিলটা শেষ হয়েছে একেবারে অক্ষয়দের গ্রাম মালাড়ার পুবে। ঐ মালাড়াতেই ছিল, শ্রীরঞ্জনবাবুর মামার বাড়ি।

ফত্রিঙ্গা তামাক এনে বল্লে—"নিন বাবু।"

শ্রীরঞ্জনবাবু হুঁকোটা নিয়ে মুচে ধরে একমনে টান্‌তে লাগলেন ; তাঁর বাঁ হাতখানা রইল খাতার ওপর। ক্রমে ধোঁয়ায় তাঁর মুখের চারধার ঢেকে গেল।

"অক্ষয়টা—হাঃ—হাঃ—একবার আখ-ক্ষেতে আ[খ] ভাঙতে গিয়ে—কি রে অক্ষয় ?—তুই ? এই রাতে— বস্—বস্। সে কি দাঁড়িয়ে থাক্‌বি ?" শ্রীরঞ্জনবা[বু] আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

অক্ষয় জিজ্ঞাসা করলে—"কবে এসেছিস ?"

"দুটো রাতও কাটেনি। তোর চিঠি পেয়েছিলাম। ক গোলমাল গেল ক'দিন ! উত্তর দেওয়া হয়নি। দেখদে[খি] ভাই কি গ্রহের ফের ! সেই চন্দনপুর ষ্টেশনেই এলা[ম] ছোটবাবু হয়ে ? তারপর কি খবর ? কিন্তু এই রাতে তুই—?"

অক্ষয়ের আপাদ-মস্তক ঢাকা, কেবল মুখখানা খোলা তাঁর স্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ দুটোকে আরও উজ্জ্বল বো[ধ] হচ্ছে ; বল্লেন—"রঞ্জন, তোর চুল সবই পেকে গেছে—"

"পাক্‌বে না ? কত বয়স হ'ল বল দেখি ? তা ছাড়া— কিন্তু তোর চেহারা বেশ আছে। বস্‌ছিস্ না কেন ?"

অক্ষয় টেবিলের কাছ থেকে হাত কয়েক দূরে সরে গি[য়ে] টিকিট বাক্সের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। শ্রীরঞ্জ[ন]বাবুর মনে হ'ল, অক্ষয়ের ব্যবহারে আন্তরিকতা নেই, যে[ন] যেন একটু দূরে সরে গেছে ; বল্লেন—"তামাক খা[বি]? ওহো ! আমি ভুলেই গেছি, এই বদ্ অভ্যাসটা তু[ই] করিসনি। হ্যাঁরে অক্ষয় ! বিলের ধারে বটতলায় সে[ই] পোড়ো মন্দিরটা এখনও আছে ? মাঠের ধারের সে[ই] সেই আমগাছ ক'টা ? আমার মামাদের ভিটে ?"

অক্ষয় ঘাড় নেড়ে জানালেন—হাঁ। তারপর জিজ্ঞাস[া] করলেন—"তুই সপরিবারে এসেছিস ?"

"নাঃ। নতুন জায়গা—সব দেশে। আমাদের দেশে[র] কথা তোর মনে পড়ে ?"

"হাঁ। সেই চিঁড়ে, গুড়, নারকেল আর সকলের ওপর কাকীমার যত্ন এখনও ভুলতে পারিনি।"

মায়ের কথা মনে পড়ে গেল ; শ্রীরঞ্জনবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ; তারপর বল্লেন—"যখন দেশে যাব ওদের আন্‌তে, আসবার সময় তোর জন্য চিঁড়ে, গুড়, নারকোল এলে মালাড়ায় গিয়ে দিয়ে আসবো—"

"কিন্তু আমি ত আর ওখানে নেই।"

"সে কি? কোথায় আছিস? তোর স্ত্রী ছেলে-মেয়ে—?"

"তারা সকলেই আছে। কেবল আমিই চলে এসেছি—"

"এই বয়সে রাগ করে বিবাগী হয়েছিস? কার ওপর রাগ—স্ত্রীর না ছেলের?"

"কারো ওপরেই আমার রাগ নেই। আর থাকতে পারলাম না।"

"কোথায় যাচ্ছিস্? এ কি ছেলেমানুষী? সে হবে না—টিকিট ত আমার হাতে। ছাড়ছি না। বাড়ি না যাও, এখানে থাক। হতভাগারা এল বলে, তোর খোঁজে। আমি নিজে যাব তোর সঙ্গে—"

অক্ষয় একটু হাস্‌লেন; তাঁর চোখে-মুখে নির্লিপ্ত ভাব।

শ্রীরঞ্জনবাবু বললেন—"কোন গুরু পাক্‌ড়েছ বুঝি? তিনি কানে মন্ত্র দিয়েছেন—কা তব কান্তা?···"

ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠল—ঠং-ঠং-ঠং। বাইরে কোথায় কাকও ডাকছে। দূরে রেল-লাইনের ধার থেকে একপাল শিয়াল ডেকে উঠল—রাত শেষ হয়ে এল।

"দাঁড়া ভাই। কাজটা সারি—ভোরের গাড়ীর সময় হ'ল" বলে ছোটবাবু তাড়াতাড়ি উঠে হাত থেকে হুঁকোটা টেবিলের পায়ার গায়ে হেলান দিয়ে রেখে টেলিফোনের কাছে গেলেন। তারপর ফোন ধরে হাঁকলেন—"হ্যাঁ—কি?—লেট হয়নি? আসছে? ওরে ফত্রিঙ্গা—এই ফতে! গাড়ীর ঘণ্টা দে।"

সেখানকার কাজ সেরে টিকিটবাক্‌সের দিকে যেতে যেতে বললেন—"তারপর ব্যাপারটা কি খুলে বল্‌ত।" এবং অক্ষয়ের দিকে চোখ তুলে দেখেন, সেখানে অক্ষয় নেই! এদিক ওদিক তাকালেন, কোথাও তাকে দেখতে পেলেন না। দেখলেন, বাইরে যাবার দরজার কাছে বসে ফত্রিঙ্গা তার বিছানাটা গুটিয়ে নিচ্ছে! শ্রীরঞ্জনবাবুর বিস্ময়ের সীমা থাক্‌ল না। ঘরের দুটি দরজা, দুটি জানালাই ত বন্ধ। টিকিট দেবার ঘুলঘুলিটাও আঁটা।

শ্রীরঞ্জনবাবু ফত্রিঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাবুটি কোথায় গেলেন দেখেছিস্?"

"কৌন্ বাবু?"

"যে বাবু একটু আগে এসেছিলেন?"

"কৌনো বাবু ঘরমে ঘুষা নেহি—"

শ্রীরঞ্জনবাবু তাড়াতাড়ি তার ঘরের মধ্যে গিয়ে ঘর-খানা পরীক্ষা করে এলেন। সেখানেও অক্ষয় নেই!

ফত্রিঙ্গা ঘণ্টা দিচ্ছে; পয়েন্ট্‌সম্যান ফাগু এসে সিগ্‌নালের তালার চাবি নিয়ে গেল।

শ্রীরঞ্জনবাবু অন্যমনস্কের মত টিকিট বাক্‌সের ডালাটা খুল্‌লেন, টিকিট দেবার ঘুলঘুলিটার ঢাকা সরিয়ে নিলেন। তৎক্ষণাৎ সেখান দিয়ে একখানা কালো হাত ভেতরে এল, ওপাশ থেকে হাতের মালিক বললে—"বাবু, ষষ্ঠিপুর সাড়ে তিন খানা—"

তারপরই শোনা যেতে লাগ্‌ল টাকা-পয়সার শব্দ, টিকেটে ছাপ দেবার আওয়াজ—ঘটাং—ঘটাং—ঘটাং—

হাতের মালিক বল্‌লে—"বাবু! দুটো পয়সা কম নেন্। গরীব মানুষ!"

"ধ্যৎ! কৈ হে আর কে আছ? এই সরে যাও ওখান থেকে।"

টিকিট দিতে দিতে শ্রীরঞ্জনবাবু নিজের মনেই বলে উঠ্‌লেন—"তখন নিশ্চয়ই আমার তন্দ্রা এসেছিল। তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখেছিলাম।"

স্থির করলেন, অক্ষয়কে তাঁর আগমন-সংবাদ জানিয়ে চিঠি দেবেন। তবুও তিনি মনে শান্তি পেলেন না।

ক্রমে টিকিট দেওয়া শেষ হ'ল। ওদিকে তখন পূব দিক ফরসা হয়ে এসেছে। গাড়ির হুইসিল শোনা গেল।

শ্রীরঞ্জনবাবু কম্ফর্টারের ওপর মাথায় গোল টুপি চড়িয়ে কলম হাতে প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে দেখলেন, গাড়ি হোম-সিগন্যাল পার হচ্ছে। ঐ ঝিকমিক করছে ইন্‌জিনের আলো।

আবার ঘণ্টা পড়ল। দেখতে দেখতে গাড়ি এসে থাম্‌ল। যাত্রীরা উঠছে, নামছে, ছুটছে, চীৎকার করছে; দরজা বন্ধ হচ্ছে, খুলছে। চারধারে ব্যস্ততা ও শব্দ। শ্রীরঞ্জনবাবু গার্ডের গাড়ির কাছ থেকে মাথার ওপর হাত নেড়ে, হাঁক্‌লেন—"ঘণ্টা—।"

ঘণ্টা পড়ল, গার্ড হুইসিল দিতে দিতে লণ্ঠন দোলাতে লাগ্‌ল, ইন্‌জিন হুইসিল দিয়ে সশব্দে চল্‌তে আরম্ভ করল। শ্রীরঞ্জনবাবু জন দুই যাত্রীর কাছ থেকে টিকিট সংগ্রহ করে ষ্টেশন ঘরের দিকে অগ্রসর হতে লাগ্‌লেন।

এদিকে পূবের আলো ততক্ষণে আকাশ বেয়ে পশ্চিমে পৌঁছেচে, নীচের অন্ধকার গলে পাতলা হয়ে উবে যাচ্ছে; কিছুদূরের মানুষকে বেশ চেনা যায়।

শ্রীরঞ্জনবাবু দেখলেন, একটি যুবক, তার পাশে একটি কিশোরী, তাদের পাশে একজন লোক আসছে। লোকটার মাথায় বিছানা ও ট্রাঙ্ক। তারা সেই ট্রেণ থেকেই নেমেছে। তারাও ষ্টেশন ঘরের দিকে আসছিল। তার গায়েই ষ্টেশন থেকে বা'র হবার দরজা।

তারা তিনজনে শ্রীরঞ্জনবাবুর কাছাকাছি হতেই তিনি তাদের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখ্‌লেন। দেখেই বলে উঠলেন—"অক্ষয়ের জামাই না? ঐ ত ওর পাশে কমলা। আর ঐ যে ওদের রাখাল, মধু। নিশ্চয়ই অক্ষয় এসেছে। আমি স্বপ্ন দেখি নি। কিন্তু সে পালাল কেন?" তারপর উঁচু গলায় বল্‌লে—"বাবাজী যে? ভাল ত? মা কমলা!"

অক্ষয়ের জামাতা বাবাজী ও মেয়ে কমলাও এবার তাঁর দিকে ভাল করে তাকালে।

জামাতা বাবাজী নমস্কার করে বললে—"আজ্ঞে হাঁ।"

কমলা তাঁর মেয়ে গৌরীর বয়সী। গৌরী নেই! তিনি বল্‌লেন—"কেমন আছ মা? তোমার বাবা ত—"

কমলা তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতেই

তিনি দেখলেন, তার দু'চোখে জল টল টল করছে। তিনি বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে বলে উঠ্‌লেন—"তোর চোখে জল কেন মা?"

জামাতা বাবাজী বল্‌লে—"জানেন না? সাত দিন হ'ল শ্বশুর মশায় স্বর্গারোহণ করেছেন—"

"কি?"

"সাত দিন হ'ল মারা গেছেন—"

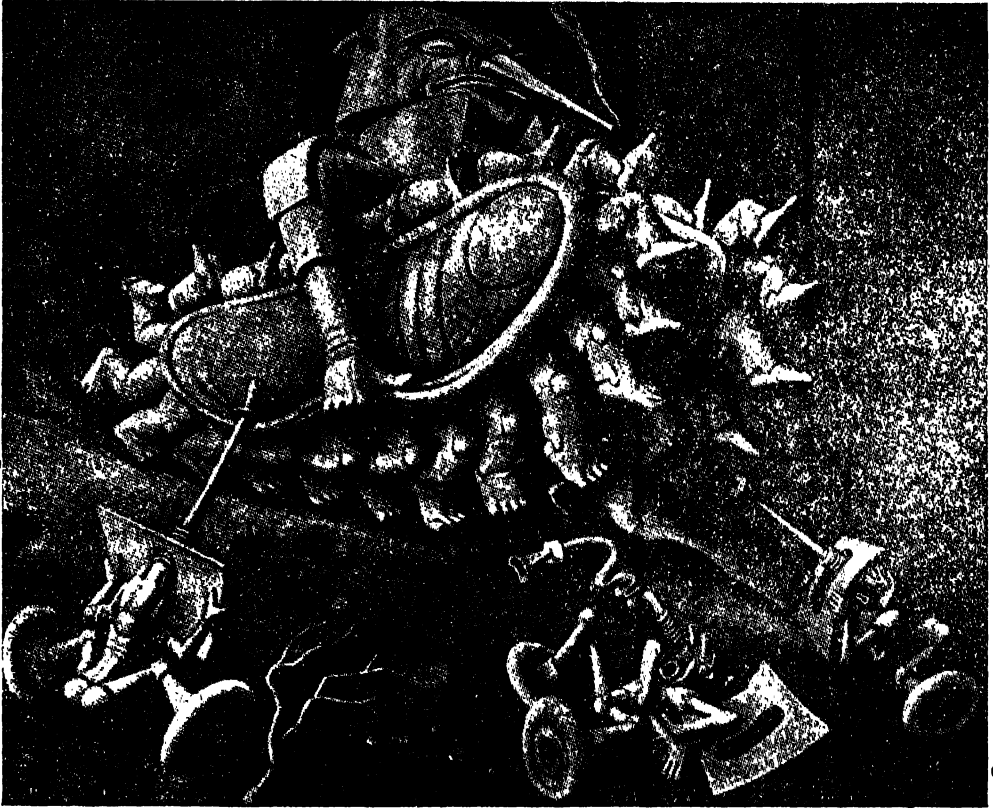
"কিন্তু—আমি যে"—শ্রীরঞ্জনবাবুর মুখ দিয়া আর একটি কথাও বার হ'ল না। ক্ষণিকের জন্য তিনি স্মৃতির মাঝে চেতনা হারিয়ে ফেল্‌লেন। সহসা ফত্রিঙ্গার ডাকে ফিরে দেখেন, জামাতা বাবাজীরা তিনজনে গেট পার হয়ে, পথের ধারে একখানা ছই-ওয়ালা গরুর গাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না; ষ্টেশন ঘরের দিকে চলতে লাগলেন।

সেদিন কোয়াটারসে যাবার আগে তিনি এক টাকা সাড়ে তিন আনার হদিস্ পেলেন. কিন্তু অক্ষয়ের সঙ্গে নিশীথে সাক্ষাৎ—স্বপ্ন কি সত্য, তার মীমাংসা করতে পারলেন না।

[চৈত্র, ১৩৪৬] শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ট্যাঙ্ক ও ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান



বিখ্যাত আমেরিকান শিল্পী বোরিস্ আরৎসিব্যাশফ্ অঙ্কিত ট্যাঙ্কের ও কামানের ব্যঙ্গচিত্র। বিরাটকায় ট্যাঙ্ক নিজের পদভরে মেদিনী কাঁপিয়ে চলেছে—কোন দিকে কিছু গ্রাহ্য নেই। তাকে চারদিক থেকে আক্রমণ করেছে বিধ্বংসী কামানেরা। এইরূপ ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনে মার্কিন-শিল্পী সিদ্ধহস্ত।



অক্সফোর্ডের চিঠি

তোমাদের কাছে অক্সফোর্ড সহরের গল্প করেছি—এবার বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রদের জীবনের সম্বন্ধে কথা বলব। এই ছাত্রদের নিয়েই তো অক্সফোর্ডের গৌরব। বিশ্ববিদ্যালয় ওখানে না থাকলে কি তোমরাই ওর কথা জানতে? সুন্দর সহর তো দুনিয়ায় অনেক আছে, আর মধ্য যুগের যারা—তার পরিচয় ইউরোপের আরো অনেক জায়গায় বেরলে মেলে। কিন্তু অক্সফোর্ডের তুলনা এক অক্সফোর্ড। কত শতাব্দীর ছাত্রদের সুখ দুঃখ নিয়ে, কত সত্যের সাধনায় যে সে ধনী, তার কি হিসাব আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় বলতেই তোমরা ভাব যে আমাদের দেশের মতন বুঝি কতগুলি স্কুল কলেজ রয়েছে—সেখানে এসে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ে। মাষ্টার মশায়রা পড়িয়ে যান—ছাত্রদের কাজ সে পড়া শোনা, মনে রাখা। তারপরে যখন শোন যে অক্সফোর্ড রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটী, অর্থাৎ সেখানে পড়তে হলে সেখানেই থাকতে হয়, তখন স্বভাবতই প্রথম প্রশ্ন হয়—ও, তাহলে বুঝি ছেলেমেয়েদের জন্য অনেকগুলি হষ্টেল আছে, সেখানে থেকে তারা কলেজে পড়ে? তা আমাদের দেশেও তো অনেক ছেলেমেয়ে হষ্টেলে মেসে থেকে স্কুল কলেজে পড়ে—অক্সফোর্ডেও বুঝি তাই?

আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়—কারণ পড়ার চেয়ে অক্সফোর্ডে থাকাটাই বেশী দরকার!! তোমাদের বোধহয় মনে আছে যে এখানে ছুটী ২৮ সপ্তাহ—Term বা কলেজের সময় ২৪ সপ্তাহ। আর সে ২৪ সপ্তাহও বেশীর ভাগই যে কেমন করে কেটে যায় তার হিসাব রাখা কঠিন। পড়ালেখা যা করবার তা ওই ২৮ সপ্তাহ ছুটীর মধ্যেই করতে হয়। তোমরা ভাবছ যে সে আবার কেমন? এ যে একেবারে উল্টো কথা। কোথায় ছুটীর সময় হেসে খেলে বেড়িয়ে বেড়াব, না তখনই করতে হবে পড়ালেখা, আর কলেজের সময়ই সময় কাটবে অন্যভাবে! এ ভারী মজার দেশ।

সত্যিই ব্যাপারটা প্রথম দেখলে মজারই লাগে। কেম্ব্রিজে ঐ একই নিয়ম—আর সেখানকার কলেজের এক কর্তা একবার বলেছিলেন—কেম্ব্রিজে—সে তো লেখা-পড়ার বা পরীক্ষা পাশের জায়গা নয়—সেখানে এসে ছেলেরা তিন বছর থাকে। আর এই থাকাটাই হল তাদের প্রধান শিক্ষা; তাই বলে যে টার্মের সময় লেখা-পড়া কেউ করে না, তা নয়—কারণ প্রতি সপ্তাহে একবার করে সপ্তাহের কাজকর্ম্ম বুঝিয়ে দিতে হয়। আর সেখানে ফাঁকি চালানো সহজ নয়। কেমন করে কাজের হিসাব নেওয়া হয়, সে কথা পরে বলছি।

হষ্টেল মেস নেই। তাহলে ছেলেরা থাকে কোথায় ভাবছ? কেন, কলেজগুলো রয়েছে কি করতে? ওখানে কলেজগুলির উদ্দেশ্যই হল যে ছেলেরা সেখানে বাস করবে—মাষ্টারেরাও তাই। ক্লাস্-ঘরে বা লেক্চার হল কোন কোন কলেজে নেইই—বেশীর ভাগ কলেজে একটি বা দুটী ঘর হয়তো আছে, সেখানে লেকচার বা বক্তৃতা হয়। বাকী সব ঘরগুলোতে ছেলেরা থাকে, মাষ্টারেরা থাকেন। বক্তৃতা টক্তৃতা যখন দেওয়া হয়, তখন সেগুলি খাবার ঘরেই হয়—প্রতি কলেজের ডাইনিং হল বা ভোজনাগারই হ'ল প্রধান বক্তৃতাশালা।

কাজেই ক্লাশ করে যে ওখানে পড়বার রীতি নেই সে কথা বুঝতেই পারছ। ঘরই নেই; ক্লাস বসবে কোথায়? আর সেতো আমাদের দেশ নয় যে বাইরে মাঠে বা গাছের তলায় বসে গেল।

তা করতে গেলে শীতে জমে বরফ হয়ে যাবে। কাউকে আর পড়ালেখা করতে হবে না। কাজেই পড়ালেখা ছেলেদের প্রত্যেককে নিজেকেই করতে হবে—তার অসুবিধাও নেই—প্রত্যেকের নিজের ঘর রয়েছে, সেখানে বসে পড়, আর নইলে ইচ্ছে হয় তো সব লাইব্রেরী রয়েছে, সেখানে গিয়ে লেখাপড়া কর। র‍্যাডেক্লিফ বলে একটা যায়গা আছে, ছেলেরা ওকে আদর করে বলে র‍্যাডার। অক্সফোর্ড ছাত্রদের বোধ হয় এটা তীর্থস্থান

বল্লেও অত্যুক্তি হয় না—কারণ দলে দলে ছেলেমেয়েরা ওখানে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়। খোলে সকাল দশটায় আর বন্ধ হয় রাত্রি দশটায়—তার মধ্যে যতক্ষণ খুশী গিয়ে পড়ালেখা কর। চাঁদা নেই, কোন বাধা নিষেধ নেই, ইচ্ছে করলে প্রায় যে কেউই সেখানকার সভ্য হতে পারে, আর ইংরিজি ভাষায় এমন বই নেই যে ওখানে মেলে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বইয়ের বিষয় তো নিয়মই রয়েছে যে বই বের হলে প্রকাশকদের ওখানে একখানি পাঠাতেই হবে।

তা বইয়ের না হয় বন্দোবস্ত হ'ল, কিন্তু ছেলেরা না পড়লে সে বই ধুয়ে তো আর বিদ্যা হবে না! লাইব্রেরীর আলমারীতে তো কত বইই থাকে, তাই বলে কি সবাই পণ্ডিত হয়ে যায়? তাই ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা করছে কিনা তার উপর একটু চোখ রাখবার জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে টিউটোরিয়াল বা ছাত্র মাষ্টারের একটা বোঝা-পড়া হয়। মাষ্টার মশাই তাকে কোন একটা বিষয় দিয়ে দেন; বলেন যে সে সম্বন্ধে পড়াশোনা করে ছাত্র তার নিজের একটা মতামত দাঁড় করাবে, পরে সেই মতামত লিখে নিয়ে সে এসে মাষ্টারকে শোনাবে; মাষ্টার তার সমালোচনা করবেন। সে বিষয়ে কি কি খোঁজ কোথায় পাওয়া যায় সেটা অবশ্য মাষ্টারই বলে দেন। আর এরকম করে পড়ায় ফাঁকি চলে না। কারণ ছেলেরা এক বা দুজন করে মাষ্টারের কাছে গিয়ে এদের বিদ্যাবুদ্ধি জাহির করে। কোথাও থেকে টুকে যে লিখে নিয়ে যাবে, তারও উপায় নেই, কারণ না হয় টুকলই, কিন্তু সেটা পড়বার পর যখন টিউটর তার সমালোচনা স্বরু করেন, তখন ছেলেকে তো নিজের কথা সমর্থন করতে হবে! আর একা যায় বলে চুপ করে সকলের মধ্যে বসে থেকে মাষ্টারের দৃষ্টি এড়ানোও সম্ভব নয়।

এসব টিউটোরিয়াল হয় মাষ্টারের ঘরে—একটা আরাম কেদারা বা সোফায় টিউটর বসে পাইপ টানতে থাকেন—ওটা অক্সফোর্ড মাষ্টারদের প্রায় অপরিহার্য্য আনুসঙ্গিক—ছেলে বা ছেলেরা এসে আগুনের ধারে চেয়ারটা টেনে বসে—ছেলেদের মধ্যেও অনেকেই পাইপ ভক্ত, তাহলে তার পকেট থেকে পাইপটা বের করে, তা নইলে ধূমপায়ী হলে মাষ্টারই অনেক সময় সিগারেট টিগারেট খেতে দেন। তোমরা ভাবছ এ আবার ব্যাপার কী? ছাত্র খাবে মাষ্টারের সঙ্গে এক সাথে চুরোট!! কিন্তু ও বিষয়ে কোন সঙ্কোচ নেই—যদি খাবে তো সবার সামনেই খাও, তা নইলে খেয়ো না। আর একদিক থেকে বোধ হয় সেটাই ভালো—তার ফলে ছেলেদের মধ্যে লুকিয়ে কিছু করবার প্রবৃত্তি থাকতে পারে না, সাহসও তাতে অনেক বেড়ে যায়। তাই বলে সবাইকে যে চুরোট খেতে হবে, এমন কোন কথা নেই, ওখানেও অনেকেই খায় না; আর বিশেষ করে আজকাল মেয়েরা যে পরিমাণে সিগারেট খেতে [illegible] করেছে তাতে ছেলেদের মধ্যে অনেকেই ওটা মেয়েলী বলে খাওয়া ছেড়ে দিচ্ছে! আর সত্যি সত্যি স্বাস্থ্যের দিক থেকে তো সিগারেট খাওয়া একেবারেই ভালো নয়—বাহাদুরীও ওতে বিশেষ নেই।

এভাবে পড়ালেখার রীতি বলে ছেলেমেয়েরা খুব আত্ম-বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ, বই-পত্র ঘেঁটে একটা নিজের মত খাড়া করা—এটাই একটা মস্ত বড় শিক্ষা। তারপরে সেই নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় টিউটরের সঙ্গে আলোচনা—তাতেও কম উপকার হয় না। একেই তো নিজের চেয়ে বড় ও বিদ্বান লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় অনেক শেখবার আছে—আর সেই কথা-বার্ত্তা যখন ঘণ্টাভর একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে সমান সমান ভাবে হয়, তখন তার উপকার আরও বেশী। নিজের বুদ্ধির ওপর তাতে নির্ভর বেড়ে যায়, কেবল কতগুলি পুঁথি গিলে তা দিয়ে চলে না।

এটাই হ'ল বিলেতের শিক্ষার বিশেষত্ব। ওখানে ছেলেবেলা থেকেই ছোটরা নিজেরা ভাবতে শেখে, নিজেদের মতামত, নিজেদের যুক্তি দিয়ে দাঁড় করতে চায়। মাষ্টার মশাই এসে বলে গেলেন, আর ছাত্রেরা বেদবাক্য বলে তা মেনে নিল। এটা মোটেই ওদের লেখাপড়ার ধরণ নয়, আর তা করলে মানুষের বুদ্ধি সহজ ভাবে বাড়বে কি করে?

আগে যে বলেছি যে লেকচার-টেকচার বা ক্লাস ওখানে বেশী নেই, তার কারণও এইখানে পাওয়া যায়। কারণ লেকচারে গিয়ে ছেলেরা মাষ্টারের কথা না শুনে নিজেরা গিয়ে লাইব্রেরীতে পড়ুক এটাই ওরা বেশী চায়। সে সম্বন্ধে তোমাদের কাছে আরো অনেক বলবার রইল—পরে সে সব হবে।

[ফাল্গুন, ১৩৩৯] হুমায়ুন কবির

ইউরোপের চিঠি

মৌচাকের পাঠক-পাঠিকা—আমার ছোট ভাইবোন-গুলি,—কিছুদিন আগে আমি সুইজারল্যাণ্ডে গিয়েছিলুম। সুইজারল্যাণ্ড হচ্ছে ইউরোপের মধ্য প্রদেশ; আমাদের যেমন বিন্ধ্য পর্ব্বত, ওদের তেমনি আল্পস্ পর্ব্বত। আল্পসের শাখা-প্রশাখায় দেশটা ছেয়ে গেছে, আর সেই সব শাখা-প্রশাখার মাঝে মাঝে এক একটি হ্রদ। দেশটি যেমন সুন্দর তেমনি স্বাস্থ্যকর। বৎসরের অধিকাংশ দিন বরফ পড়ে বা বরফ থাকে, পাহাড়ের চূড়া থেকে ঘরের আশপাশ অবধি কেবল সাদা মখ্‌মলের মতো বরফ বিছানো! আমাদের দেশে যেমন "চল্‌তে গেলে দল্‌তে হয় রে দুর্ব্বা কোমল" ওদের দেশে তেমনি চল্‌তে গেলে দল্‌তে হয়, দুগ্ধফেননিভ রাশি রাশি বরফ। রাস্তার ওপরে ধুলোর মত বরফ গুঁড়ো জমে রয়েছে, তার ওপরে পা ফেল্‌তে মায়া হয়, চক্‌খড়ির গুঁড়োর ওপর হাঁটবার সময় যেমন মনে হয় সেইটে একবার কল্পনা করো, কেমন মস্ মস্ মুড় মুড় করতে থাকে। যে বরফ আমরা ঘোলের সরবতের সঙ্গে খাই এ বরফ তেমন কঠিন তেমন নিরেট নয়। এ বরফ যখন পড়ে তখন পেঁজা তুলোর মতো খুব আস্তে আস্তে খুব মোলায়েম ভাবে পড়ে, ভোর বেলাকার শিউলি ফুলের মতো নিঃশব্দে। বরফ পড়বার সময় বাইরে বেরিয়ে আরাম আছে, অবশ্য সর্ব্বাঙ্গ গরম পোষাকে মুড়ে, পায় ডবল্ বুট চড়িয়ে এবং মাথায় টুপী পরতে না ভুলে। বৃষ্টিতে তো অনেক ভিজেছ, একবার যদি বরফে ভিজ্‌তে তো জান্‌তে কেমন ফুর্ত্তি। তবে মুস্কিল এই যে পা পিছ্‌লে আছাড় খাবার সম্ভাবনা প্রতি পদেই। এতো আর জল নয় যে মাটীতে পড়ে স্রোত হয়ে পথ কেটে যায় যাবে, দাঁড়াবে না। এ হচ্ছে বরফ, এ যেখানে পড়ে সেখান থেকে নড়বার নাম করে না, যতদিন না সূর্য্যের উত্তাপ লেগে গলে যায়। ঘরের জানালা খোলা রাখলে আর রক্ষে নেই, রাজ্যের বরফ এসে তোমারি ঘরে জড়ো হবে, তোমার ঘরে যদি খাবার জল থাকে, তো সে জল জমে বরফ হয়ে যাবে, যদি দুধ থাকে তো দুধেরও সেই দশা। ঘরের দরজা জানালা প্রায় সারাক্ষণই বন্ধ রাখ্‌তে হয়, অবশ্য বাতাসের জন্য ফাঁক রেখে! ঘরে সেন্‌ট্রাল হীটিংএর ব্যবস্থা থাকে, তার মোটামুটি মানে এই যে ঘরটাকে কৃত্রিম উপায়ে গরম রাখা হয়। বিছানা খুব পুরু করে পাতা দরকার, লেপ, কম্বল এক দঙ্গল! ঘরে বসে জানালার কাঁচ দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে পারো—যতদূর চোখ যায় বরফ আর বরফ, "কোথায় এমন তুষার ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে! ও সে—মাটীর উপর ঢেউ খেলে যায় বরফ কাহার দেশে!" সূর্য্যের আলো যখন সেই বরফের ওপর ঝক্‌মক্ করে সাত রঙে বিভক্ত হয়ে যায় আর চাঁদের আলো যখন সেই বরফের ওপর মুক্তোর মতো দাঁত বের করে হাসে, তখন সে যে কী অপূর্ব্ব স্বপ্নের মতো মনে হয়, যেন দুধ-সাগরের কূলে এসে পৌচেছি, তার ওপারে রাজ-কন্যার ঘুমন্ত পুরীর দেউড়ীতে পর্ব্বত পাহারা দিচ্ছে, পঙ্‌ক্তের পাগড়ীতে সাপের মাথার ফণির মতো জ্বলছে আকাশের তারা। আঁধার রাতে সমস্ত প্রান্তর খাঁ খাঁ করতে থাকে, আর বরফের ওপরে চোখ ফেল্লে মনে হয় যেন মড়ার মাথার-খুলি; মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে কম্বলের ভিতর থেকে মুখ বার করে তাকাই, আর জানলার সার্শীর ওপরের দৃশ্য চোখে পড়ে যায়, মা গো, সে কী ভয়ানক! কী নিঃঝুম! যেন জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর বেলার রোদ্দুর ডিসেম্বর মাসের রাত্রের বেলা বরফ সেজে এসেছে; যেন দ্বাপর যুগের পুতনা রাক্ষসী সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে যোজন জুড়ে পড়ে রয়েছে, যেন হাজার হাজার জোনাকী তারার মুখোস পরে আকাশময় উড়ে বেড়াচ্ছে। তক্ষুনি চোখ বুঁজে মুখের ওপর কম্বল টেনে দিই। তারপরে আবার যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন শুয়ে শুয়ে ঘরের আয়নার দিকে চেয়ে দেখি ভোরের সূর্য্য আকাশ আলো করে পাহাড়ের শিখরে সোণার কাটি ছুঁইয়ে দিয়ে বলছে—'জাগো।"

তখন দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে বোতাম টিপে দিই; দাসীর ঘরে ঘণ্টা বেজে ওঠে, সে গরম জলের পাত্র নিয়ে দ্বারের ওপাশ থেকে টোকা দিলে ফরাসা ভাষায় বলি "আঁত্রে" (প্রবেশ করিতে পারো); ঘরে ঢুকে সে বলে "বঁ ঝুর্, মশিয়া (সুপ্রভাত, মহাশয়); সে চলে গেলে মুখ ধুই, প্রাতঃকৃত্য করি, তারপর আবার বোতাম টিপ্‌লে সে এসে "ব্রেকফাষ্ট" দিয়ে যায়। "ব্রেকফাষ্ট" সাধারণতঃ দুধ, "রোল্" (রুটি), মাখন, জ্যাম। সুইজারল্যাণ্ডের দুধ খেতে এত সুন্দর, তার একটা নিজস্ব সুগন্ধ আছে যা অন্য কোনো দেশের দুধে নেই, তার রংটিও তার নিজস্ব। তার সুইস্ "রোল্" তো সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, শুকনো অথচ শক্ত নয়; চিম্‌সে নয়, মুখ দিতে না দিতেই মিলিয়ে যায়, অনেকক্ষণ ধরে চিবোতে হয় না, জ্যাম না মাখালেও মিলিয়ে গিয়ে মিষ্টি লাগে। আর সুইজারল্যাণ্ডের মাখনটিও খেতে এমন সুন্দর, পারী (Paris)র মাখনের মতো পান্‌সে নয়, লণ্ডনের মাখনের মতো নোন্‌তা নয়, যেন সদ্য প্রস্তুত টাট্‌কা জিনিষ, কৌটায় বন্দী বহুদূর থেকে আনীত নয়। সুইজারল্যাণ্ডের হাওয়ার প্রভাবে বোধ হয় সব জিনিষই শুষ্কতাপন্ন; লণ্ডন পারীর হাওয়ার দোষে সব জিনিষই কতকটা স্যাঁৎসেঁতে। তফাৎটা যেন ছোট নাগপুরের সঙ্গে বাংলাদেশের তফাৎ।

লণ্ডন থেকে সুইজারল্যাণ্ডের পশ্চিমপ্রান্ত যেন

কল্‌কাতা থেকে কাশী। মাঝখানে ফরাসীদের দেশ ফ্রান্স্‌। সুইজারল্যাণ্ডে যেতে হলে পারী (Paris) হয়ে যেতে হয়, লণ্ডন থেকে পারী যাবার দু'টো উপায় আছে—একটা হচ্ছে ট্রেণে করে কিছুদূর, স্টীমারে করে কিছুদূর এবং আবার ট্রেণে করে বাকীটা; আরেকটা হচ্ছে এরোপ্লেন করে সমস্ত পথ। পারী থেকে বরাবর ট্রেণ। ইউরোপটা আমাদের ভারতবর্ষের মতো, আর ইংলণ্ড হচ্ছে আমাদের সিংহল। ভারতবর্ষের আসাম থেকে গুজরাটে যাওয়া আর ইউরোপের স্পেন্‌ থেকে সুইডেনে যাওয়া একই রকম ব্যাপার—কেবল মাঝে মাঝে শুল্ক বিভাগের আম্‌লারা এসে বাক্স খুলে দেখে কোনো রকম মাশুল দেবার মতন জিনিষ লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কিনা আর পাস্‌পোর্ট পরীক্ষা করে দেখে বিদেশে ভ্রমণ করবার অনুমতি পেয়েছি কিনা। এ সব ব্যাপার বড় অপ্রীতিকর, একবার নয় দু'বার নয় চারবার এই হাঙ্গাম। আসাম থেকে গুজরাট যেতে চাও তো আরামে যেতে পারো, কিন্তু স্পেন থেকে সুইডেনে যেতে চাইলে পাঁচ সাতবার পাস্‌পোর্ট্‌ খুলে দেখাতে হবে। ঝক্‌মারী! মাশুল দেবার মতন জিনিষ সব দেশে এক নয়, ইংলণ্ডে যা স্বচ্ছন্দে আন্‌তে পারো ফ্রান্সে তা নিতে চাইলে মাশুল দিতে হবে। সুইজারল্যাণ্ডে যাবার সময় যে কাম্‌রাটায় যাচ্ছিলুম সেই কামরাটায় একজনের সঙ্গে কিছু সিগার ছিল, সুইস সীমান্তে এসে সে সেগুলোর কিছু নিজের পকেটে, কিছু আলাপীদের পকেটে, কিছু সীটের নীচে, "বাঙ্কে"র ওপরে চট্‌পট্‌ সরিয়ে ফেল্লে। শুল্ক বিভাগের আম্‌লারা যখন এল তখন সে অম্লান বদনে বল্লে, "না, আমার কাছে নিষিদ্ধ কিছু নেই"; তারা চলে গেলে আলাপীদের পকেট থেকে সিগারগুলি উদ্ধার করে তাদের এক একটি খাওয়ালে, আর খুব এক চোট হেসে নিলে। ফ্রান্সের ইতালীর সুইজারল্যাণ্ডের লোক খুব আলাপী ও মিশুক প্রকৃতির। ইংরাজরা ওদের মতো ট্রেণে উঠে বক্‌বক্‌ করে না।

সুইজারল্যাণ্ডে পৃথিবীর সব দেশের লোক হাওয়া বদ্‌লাতে যায়, যক্ষ্মারোগ সারাতে যায়, বরফের ওপর স্কী খেল্‌তে, স্কেট্‌ কর্‌তে হয়। প্রতি বৎসর লাখ লাখ বিদেশী গিয়ে সুইজারল্যাণ্ডের হাজার হাজার হোটেল দখল করে বসে, তাদের দৌলতে সুইজারল্যাণ্ডের মতো পাহাড়ী দেশের গরীব অধিবাসীরা বড় মানুষ হয়ে গেল। যেন সারা বৎসর মহোৎসব চলেছে, দীয়তাং আর নীয়তাং, টাকাং দীয়তাং আর সেবাং নিয়তাং।

"ব্রেকফাষ্টে"র পরে কি হয় তোমাদের তা বলিনি। "ব্রেকফাষ্টে"র তিন ঘণ্টা পরে "লাঞ্চ্‌" (মধ্যাহ্নে ভোজন)। ততক্ষণ সবাই নিজের নিজের কাজে বা খেলায় লেগে যায়। বরফ ঢাকা রাস্তার ওপর দিয়ে, কেউ বা যায় চাকা-বিহীন "শ্লেজ" গাড়ী পিছ্‌লিয়ে, কিম্বা চাকা-বিহীন "লুজ্‌"-পিঁড়ি পিছ্‌লিয়ে, রাস্তার এক পাশ দিয়ে কেউ বা চলে স্নো-বুট্‌ পরা পায় হেঁটে। বরফ ঢাকা মাঠের ওপরে খেলা জমে—মোচার খোলার মতো এক প্রকার সরঞ্জাম পায় বেঁধে স্কী খেলা, উল্টো প[া] দু'খানা খড়মের মতো এক রকম সরঞ্জাম পায়ে পরে স্কেট্‌ করা। আরো কত রকম খেলা আছে। ইউরোপের খোকাখুকী থেকে বুড়োবুড়ী পর্য্যন্ত সবাই খেলোয়াড়। আমার হোটেলে দু'টি আমেরিকান মেয়ে ছিল ওরা একা একা আমেরিকা থেকে জাহাজে চড়ে এসেছে, এসে ওদের মা'র সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ওরা রোজ যেত স্কী খেল্‌তে বা স্কেট্‌ করতে; পুরুষদের মতো খেলার পোষাক পরে। শুধু আমেরিকান কেন, সব দেশের মানুষ সুইজারল্যাণ্ডে দেখা যায়। আমার হোটেলে যারা থাকত তাদের দেশ দেখা হতো "লাঞ্চ" খাবার ও "ডিনার" খাবার ঘরে। "ডিনার" মানে রাত্রি ভোজন। তারপরেও কেউ কেউ "সাপার" খায় কিন্তু সাধারণের পক্ষে "ডিনার"ই শেষ খাওয়া। এক টেবিলে বসে অনেকজন মিলে "লাঞ্চ" বা "ডিনার" খায়, নানা দেশের লোক, জার্ম্মান ফরাসী ইংরেজ ইতালিয়ান চেক্‌ হাঙ্গারিয়ান ইত্যাদি। ভারতবর্ষের সব প্রদেশের লোক কোনো দিন এক সঙ্গে খায় কি? তোমরা কি তোমাদের স্বদেশবাসী—কানাড়ী মালয়ালী সিন্ধী নেপালীদের সঙ্গে বসে খেতে পাও! কিম্বা তোমাদের আপন প্রদেশের বেনে বাগ্‌দী নমঃশূদ্রদের সঙ্গে সামাজিক ভোজে যোগ দিতে পাও? ইউরোপের লোক এক হবার যত সুযোগ পায় আমরা তত পাইনে।

লাঞ্চের পর আমরা পাহাড়ের ওপর ওঠে বনের ভিতর দিয়ে বরফের ওপর আছাড় খেতে খেতে অন্য গ্রামে বেড়িয়ে আস্‌তুম, আমি যে গ্রামটাতে ছিলুম সেটার নাম লেঁজ্যা; সেখানে তোমাদের সুপরিচিত মনীন্দ্রলাল বসু থাকেন। ইউরোপের গ্রামগুলো শহরগুলোর চেয়েও আরামের। শহরের সব সুবিধাই গ্রামে আছে। বেড়াতে বেড়াতে তেষ্টা পেলে কাফেতে বসে কাফীর ফরমাস করো কাফেতে চুমুক দিতে দিতে দু' ঘণ্টা বসে থাকলেও কেউ কিছু বলবে না। কাফেটা সাধারণ লোকের ক্লাবের মতো সেখানে গিয়ে যতক্ষণ খুশী আড্ডা দাও, বই পড়ো, তাস খেলো, কাফীর জন্য দু'চার আনা পয়সা ধরে দিলেই সাত খুন মাপ! কুলী মজুরেরাও দিনের কাজের শেষে খেয়ে দেয়ে কাফেতে গিয়ে মদের গ্লাস নিয়ে বসে, তাদের অবশ্য স্বতন্ত্র কাফে। ছাত্রেরা কাফেতে গিয়ে কাফীর পেয়ালার সামনে পাঠ্যপুস্তক খুলে বসে, তাদেরও তেমনি নিজেদের পৃষ্ঠপোষিত কাফে। কাফেতে নাচ গানও হয়।

এতক্ষণ তোমাদের শুধু খেলার দিকটা দেখিয়েছি কাজের দিকটা দেখাইনি। ইউরোপের লোক প্রাণপণে খাটে। দারুণ শীতের মধ্যেও কুলীরা মাটী খুঁড়ছে, চাষার চাষ করছে, দোকানীরা দোকান চালাচ্ছে। কাজের সময় অবিশ্রান্ত কাজ, খেলার সময় অবিশ্রান্ত খেলা। আমাদের সেই হোটেলের দাসীটি ভোর থেকে মাঝ রাত অবধি কত রকমের কত খাটুনী যে খাটত, দেখে অবাক হয়ে যেতুম



আগমনী



শীতের কাশ্মীর

অথচ তার মুখে কথা নেই, বিরক্তির চিহ্ন নেই, হাসি লেগে রয়েছে। ইউরোপের লোক খুব কষ্ট পাবার সময়েও হাসি বাঁচিয়ে রাখে। লেজ্যাঁতে যক্ষ্মারোগীদের যে সব ক্লিনিক আছে সেগুলিতে যে সব রোগী তিন বছর একই ভঙ্গীতে শয্যাশায়ী ভাবে পড়ে আছে, তাদের দেখলে মনে হয় না যে তারা একটুও দুঃখিত বা চিন্তিত। জীবনটাকে খুব হালকা ভাবেই ওরা নিচ্ছে, যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ। কয়েকটি ক্লিনিকে যক্ষ্মা রোগী ছেলেমেয়েরা শয্যাশায়ী। নানা দেশের ছেলেমেয়ে—ফিন্‌ল্যাণ্ড থেকে পর্ত্তুগাল অবধি ইউরোপের মানচিত্রে যতগুলো দেশ দেখছ, সব দেশের বালক বা বালিকা প্রতিনিধিরা সেখানে একজোট হয়েছে, এদের দিয়ে নতুন ইউরোপ এক হয়ে গড়ে উঠছে। সুইজারল্যাণ্ডে রুগ্ন ছেলে মেয়েদের জন্য আন্তর্জ্জাতিক স্কুল আছে, সূর্য্যালোক ও মুক্ত বাতাসের মধ্যে তারা স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা লাভ করে। ইউরোপের ইস্কুলগুলিতে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজও শেখানো হয়। ড্রিল ইত্যাদি কসরৎ তো শেখানো হয়ই, সেই জন্য ইউরোপের ইস্কুলকে পাঠশালা বল্লে তার ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না; পাঠশালা তো বটেই নাটশালাও বটে, আবার হস্ত-শিল্পের কারখানাও বটে। ছেলেরা বাড়ীতে পড়ে না, যতটুকু পড়াবার ততটুকু ইস্কুলে গিয়ে পড়ে। ছেলেরা ত বই মুখস্ত করবার যন্ত্র নয় যে সকাল দুপুর সন্ধ্যা কেবল ঐ কর্ম্মই করবে? খেলাও ওদের একটা কর্ম্ম, ওদের বয়সে খেলাটাই বরং মুখ্য, পড়াটা হচ্ছে গৌণ।

সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফেরবার পথে একটি ইংরেজ বালকের সঙ্গে দেখা। সুইজারল্যাণ্ডে স্কী খেল্‌তে স্কেট্ করতে গিয়েছিল, সুইজারল্যাণ্ডটা হচ্ছে ইউরোপের Play-ground, বিশেষতঃ শীতকালে। ডোভারে ট্রেনে ওঠবার পর তার সঙ্গে আলাপ। বল্লে, "চা খেয়েছেন? চা আন্‌তে দেবো?" বল্লুম—"এই মাত্র খেয়ে এলুম, ধন্যবাদ।" সে ট্রেণের দেয়ালের বোতাম টিপতেই রেঁস্তরা কারের ওয়েটার এল, তাকে নিজের জন্যে চায়ের ফরমাস দিলে। ইতিমধ্যে এক ফরাসী যুবক এসে জিজ্ঞাসা করেছেন, "জায়গা হবে কি?" আমরা বলেছি, "ঠিক একটি জায়গা খালি আছে, আপনাকে দিয়ে আমরা তিন জন হবো!" ফরাসীটি এসে বস্‌বামাত্র তাকেও জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "চা খেয়েছেন? আনতে দেবো?" তার সম্মতি নিয়ে তার জন্যে চা আনতে দিলে, কিন্তু চা আর আসে না! নিজের চা'টা ভদ্রলোককে খেতে অনুরোধ করে সে একখানা বই খুলে পড়তে আরম্ভ করে দিলে। অনেক দেরিতে চা যখন এল তখন নিজের টোষ্ট নিয়ে তাঁকে খাওয়ালে। তারপর তিন জন মিলে গল্প। ছেলেটি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতুহলী হয়ে অনেক খবর জান্‌তে চাইলে, জানালুম কিন্তু শেষকালে আমাকে বল্লে, "আপনি আমাকে নিরাশ করলেন, আমি ভেবেছিলুম আপনি যখন ভারতবর্ষের লোক তখন কিছু না হোক দু'চারটে ভেল্কী ভোজবাজী বল্‌বা মাত্রই দেখাবেন। কিন্তু আপনি বলছেন ও সব কিছু জানেনই না, যদিও ইস্কুলে আমরা পড়েছি আপনারা জানেন।" অগত্যা সে নিজেই আমাকে একটা সস্তা বিলিতী মজলিসী খেলা শিখিয়ে দিলে; কাগজে কলমে নক্সা কেটে খেল্‌তে হয়। ফরাসীটিও দেশলাইয়ের ওপর দেশলাইয়ের কাটি সাজিয়ে কি একটা কৌশল শেখাতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ট্রেন এসে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে লাগল।

[বৈশাখ, ১৩৩৫] শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়



সুইজারল্যাণ্ডের ছেলেমেয়ে

তুষারিকা

প্যারিস্ তখনো জাগেনি। রাস্তাগুলো সব্ ঘুমন্ত,—সাড়াশব্দ নেই। আটটার কাছাকাছি রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছলুম; তার দু' মিনিট পরে পৃথিবীর সব্‌চে সুন্দর সহর পিছনে ফেলে রেখে ট্রেণ পুবের দিকে যাত্রা করল।

বেলা দুপুর। কাচের জান্‌লায় কুয়াশার পর্দ্দা জমেছে। তার ফাঁক্ দিয়ে চেয়ে দেখি, আকাশের প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড একটা প্রান্তর দেখা যায়। কোথাও রুক্ষ, কোথাও ঈষৎ সবুজ, বরফের স্পর্শে কোথাও একেবারে বিবর্ণ। ইউরোপের সুপ্রসিদ্ধ 'রাপিড এক্‌স্‌প্রেস্' বিদ্যুতের মত ছুটে চলেছে; গতিবেগে সমস্ত ট্রেণটা কাঁপছে, বিনা অবলম্বনে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। বেলা শেষে ফ্রান্সের সীমান্ত পিছনে প'ড়ে রইল। আমরা বরফের দেশে প্রবেশ করলুম।

মাঠভরা বরফ; গাছের গায়ে বরফের সাদা পোষাক; মাটির বুকে যেন কোটি কোটি কুন্দফুল ছড়ানো। দেখলুম, বাস্তব কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। যে সৌন্দর্য্য দেখবার আশা ছিল তার চেয়ে ঢের বড় সৌন্দর্য্য দেখলুম। লণ্ডনের হ্যাম্পষ্টেডে (একটা পাড়ার নাম) একটা পুকুর আছে; ছোট ছেলেরা তাতে পাল-তোলা নৌকা ভাসায়; হঠাৎ একদিন দেখি, পুকুরের সব জল জমে গেছে! তাতে আর নৌকা ভাসানো চলে না, কিন্তু খেলা চলে। সুতরাং ছোট বড় ছেলেমেয়ে সবাই জুতোর নীচে চাকা বেঁধে পুকুর-ভরা বরফে স্কেটিং সুরু ক'রে দিয়েছে। কিন্তু লণ্ডনের সে বরফ আর সুইজারল্যাণ্ডের বরফে কোন তুলনাই হয় না। সব্‌চে বড় তফাৎ এই,—একটার সীমা আছে। আর একটার সীমা নেই। সারা সুইজারল্যাণ্ড একটা প্রকাণ্ড তুষারমরু। মরুভূমির গঠন যেমন বালি দিয়ে, এর গঠন তেমনি কণা কণা তুষারে। মরুভূমিতে যত গরম, এতে তত শীত। এ শীতের পরিচয় পাওয়া গেল লেজাঁ পৌঁছে। এগল্ থেকে গাড়ী বদল ক'রে পাহাড়িয়া ট্রেণে খাড়া উপরে উঠতে হয়। কতকটা দার্জ্জিলিংয়ের মতন। লেজাঁয় যখন নামলুম রাত তখন ন'টা। ছোট একটা ষ্টেশন, তাতে তিনটি মাত্র ঘর। চেয়ে দেখি যে ক'টা 'স্লে' (sledge) ছিল সব একে একে যাত্রীদের নিয়ে চলে গেল, তাদের শুধু একজন ভরসা দিলে, শীঘ্রই ফিরে আসবে। 'স্লে' আমাদের দেশের এক্কার মতন,—ঘোড়ায় টানে, তবে তার একটাও চাকা নেই। মসৃণ বরফে বিশ চাকায় খুব জোরে ছুটে চলে। এ ছাড়া বরফের উপর আর কোনো গাড়ী চলতে পারে না।

অজানা জায়গায় নিতান্ত অচেনা ভাবে যাবার ভারি এক মজা আছে। সুতরাং আমি যাবার আগে লেজাঁয় কোনো খবর পাঠাইনি। একটা হোটেলের ঠিকানা জানা ছিল; সেখানে গিয়ে দেখি, কোনো ঘর খালি নেই। তারপর গভীর রাতের কন্‌কনে শীতে অন্য হোটেল খোঁজের পালা। শেষে যেখানে গিয়ে উঠলুম, দেখি, সেখানে নববর্ষ উপলক্ষে উৎসব চলেছে; ফ্যান্সি ড্রেস্ (অর্থাৎ বহুরূপীর সাজ) প'রে ছেলেমেয়েরা নাচতে সুরু ক'রে দিয়েছে। সকাল উঠে শুনলুম, সমস্ত রাত সে নাচের বিরাম হয়নি।

তারপর বরফের সঙ্গে আরো নিবিড় পরিচয়। সাদার মাঝে সবুজ,—বরফের মাঝে পাইন্ বন। একে অন্যের শোভা বাড়িয়েছে। এখানে এসে ছোট বড় সবাই ছেলেমানুষ হয়ে যায়, আমরাও বাদ যাইনি। পাহাড়ের ঢালু রাস্তায় ছুটতে সুরু করা গেল। পায়ের তলায় বরফ —মাথায় অজস্র বরফ্ ঝরছে; দেখতে দেখতে আমাদের টুপি, ওভারকোট সব সাদা হয়ে গেল। আমরা তখন যেন উত্তর মেরুর মানুষ,—বরফের ঘরে বাস, জীবনে কখনো যেন গ্রীষ্মের মুখ দেখিনি। মাঝে মাঝে আছাড় খাওয়াও বাদ পায়নি; তাতে আরো আনন্দ! বরফের নরম কোলে আঘাত লাগে না। "রমলার" রচক শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রলাল বসুকে তো তোমরা চেন,—তিনি আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়, সুতরাং দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারলেন না,—পেছিয়ে গেলেন।

ইউরোপের মেয়েদের বরফের দেশে দেখতে ভারি চমৎকার লাগে। ছেলেদের মতন 'ব্রীচেস্' পরেছে, গায়ে লাল সোয়েটার, মাথায় তেম্নি লাল কান্-ঢাকা উলের টুপি। যে বয়সে আমাদের দেশের খুকিরা বেণী দোলানো ছেড়ে মাথায় ঘোম্‌টা টান্‌তে শেখে এবং দেখতে দেখতে খুকীর মা হয়ে পড়ে, সেই বয়সের সুইস্ খুকীরা এখানে কি তুমুল সাহসে ski করছে! জুতোয় 'স্কি' পরার সরঞ্জাম বেঁধে বরফের উপর দিয়ে বিদ্যুতের মত ছুটে যাচ্ছে। পদে পদে ভয়ানক আছাড় খাবার ভয়, এবং আচম্‌কা পড়লে হাত্ পা ভাঙবার সম্ভাবনা। সেদিকে ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই, যে আনন্দ পাচ্ছে তার দিকেই দৃষ্টি, যে দুঃখ পেতে পারে তার জন্য কোনো চিন্তা মনে আসে না। এই 'স্কি' পরা মেয়েদের দলে একজন ভারতীয় মেয়েও আছেন। তিনি মারহাট্টি তাই এত সাহস!

বরফের মোহ যত নিবিড় তত গভীর নয়; দু' দিনেই কেটে যায়। তখন মনে হয় এর চেয়ে লণ্ডন প্যারিস্ ভাল —জীবন যেখানে লক্ষ কোটি স্রোতের ধারায় ছুটে চলেছে। বরফের যেন একটা বৈরাগ্য আছে; অথচ নির্ব্বিকার, আজ যেমন কালও ঠিক তেম্নি। ধ্যানমগ্নের মত। এত নীরবতা ভাল লাগে না, তাই একদিন সকালে উঠে 'স্লে' ডাকিয়ে সবার কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা করা গেল রেলওয়ে ষ্টেশনের উদ্দেশে।

[বৈশাখ, ১৩৩৬] শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

কাশ্মীরের কথা

কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যের কথা শোনেনি কিম্বা পড়েনি এমন লোক আমাদের দেশে খুব কমই আছে; কিন্তু এই সুন্দর দেশ স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটেছে। ভারতের একপ্রান্তে পাহাড়ের কোলে এই অপরিজ্ঞাত দেশের সৌন্দর্য্য যারা দেখেনি তাদের কাছে কোন সুপটু চিত্রকর সুনিপুণ তুলিকায় এই দেশের সুষমা কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারবে না।

এবার পূজার ছুঠিতে কাশ্মীর দেখবার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। কলকাতা থেকে সোজা লাহোর; লাহোরে গাড়ী বদলিয়ে রাওলপিণ্ডি। পিণ্ডি থেকে মোটরে কাশ্মীর যেতে হয়। পিণ্ডি থেকে কাশ্মীর ২০০ মাইল। ট্যাক্সিতে গেলে একদিনে, আর বাসে গেলে দুই দিনে শ্রীনগরে পৌছন যায়। এই দুশো মাইল পথ ভারী চমৎকার। পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা; পাহাড়ের অনেক নীচে উজ্জ্বল রুপোর মত নদী এঁকে বেঁকে লীলা-ভরে খেলা করতে করতে চলেছে—তার কলগীতি যাত্রীদের পথশ্রমকে লাঘব করে দেয়। আশে-পাশে কাছে-দূরে নানান রকম গাছের শ্রেণী। ঘন পাইন বন, দেওদার-বন, ফার গাছ, চারিদিকে শ্যামল শোভা ছড়িয়ে দিয়েছে।

শ্রীনগর পৌছে আমরা ঝিলাম্ নদীর উপর হাউস বোটে আশ্রয় নিলাম। প্রকাণ্ড হাউস বোট—নাম Jasmine flower (যুঁই ফুল)। এতে নানা আসবাবপত্র ও কার্পেট ঢাকা ড্রইং-রুম, ডাইনিং-রুম, ও তিনটি শোবার ঘর ছিল। সমস্ত ঘরে ইলেক্‌ট্রিক লাইট—বোটের ছাদে ছোট একটা ফুলের বাগান।

কাশ্মীরের প্রাচীন মোগল উদ্যান, তুষার মণ্ডিত পাহাড়, সূর্য্যাস্তের অপরূপ শোভা, রঙ্গীন ফুলে ঢাকা মাঠ, উপত্যকার শান্ত শোভা যুগযুগান্ত ধরে দুরদেশী পথিকদের মন হরণ করে আসছে; আমাদেরও মন হরণ করে নিল।

ভোরে যখন প্রথম রঙ্গীণ আলো আকাশে ফুটে উঠেছে কিম্বা বৈকালে যখন অস্তগামী পড়ন্ত সূর্য্যের আলোতে ঝিলম্ নদী ঝলমল করছে তখন বহুদূরে পাহাড়ের চূড়ায় বরফের শোভা দেখতে দেখতে 'শিকারায়' হেলান দিয়ে ভেসে বেড়ানো যে কি আনন্দ তা যারা অনুভব করেছে তারাই জানে।

শ্রীনগরে ঝিলম্ নদীর শোভা অফুরন্ত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 'শিকারায়' চড়ে নদী বেয়ে স্কুলে চলেছে। দোকানীরা নৌকা বোঝাই পশরা নিয়ে বোটে বোটে নানারকম জিনিষ বিক্রি করে বেড়াচ্ছে। ফলওয়ালা ফল নিয়ে চলেছে—নদীর দুই ধারে ঘাটে ঘাটে শিশুর কলরবে মুখরিত। ভোরে স্নানার্থী ও স্নানার্থীনীদের আগমনে সব ঘাট মুখরিত। নদী বেয়ে অজস্র হাঁসের সারি চলেছে। সকালে, সন্ধ্যায়, বিকেলে—সব সময় শান্ত মধুর ভাব। হট্টগোল নাই, চিৎকার নাই,—পৃথিবীটা অত্যন্ত শান্ত ধীর গতিতে চলেছে।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যার ছায়া ঝিলম্ নদীর বুকে নেমে আসে; নদীর দুধারে 'চেনার' গাছে বাতাসের সর্‌সর্ আওয়াজ কানে ভেসে আসে, নদীর বুকে হাউস বোটের অসংখ্য আলোর প্রতিবিম্ব জলে ফুটে ওঠে; নদীর ক্ষীণ স্রোতে শান্ত জোৎস্নার আলো চিক্ চিক্ করে ওঠে। মধ্যে মধ্যে পাশ দিয়ে কোন ভাসমান দূর যাত্রীর বাঁশীর সুর ক্ষীণ হতে ক্ষণতর হয় অদৃশ্যে মিলিয়ে যায়। নদীর বুকে বিদেশী যাত্রীর দিন এমনি সব দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলে।

শ্রীনগরের একদিকে ডাল হ্রদ—পাঁচ ছয় মাইল জোড়া এই হ্রদ। হ্রদের জল পরিষ্কার, চিত্রিত দর্পনের মত স্থির। চারিদিকের পাহাড়ের স্থির ও চলন্ত মেঘের ছাব সব সময় হ্রদের বুকে প্রতিফলিত। বৈকালে পড়ন্ত রঙ্গীন আলো ও মেঘের লুকোচুরির খেলা শান্ত হ্রদের বুকে প্রতিফলিত হয়ে অপূর্ব্ব শোভায় ফুটে ওঠে।

একদিন ডাল হ্রদে আমরা প্রায় ১২।১৪ মাইল শিকারায় ঘুরে এলাম। হ্রদের একধারে অসংখ্য পদ্মের বন। বসন্তকালে যখন লক্ষ লক্ষ পদ্ম ফুটে ওঠে তখন শোভায় সমস্ত তীর ঝলমল্ করে। জলের গভীরতা নাই—অথচ এমন স্বচ্ছ যে শেষ পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। নানারকম আগাছা ও ঝাঁঝিতে হ্রদের তলা প্রায় ঢাকা—এর মধ্যে মাছের সারি চলেছে। দূরে ধারে ধারে হ্রদের বুকে ভাস-মান বাগানে নানা রকম চাষ-আবাদ চলেছে। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডাল হ্রদের রঙ্গীন সন্ধ্যা একটা শ্রেষ্ঠ জিনিষ।

হ্রদের একধারে সহর থেকে ৭।৮ মাইল দূরে কয়েকটা মোগল উদ্যান। মোগল সম্রাটরা কাশ্মীরের অনুপম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে এখানে কয়েকটা বাগান তৈরী করে-করেছিলেন। এ বাগানগুলো এখনও আছে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে নিশাৎ বাগ, শালিমার বাগ ও নিশিম্ বাগ। নিশাৎ বাগের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। আমরা নিশাৎ বাগের অপরূপ ফুল-শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এত রকম ফুল এবং অসংখ্য রকম রং ভারতবর্ষের আর কোন বাগানে দেখা যায় না। রংয়ের বাহারে আমাদের চোখ ঝলসে উঠল। ফুল ছাড়া, চেরী, আপেল, আখ-রোট, পিয়ার—ইত্যাদি নানা ফলে বাগান শোভিত।

শ্রীনগরে ঝিলম্ নদীতে যে শোভা আছে—সহরের ভিতরে তা নাই। সহরটি অত্যন্ত পুরোনো ও নোংরা। নদীর দুই ধারেই এই সহর। পর পর সাতটি সেতু সহরের

দুই ধারের সঙ্গে যোগ রেখেছে—সাত নম্বর সেতুর কাছে ঝিলমের জল বন্ধ রাখা হয়। মধ্যে মধ্যে জল ছেড়ে দেওয়া হয়।

সমস্ত কাশ্মীর উপত্যকা একটা ওভ্যাল টেবিলের মত—এক দিকে ৮০ মাইল আড় দিকে ২০ মাইল লম্বা। চারিদিক প্রকাণ্ড পাহাড়ের সারিতে ঘেরা। বনশ্যামল পাহাড়গুলো নেমে নেমে উপত্যকার সঙ্গে মিশে গেছে। পাহাড়ের চুড়োয় দিগন্তব্যাপী চির তুষারের রাজ্য—তার উপর ক্রমাগত ছায়া সুষমার খেলা—নিচে পাহাড়ের গায়ে গায়ে বিভিন্ন রংয়ের মেলা। উইলোশ্রেণী, বাদামী ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ, পিচ গাছ, শরষে ফুলের চোখ ঝলসানো রং, সাদা লাল রংয়ের টিউলিপ মধ্যে মধ্যে খুবানী, ম্যালবেরি গাছের বাগান। সমস্ত বন উপবন পাখির কুজনে মুখরিত। প্রকৃতির তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য বিছিয়ে কাশ্মীরে এই অনুপম উপত্যকায় বসে আছে!

শ্রীনগর থেকে ২৫ মাইল দূরে—গুলমার্গ। ৮,৯০০ উঁচু পাহাড়ের উপর ছোট একটা সমতল ভূমিতে এই পাড়াগাঁ। গুলমার্গের চার ধারে পীর পাঞ্চাল পাহাড়ের শ্রেণী—আর মধ্যে মধ্যে 'মার্গ' অর্থাৎ পাহাড়ের চূড়া। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় শাদা বরফ, পাহাড়ের গা বেয়ে সুন্দর ঘাসের গালিচা, চারিদিক অসংখ্য ফুটন্ত পাহাড়ী ফুল। এ দিকে সার দিয়ে 'ফারের' শ্রেণী চলেছে। এই ফার শ্রেণীর ভিতর দিয়ে চলতে চলতে চোখের সামনে দূরে পাহাড়ের উপর সূর্য্যালোকে তুষার-শ্রেণী ঝলসিয়ে উঠে। সাহসী যাত্রীরা ঘোড়া ও তাঁবু নিয়ে পাহাড়ের কোলে কোলে পাহাড়ী ফুলে ঘেরা মাঠে তাঁবু ফেলে প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চলে। আমরা যখন গুলমার্গে গেলাম, তখন শীতের আরম্ভ। গ্রাম পরিত্যক্ত, একটীও জনপ্রাণী নাই; সমস্ত বাড়ী শূন্য ও বন্ধ। আমরা কয়েকজন এই শূন্য গ্রামের মাঝে দাঁড়িয়ে দূরে তুষার মণ্ডিত পীর-পাঞ্জালের দিকে তাকিয়ে প্রকৃতির এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। আর কয়েকদিন পরে সমস্ত গুলমার্গ তুষার ঢাকা হোয়ে যাবে। তখন সাহসী যাত্রীরা ঢালু জমির উপর দিয়ে বরফের উপর "শী" (ski) খেলায় মত্ত হোয়ে উঠবে।

গুলমার্গের শী (ski) খেলার মাঠে বসে আমি তুষার ঢাকা পীর-পাঞ্চাল পাহাড় শ্রেণীর উপর সূর্য্যাস্তের শোভা দেখতে লাগলাম। আমার সাহসী বন্ধুটী ঘোড়ায় চড়ে বরফ ছোঁবার আশায় দূরে উঁচুতে খিলান-মার্গের দিকে চলে গেলেন।

শ্রীনগর থেকে কাছে ও দূরে দেখবার জায়গা অনেক আছে। এ সব জায়গায় ঝিলম্ নদী বেয়ে বোট নিয়ে নদীর দুধারের সৌন্দর্য্য অনুভব করতে করতে যাওয়া যেতে পারে কিম্বা সহর থেকে মোটরেও যাওয়া যায়। ডাল হ্রদ ছাড়া ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় উলার হ্রদ, মানসবল্, গন্ধর্বল হ্রদেও অনায়াসে যাওয়া যেতে পারে; তা ছাড়া শ্রীনগর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে পাহলগাম—একটী সুন্দর জায়গা। কাশ্মীর যাত্রীরা সবাই এই স্থানের সৌন্দর্য্য দেখবার জন্য যায়। এখান থেকে অমরনাথ তীর্থক্ষেত্রেও যাওয়া যেতে পারে।

আমরা গিয়েছিলাম শীতের আরম্ভে—কাশ্মীরের শীতের সৌন্দর্য্য বসন্তকালের চেয়ে অন্য রকম। ডাল হ্রদে পদ্ম ফুল নাই, গোলাপ ফুলের পাতা শুকিয়ে গিয়েছে। চেনারের পাতা হলদে হোয়ে খসে পড়ছে, পপলারের শুকনো পাতায় রাস্তা ছেয়ে গেছে। কিন্তু দূরে ইস্‌লামবাদে চোখ ঝল্‌সানো জাফ্‌রাণ ফুলের মেলা বসেছে। আসন্ন শীতের ভয়ে পাখীরা কোথায় উড়ে গিয়েছে। কিন্তু পাহাড়ের চূড়ায় তুষার-শ্রেণীতে ছায়ালোকের খেলা চলেছে। মাঠে ঘাসের গালিচা ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত। দুই দিন পরে নদীতে জলের উপরে বরফের 'পলি' পড়বে। সাহসী যাত্রীরা তুষার স্রোত (glacier) দেখবার জন্যে দুর্গম পথে চলে যাবে। পেঁজা তুলোর মত তুষারপাতে পথ ঘাট ছেয়ে যাবে। এই তুষার সৌন্দর্য্য কি দুঃসাহসিক যাত্রীর কাছে বসন্ত-শোভার চেয়ে কোন অংশে কম?

ফিরবার সময় অন্য পথে এলাম। এবারে মোটরে শ্রীনগর থেকে একেবারে লাহোর—প্রায় ৩০০ মাইল। পথে বানিহাল-পাস্, কাশ্মীরের রাজধানী জম্মু, গুজরানওয়ালা, শিয়ালকোট পড়ল। এখানেও পথের সৌন্দর্য্য রাওলপিণ্ডি-শ্রীনগরের মত। তবে এ পথ আরো দুর্গম ও অনেক উঁচু। বিখ্যাত বানিহাল-পাস্ এই পথে পড়ে। এই গিরিপথ বছরে ছয় মাস বরফে ঢাকা থাকে। সেইজন্যে শীতের প্রারম্ভেই এই পথে মোটর চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অনেকগুলি নদী এই পথে আছে—পথ অসম্ভব আঁকা বাঁকা—এবং এক সময় প্রায় ৯৫০০ পর্য্যন্ত মোটরকে উঠতে হয়। কিন্তু সমস্ত পথশ্রম লাঘব করে এই পথের অনুপম সৌন্দর্য্য।

[**অগ্রহায়ণ, ১৩৪১**] শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

সুন্দর সুইজারল্যাণ্ড

ইয়োরোপের ম্যাপ খুল্লে দেখতে পাবে ইয়োরোপের মাঝখানে জার্ম্মানী—অষ্ট্রিয়া-ইতালী-ফ্রান্স ঘেরা একটী ছোট দেশ আছে, ম্যাপেতে দেখতে পাবে দেশটি পাহাড় ও হ্রদে ভরা, এ হচ্ছে সুইজারল্যাণ্ড—ইয়োরোপের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেশ। অনেকে এ দেশকে আমাদের কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনা করেন। যদিও ইয়োরোপের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পাহাড় মঁ ব্লাঁ (Mont Blanc) সুইজারলণ্ডের উত্তর-দক্ষিণে ফ্রান্সদেশে, কিন্তু আল্পস্ পাহাড়ের সারি ও ইয়োরোপের সুন্দর হ্রদের মালা এই দেশে। এই হ্রদ ও পাহাড়ের সুন্দর দেশের কথা তোমাদের বলব।

দেশটি আয়তনে ছোট, ১৫ হাজার বর্গ মাইল মাত্র, বাংলার চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু এই ছোট দেশ দেখতে পৃথিবীর সকল দেশ থেকে সকল জাতির ভ্রমণকারীরা আসেন। এ থেকে এদেশের আয় বড় কম নয়। সুইজারল্যাণ্ডের কোন বড় সহরে গেলে দেখবে শুধু হোটেল আর হোটেল; তাতে সব বিদেশী নানা জাতির লোক ভরা। কোন বড় হোটেলে গেলে মনে হয় জায়গাটা যেন পৃথিবীর সব জাতির মিলনের জায়গা। আমি এখন সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ের মাথায় একটি ছোট সহরে আছি। আমি যে ছোট হোটেলে আছি, সেখানে একজন রাশিয়ান, একজন জার্ম্মান, একজন ইতালিয়ান ইত্যাদি ইয়োরোপের নানা দেশের লোক ত আছেনই, তাছাড়া একজন কালিফোরনিয়া থেকে এসেছেন, একজন ভেনেজুয়েলা (Venezuela) থেকে এসেছেন। Venezuela কোথায় তোমাদের বলব না, তোমরা ভূগোল দেখে জেনে নেবে। এই বিদেশী লোকদের থাকা খাওয়া খেলা বেড়ানোর ব্যবস্থা করানই হচ্ছে সুইজারল্যাণ্ডের লোকদের প্রধান ব্যবসা! বিগত যুদ্ধের পরের হিসাব আমার জানা নেই। যুদ্ধের আগের হিসাব কিছু দিতে পারি। যুদ্ধের আগে ১৯০৫ সুইজারল্যাণ্ডে দু' হাজারের ওপর বড় হোটেল ছিল। সে বছর বিদেশীদের কাছ থেকে লাভ হয়েছিল ৭৫ লক্ষ পাউণ্ডের ওপর। সে বহুদিনের কথা, তারপর আরও অনেক হোটেল হয়েছে। সুইজারল্যাণ্ডের কোন কোন সহরে অর্দ্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ লোক হচ্ছে বিদেশী।

অনেক লোক বেড়াতে, পাহাড়ে উঠতে, ও হ্রদে বেড়াতে আসে। অনেকে স্বাস্থ্যের জন্য আসে, এখানে পাহাড়ের ওপর জায়গাগুলি খুব স্বাস্থ্যকর। বিশেষতঃ যক্ষ্মা রোগীদের জন্যে সানাটোরিয়াম বা স্বাস্থ্যনিবাস কয়েকটি জায়গায় আছে। লেজাঁ বলে একটি জায়গায় যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত ছেলেদের জন্য সানাটোরিয়াম আছে, এখানে সূর্য্যের আলো লাগিয়ে তাদের চিকিৎসা করা হয়। ভাল হাওয়া, ভাল খাবার ও পরিপূর্ণ বিশ্রাম হচ্ছে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা; তার সঙ্গে সূর্য্যের আলো লাগিয়ে চিকিৎসা করতে পারলে আরও ভালো। কিন্তু যক্ষ্মা যদি হাড়ে হয় তা হলেই সূর্য্য-কিরণে চিকিৎসা চলে, বুকে হলে চলে না। এখানে ছেলেমেয়েদের একটি স্কুলও আছে, যাদের স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়, বা সহরে থাকলে যাদের সহজে যক্ষ্মা হতে পারে এই রকম সব ছেলেদের এখানে রাখা হয়, তারা খেলাধূলা পড়াশোনা করে, তার সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চিকিৎসাও চলে। এই যে সব ছেলে মেয়েরা, তারা বেশীর ভাগই সুইজারল্যাণ্ডের নয়, কেউ ইংলণ্ডে থেকে এসেছে, কেউ রাসিয়া থেকে এসেছে, কেউ বা চীন বা আমেরিকা থেকে এসেছে। আমাদের দেশেও সব দুর্ব্বল-স্বাস্থ্য ছেলেমেয়েদের জন্য এরকম ভাল জায়গায় স্কুল হওয়া দরকার।

সুইজারল্যাণ্ডের আর একটি আকর্ষণ আছে, শীতকালে বরফে খেলা। এখন ফেব্রুয়ারী মাস, তোমাদের ওখানে ফাল্গুনের বাতাস বইছে কিন্তু আমাদের এখানে বরফ-পড়া শেষ হয় নি। আমি সুইজারল্যাণ্ডের একটি পাহাড়ের মাথার সহর থেকে তোমাদের লিখছি। জায়গাটি পাঁচ হাজার ফিট উঁচু হবে। কিন্তু আজ সকাল থেকে সারাক্ষণ বরফ পড়ছিল, দুপুরবেলা থেমেছে। এই বরফ পড়া না দেখলে কিছুতেই বোঝা যায় না এ কি ব্যাপার। বরফ বল্লে আমরা গ্রীষ্মকালে যে রকম বরফ খাই, তার কথা মনে হয়। কিন্তু এ বরফ সে রকম শক্ত বা ভারী মোটেই নয়, মনে হয় যেন সাদা আকাশ থেকে সাদা ফুলের পাঁপড়ি ঝরে পড়েছে, অথবা কে যেন চারিদিকে চিনি বা লবণ ছড়িয়ে দিচ্ছে অথবা যেন পেঁজা তুলো দিয়ে কে চারিদিক ঢেকে দিচ্ছে। মনে কর যেমন বিষ্টি পড়ে, সেই বিষ্টির প্রতি ছোট বড় ফোঁটা জলের ফোঁটা হয়ে না পড়ে, প্রতি ফোঁটা বকুল ফুলের মত বা পেঁজা তুলোর মত জমে গিয়ে পথে ঘাটে মাঠে বাড়ীর ছাদে চারিদিকে জড়িয়ে পড়ছে, ঝমঝম শব্দ নেই, ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে না। চারিদিক দুধের সরের মত সাদা রংএ ঢেকে দিয়েছে। এই বরফ ঢাকা পাহাড় বন গ্রাম মাঠ দেখতে বড়ই সুন্দর। চারিদিক সাদায় সাদা, একটি শুভ্র নির্ম্মল স্বপ্নের মত, পথেতে কাদা নেই, বাড়ীর ছাদে ময়লা নেই, মাঠে সবুজ রং নেই, চারিদিক সুন্দর সাদা।

সমস্ত সকাল বরফ পড়ার পর তখন বরফ-পড়া থেমেছে, কুয়াশা ভেদ করে সূর্য্যের আলো চারিদিকে ঝিক্‌মিক্ করছে, সবাই বরফে খেলা করতে বাহির হয়েছে।

বরফের গোলা করে ছুঁড়ে মারামারি করা হচ্ছে স্কুলের ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে প্রিয় খেলা। সব স্কুলের সামনে দেখবে টিফিনের ছুটিতে বা স্কুলের পরে সব ছেলেমেয়েরা

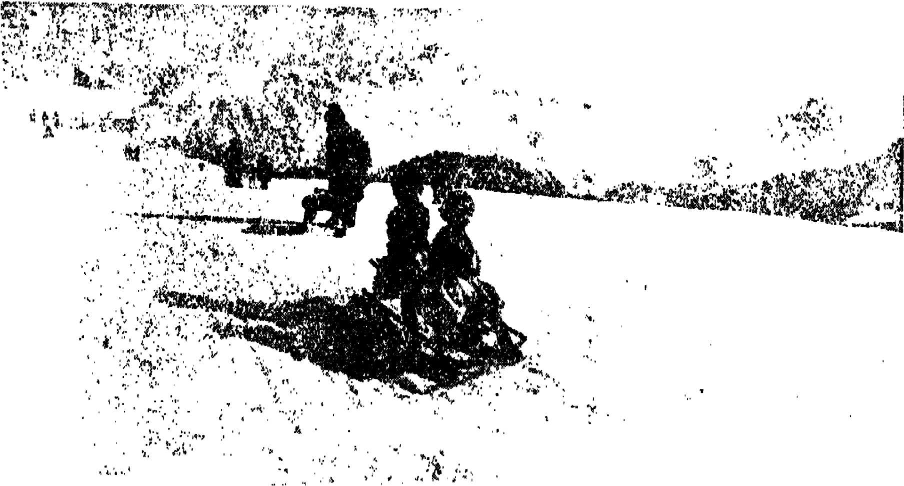
বরফ ছুঁড়ে খেলা করছে। তা ছাড়া বরফের মানুষ-গড়া হচ্ছে সুন্দর খেলা। শীতকালে পাহাড়ের ওপর এত ঠাণ্ডা যে বরফ গলে যায় না। বরফ জমিয়ে বেশ মানুষের মূর্ত্তি গড়া যায়।

কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর ও মজার খেলা হচ্ছে স্কি-করা। বরফ যখন পথে বা মাঠে বেশ ভাল পড়ে গেছে, তখন সবাই, পায়ে বুট জুতোর সঙ্গে দুটি লম্বা কাট (Ski) মজবুৎ করে বেঁধে হাতে দুটি ছড়ি নিয়ে বাহির হয়, ছড়ির শেষে একটি ছোট চাকা লাগান থাকে। এই স্কি পরে গড়ান রাস্তা দিয়ে বা উঁচু-নীচু ঢেউ খেলান মাঠে, ওপর থেকে নীচে বেশ সোঁ করে গড়িয়ে চলে যাওয়া যায়। বরফ পড়ে পথ-মাঠ এমন মসৃণ হয় যে ওপর থেকে নীচে চলে যেতে বড় আমোদ বোধ হয়, পা পিছলে আপনি চলে যায়।

কিন্তু সব ছেলেমেয়ের ভাগ্যে কি পাওয়া জোটে না। কারণ স্কির দাম আছে। কিন্তু প্রায় সব বাড়ীতে ছোট স্লেজ্ (Sledge) বা চাকাহীন গাড়ী আছে, তাতে একজন বা দু'জন বসে পথ দিয়ে বেশ গড়িয়ে নেমে যাওয়া যায়। স্কি স্লেজিং করতে গেলে প্রথমে বরফ চাই, তারপর উঁচু নীচু জমি চাই, তাই সুইজারল্যাণ্ডে সবাই আসে।

বরফের ওপর আর একটি খেলা আছে স্কেটিং। এর জন্যে মসৃণ সমতল জমি চাই, বরফ খুব পেছলান ও শ হওয়া দরকার। বরফ পড়ে গেলে কোন সমতল বৃহৎ জায়গায় বরফ সমান করে স্কেটিং করবার জায়গা করতে হয়। স্কেটিং হচ্ছে জুতোর তলায় আধখানা চাঁদের মত বেঁকা একখানি লোহার পাত বেঁধে বরফের ওপর চলা, দৌড়ান, নাচা ইত্যাদি। অনেক জায়গায় পায়ে এরূপ স্কেট্ (Skate) বেঁধে লোক হকি খেলে। বরফ পড়া পথের ওপর চাকা-ওয়ালা গাড়ী যেতে পারে না, কারণ চাকা বসে যাবে, তখন স্লেজ্ বলে চাকাহীন গাড়ী ঘোড়ার সঙ্গে জুতে দেওয়া হয়। বরফ ঢাকা পথে চারিদিক বরফ ঢাকা পাহাড় বন মাঠের মধ্যে দিয়ে এই স্লেজ (Sledge) করে যাওয়া বড়ই আনন্দকর।

[, ১৩৩৪] শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু



বরফের খেলা

চিতোর গড়

কথা ছিল দিল্লীতে নেমে একদিন জিরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ফ্যানের হাওয়ায় রাত্রে দিব্যি ঘুম হওয়াতে সকাল-বেলা দিল্লীতে নেমে একটুও শ্রান্তিবোধ হচ্ছিল না। খবর পেলাম পাশের প্ল্যাটফর্ম্মেই রাজপুতানার ট্রেন অপেক্ষা করছে--ছাড়্‌তে ঘণ্টা দুয়েক বাকি। কলকাতা থেকে এক-টানা ন'শো দু' মাইল চলে' এসে মনে চলবার একটা ভীষণ নেশা ধরেছে; তাই দু' হাতে হোটেলের কার্ড-দেখানো ফিরিওয়ালাদের ভিড় সরিয়ে পাশের প্ল্যাটফর্ম্মে আমরা চলে' এলাম। গাড়ি ছাড়বার যতটুকু সময় ছিল তা মুখ ধোয়া, দাড়ি কামানো ও স্নান ইত্যাদি সেরে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। চা খেয়ে বেশ তাজা হয়ে উঠলাম। গাড়ি যখন গড়ালো, সোনালি রোদে দিল্লীর আকাশ তখন প্রফুল্ল হ'য়ে উঠেছে।

বি, বি এণ্ড্ সি, আই—অর্থাৎ বম্বে বরোদা এণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে সীমান্তের একটি ষ্টেশন এই দিল্লী। আগ্রা থেকেও বান্দিকুই হ'য়ে যাওয়া যায়। এ পরে বৃটিশ ভারতের মথুরার সঙ্গেও এ-লাইনের যোগ আছে। গাড়ীগুলো ছোট—লাইনটাও মিটার্-গেজ্-এর। সাধারণত এ-লাইনে ইণ্টার ক্লাশ থাকে না; রিটার্ণ টিকিটেরো বালাই নেই। অগত্যা ফ্যানের আশা ছেড়ে রোদের হল্‌কা সইবার জন্যে থার্ড ক্লাশেই গদিয়ান হ'তে হল

বান্দিকুই জংশন্ পেরোতেই একটা মজার কাণ্ড ঘটল। গাড়িতে বেজায় ভিড়, তিল ধারণেরো স্থান নেই। যত সব রেলোয়ের রাজপুত কুলি মজুররা কি-একটা পরব্ উপলক্ষে গাঁয়ে ফিরছে। মাথায় রঙিন সাফা (পাগড়ি), গায়ে রঙিন কুর্ত্তা। বলিষ্ঠ দেহ, বিস্তৃত বক্ষতট। মেয়েদের কারো পোষাকই বেরঙা নয়, আর তারা সবাই তাদের পর্দা নেই, অর্থাৎ তারা ঘরের কোনে আর মেয়েটি বিজয়িনীর মত সেই ফাঁকে কামরাতে পড়ল ঢুকে। স্বাভাবিক সৌজন্যবশতঃ লোকটা যে নম্র হ'য়ে থাকবে তা নয়, সে এ অপমান স'তে না পেরে মেয়েটিকে আক্রমণ করলে। মেয়েটিও নাছোড়বান্দা, সহজে হটবার পাত্রী সে নয়। কব্জিতে যেমন তার ভারি ভারি রূপোর গয়না আছে, তেমনি আছে জোর; আর দশ আঙুলে আছে নোখ। মেয়েটির এই ভয়ঙ্কর তেজ দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম। সব চেয়ে লক্ষ্য করবার হচ্ছে এই যে কেউ কাউকে কটুভাষায় গাল দিচ্ছে না, নীরবে যুদ্ধ করছে। মেয়েটি এক হাতে ঘোমটা সাম্‌লাচ্ছে, আরেক হাতে মারচে খামচি। কেন না মাথা থেকে ঘোমটা খসে মুখ তার অনাবৃত হলেই তার হার হবে।

একটা রফা অবশ্যি হ'ল। মেয়েটিকে আমরা একটা জায়গা ক'রে দিলাম। যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে এরা শান্ত হ'য়ে নিজের নিজের আহত স্থানগুলি পরীক্ষা করতে লাগল, কিন্তু মুখে তিরস্কার বা প্রতিবাদের একটি ভাষা নেই। এত বড় একটি মারাত্মক যুদ্ধ এমন নিঃশব্দে সমাধা হবার কথা আগে কোন দিন শুনিনি।

ভেবেছিলাম পথে মরুভূমি দেখতে পাব। বাঙলা দেশের মাঠ আর আকাশ দেখে দেখে মন একেবারে জুড়িয়ে গেছে; এখন কর্কশ রুক্ষ বালুকাকীর্ণ মরুপ্রান্তর দেখতে পেলে নিরুৎসাহ নিবীর্য্য মন সতেজ হয়ে উঠতো হয় তো। কিন্তু খাঁটি খবর পাওয়া গেল এ-পথে রেগিস্থান (মরুভূমি) পড়ে না; যোধপুর বিকানীর লাইনের দু'ধারে বিস্তীর্ণ মরুভূমি! দিল্লী পর্য্যন্ত আসতে ট্রেনের জানলা থেকে খালি একঘেয়ে মাঠ দেখেছি, সে-মাঠ শস্যসমৃদ্ধ; কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ বা শীর্ণ নদী-রেখা আছে। এ-পথে যে-মাঠ দেখলাম তাতে খালি রৌদ্রদগ্ধ হলদে ঘাস,—কোথাও সুশ্যামল শস্যের একটি ক্ষীণ সঙ্কেত নেই। মাঝখানে গাছ দাঁড়িয়ে সে মাঠের বার্ত্তাহীন বিস্তারকে ব্যঙ্গ করেনি। সে-দেশ থেকে নদীরা পলাতকা; সে দেশের উপর সূর্য্যের নিষ্ঠুর দুর্জ্জয় অভিশাপ।

বালির উপর লতা-ঘেরা ছোট ছোট ষ্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই যাত্রীদের মধ্যে জলের জন্যে একটা তুমুল সোরগোল পড়ে যায়। ষ্টেশনে যে কয়েকটি জলের কল আছে তার ধারে লেখা---জল অত্যন্ত মূল্যবান, অযথা অপব্যয় কোরো না। মুহূর্ত্তে গলা শুকিয়ে আসে, জলের অভাবে জল আসে চোখে।

জয়পুর ছেড়ে গেল। আজমির যখন এসে পৌঁছুলাম তখন রাত প্রায় দশটা। আজমির কিন্তু স্বাধীন নয়,—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। শুনলাম সেখানে নাকি স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন চল্‌ছে; নইলে সারা রাজ-

পুতানা ভারতবর্ষের মুক্তিব্রতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন মনে হ'ল। আজমিরে গাড়ি বদল করলাম—শেষ রাত্রে চিতোর পৌঁছুব। ভাগ্যিস্ গাড়িতে ভিড় ছিল না, কাঠের বেঞ্চির উপর লম্বা হয়ে পড়লাম। আজমির থেকেই পাহাড় সুরু হ'ল—মাটির ঢিবি নয়, কঠিন পাথরের। পাহাড়ের উপর গহন জঙ্গল। দূর থেকে মনে হয় ধূসর রঙে আঁকা ছবি; সামনে এলেই মায়া যায় ঘুচে। ভীত মনে বিস্ময়ের রোমাঞ্চ সুরু হয়।

তিথিটা পূর্ণিমার কাছাকাছি। সারা রাস্তা চাঁদ পাহাড়ের তকলিতে জ্যোৎস্নার সুতো কাটছে। এক একবার ঘুম ভেঙে যায়, আর চাঁদ অস্ত যায় নি দেখে মনটা খুসি হ'য়ে ওঠে। চিতোরে যখন নামলাম রাত তখনো ফুরোয় নি। শুনলাম সাম্নেই একটা সরকারী ধর্ম্মশালা আছে। সেখানে এসে দেখি বারান্দায় রাজ্যের লোক ঘুমুচ্ছে আর উঠোনে অসংখ্য উট। কেউ সাড়া নিলে না। তাই ভোর হবার জন্য অপেক্ষা করতে হ'ল।

ভোরবেলা একদল লোক তাদের রাতের বাসা ছেড়ে সরে পড়ল বলে' একটা যা-তা ঘর পেয়ে বেঁচে গেলাম যা হোক্। টাঙা ঠিক হ'ল। মুখ হাত ধোবার জন্যে, বাল্তি ও লোটার জন্যে পয়সা দিতে হ'ল,—ঘর বন্ধ করবার জন্যে সঙ্গে তালা ছিল না বলে' জরিমানা চাই। রুটির সঙ্গে ট্যাঁড়স-এর 'শাক' খাবার বন্দোবস্ত ক'রে টাঙায় এসে উঠলাম।

চিতোর উদয়পুরের অধীনে ছোট একটা গাঁ; কলকাতার একটা সামান্য গলির চেয়েও ছোট। সমতল জায়গায় দু' কদম হাঁটলেই সেই গাঁ ফুরিয়ে যায়। আসলে যে-পাহাড়ের ওপর রাজপুতদের যুগ-যুগ-প্রসিদ্ধ দুর্গ বিরাজ করছে সেই পাহাড়ই সত্যিকারের চিতোর—সেই পর্ব্বত শীর্ষেই রাজধানী ও তার আনুসঙ্গিক সমস্ত উপকরণ ছিল। কত শতাব্দী আগেকার কত স্মৃতি সেই পর্ব্বতে স্তূপীকৃত হ'য়ে আছে!

গোটা পাহাড়টাই চিতোর' গড়। মনে হয় কত কাছে, কিন্তু নাগাল পেতে কতটা পথ যে ঘুরতে হয় বলা যায় না। পাহাড়টা যেমন উঁচু তেমনি প্রকাণ্ড। মনে হয় যেন একটা রুদ্র দৈত্য স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছে। বজ্রের মত কঠোর, মৃত্যুর মত সুগম্ভীর। দেখে সত্যিই বিশ্বাস হয় প্রতাপসিংহের মাতৃভূমি বটে। এমন দেশের কোলে জন্মেছিল ব'লেই প্রতাপের চরিত্রে এমন তেজ ছিল। এই পাহাড়ের মতই অটল ছিল তার প্রতিজ্ঞা, গর্ব্বোন্নত ছিল তার দেশপ্রেম।

পাহাড়ের উপর দিয়ে টাঙার জন্যে দিব্যি রাস্তা আছে। টাঙা রাস্তার এক-একটা বাঁক ঘুরে উপরে উঠছে, অমনি আবার পাহাড় উদ্ধত গৌরবে মাথা তুলছে। শেষকালে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের চূড়ার এসে অবতীর্ণ হলাম। সেই চূড়াটা সমতল করতে পারলে কম করে' কুড়িটা ফুটবলের মাঠ হয়। সেই পর্ব্বত চূড়ায় দাঁড়িয়ে চারিদিকে দৃশ্য দেখতে দেখতে কার মন না অভিভূত হয়েছে! মনে হয় যেন নিমেষে আকাশের প্রতিবেশী হয়েছি। দিল্লীর কুতুব-মিনার এর চেয়ে উঁচু সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে চড়ে নীচের দিকে তাকালে দেখা যায় কতকগুলি মাঠ আর গ্রাম—আর দূরে নায়া দিল্লীর দালান-বালাখানা। কুতুবের সিঁড়ির ভাঙতেই যে আনন্দ! কিন্তু চিতোর গড়ে দাঁড়িয়ে চারিপাশের রাশীকৃত পাহাড় ও মেঘলোকের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন একটা রূপোপন্যাসের দেশে চলে' এসেছি। লোকজন চোখে পড়ে না, দূরে একটা মরা নদীতে কতকগুলি মোষ স্নান করেছে শুধু।

কত শতাব্দীর পুরোণো ইতিহাস একসঙ্গে মুখর হ'য়ে উঠ্ল। মেবারের রাজধানী এই চিতোরকে আলাউদ্দিন একদিন বিপুল বিক্রমে আক্রমন করেছিলেন। সে দিন অগণন রাজপুত বীর সে-আক্রমণকে বুক দিয়ে বাধা দিয়েছিল। মনে হয় পাহাড়ের প্রতিটি পাথরে সেদিনকার অসির ঝন্ঝনা যেন স্তব্ধ, মূক হ'য়ে আছে। চিতোরের রাণী পদ্মিনীকে কেড়ে নেবার জন্যে আলাউদ্দিনের ভারি সাধ ছিল। রাজপুত বীরের রক্তে চিতোর যখন রাঙা হ'য়ে উঠ্ল, তখন পদ্মিনী বুঝলেন যে আত্মরক্ষার আর উপায় নেই। চিতোর পাহাড়ে একটা প্রকাণ্ড সুড়ঙ্ আছে, তাতে নামবার সিঁড়ি আছে—সে-সুড়ঙ্ কত দূর চলে' গিয়েছে আজকাল কেউ তার হিসেব দিতে পারে না। পদ্মিনী ও তাঁর সহচরীরা এই সুড়ঙে নেমে সামনের দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর দিলেন আগুন জ্বেলে। আলাউদ্দিন চিতোর জয় করলেন বটে, কিন্তু পদ্মিনীকে পেলেন না।

সেই মহান আত্মহত্যার সাক্ষী স্বরূপ সেই জহরকুণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে মন আনন্দে ও অহঙ্কারে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্ল। সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা নাম্লাম—কী ভীষণ অন্ধকার!

কত প্রাসাদ ও কীর্ত্তিস্তম্ভের ভগ্নাবশেষ এই চিতোর? রাণা কুম্ভ একদিন দেশ জয় ক'রে এক স্তম্ভ তৈরী করে-ছিলেন, তা আজো অটল হ'য়ে বিরাজ করছে। তার উপরে উঠে নীচেকার সৈন্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করা হ'ত। তার উপরে উঠে মাটি থেকে দৈর্ঘ্য মাপলে নিশ্চয়ই কুতুব মিনারের চেয়ে উঁচু হবে। পাশে মীরা বাঈয়ের কৃষ্ণ মন্দির। মন্দিরটি নিস্তব্ধ, গাম্ভীর্য্য পূর্ণ। একটি অন্ধ পূজারী রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় ভজন গেয়ে উপাসনা করে। এই মন্দিরে মুসলমানদের ঢুকতে নিষেধ নেই।

চিতোর দুর্গে প্রকাণ্ড একটা তোপখানা আছে। তাতে এমন সব বিশালকায় কামান রাখা হয়েছে যার মত কামান গত য়ুরোপীয় যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত ব্যবহার করা হয় নি। স্থানীয় লোকেরা কেউ কেউ সে-সব কামানকে পুজো করে দেখলাম।

ইতিহাসে তোমরা জয়মল্লের কথা নিশ্চয়ই পড়েছো। আকবর যখন চিতোর আক্রমণ করলেন তখন চিতোরের রাণা উদয়সিংহ কাপুরুষের মত পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

চিতোর রক্ষা করতে এগিয়ে এল জয়মল্ল—একজন সামান্য সেনাপতি মাত্র। মোগলের সঙ্গে রাজপুতের যে নিদারুণ সঙ্ঘর্ষ সেদিন বেধেছিল তার নিদর্শন আজো অটুট রয়েছে। আকবর কামান দিয়ে দুর্গের খানিকটা উড়িয়ে দিলেন, তখন সেই ভাঙা জায়গাটাই বিশেষ ক'রে মোগলদের লক্ষ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। জয়মল্ল নিজে কী অসীম সাহসের সঙ্গে সেই ভাঙা দুর্গপ্রাচীর রক্ষা করেছিল তা ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। কিন্তু এক সময় আকবরের অব্যর্থ গুলি এসে জয়মল্লের বুকে বিদ্ধ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আবার রাজপুত মেয়েরা আগুনে পুড়ে মরতে লাগ্‌ল। চিতোরও মোগলের করায়ত্ত হল। জয়মল্ল যেখানে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, সেখানে ছোট একটি বেদী আজো জয়মল্লের অপূর্ব্ব শৌর্য্যের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

এমনি আরেকটি ছোট স্মৃতি-মন্দির দেখেছিলাম গত বছর ফতেপুর সিক্রিতে। সেলিম চিস্তে নামে আকবরের এক গুরু ছিলেন। দু' ছেলে হ'য়ে মারা যাবার পর আকবর গুরুর কাছে এসে ভাবী সন্তানের কুশল-প্রার্থনা করেন। জাহাঙ্গীর ভূমিষ্ঠ হ'ল এবং যাতে জাহাঙ্গীর দীর্ঘায়ু হয় সেই জন্যে সেলিম চিস্তে তাঁর দু-মাসের শিশু পুত্রকে স্বহস্তে বলি দেন। গুরুর এই উৎসর্গের খবর পেয়ে কৃতজ্ঞ মুগ্ধ ভক্ত আকবর তাঁর রাজধানী আগ্রা থেকে ফতেপুর সিক্রিতে নিয়ে আসেন। সেলিম চিস্তের সেই ছেলের কবরের উপর সুন্দর ছোট একটি বেদী রচনা করা আছে। তাতে সন্ধ্যায় ধূপ দীপ জ্বলে, তাতে ছোট একটি তুলসী গাছ। মনে হয় মোগল রাজত্বের সকল কীর্ত্তি ও ঐশ্বর্য্যের পেছনে এই অস্ফুট শিশু-কোরকের করুণ আত্মদান রয়েছে।

চিতোর-পাহাড়ে খুব শীর্ণ ও দুর্ব্বল একটি ঝর্ণা আছে। পাহাড়ের গা বেয়ে কাপড়ের সরু পাড়ের মত একটি ক্ষীণ জলরেখা অনবরত নেমে আস্‌ছে। যেখানে এসে পড়ছে সেটা একটা পুকুর। জল কী ঠাণ্ডা, এবং কী টাট্‌কা! টাঙাওয়ালার কথা মত কাপড়-চোপড় নিয়ে এসেছিলাম, স্নান করে' তাজা হওয়া গেল।

তারপর বেলা করে ধর্ম্মশালায় ফিরে এসে দেখি ট্যারসের 'শাক' খাবার আর সময় নেই। দুপুরের ট্রেনে উদয়পুর যেতে হবে।

[পৌষ, ১৩৩৭] শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত



ভারতের বস্ত্র শিল্প—তুলো হতে সুতা



আমার ভারতবর্ষ অমর

ট্রেন্ ছেড়ে দিল। খুব আস্তে আস্তে চল্‌ছিল গাড়ী—আমি জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে আমার দু চোখ ভরে নিলাম। নীচের রাস্তা দিয়ে অফুরন্ত জনস্রোত—মাঝে মাঝে গঙ্গার দৃশ্য চোখে পড়ে—এখানে একটা মন্দির, ওখানে সেতু। গাড়ী যতই এগিয়ে চল্ল, ততই যেন রাস্তার আর বাজারের জনতা আরো ঘন হয়ে উঠ্‌ল। সমগ্র ভারতের—সমস্ত প্রদেশের নরনারী এখানে জড়ো হয়েছে—ভীড়ের ভেতর দিয়ে ঠেলাঠেলি করে' কোন রকমে পথ করে' চলেছে তারা। সারা রাস্তায় রঙের কী সমারোহ! যেন আকাশের রামধনু পৃথিবীর বুকে খসে পড়েছে! রঙচঙে পোষাকের ভেতর দিয়ে নরনারীর স্ফূর্ত্তির অজস্রতাই যেন ঝল্‌মল্ করছিল!

আমি মনের রাশ ছেড়ে দিলাম—এই জনতার পশ্চাদ্বর্ত্তী পটভূমি কল্পনায় আনতে চেষ্টা করলাম। কত না সুরম্য অট্টালিকা, কত না পর্ণকুটীরের নেপথ্য থেকে এই সহস্র সহস্র যাত্রীরা এখানে হরিদ্বারে এসে জমা হয়েছে!... এমন সময়ে এক তরুণ সহযাত্রীর গলা কানে এল আমার। এর আগের দিনে শোভাযাত্রা করে' যে নাগা সন্ন্যাসীর দল গঙ্গাস্নান করতে বেরিয়েছিল, তাদের সম্পর্কেই তাঁর সুতীব্র মতামত তিনি ব্যক্ত করছিলেন।

"উঃ, এরকম বীভৎস দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি—" আমাদের পাঞ্জাবী বন্ধুটি বলছিলেন—"নগ্নকায় এক দল অসভ্য—কোনো ধর্ম্ম-প্রণোদনায় নয়, এমনিই কেবল নিজেদের জাহির করবার জন্যে, হরিদ্বারের রাজপথ দিয়ে মিছিল করে' চলেছে—কারুর পরোয়া না করে'—বর্ব্বরতার চূড়ান্ত করে' চলেছে তারা। আর হাজার হাজার অন্ধ-বিশ্বাসী নরনারী, তাদের নগ্নতাকে সাধুত্বের নিদর্শন মনে করে' ভক্তিভরে তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ছে—তাদের পদধূলি নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি মারামারি করছে। অসহ্য দৃশ্য!..." সহযাত্রীটি দৃশ্যটি ধারণা করতেই শিউরে উঠলেন।

আমি জানালার থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আমার মন আহত হয়ে বর্ত্তমান অস্তিত্বে ফিরে এল—এক ধাক্কায় বর্ত্তমান সমস্যার শোচনীয়তায় ফিরে এল আবার। আমার কল্পনা এতক্ষণ ধরে' অসংখ্য নরনারীর সঙ্ঘবদ্ধ এই আত্মপ্রসাদ—এই অপরিমেয় স্ফূর্ত্তির উচ্ছ্বাস অবলম্বন করে' স্বপ্নময় যে রঙীন জাল বুনে চলেছিল—তা যেন এ মুহূর্ত্তে ছিঁড়ে গেল; রাঙা গোলাপের কাঁটার দিকটা চোখে পড়ল আমার। এদের সম্পর্কে—এই জনতার সম্বন্ধে সমস্ত উৎসাহ আমার উবে গেল—আমার এতক্ষণকার মোহন মায়াজাল নিমেষে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে খসে' পড়ল। আমার চোখের সামনে দাসত্বভারনত আমার ভারতবাসীকে দেখতে পেলাম—দরিদ্র এবং দলিত—বুভুক্ষু এবং মুক্তি-লোভাতুর। তাদের দুর্ব্বল এবং বিশীর্ণ দেহ তাদের দুর্ব্বল ও বিশৃঙ্খল মনের উপযুক্ত আধার—আসল পরিচয়ই বটে!

ভারতবর্ষের এতদূর অধোগতি হতে পারে, ভাবতেও পারা যায় না! সৌন্দর্য্য এবং সাহসের লীলাস্থল এই ভারত—এখনো যার প্রত্যেক কোণে বীরত্বের আর মহত্বের স্মৃতি জড়ানো—দিকে দিকে ছড়ানো কীর্ত্তির ইতিহাস—যে ভারতের ছেলেরা একদা অপমানের থেকে সর্ব্বনাশকে বরণীয় ভেবেছিল, লাঞ্ছনার চেয়ে মৃত্যুকে বাঞ্ছনীয় মনে করেছিল। যার মেয়েরা চিরদিন ধরে' উচ্চ আদর্শের ধারা অনুসরণ করে চলেছে—যে-আদর্শ যুগযুগান্ত কাল বাঁচিয়ে রেখেচে এই ভারতবর্ষকে। আজ এই ভারতভূমি বহুখণ্ডিত, এখানে ভায়ের সঙ্গে ভায়ের বিরোধ, প্রত্যেকে এখানে আজ স্বার্থসর্ব্বস্ব,—আর আজকের মেয়েরা? তাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার জাতির এই অধঃপাতের জন্য অল্প দায়ী নয়।

আমার মন ভারী হয়ে এল; গাড়ীর গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হোলো, চাকাগুলো পর্য্যন্ত যেন আমার দুঃখের সুরে সুর মিলিয়ে আমার হৃৎস্পন্দনের তালে তালে বলছে: "হায় হায়! ভারতবর্ষ গেল! মারা গেল ভারতবর্ষ!"

কিন্তু আবার যখন আমি বাইরে তাকালুম—নীল

আকাশের পানে, দূরের সবুজ পাহাড়ের দিকে, আমার মনে নতুন এক আশা গুন্ গুন্ করে' উঠল,—কেমন করে' এই ভারতবর্ষ মরতে পারে? এত কালের এত বিশ্বাস, এত বীরত্ব, এতখানি ভালোবাসা আর এতদূর আত্মত্যাগ কখনো ব্যর্থ হতে পারে না—এই সব মিলিয়ে মিশিয়েই আজকের ভারতবাসীরা এক জাতি হয়ে গড়ে উঠেছে—এই সবের বীজ নিশ্চয়ই এখনো সজীব রয়েছে আমাদের মধ্যে। আত্মকলহ আছে বটে কিন্তু ঐক্যও কি নেই? অজ্ঞতা যেমন রয়েছে তেমনি কি জ্ঞানের শিখাও ফের জ্বল্‌ছে না? অন্ধ কুসংস্কার যেমন দিগ্বিদিক চ'ষে বেড়াচ্ছে, তেম্‌নি শিক্ষার বিস্তৃতিও কি তাকে তাড়া করে' ফিরছে না—তাকে তাড়িয়ে দেশান্তরিত করবার পথ খুঁজছে না?

এখনো হয়ত আমরা অনেক জাতির পেছনেই রয়েছি, কিন্তু তবু ঐ নতুন সূর্য্যোদয় দেখা যায়! নব প্রভাতের আলো নতুন আশার বিস্তার করে' ছড়িয়ে পড়ছে ঐ! এই কথা ভাবতেই আবার আমার মনে আনন্দ এল। ভারতবর্ষ নিশ্চয় বাঁচ্‌বে—এবং এর ভবিষ্যতের মহিমা এর অতীতের গরিমার চেয়ে কোনো অংশে খাটো হবে না। রেলগাড়ীও আমার মনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন সুরে গাইতে সুরু করে' দিল: "আমার ভারত অমর ভারত! আমার ভারত অমর ভারত!!" (অনুদিত)

[আষাঢ়, ১৩৪৯] শ্রীবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

নিষ্কৃতি

[পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বিশ্রামের জন্যে কয়েক দিন পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি একটা সুন্দর প্রবন্ধ Modern Review মাসিক পত্রে লিখেছিলেন। তার বাংলা অনুবাদ এখানে ছাপা হোল।

হরিপুর কংগ্রেস শেষ হয়েছে। তাপ্তী নদীর তীরে যে বাঁশের তৈরী মায়াপুরী গড়ে উঠেছিল, তা এখন জনশূন্য ও শ্রীহীন। দুই একদিন আগেও এর পথগুলি উৎফুল্ল চলন্ত জনতার কলকোলাহলে মুখরিত ছিল—কত হাসি, পরিহাস, আলাপ, আলোচনা এবং সকলের প্রাণে ভারতের ভাগ্যরচনায় যোগ দেবার সচেতন অনুভূতি। কিন্তু সেই শতসহস্র নরনারী হঠাৎ তাদের দূরদূরান্তরের বাড়ীতে চলে গিয়েছে—নিথর বাতাসে এখন শূন্যতার ভাব লেগে আছে। এমন কি ধূলিঝঞ্ঝাবাতও শান্ত হয়ে গিয়েছে। এখানে আসবার পর এই প্রথম সামান্য একটু অবসর পেয়ে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি তাপ্তী নদীর চলন্ত জলধারার ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার মন বিষাদে ভরে উঠল, ভাবতে লাগলাম—মাঠ ও পোড়োজমির উপর তৈরী এই মনোহর নগরী ও শিবির শূন্যে মিলিয়ে গেল—প্রায় কোন চিহ্নই রেখে গেল না, থাকলো কেবল স্মৃতি।

কিন্তু বিষাদ কেটে গেল। আমার মনের দীর্ঘকাল পোষিত আশা—কোন সুদূর স্থানে যাবার আশায় জেগে উঠল। এটা শারীরিক ক্লান্তি নয়, এটা হচ্ছে মনের অবসাদ—যা পরিবর্ত্তন চায়, বিশ্রাম কামনা করে। রাজনৈতিক জীবন শোষণকারী কাজ; এবং এই কাজ আমি কিছুদিনের জন্য যথেষ্ট করেছি। দীর্ঘকালের অভ্যাস এবং নিয়মিত কর্ম্মধারা আমি মেনে চলেছি। কিন্তু এই দৈনিক কাজের প্রতি আমার মন বিষিয়ে উঠেছিল। যখন আমি প্রশ্নের উত্তর দিতাম, কিম্বা সহকর্ম্মী ও বন্ধুদের সঙ্গে যথাসম্ভব মিষ্টি ভাবে আলাপ করতাম, তখন আমার মন থাকত অন্য দিকে। আমার মন চলে যেত উত্তরের পর্ব্বতমালার গভীর উপত্যকায়, বরফ-ঢাকা দুরারোহ পাহাড়ের গায়ে, পাইন ও দেবদারু তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়ে ওঠা নামার মধ্যে। আমাদের চারিপাশের সমস্যা ও বিরক্তি হতে মন নিষ্কৃতির আশায় অধীর হয়ে উঠত। মন চায় শান্তি, নির্জ্জনতা এবং বাতাসের স্নিগ্ধ শ্বাস।

এতদিন পরে ইচ্ছামত কাজ করবার সুযোগ পেলাম। আমার অনেক দিনের পোষণ-করা আশা পূর্ণ করতে পারব। মুক্তির দরজা যখন আমার সামনে খোলা রয়েছে, তখন মন্ত্রিত্বের ওঠা নামা অথবা আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাস্রোতের ঘূর্ণিপাক নিয়ে নিজেকে বিব্রত করে কি লাভ?

আমি এলাহাবাদ যাত্রা করলাম। এসে দেখি বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে। মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। নিজের উপর রাগ ও বিরক্তি বাড়তে লাগল। কতকগুলো নির্ব্বোধ ও ধর্ম্মান্ধ গোঁড়া সাম্প্রদায়িক মারামারির চেষ্টা করেছে; সেই জন্য আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ হবে এবং আমি পাহাড়ে যেতে পারব না? আমি নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগলাম, হয়ত বেশী কিছুই ঘটবে না, অবস্থার উন্নতি হবে, বুদ্ধিমান লোকেরও তো অভাব নাই। এইভাবে নিজের সঙ্গে তর্ক করে নিজেকে ভুলিয়ে ফেললাম। কেননা পাহাড়ে পালাবার আকাঙ্ক্ষায় মন আমার ভরপুর হয়েছিল। যখন এলাহাবাদে আমার থাকা দরকার ছিল, তখন আমি পাহাড়ের ডাকে কাপুরুষের মত পালিয়ে গেলাম।

কিন্তু শীঘ্রই আমি এলাহাবাদ ভুললাম, এমন কি ভারতের সমস্যাগুলিও আমার মাথার কোন নিভৃত কোণে সরে গেল। কুমায়ুন পর্ব্বতমালায় আলমোড়ার পথে উঠতে উঠতে পাহাড়ের বাতাসে আমার মনে এক অপূর্ব্ব মাদকতা এনে দিল। আলমোড়া ছাড়িয়ে আমরা খালী পর্য্যন্ত অগ্রসর হলাম। পথের এই শেষটুকু বলিষ্ঠ পাহাড়ী ঘোড়ায় চড়ে যেতে হয়েছিল।

দুই বৎসর থেকে যেখানে আসবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করেছি,—আমি এখন সেই খালীতে। কত সুন্দর এই জায়গা! সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। আমি তৃষিত চোখ মেলে নন্দাদেবী ও তার সঙ্গী বরফ ঢাকা শৃঙ্গমালা খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু তারা হাল্‌কা মেঘমালায় ঢাকা।

দিনের পর দিন যেতে লাগল। হিমগিরির বায়ু প্রাণ ভরে পান করছি। চিরতুষার-ঢাকা উপত্যকার সৌন্দর্য্যে চোখ ভরিয়ে নিচ্ছি। ইহা কত সুন্দর! কি পরিপূর্ণ শান্তি —মনে হয় জগতের অন্যায়গুলি বহু দূরে চলে গিয়েছে এবং তারা অবাস্তব। পশ্চিমে ও দক্ষিণপূর্ব্বে সুবিস্তৃত গভীর উপত্যকা দুই তিন হাজার ফুট নীচে বঙ্কিম রেখায় দিগন্তে মিলিয়ে গিয়েছে। উত্তরে নন্দাদেবী শাদা কাপড়-পরা সহচরীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পর্ব্বতের ভীষণ দর্শন সানুদেশ কোথাও বা সরল রেখায় নেমে গিয়েছে,স্থানে স্থানে সমতলে গিয়ে মিশেছে, কিন্তু অধিকাংশ পাহাড়ই কোমল গোল রেখার মত তরঙ্গায়িত। আবার কোথাও বা স্তরে স্তরে সবুজ শস্যক্ষেত্র মানুষের পরিশ্রমের ফল বলে প্রমাণ করে দিচ্ছে।

খুব ভোরে আমি খোলা গায়ে বাইরে এসে বসি। স্নিগ্ধ চোখে পাহাড়ের সূর্য্য আমাকে গরম আলিঙ্গন দান করে। বরফের মত ঠাণ্ডা বায়ু আমাকে একটু কাঁপিয়ে তোলে; কিন্তু সূর্য্য এসে তাপ ও কল্যাণ দান করে আমাকে রক্ষা করে।

কখন কখন আমি পাইন-তরুতলে শুয়ে শুয়ে চলন্ত বাতাসের কথা কাণ পেতে শুনি। সে কাণে কাণে কত আশ্চর্য্য কথা বলে যায়, আমার সমস্ত শরীর তন্দ্রাতুর হয়ে পড়ে, উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়। আমাকে অসহায় ও আক্রমণের সুযোগ পেয়ে বাতাস হাসির ছলে পাহাড়ের নীচের মানুষের বোকামী দেখিয়ে দেয়—দেখিয়ে দেয় তাদের চিরদিনের ঝগড়া, তাদের ঘৃণা, ধর্ম্মের নামে তাদের অন্ধ গোঁড়ামি, তাদের আদর্শের অধঃপতন। তাদের দলে ফিরে গিয়ে, তাদের সঙ্গে মিলে কাজ করে জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করার কি কোন মূল্য আছে? এখানে চারিদিকে শান্তি, নিস্তব্ধতা ও কল্যাণ। আমাদের সঙ্গী তুষারঢাকা পর্ব্বত-শ্রেণী, অজস্র তরুলতা পুষ্পশোভিত পর্ব্বতগাত্র ও সুকণ্ঠ পাখীর দল। এমনি করে বাতাস লীলাভরে কাণে কাণে কত মৃদু কথা বলে এবং বসন্ত দিনের মাদকতায় বিহ্বল হয়ে আমি কাণ পেতে থাকি।

নিচে এর মধ্যেই গরমের সাড়া পড়েছে, কিন্তু এখানে বসন্তের প্রথম আভাষ দেখা দিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে রডোডেনড্রন পুষ্পরাশি উজ্জ্বল ও লাল স্তবকে স্তবকে বিকশিত—যা বহু দূর থেকে দেখা যায়। ফলে ভরা গাছ-গুলো নবমঞ্জরীতে ভরে উঠেছে, লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র কিশলয় স্ফুটনোন্মুখ—শীঘ্রই তারা তরুণ কোমল সবুজ গাছের শ্রেণীর নগ্নতা ঢেকে দেবে।

খালী হতে চার মাইল দূরে পনের শত ফুট উঁচুতে বিনসার পাহাড়ী গ্রাম। একদিন আমরা সেখানে গিয়ে যে দৃশ্য দেখিলাম, তা জীবনে ভুলব না। আমাদের সামনে ছয়শ মাইল জোড়া হিমালয়ের তুষারঢাকা পর্ব্বতমালা তিব্বত হতে নেপাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং মাঝখানে নন্দাদেবী মাথা তুলে আছেন। এই বিশাল বিস্তৃতির উত্তরে বদ্রীনাথ, কেদারনাথ আরও কত বিখ্যাত স্থান এবং তাদের পরেই রয়েছে কৈলাস ও মানস সরোবর। এ এক মহান্ দৃশ্য! আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ চেয়ে রইলাম—তার বিশালতায় মন বিস্ময়ে ভরে উঠল। নিজের উপর রাগ হল। কি আশ্চর্য্য! এই বিরাট শোভা আমি এতদিন দেখি নাই—আমার নিজের প্রদেশের এত কাছে, অথচ আমি সমস্ত ভারতবর্ষ বেড়েয়েছি এবং বহু দূরদেশও দেখেছি। ভারতের কয়জন লোক এ দৃশ্য দেখেছে, এমন কি, তার কথা শুনেছে? হাজার হাজার লোক প্রত্যেক বৎসর অতি খেলো ও বাজে চাকচিক্যময় শৈলাবাসে খেলো বাজনা ও তাস খেলা খুঁজে বেড়ায়, তাহাদের মধ্যে কয়জন এ দেখেছে?

এই ভাবে আমার দিন কাটতে লাগল, আমার মনে তৃপ্তির আনন্দ। কিন্তু ভয়ও আছে, পাছে আমার এই ছোট অবকাশ শীঘ্রই ফুরিয়ে যায়। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র ও সংবাদ পত্রের বিরাট বোঝা আসত ও দেখবামাত্র আমার মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠত। পোষ্ট আফিস দশ মাইল দূরে। ইচ্ছা হত চিঠিপত্রগুলো ওখানেই পড়ে থাকুক। কিন্তু পুরানো অভ্যাস কিছুতেই ছাড়া যেত না। হয়ত দূরদেশবাসী কোন প্রিয়জনের চিঠি পাব এই আশায় আগন্তুকদের দরজা খুলে অভ্যর্থনা করতে হত।

হঠাৎ এক কঠোর আঘাত পেলাম। হিটলার অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করেছেন। ভিয়েনার সুন্দর বাগানগুলিতে বর্ব্বর-দিগের পদধ্বনি আমার কাণে এসে পৌছল। এতকাল আমরা যে পৃথিবীব্যাপী প্রলয়ের ভয় করছি—এ কি তারই পূর্ব্বাভাষ? এ কি যুদ্ধ? আমি খালী ভুললাম, পর্ব্বতমালা ভুললাম, আমার দেহ কঠিন হল ও মন ক্ষেপে উঠল। এই দূর পাহাড়ের কোণে বসে আমি কি করছি? ওদিকে জগৎ ধ্বংসের সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে, অন্যায় জয়লাভ করেছে, এবং এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ করতে হবে। কিন্তু হায়! আমি কি করতে পারি? আর এক আঘাত পেলাম—এলাহাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহুলোকের মাথা ফেটেছে এবং কয়েকজন লোক নিহতও হয়েছে। কয়েকজন লোক মরুক কিংবা বাঁচুক তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু এই

াগলামী ও বোকামী আমাদের জাতকে মাঝে মাঝে ঃপাতের দিকে নিয়ে চলছে—তার কি উপায় করা যায়?

এই শান্তিপূর্ণ খালীতেও আমার জন্য শান্তি নাই, নিষ্কৃতিও নাই। যে চিন্তা আমার মনকে বেদনাক্লিষ্ট করেছে ার হাত হতে কেমন করে নিষ্কৃতি পাব? আমার এই ম্পিত হৃদয় হতে পরিত্রাণের পথ কোথায়? আমি অনুভব রলাম, আমাদের জগতে এই উদ্দাম মনোভাবের সঙ্গে ড়াই করতে হবে। পৃথিবীর বেদনা সহ্য করতে হবে। খনও হয়ত বা জগতের মুক্তির স্বপ্ন দেখব। এই মুক্তির । কি স্বপ্ন দিয়ে তৈরী মনের মরীচিকা না আরও কিছু? হা কি কখনও বাস্তবে পরিণত হবে না?

আমি আরও কয়েকদিন খালীতে থাকলাম। কিন্তু এক শান্তিতে মন ভরে উঠল। মানুষের নিবুর্দ্ধিতার স্পর্শমুক্ত জানা শান্ত শুভ্র পর্বতমালার দিকে আমি চেয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে মন একটু শান্ত হল। মানুষ যাই করুক না কেন, এমন কি যদি মানুষ আত্মহত্যা করে বা আস্তে আস্তে বিস্মৃতির তলে তলিয়ে যায়, তবুও এই পর্ব্বতমালা স্থির থাকবে, এখানে বসন্ত আসবে, পাইন তরুশ্রেণী মর্ম্মরিত করে বায়ু বইবে এবং পাখীরা গান গাইবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে ভবিষ্যতের গর্ভে ভালই থাকুক আর মন্দই থাকুক, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি নাই। কাজ করা ছাড়া আর নিষ্কৃতির অন্য কোন পথ নাই। কোন খালীই মনকে শান্ত করতে পারবে না, অথবা বিস্মৃতি আনতে পারবে না; তাই আমি খালীকে বিদায় নমস্কার নিবেদন করে ষোল দিন পর আর একবার তৃষিত নেত্রে উত্তরের সাদা পর্ব্বতমালাকে শেষ দেখা দেখলাম এবং আমার মনের পর্দায় তাদের মহিমান্বিত রূপ মুদ্রিত করলাম।

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫] পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

আমেরিকায় বাঙালী লেখক

অল্প বয়স থেকে ছেলেমেয়েদের নিজের উপর নির্ভর করতে শেখা দরকার। তবেই তার আত্মসম্মান-জ্ঞান প্রখর হবে, তবেই তার দ্বারা জীবনে বড়ো বা মহৎ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

শৈশব থেকেই পারতপক্ষে সকল কাজ নিজের হাতে করতে শেখা শিক্ষার মূল ভিত্তি হওয়া উচিত। অন্যায় কাজ ছাড়া কোনো কাজেই লজ্জা নাই, নিজের খরচ নিজের উপার্জ্জিত অর্থে চালানোতেই গৌরব—পরের দৌলতে আলস্যে দিন কাটানো লজ্জার কথা।

এই সত্য আমেরিকার লোকে যেমন বোঝে বোধ করি আর কোথাও তেমন নয়। সেজন্য সে-দেশের ছেলে মেয়েরা যতটা আত্মনির্ভর এমন আর কোনো দেশে দেখা যায় না। আমেরিকার অনেক নামজাদা লোকের জীবনী পড়লে দেখা যায় তাঁরা সকলেই গোড়ায় নানা অভাব ও কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন; আমরা যাকে ছোট কাজ বলি এমন সব হাতের কাজে লিপ্ত থেকে জীবিকা উপার্জ্জন করেছেন, তারপরে ধীরে ধীরে অসীম অধ্যবসায় ও সাধনার বলে স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন। গারফীল্ড, লিংকন, ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি অনেকের নাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে, অথচ তাঁরা সকলেই অতি হীন অবস্থা থেকে আত্ম নির্ভরতার ফলে এত বড়ো সম্মানের অধিকারী হতে পেরেছিলেন।

সে কথা থাক। আপাতত যাঁর কথা বলবো তিনি বাঙালীর ছেলে, তাঁর নাম ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল জাপান-দেশে। সে আজ অনেক দিনের কথা—আঠারো উনিশ বছর হতে চল্লো। জাপানের রাজধানী তোকিও সহরে এদেশের অধিকাংশ ছাত্র তখন যে-বাড়িতে ছিলেন তার নাম ছিল "India House" বা "ভারত-নিবাস"। সে-বাড়ীতে ধনগোপাল বাবু যখন উপস্থিত হলেন তখন তাঁর বয়স উনিশ বছর, কিন্তু তাঁকে দেখে তা মনে হয় নি। পাতলা ছিপছিপে শ্যামবর্ণ নিতান্ত অনভিজ্ঞ বালকের মত চেহারা। বুদ্ধি-মাখানো মুখখানি স্নিগ্ধ সরল, বড়ো-বড়ো ভাসা-ভাসা চোখ দুটি ভারি সুন্দর। গায়ে তাঁর নীল সার্জের সাহেবী পোষাক, তার কাট-ছাঁট মোটেই ভালো নয়, নিশ্চয় চাঁদনী বা বৌবাজারের দর্জ্জির তৈরি।

অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে জানতে পারলুম তিনি যে কি পড়বেন বা শিখবেন তা ঠিক করে আসেন নি। বিদেশে থাকার খরচপত্র কি করে চালাবেন তা-ও জানেন না—সত্যি কথা বলতে কি, মনে হল তিনি বাড়ি থেকে পালিয়েই এসে-ছেন। তবু কিন্তু তাঁর ওপর রাগ বা বিরক্তি হল না, মনে মনে তাঁর সাহসের তারিফ করলুম। দিনে দিনে তাঁর প্রতি আমার স্নেহ বেড়েই চল্লো।

তাঁর বই পড়ার খুব সখ—সময় পেলেই আমরা দুজনে পড়াশুনা ও আলোচনা করতুম। বয়স কম হলেও তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি বড়ো কম ছিল না, বরং বয়সের অনুপাতে বেশি রকমই ছিল। ইতিহাস ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের মাত্রা দেখে তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারিনি।

মাসকয় পরে একদিন তিনি বল্লেন, জাপানে টাকা

উপায়ের নেই, নিজের খরচ চালানো দায়। আমি ঠিক কর্‌ছি আমেরিকাই যাবো।

আমেরিকা যাবার খরচ অল্প নয়, অথচ তাঁর শূন্য হাত, তাই তাঁর কথা শুনে অবাক হলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, টাকা কোথা? তিনি বল্লেন, তার জন্যে ভেব না। জোগাড় ক'রে নেব'খন!

কিছু কালের মধ্যেই তিনি তাঁর সঙ্কল্প কাজে পরিণত করলেন। য়োকাহামা বন্দর তোকিওর অদূরে অবস্থিত। সেখানে অনেক ভারতবাসী ব্যবসা-বানিজ্য উপলক্ষে বাস করেন। তারা সঙ্গতিপন্ন লোক। তাঁদের কাছে কিছু কিছু সাহায্য নিয়ে পাথেয় মাত্র সংগ্রহ করে', ধনগোপাল বাবু জাহাজের ডেকের বা সব চেয়ে নিম্নশ্রেণীর যাত্রী হয়ে একদিন আমেরিকা যাত্রা করলেন।

যথা সময়ে দেশে ফিরলুম। বহুকাল ধনগোপাল বাবুর খোঁজখবর নেই। মাঝে মাঝে তাঁর কথা মনে পড়তো, ভাবতুম আমেরিকায় পয়সা উপায় করে' পড়াশুনা করা সহজ নয়, চিঠিপত্র দেবার সময় নিশ্চয়ই নেই! তা ছাড়া একখানি চিঠি পাঠাতেই খরচ দশ পয়সা, তা-ই বা আসে কোথা থেকে! তবুও জানতে ইচ্ছে হ'ত আমেরিকা গিয়ে তাঁর হার হল না জিত হল।

একদিন আমেরিকার ছাপ-মারা একটি বইয়ের পার্শেল হাতে এসে পৌছুলো। ধনগোপাল-বাবুই পাঠিয়েছেন দেখে খুব আনন্দ হ'ল কিন্তু কি বই? মোড়ক খুলে দেখি দুখানি ইংরেজি বই এবং সেই বই দুখানি ধনগোপাল বাবুরই রচনা—একখানি কাব্য অপরখানি নাটক।

সেই দুখানি ছোট ছোট বই নিয়ে যিনি আমেরিকার সাহিত্য-ক্ষেত্রে একদিন ভয়ে ভয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন আজ তিনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার। বয়স্ক ও অল্পবয়স্ক দুরকম পাঠকের জন্যই তিনি অনেকগুলি বই রচনা করে' সে-দেশে খুব যশস্বী হয়েছে। তা ছাড়া আমেরিকার নানা সহরে তিনি আমাদের দেশের সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতাও করে' থাকেন।

তাঁর বইয়ের মধ্যে "A son of Mother India Answers" বা "ভারত-মাতার ছেলের জবাব" সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে। তিন মাসের মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজার বই কেটে গেছে। মিস্ মেয়ো আমেরিকার এক লেখিকা, তিনি "Mother India" বা "ভারতমাতা" নামে একখানি বই লেখেন। তাতে তিনি আমাদের দেশের মন্দ দিকটাই দেখিয়েছেন, ভালো দিকটা মোটেই দেখান নি। তা ছাড়া সে' বইয়ের এমন অনেক মিথ্যা কথা আছে যা পড়্‌লে বিদেশের লোক আমাদের ঘৃণা করবে। "ভারত মাতার ছেলের জবাব" তার প্রতিবাদ। বইখানি এখন কলিকাতার দোকানেও বিক্রি হচ্ছে।

ধনগোপাল বাবুর সকল বইয়ে আমাদের দেশেরই কথা আছে, কেবল একখানিতে সে-দেশের কথা। সেই বইখানি পড়্‌লে আমরা জান্‌'তে পার্‌, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মানুষ হবার চেষ্টায় তাঁকে কত কঠিন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল কত লাঞ্ছনা ও দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁকে পদে পদে ঠেকে শিখতে হয়েছে।

আমেরিকায় বড়ো বড়ো ছেলেমেয়েরা সকলেই কোনো-না-কোনো কাজ করে' অর্থ উপর্জ্জন করে' পড়ার খরচ চালায়। কিছু দিন কাজ করে' হাতে কিছু টাকা হলে তারা ইস্কুল বা কলেজে ভর্ত্তি হয়। যতদিন টাকা না ফুরোয় ততদিন লেখাপড়া করে, হাত খালি হলে আবার কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এতে পড়াশুনার ক্ষতি হয় না, কারণ, সেখানকার কলেজে তিন মাসে একটি একটি বিষয়ের পড়া ও পরীক্ষা শেষ হয়। তারপর ছাত্রেরা নিজ নিজ সুবিধা অনুসারে আবার তিন মাসের খরচ সংগ্রহ করে' অপর একটি বিষয় পড়তে সুরু করে।

আমেরিকায় কাজ নানারকম পাওয়া যায়। বাসনমাজা, রান্না, ঘরদোর ঝাঁটপাট, খাবার পরিবেশন প্রভৃতি সাংসারিক কাজ থেকে সুরু করে' বাগানের মালিগিরি বা শস্যক্ষেতে শস্য কাটা ফল তোলা পর্য্যন্ত। যার যেমন জোটে সে তেমনি কাজ করে। কিন্তু কাজ পেলেই তো চলে না, তা সুসম্পন্ন করা চাই। আনাড়িকে কোনো দেশেই কেউ পছন্দ করে না। সেদেশে কাজ পাওয়া যায় যেমন সহজে হারানোও যায় তেমনি সহজে।

ধনগোপাল-বাবুও বিভিন্ন সময়ে এমনি ধারা নানা কাজ করে' নিজের খাওয়া-পরা ও পড়ার খরচ চালিয়েছিলেন। এ-সম্বন্ধে অনেক মজার গল্প আছে। একটি গল্প এখানে বলি—

একবার এক বিশপ্ বা ধর্ম্মযাজকের কাছে মালির কাজে তিনি বাহাল হন। তখনো তিনি আমেরিকার হালচাল জানেন না। বিশপের সঙ্গে রেলগাড়িতে তিনি তাঁর কর্ম্মস্থানে যাত্রা করলেন। আমেরিকার রেলগাড়িতে দুটি মাত্র শ্রেণী—'পুলম্যান' ও সাধারণ শ্রেণী। 'পুলম্যানে' ধনী লোকেরাই চড়েন, কারণ খরচ বেশী। সেখানে আরাম ও সুবিধা প্রচুর—ওমরাহী কাণ্ড বল্লেই চলে। বিশপ্ তাঁকে নিয়ে 'পুলম্যানে' উঠলেন। ধনগোপাল বাবুর 'পুলম্যানে' ভ্রমণ সেই প্রথম। প্রথম বিপদ উপস্থিত হল খাবার টেবিলে। হরেক রকমের ছুরি কাঁটা চামচ—কোন্‌টি কখন কি খেতে ব্যবহার করতে হয় তা তিনি জানেন না। ব্যাপার দেখে তিনি দিশাহারা হয়ে পড়লেন। টেবিলে পরিবেশনকারী 'বয়েরা' ধোপদুরস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাকে নিঃশব্দে তাদের কাজ করছে—যেন এক একটি যন্ত্র। 'বয়' তাঁদের সামান প্লেটে করে' 'অয়ষ্টার' রেখে গেল। খাদ্য হিসাবে, সেদেশে, 'অয়ষ্টার' বা ঝিনুকের শাঁসের খুব কদর। একখানা চামচ দিয়ে যেই ধনগোপাল-বাবু খেতে সুরু করেছেন অমনি 'বয়' হাঁ-হাঁ করে' ছুটে এসে তাঁর হাত থেকে চামচটি কেড়ে নিলে। তারপর যে-যন্ত্রটি দিয়ে খাওয়া নিয়ম সেটি তাঁর হাতে গুজে দিয়ে গেল। 'বয়' যে বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিল

তা বেশ বোঝা গেল—'অয়ষ্টার' খেতে জানে না এমন বর্ব্বর 'পুলম্যান' চাপে কোন্ সাহসে?

আহার কোনোগতিকে শেষ হল, এবার শোবার পালা। তাঁর জন্যে নির্দ্দিষ্ট বেঞ্চিখানা 'বয়' তাঁকে দেখিয়ে দিলে। সেটা উপরে, তার ঠিক নীচের বেঞ্চিতে অপর এক আরোহীর স্থান। অনেক কষ্টে যদিবা সেখানে উঠলেন, কিন্তু পায়ের জুতোই বা খোলেন কি করে', আর তা রাখেনই বা কোথা, এই হল সমস্যা। তলা দিয়ে লোকেরা যাতায়াত করছে আর বোকার মত তিনি পা ঝুলিয়ে বসে' আছেন। কি যে করবেন কিছুই ভেবে ঠিক করতে না পেরে তাঁর বিষম লজ্জা করতে লাগলো। শেষে লক্ষ্য করলেন চাকর ডাকবার ঘণ্টা টিপলে সেই বয়টি আসে যে খাবার পরিবেশন করেছিল। অগত্যা তিনিও ঘণ্টা টিপলেন। 'বয়' এসে গম্ভীরভাবে তাঁর আপাদমস্তক একবার দেখে নিলে, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই? তিনি বল্লেন, জুতো রাখবো কোথা? বিনা বাক্যব্যয়ে 'বয়' তাঁর পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে চলে গেল। আবার দুশ্চিন্তা—জুতো নিয়ে ভাগলো না কি? পোষাক ছাড়া যায় কি করে'? এ যে হিতে বিপরীত হল—এখন যে খালি পায়ে আর নামবারও উপায় রইলো না—এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! তার কান্না পেতে লাগলো ভাগ্যগতিকে ঠিক সেই সময় বিশপ্ ফিরে এলেন চুরুট খাবার ঘর থেকে, এসে বুদ্ধি বাৎলে দিয়ে তাঁকে তখনকার মত উদ্ধার করলেন।

বিশপের বাড়ি পৌঁছে বাগান দেখে তাঁর চক্ষুস্থির। এরই নাম বাগান? এ যে বিষম ব্যাপার! বিঘের পর বিঘে জুড়ে রকমারি অসংখ্য ফল ও ফুলের গাছ। এরই খবরদারি তাঁকে করতে হবে—মনটা বিষম দমে' গেল। বাগান দেখাতে দেখাতে বিশপ্ জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন মালীর কাজ করা সুবিধে হবে ত? তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেও একটা ঢোক গিলে বল্লেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!

বাগানের সর্দ্দার-মালী এক কাফ্রি—প্রকাণ্ড লম্বাচওড়া কুচকুচে কালো চেহারা, যেন যমদূত! তার সঙ্গে একদিন তর্ক হয়ে গেল। সে বল্লে, গোলাপ ফোটে গ্রীষ্মকালে। ধনগোপাল-বাবু বল্লেন, আমাদের দেশে ফোটে শীতকালে। কাফ্রি খাপ্পা হয়ে উঠলো, বল্লে, বাজে বোকো না, তা আবার কখনো হয়? চাকরি করতে এসে সর্দ্দারের মন জুগিয়ে চল্‌তে হয় ধনগোপাল-বাবুর সে-শিক্ষা তখনো হয়নি। তিনি বিরক্ত হয়ে বল্লেন, নিশ্চয় হয়! আমার দেশের কথা আমি জানি না? কাফ্রিও চ'টে উঠলো, বল্লে, তাই যদি, তবে মরতে এখানে এসেছ কেন? সেখানেই ফিরে যাও।

বিশপ্ অল্প দিনের মধ্যেই বুঝলেন মালীর কাজ চালানো তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। তখন তিনি তাঁকে বাড়িতে বাসনা-মাজা কাজে বাহাল করলেন। কিছু দিন সেখানে কাজ'করার পর আবার একদিন কি একটা তুচ্ছ ব্যাপারে কাফ্রির সঙ্গে তর্ক বাধলো। সে দিন সে একেবারে মারমূর্ত্তি হয়ে তাঁকে 'মিথ্যাবাদী' বলে' গাল দিলে। আর সহ্য হল না, ধনগোপাল-বাবু কাজে ইস্তাফা দিলেন। বিশপ্ অতি ভদ্রলোক, সমস্ত শুনে তিনি তাঁর পাওনা তখনি চুকিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, আর যাবার একখানি ট্রেণের টিকিটও তাঁকে কিনে দিলেন।

আমেরিকার ছেলেমেয়েদের জন্যে ধনগোপাল-বাবু এ পর্য্যন্ত চারখানি বই লিখেছেন।* সেদেশে বইগুলির খুব আদর। আমাদের দেশের বিবিধ জন্তু জানোয়ার ও সাপুড়ে, বাজিকর, বোম্বেটে বা জলদস্যু, শিকারি প্রভৃতির অনেক আশ্চর্য্য গল্প প্রথম তিনখানি বইয়ে আছে। বইগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন চোখের সামনে এ দেশের বনজঙ্গল পাহাড়-পর্ব্বত নদনদী, বাজার ও মেলা, রংবেঙের পোষাকে নানারকম মানুষ সমস্তই দেখতে পাচ্ছি। সেখানকার কত শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি, কত গন্ধ যেন আমাদেরই আশেপাশে বাতাসে ভাসছে। ছেলেবুড়ো সব মানুষগুলোই যেন আমাদের চেনা-চেনা, এমনি তারা স্বাভাবিক।

ন' বছরের একটি ছেলে, তার বন্ধু হল পাঁচ মাসের বাচ্ছা-হাতী। হাতীর পিঠে ছেলেটি কত জায়গায় যায়, কত ব্যাপার দ্যাখে। হাতী নদী থেকে জলে-ডোবা ছেলেকে উদ্ধার করে, বাজারের মাঝ দিয়ে যেতে যেতে দোকান থেকে কলা চুরি করে' খায়, জঙ্গলের বাঘের মুখে পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। বাঘ-শিকার, চোরাবালির বিপদ, ক্ষেপা হাতী, গ্রামে মানুষ খেকো বাঘের আবির্ভাব, বাণ-ডাকা এমনি সব ভয়ের গল্প পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দ্যায়। এক জায়গায় রাতের জঙ্গলের কথা আছে। সেখানে জন্তু-জানোয়ারে অবিরাম লড়াই চলছে, চারিদিকে বিষম উত্তেজনা। কতক জন্তু মরে কতক বা আহত হয়। তাদের গা থেকে ঝরঝর করে' রক্ত ঝরে, পায়ের তলায় মাটি লাল হয়ে ওঠে। কারও শিং কারও দাঁত কারও হাত-পা ভাঙে, কেউ ধরাশায়ী হয়ে তখনি মরে, কেউ আবার লড়াইয়ে হেরে আর্ত্তনাদ করতে করতে ক্ষত-বিক্ষত দেহে ছুটে পালায়। জোর যার মুল্লুক তার!

আমেরিকায় একটি সমিতি আছে, তার নাম American Library Association বা "আমেরিকার লাইব্রেরি-সমিতি"। প্রতি বৎসর আমেরিকায় প্রকাশিত শিশুপাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে যে বইখানি ঐ সমিতির বিচারে শ্রেষ্ঠ নিরূপিত হয় তার লেখককে তাঁরা একটি পুরস্কার দেন। পুরস্কারের নাম John Newbery Medal। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯২৭ সালের এই পুরস্কার ধনগোপাল বাবু পেয়েছেন তাঁর "Gay-Neck" বা "চিত্রগ্রীব" বইয়ের জন্য।

বইখানির প্রধান চরিত্র একটি পায়রা, তার নাম

* Jungle Beasts & men; Kari the Elephant, Hari the Jungle Lad, Gay-neck.

"চিত্রগ্রীব"। তার জন্ম হয় কলিকাতা সহরে। তার মা-বাবার সাহায্যে সে খাওয়া ওড়া প্রভৃতি থেকে সুরু করে আকাশ থেকে পথ চিনে প্রভুর বাড়ির ছাতের ওপর নামতে পর্য্যন্ত শিখলে। তারপর ক্রমশ বাজপাখী ও ঈগলপাখীর আক্রমণ এড়াবার উপায় শিখে নিলে। এমন সময় আকাশে মায়ের সঙ্গে ওড়বার সময় একদিন তার মা বাজপাখীর আক্রমণে মারা গেল। মায়ের মরণ দেখে তার মনে এমন ভয় হল যে তার ফলে সে প্রায় অকর্ম্মণ্য হবার জোগাড়। শেষে এক পাহাড়ী লামার কৃপায় সেই ভয় থেকে মুক্ত হয়ে নিজের শক্তির ওপর তার অসীম বিশ্বাস জন্মালো—সে ক্রমে ক্রমে হাজার পায়রার দলপতি হল। সেই সময়ে সে এক শিকারির সঙ্গে ফরাসীর দেশে গিয়ে পৌছুলো—সেখানে তখন য়ুরোপের মহাযুদ্ধ চলছে। "চিত্রগ্রীব" সাহস ও বুদ্ধিবলে অল্পকালের মধ্যেই যুদ্ধের হরকরার কাজে দক্ষ হয়ে উঠলো। সেই কাজ করতে করতেই একদিন সে গুলির ঘায়ে আহত হয়ে নীচে পড়ে গেল। সৌভাগ্যক্রমে সে-জায়গাটা ছিল মিত্রপক্ষের দখলে। সেখানে সেবাশুশ্রূষার পর একটু সুস্থ বোধ করলে সে দেশে ফিরে এল। কিন্তু তার শরীর ও মন ভেঙে গিয়েছিল, আবার মনে ভয় ঢুকেছিল,—মনের অশান্তিতে সে ভাবতে লাগলো আর কখনো সে আকাশে উড়তে পারবে না। এই অশান্তি ও ভয় থেকে পাহাড়ী লামা তাকে দ্বিতীয়বার উদ্ধার করলেন—তাঁর কৃপায় তার শরীর ও মন আবার নীরোগ ও সবল হয়ে উঠলো। আবার সে কলিকাতার বাড়ির ছাতের ওপর শিকারি ও তার প্রভুর সঙ্গে এসে মিলিত হল।

এই হল খুব সংক্ষেপে "চিত্রগ্রীবে"র গল্প।

[ভাদ্র, ১৩৩৫] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শিকার ও শিকারী

পুরুষের জীবনে যত রকম দুরন্ত আনন্দ ও দুঃসাহসের অভিযান আছে—শিকার যাত্রা বোধ হয় তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বলশীলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, সাহস ও তেজোশক্তি —এই প্রাথমিক গুণগুলির যারা অধিকারী তাদের পক্ষেই শিকার অভিযান প্রশস্ত। ক্রীড়া-নৈপুণ্যে হাত ও পায়ের সহজ সঞ্চালন, হাল্কা শরীর, দ্রুত ধাবনের অভ্যাস, উপবাস পটুতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—এ গুলি শিকারীর পক্ষে অভ্যস্ত হওয়া আবশ্যক।

ভয় বস্তুটা শিকারীর পক্ষে মারাত্মক, সেজন্য শিকার যাত্রার পূর্ব্বে চিকিৎসকের দ্বারা শরীর পরীক্ষা দরকার। শারীরিক সুস্থতা কেবল নয়, ভিতরের স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্কের পটুতা, ফুস্‌ফুসের সহজ ক্রিয়া, শিরা-উপশিরায় রক্ত চলাচলের গতি, সতেজ প্রাণশক্তি—এই সমস্তগুলির সম্বন্ধে আগে থেকে অবহিত থাকা প্রয়োজন। এমন অনেক সময় দেখা গেছে অতিশয় বলিষ্ঠ পুরুষ জঙ্গলে গিয়ে জানোয়ার দেখে চেতনা হারিয়েছে। মানসিক বলশালীতা শিকারীর পক্ষে প্রথম প্রয়োজন। আমি জানি একজন ব্যায়াম-বীর কলেজের ছাত্র যখন বাঘের গর্জ্জন শুনলো তার হাতের রাইফেল প'ড়ে গেল, মূর্চ্ছা গিয়ে সে গোঁ গোঁ করতে লাগল। বাঘ শিকারই শিকারীর পক্ষে সকলের বড় পরীক্ষা।

শীতকাল ও গ্রীষ্মকাল শিকার যাত্রার প্রশস্ত সময়। জঙ্গলের ভিতরে জল ও কাদা না শুকোলে শিকারে যাওয়া সম্ভব নয়—অর্থাৎ নবেম্বর থেকে জুন মাসই শ্রেষ্ঠ সময়। শিকারীর সাজ-সজ্জা 'সাহেবী' হওয়া দরকার। কিন্তু তারও কিছু বিধি নিষেধ আছে। এমন রঙের পোষাক হওয়া দরকার, যে রঙটা জঙ্গলের রঙের সঙ্গে মানায়। কোনরূপ গাঢ় রঙ চলবে না—সাদা, কালো, লাল, পাটকিলে, হরিদ্রা—এই সকল রঙের পোষাক অচল। কারণ এই সকল রঙ সহজে জানোয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—হয় তারা দ্রুত পালায়, নয়ত আক্রমণ করে। খাকি রঙ অথবা ফিকে পাঁশুটে রঙ—যা চোখে লাগে না, সহজে জঙ্গলে মিলে যায় এরাই প্রশস্ত। একথা মনে রাখা দরকার যে,জঙ্গল যতই নিঃসাড় ও প্রাণী চিহ্ন হীন হোক—মানুষ গেলে সেই অটল নিঃশব্দতার মধ্যে একটা সাড়া প'ড়ে যায়। আমরা মনে করি খুব আত্মগোপন ক'রে আছি কিন্তু তা নয়, জটিল জঙ্গলের কোটি কোটি ডালপালা, লতা, পাতার ফাঁকে অসংখ্য নীরব চক্ষু আমাদের লক্ষ্য ক'রে নিঃশব্দে গা ঢাকা দিয়ে চ'লে যায়। এই কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাঘেরও প্রাণে ভয় আছে, মানুষ নামক বিচিত্র জীবটিকে দেখে তারাও চুপি চুপি পালায়।

জঙ্গলের কাঁটালতা, সাপ, বিছা, পোকামাকড় ও নানারূপ সরীসৃপের কবল থেকে দুই পা বাঁচাবার জন্য ব্রীচেস্ পরা দরকার। জুতা হবে খুব নরম, একটুও লাগবে না অথবা পায়েও ফোস্‌কা পড়বে না, খুব সহজে হাঁটা ও দৌড়ানো চলে। জুতার মচমচ শব্দ হওয়া অতিশয় অনিষ্টকর। জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে অকারণ হাত পা নাড়া, হাঁচি, কাশি, চুপি চুপি কথা বলা, সিগারেট টানা, খাওয়া, জল ব্যবহার করা, বাদামের খোসা ফেলা, দেশলাইয়ের কাঠি ছড়ানো, সিগারেটের কুচি ফেলে দেওয়া—এই অভ্যাসগুলি সম্পূর্ণ বর্জ্জন করা আবশ্যক এমন কোনো চিহ্ন, এমন কোনো ইঙ্গিত রাখা চলবে না

যাতে জানোয়ার বুঝতে পারে যে কোনো বিচিত্র 'সভ্য' জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল। একবার একজন শিকারী বহু কষ্টে এক আদম-খোর (man-eater) বাঘকে মারতে না পেরে এক উপায় উদ্ভাবন করলো। বাঘটা ভীষণ চতুর, বহুদূর থেকে কেমন ক'রে যেন শিকারীর গন্ধ পেয়ে গা ঢাকা দিয়ে পালায়। দিনের পর দিন চেষ্টা ক'রে শিকারী এক ফাঁদ পাতলো। কয়েক মাইল দূরে গিয়ে এক গ্রামের ধারে জঙ্গলে যেখানে সেই আদম্-খোরের যাতায়াতের সম্ভাবনা এমন এক জায়গায় কয়েকটা আনাগোনার পথের ধারে শিকারী করলে কি, কয়েকটা লতা-পাতার ডগায় লাল কাপড়ের গুলি, দেশলায়ের বাক্স, কাগজের টুকরো প্রভৃতি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলো। একটা পথে কিছুই বাঁধলে না —সেই পথের সীমান্তে এক উঁচু গাছের আগায় শিকারী দুদিন বসে রইলো। অবশেষে বাঘ এলো। কাপড়ের গুলি আর কাগজের টুক্‌রো দেখে সন্দেহ ক্রমে বাঘ আর সেদিকে গেল না, যে-পথে কোনো চিহ্নই নেই সেই পথে সেই শার্দ্দূলরাজ অগ্রসর হলেন। মানুষের বুদ্ধি সকল জানোয়ারকেই হার মানিয়েছে, ব্যাঘ্রবর কিছুদুর অগ্রসর হতেই গাছের আগডাল থেকে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে আগ্নেয়াস্ত্র গর্জ্জন ক'রে উঠলো। ব্যাঘ্রের গর্জ্জন, পতন ও মৃত্যু।

বাঘ আসে নত মস্তকে। তার গতি-বিধিতে কোথাও কোনো চাঞ্চল্য নেই। মনে হয় যেন তপস্বী, চক্ষে কেমন একটা স্বপ্নাবেশ,—পথের দুই ধারে চেয়ে চেয়ে অরণ্যের আত্মার সঙ্গে যেন পরিচয় ঘটায়। অতিশয় সন্দিগ্ধ দৃষ্টি কিন্তু আশ্চর্য্য রকম উদাসীন। সর্ব্বাঙ্গে রাজোচিত গাম্ভীর্য্য, অথচ বিনয়ের অবতার। ল্যাজটা মাঝে মাঝে যেন তার ক্ষুধার কথা জানায়। বাঘকে সহসা আক্রমণ করতে নেই, তাকে উপযুক্ত অবসর দিতে হয়। সাম্‌নাসাম্‌নি আক্রমণ করা অতিশয় বিপদজনক, পাশ ফিরে অন্য দিকে ঘুরে দাঁড়ালে তবেই গুলী ছোঁড়া উচিত। অর্থাৎ এই কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, গুলীর আঘাতে ও শব্দে তাকে দিশাহারা ক'রে দিতে হবে। সে যেন গর্জ্জন ক'রে অন্য দিকে লাফ দেয়। শিকারী যতই আত্মগোপন করে থাকবে ততই নিরাপদ। বাঘের সম্মুখের কাঁধে, গলায়, মেরুদণ্ডের উপর মাথায় ইত্যাদি সন্ধিস্থানে গুলী লাগা দরকার—একটা গুলীতেই সে যেন অকর্ম্মণ্য হয়, এই কথাটা মনে রাখতে হবে—নচেৎ বিপদ। বড় বাঘ এক গুলীতে সাধারণতঃ মরে না, গর্জ্জন করে, লাফ দেয়, অথবা পালায়।

বাবলার ঝোপের পাশে এক দুঃসাহসী শিকারী লুকিয়ে বসেছিল। অদূরে একটা বাচ্চা মহিষ বাঁধা। ইংরাজিতে এইগুলোকে 'কিল্' বলে, দেশী ভাষায় বলে, 'মরী'। মরীর লোভে রাত্রিকালে বাঘ এলো। ঝোপের পাশে শিকারী—বাঘের খাবার কাছ থেকে মাত্র পাঁচ হাত দূরে। বাঘ সন্দেহ করে নি, মরীর দিকেই তার একাগ্র দৃষ্টি ছিল, মরীটাকে সে আক্রমণ করলে—ঘাড়টা মটকে ধরলো, একটা কামড় দিল, রক্তটা খেতে লাগলো—এমন সময় গুড়ুম্। হতচকিত বাঘ মরীটাকে কামড়ে ধরেই সমুখের একটা প্রকাণ্ড গাছের উপর লাফ দিল। মনে করেছিল গাছের উপরেই বুঝি তার শত্রু। গাছের ডাল শুদ্ধ ভেঙে বাঘ মাটীতে প'ড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগলো। তারপর প্রচণ্ড আক্রোশে বাচ্চা মহিষটাকে দাঁতে ধ'রে ঝট্‌কা দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে ছিটকে ফেলে দিল। তখন শিকারী আর একটা গুলী মারলে। গুলী খেয়ে বাঘটা আবার লাফ দিয়ে পড়লো পাশের এক নালায়, সেইখানেই তার ইহলীলা সাঙ্গ হোলো।

বহুদিনের অভিজ্ঞতা, জানোয়ারের চরিত্র সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও অজেয় দুঃসাহস এসব নৈলে পায়ে হেঁটে শিকার করা সম্ভব নয়। পায়ে হেঁটে শিকার করা অতিশয় কষ্ট-সাধ্য, কারণ জন্তু আবিষ্কার ক'রে মারা খুব অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভব। বাঘ মারবার জন্য অনেক শিকারী পনেরো দিন পর্য্যন্তও অরণ্যের মধ্যে বাস করে।

দিনের বেলা সচরাচর জঙ্গলে ঘেরাও ক'রে শিকার করাই প্রশস্ত। এই জাতীয় শিকারে উত্তেজনা আছে, আমোদ আছে কিন্তু বীরত্ব নেই, পৌরুষ নেই। বহু লোক-লস্করের সাহায্যে জঙ্গলের এক অংশ ঘেরাও করে 'বীট্' করা হয়। একে 'ঝালাও' অথবা 'ঝালোয়া' বলে। তিন দিক ঘিরে লোকেরা চিৎকার করে, কাঁসি ও কানেস্তারা বাজায়, ঘণ্টার শব্দ করে—তখন ভয়ে জানোয়ার বেরিয়ে প'ড়ে যে দিকে ফাঁকা সেই দিকে দৌড়ায়—কিন্তু সেই দিকেই শিকারী থাকে মাচার উপরে। ভয়ার্ত্ত জানোয়ার পালাতে গিয়ে তার গুলীতে প্রাণ হারায়। এই জাতীয় হত্যাকাণ্ড রাজা-রাজড়াদের মানায়, সত্যকারের শিকারী এই হত্যাকাণ্ডে আনন্দ পায় না।

জঙ্গল 'বীট' করার সময়কার অবস্থা বিপজ্জনক। জানোয়ারগণ এই সময় তিন দিকে বাধা পেয়ে মরিয়া হয়ে দৌড়ায় প্রাণরক্ষার দায়ে; তখন তারা আরো বেশি হিংস্র হয়ে উঠে। এই সময়টা মাচার থাকাই বিধি, নিচে নামা অনুচিৎ। হাতে রাইফেল অথবা বন্দুক যাই থাকুক, বিপদের সম্ভাবনা খুব বেশী। কোন্ দিক থেকে কেমন ক'রে জানোয়ার যে বেরিয়ে পড়বে তার ঠিকানা নেই। তোমার ঘরের শান্তি যদি কেউ ভঙ্গ করে তবে মরতে মরতেও তুমি প্রতিশোধ নিয়ে থাকো। সেইরূপ জানোয়ারদের শান্তি ভঙ্গ করলেও তারা পালাবার সময় একটা কিছু অনিষ্ট করে যায়। একবার জঙ্গল 'বীট' করার সময় কতকগুলি জঙ্গলী এক জানোয়ারের পালাবার পথে পড়ে গিয়েছিল। বাঘটা পালাবার সময় এক জঙ্গলীকে একটি চড় লাগিয়ে চ'লে গেল। কিন্তু সেই চড়টিই যথেষ্ট। দেখা গেল সেই জোয়ান জঙ্গলীর মাথার খুলি ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গিয়েছে। লোকটা তৎক্ষণাৎ মারা গেল।

রাত্রিকালে মোটরে চ'ড়েই সাধারণতঃ শিকারীরা অরণ্যে প্রবেশ করে। মোটরখানা উৎকৃষ্ট ও শব্দহীন হওয়ার প্রয়োজন। ড্রাইভারকে অতিশয় সজাগ ও অভিজ্ঞ

হতে হবে। অমাবস্যার নিশুতি রাতে শিকারে যাওয়া সুবিধা, ঘন অন্ধকারে মোটরখানা অরণ্যের মধ্যে আত্ম গোপন ক'রে থাকলে জানোয়ারেরা টের পায় না। সম্মুখের আলো দুটো জ্বল্‌তে থাকে, মোটরের বাকি অংশ দেখা যায় না। সেই আলো দুটো দেখে জন্তুরা মনে করে, বুঝি তাদেরই কোনো সহযোগী জানোয়ারের চক্ষু। সেই জ্বলজ্বলে আলোর চক্ষু দেখে জানোয়াররা কৌতূহলী হয়ে মুখ তুলে তাকায় এমন সময় তাদের মুখের উপর স্পট্‌লাইট' ফেললে তারা আলোর ধাঁধায় দিশাহারা হয়ে যায়। তাদের সেই হতচকিত অবস্থায় গুলী ক'রে মারাই প্রশস্ত। বড় জানোয়ারকে যারা শিকার করবে তারা যেন জঙ্গলে প্রবেশ ক'রে ছোট জানোয়ারদের শিকার না করে। হরিণ, সম্ভর, খরগোস, বনকুকুর প্রভৃতি নানাবিধ জন্তু-জানোয়ার দেখা যায়, কিন্তু তাদের মারতে গেলে বড় জানোয়ার আর পাওয়া যায় না। গুলীর শব্দে বাঘ-ভাল্লুক সজাগ হয়ে গা ঢাকা দেয়।

লেপার্ড, ভল্লুক—এরা অতিশয় হিংস্র। অনেক সময় এরা গাছে উঠেও শিকারীদের আক্রমণ করে। লেপার্ড অতিশয় চতুর—ব্যাঘ্র সমাজে তারা নাপিত। ভাল্লুক বড় সাংঘাতিক। অভিজ্ঞ শিকারী ছাড়া ভাল্লুক শিকার হওয়া সম্ভব নয়। গুলীর আঘাতে বাঘ যদি বা পালায় ভাল্লুক তেড়ে আসবেই। আক্রমণ করার সময় তারা মানুষের ন্যায় দুই হাত তুলে তেড়ে আসে। সেই সময় ভাল্লুকের বুকে অথবা মাথায় গুলীকরা বিধি। যদি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'তে থাকে তবে আর রক্ষা নেই। তারা ভয়ঙ্কর দন্তবিকাশ ক'রে শিকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, দুই হাতের বড় বড় নখের সাহায্যে সমগ্র মানুষটাকে ছিঁড়ে ফেলে। অনেকটা বন্য শূকরের মতো। বন্য শূকর অকস্মাৎ ছুটে এসে শত্রুর শরীরের যে কোন স্থানে তার নাকের উপরকার শৃঙ্গ দ্বারা বিদীর্ণ ক'রে দেয়। বন্য শূকর নির্বোধ ও ভয়ঙ্কর। আক্রোশে তারা গাছের গোড়াকেও আক্রমণ করে, দাঁতের আঘাতে মোটা গাছের গুঁড়িও বিদীর্ণ ক'রে দেয়।

বাংলা, বিহার, আসাম ও মধ্যপ্রদেশ অরণ্যের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। বাংলার উত্তরে হিমালয়ের টিরাই—গভীর অরণ্যময়। দক্ষিণে জগদ্বিখ্যাত সুন্দরবন। বিহারের বহুস্থান অরণ্যময়। গয়া, হাজারিবাগ, রাঁচি, কোডার্মা, পরেশনাথ, ডাল্‌টনগঞ্জ—এ সকল জায়গায় বহু শিকার হয়ে থাকে। আসামের পার্ব্বত্য জঙ্গল ভারত বিখ্যাত। গৌহাটির চতুঃপার্শ্বস্থ জঙ্গল,—কুলৌরা, লামডিং, ডিব্রুগড়, মণিপুর, গৌরীপুর, সুরমা উপত্যকা—প্রভৃতি বিখ্যাত শিকার ভূমি! মধ্যপ্রদেশে সগর, রায়পুর, রাজিম ইত্যাদি। এ ছাড়া হিমালয়ের পাদদেশে—অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে আসামের কোল থেকে সমগ্র উত্তর ভারত বিস্তৃত হ'য়ে উত্তর পশ্চিম পাঞ্জাব অবধি বহুস্থানে বহু উপত্যকা ও অধিত্যকাভূমিতে শিকারের প্রচুর উপকরণ পাওয়া যায়।

অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রে যারা অরণ্যপথে শিকারে বেরিয়েছে তারাই জানে এই দুঃসাহসিক যাত্রার ভিতরে কতখানি উগ্র উত্তেজনা ও উল্লাস। বন্দুকের গুলীতে জানোয়ারকে হত্যা করতে যাওয়াই একমাত্র আনন্দের বিষয় নয়, কিন্তু এই যাত্রাকে কেন্দ্র ক'রে যে ভয়, সন্দেহ, কৌতূহল, আনন্দ, উত্তেজনা মনের মধ্যে জাগে তার তুলনা বড় কম। দুস্তর তুষারের পথ দিয়ে মেরু অভিযান, উত্তুঙ্গ দুর্গম পর্ব্বতে আরোহণ, ভীষণ ঝটিকাক্ষুব্ধ ভয়াল সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া—এদেরই সঙ্গে কেবল শিকারের অভিযানের তুলনা করা যায়। শিকার ছাড়াও অরণ্য ভ্রমণের অন্য সার্থকতা আছে। প্রকৃতির সঙ্গে একটা কেমন নূতন পরিচয় ঘটে। সূর্য্যাস্তের পর অন্ধকারে অরণ্যের ভিতরে দিক নির্ণয় করা যায় না, আকাশের তারা পথনির্দ্দেশ করে না, ভিতরে পথের অনন্ত জটিলতা, জীবজগতের কোলে সঙ্কেত কোথাও নেই। তুমি ভিতরে চলে যাও, যাও অরণ্যের হৃদয়ের মধ্যে, নীরবে গিয়ে তার কেন্দ্রে দাঁড়াও,—দেখতে পাবে একটা অদ্ভুত রাজ্য। তুমি পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে থাকো, দেখবে তোমাকে ঘিরে একটা রহস্যময় জীবনযাত্রা চলেছে। অজানা প্রাণীদলের বিস্ময়কর আনাগোনা,—দেখতে পাবে একটা অদ্ভুত চক্রান্ত, নানা বর্ণের অগণন প্রাণী সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে এধার থেকে ওধারে চলেছে। তাদের বিরক্ত করো না, বাধা দিয়ো না, তোমার অস্তিত্ব প্রচার করো না, তাহলেই দেখতে পাবে যে অরণ্যকে তুমি নির্জ্জন মনে করেছিলে সেখানে কোটি কোটি প্রাণী বর্ত্তমান। ব্যাঘ্র, ভাল্লুক, লেপার্ড, প্যানথর, শূকর, হরিণ, খরগোস, সম্ভর, হায়না, বনকুকুর, নীলগাই,—এ ছাড়াও বহু জানোয়ার, যাদের কোনো নাম অবিষ্কৃত হয় নি, তাদের অবাধ ও নিঃশব্দ চলাফেরা চলেছে। বানর, পাইথন, সর্প, গিরগিটি রঙিন পতঙ্গ, বিচিত্র মক্ষিকা ও কীট, —এরা সবাই কোটরে, জঠরে, লতায় পাতায়, ডগায় নানা অবস্থায় বিরাজ করছে। কত অদ্ভুত আওয়াজ, আশ্চর্য্য আলোর রেখা, বিচিত্র কণ্ঠস্বর, জ্বল জ্বলে চক্ষু, শঙ্কাজনক চলাফেরার শব্দ—সমস্ত মিলে তোমাকে যেন ধীরে ধীরে সম্মোহিত ক'রে আনবে। তোমার অগোচরে নির্জ্জন অন্ধকারে যে কত ঘটনা ঘটছে তুমি জানতে পারবে না। একটা হরিণ ছুটে চ'লে গেল, কিছুক্ষণ বাদে একটা বনকুকুর, তারপর একটা অজানা জানোয়ারের দূরাগত কণ্ঠস্বর, একটা সরীসৃপের সরসরানি, একটা বানরের আওয়াজ, একটা ছোট গর্জ্জন—কিন্তু তারপর? আর কোথাও কোনো শব্দ নেই, মৃত্যুপুরীর মতো সব নীরব। তুমি তখন অনুভব করবে একটা বাঘের আবির্ভাব ঘটেছে। বাঘ এলেই আশ্চর্য্য উপায়ে অন্যান্য জানোয়ারের ভিতরে সংবাদ রটে যায়, তারা সবাই সতর্ক হয়। যে জঙ্গলে বাঘ আসে সেখানে আর কোনো জন্তুর আনাগোনা

থাকে না। বাঘের হিংস্রতায় বাঘেরাও ভয় পেয়ে পালায়। বাঘের প্রভুত্ব অসাধারণ।

অরণ্যের এই দৃশ্য অতীব মনোরম। যারা কেবলমাত্র শিকার করতে যায় এই সকল দৃশ্য তাদের চোখে পড়ে না। শিকারে আনন্দ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অরণ্য ভ্রমণের যে আনন্দ তার তুলনা বড় কম। মানুষের অনধিগম্য অনাবিষ্কৃত ভূমি, প্রকৃতির যেখানে অবারিত লীলাক্ষেত্র, মানবসভ্যতা যেখানে আজও পৌছিতে পারে নি, —তার একটা নিজস্ব মহিমা আছে; দুঃসাহসী বীরের উদ্যমই সেই মহিমাকে উপলব্ধি করতে পারে।

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬] শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

ছোট্ট একটী ছেলের কথা

ম্যাক্‌সিম্ গর্কী হতে অনুদিত

[ম্যাকসিম গর্কীর নাম বোধ হয় তোমরা শুনেছ। কিছুদিন হলো তিনি মারা গিয়েছেন। তিনি রাশিয়ার একজন মস্ত বড় লেখক। যারা দুঃখী, যারা অবজ্ঞাত, যাদের দিকে কেউ ফিরে চায় না, তাদের নিয়ে তিনি গল্প লিখে গিয়েছেন। দুঃখী মানুষের প্রতি এত বড় দরদ খুব কম সাহিত্যিকের দেখা যায়। তাঁর লেখা পড়ে রাশিয়ার ছেলে-মেয়েরা তাদের নিজেদের দেশের, নিজেদের সমাজের, দুঃখ-দৈন্য অনাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি পেয়েছে। তাঁর নিজের জীবনও খুব দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে কাটে। তাই তিনি নাম নিয়েছিলেন, গর্কী। রুশ ভাষায় গর্কী মানে হলো তিক্ত। ছেলেবেলাতেই তাঁর বাপ-মা মারা যায়। গরীব দুঃখীর ছেলে, দেখবার কেউ ছিল না। সেই অবস্থায় তিনি পায়ে হেঁটে সারা রাশিয়া ঘুরে বেড়ান এবং পথ চলতে চলতে তিনি দেখেন, পথের দু'ধারে রয়েছে, তাঁরি মত সব দুঃখী মানুষের দল। কেউ নেই তাদের অন্ন দেবার, কেউ নেই তাদের শিক্ষা দেবার। পরে বড় হয়ে সেই সব লোকদের কথা তিনি লেখেন। তার মধ্যে শোন, একটি ছোট্ট ছেলের কথা······]

তোমরা হয়ত ভাবছো গল্প শুনবে। গল্প নয়, সামান্য একটী ছোট্ট ছেলের কথা। এত তুচ্ছ এত সাধারণ যে তা নিয়ে গল্প বলা বড় কঠিন।

তখন আমি সবে একটু বড় হয়েছি যখন বরফ গলে, শীত চলে গিয়ে গ্রীষ্ম আসতো কিম্বা যখন গ্রীষ্মের পর আসতো বসন্ত কাল, রাস্তার ছেলেদের দল বেঁধে নিয়ে আমি যেতাম শহর ছাড়িয়ে বনে জঙ্গলে। তাদের সঙ্গে থাকতে, তাদের সঙ্গে বেড়াতে আমার বড় ভাল লাগতো। বনের পাখীর মত তারা ছিল মুক্ত, বনের পাখীর মত তারা থাকতো সহজ আনন্দে।

শহরের রাস্তার সেই ধূলো আর নোংরা ছেড়ে, সেই গায়ে-গায়ে-লাগা ভিড় ছেড়ে, দুদণ্ডের জন্যে পালিয়ে বনের মধ্যে এসে দাঁড়াতে তাদের ভাল লাগতো। যাদের মা থাকতো, তাদের মা কারুর কারুর সঙ্গে এক আধখানা রুটী দিয়ে দিতো। আমি কিছু লজেঞ্জেস্ কিনে নিতাম আর সঙ্গে বোতলে নিতাম জল। রাখাল যেমন তার নিশ্চিন্ত মেষ-শিশুর দল নিয়ে যায়, তেমনি তাদের নিয়ে আমি শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তাম মাঠে। মাঠের মধ্যে দিয়ে চলতাম বনের দিকে,—বসন্তের সবুজ রঙেভরা শ্যামলতায় স্নিগ্ধ-কোমল বন!

সাধারণত রবিবার সকালবেলা যখন গির্জ্জেতে উপাসনার জন্যে ঘণ্টা বেজে উঠতো, আমি আমার দল নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম শহর থেকে। তাদের ছোট্ট ছোট্ট চলা-পায়ে ধূলোর কুণ্ডলী জেগে উঠতো, পেছনে বাজতে থাকতো গির্জ্জের ঘণ্টা।

যখন দুপুর হতো, সূর্য্য উঠতো মাথার ওপরে, কিছুক্ষণের জন্যে খেলা ছেড়ে আমার সঙ্গীরা বনের ধারে গাছের ছায়ায় জড় হতো·· তখন হতো খাওয়া-দাওয়া ...খাওয়া সেরে তারা কেউ সেইখানে ঘাসের ওপর শুয়ে ঘুমাতো, কেউ বা ঝোপের মধ্যে গিয়ে শুতো। দলের মধ্যে যারা সবচেয়ে ছোট, তারা তখন আমাকে ঘিরে বসতো, বলতো গল্প বলো। যেমন তারা আমার সঙ্গে বকতো, তেমনি বকতাম আমিও তাদের সঙ্গে। যেন কত জানি, সেই ভাবে তাদের সঙ্গে গল্প করতাম। কিন্তু তবুও প্রথম যৌবনের সেই সব-জানা বিজ্ঞতার উৎসাহের মধ্যে, মাঝে মাঝে মনে হতো, সেই ছোট্ট ছেলের দলের মধ্যে আমি যেন একুশ বছরের একজন শিশু, আর আমার চারদিকে সব বুড়ো বুড়ো বিজ্ঞ লোক।

মাথার ওপরে অনাদি অফুরন্ত আকাশ, সামনে বন সবুজে ভরা, ধ্যানী ঋষির মত মৌন···তারি মাঝে হঠাৎ কখন জেগে ওঠে বাতাস···সমস্ত বন ক্ষণকালের জন্যে মর্ম্মরিয়া ওঠে···গন্ধে-ভরা ছায়াগুলো ওঠে দুলে···আবার সব হয়ে আসে নিস্তব্ধ···

আর আমার চারিদিকে বসে মৌন-বিস্ময়ে ছোট ছোট ছেলের দল, শুনতে চায়, জীবনের সুখ-দুঃখের কথা···

এইসব দিনগুলোর কথা জীবনে ভুলবো না, ভুলতে পারি না...জীবনের দুর্ভিক্ষের মধ্যে এই দিনগুলো এনে দিয়েছে পরমান্ন···ইতিমধ্যেই দুঃখবেদনায় জীবন হয়ে এসেছিল রুক্ষ···সেই সব শিশু-মনের স্বচ্ছ সুষমায় মলিন ধূলোর মত ধুয়ে মুছে যেতো সেই রুক্ষতা···

একদিন আমরা শহর ছেড়ে সবে মাঠের মাঝখানে এসে পড়েছি, এমন সময় একটা নতুন ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ছেলেটী য়িহুদী, বয়স খুবই কম। পায়ে

জুতো নেই, গায়ের জামা শত-ছিন্ন, সরু, রোগা, মাথার চুল গুলো ভেড়ার লোমের মত কোঁকড়ান। তাকে দেখেই মনে হলো, তার যেন কি একটা হয়েছে, সে কাঁদছিল। নিষ্প্রভ চোখ দুটীর পাতা তখনও কেঁদে ফুলে আছে··· অন্নহীন জীর্ণ পাংশু মুখে তা স্পষ্ট ভাবেই দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ ছেলের দঙ্গলের মধ্যে পড়ে গিয়ে, সে একটু নড়ে রাস্তার মাঝখানে এসে বেশ দু'পায়ে জোর দিয়ে একবার দাঁড়ালো, তারপর এক লাফ দিয়ে রাস্তার ধারে ফুটপাথে গিয়ে উঠলো···কি বলবার জন্যে যেন সে চেষ্টা করলো··· তার মুখে, ঠোঁটে তখনও ভয় মাখানো!

য়িহুদী দেখে আমার দলের ছেলেরা মজা পেয়ে গেল। তারা একসঙ্গে সকলে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, এই ধর্, ধর্, ছোঁড়াটাকে।

আমি ভেবেছিলাম ছেলেটী ভয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু সে তা গেল না। তার পাত্‌লা ঠোঁট দুটো তখনও ভয়ে কাঁপছিল, পাতলা সরু মুখে ফ্যাকাসে বড় বড় চোখ দুটো আতঙ্কে ভরা। তবু সে পালালো না। চারিদিকে ছেলেরা তার পেছনে লাগবার জন্যে চেঁচাচ্ছে, তার মধ্যে সে দুপা'য়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। হাত দুটো পেছনে দিয়ে যেন সে নিজেকে শক্ত করে নিলো। ছেলেদের চীৎকারের প্রতি কোন লক্ষ্য না করে, সে খুব গম্ভীর ও ধীরভাবে হঠাৎ বলে উঠলো,—ম্যাজিকের খেলা দেখবে, ভাই!

আমি বুঝলাম এ ব্যাপারটা আত্মরক্ষার একটা চেষ্টা মাত্র। দলের মধ্যে যারা খুব ছোট, ম্যাজিকের নামে তারা একটু শান্ত হলো এবং ছেলেটীর দিকে এগিয়ে গেল কিন্তু দলের মধ্যে যারা ছিল চাঁই, তারা এ-তে ভুলবে কেন? ও-পাড়ার য়িহুদী ছেলেদের সঙ্গে তাদের ছিল ঝগড়া···এই সুযোগ তাদের মত বন্য ছেলেরা ছাড়ে? তারা তখনও ছেলেটীকে উদ্‌ব্যস্ত করবার চেষ্টা করছে।

দলের ছোট ছোট ছেলেরা তখন য়িহুদী ছেলেটীকে ঘিরে ফেলেছে।

—দেখি, দেখা দেখি কি ম্যাজিক জানিস্।

অমনি ছেলেটি কয়েক পাক ঘুরেই মাটীর ওপর এক হাত রেখে পা দুটো ওপরে করে দিলে! একটার পর একটা কসরৎ দেখিয়ে যেতে লাগলো। এক একবার একটা খেলা দেখায় আর ছেলেদের দিকে চেয়ে ফিকে হাসি হাসে। ছোট ছেলেদের খুব মজা লেগে গেল। তারা খুব হাততালি দিতে লাগলো। কিন্তু ছেলেটী তখন ক্লান্তিতে গলদ্‌ ঘর্ম্ম হয়ে উঠেছে। দেখলেই মনে হচ্ছিল যে এবার যেন ঘুরে পড়ে যাবে। এমনি খেলা দেখাতে দেখাতে হঠাৎ সে খেলা থামিয়ে ছেলেদের সামনে হাত পেতে বল্লে,—এবার আমায় কিছু দাও!

ছেলেরা সব চুপ হয়ে গেল। একজন তাদের মধ্যে থেকে বলে উঠলো—কি পয়সা চাস্ নাকি?

ছেলেটী গম্ভীর হয়ে বল্লে,—হাঁ,

—ইয়ার্কি আর কি! ওঃ, ওরকম খেলা আমরা কত দেখাতে পারি···এর জন্যে আবার পয়সা দিতে হবে··· যাঃ···যাঃ

এই বলে ছেলের দল বেগতিক দেখে মাঠের দিকে একে একে সরে পড়লো। অবশ্য তাদের কাছে পয়সাও ছিল না। আমার কাছে মাত্র গুটী সাতেক কোপেক্ ছিল। আমি তাই থেকে দুটি কোপেক ছেলেটীর ধুলোয় ভরা হাতে দিলাম। এক গাল হেসে হেসে সে বলে উঠলো,—ধন্যবাদ!

এই বলে সে পেছন ফিরে চলে যাচ্ছিল। পিছন ফিরতেই হঠাৎ ছেঁড়া জামার ভেতর দিয়ে তার সাদা গায়ে কি একটা গভীর কালো দাগ যেন চোখে পড়লো। ছেলেটীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম,—তোমার পিঠে এ কিসের দাগ।

তেমনি হাসতে হাসতে সে ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে,—ওঃ, পিঠের দাগের কথা বলছেন? সেদিন এক জায়গায় হাওয়ায় খেলা দেখাতে গিয়ে আমি আর বাবা পড়ে যাই! বাবা এখনও শয্যাশায়ী, উঠতে পারে না...আমি উঠেছি।..

আস্তে আস্তে তার পিঠের সার্ট তুলে দেখি, বাঁ কাঁধের নিচে থেকে একটা গভীর ক্ষত রেখা সোজা হাঁটুর তলা পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে···তখনও ঘা শুকোয় নি···ঘায়ের ওপর একটা পাতলা চামড়া গজিয়েছিল সবে···ছেলেদের খেলা দেখাতে গিয়ে মাঝে মাঝে তা ছিঁড়ে ফেটে গিয়েছে··· সেই ফাটার মুখ দিয়ে আস্তে আস্তে লালা রক্ত বেরুচ্ছে—

তেমনি হেসে আমার মুখের দিকে চেয়ে সে শুধু বল্লে···আমার এখন আর লাগে না···তবে মাঝে মাঝে একটু চুলকোয় মাত্র···

তারপর, বীরের মত ঘাড় তুলে, সে আমার দিকে চেয়ে, কতকালের বিজ্ঞ লোকের মত বলে উঠলো—

—আপনি হয়ত ভাবছেন যে, আমি বুঝি নিজে দু'টো পয়সা পাবার জন্যে এই সব খেলা দেখালাম··· আপনার দিব্যি বলছি, তা নয়! আমার বাবা জানেন··· আমাদের খাবার কিছু নেই! তারপর তো বাবা শয্যাশায়ী। সুতরাং কাজ তো করতে হবে! লাগলে চলবে কেন? আর তা ছাড়া আমরা য়িহুদী··· সবাই আমাদের ক্ষেপায়···আচ্ছা...ধন্যবাদ···চল্লুম···

তারপর একবার তার মাথাটা একটু নীচু করে আমার দিকে চেয়ে ধীরে চলে গেল।

গল্প শুনে ভাল লাগলো না, না?

অতি তুচ্ছ, সামান্য কথা। কিন্তু আমার জীবনের দারুণ দুর্দ্দিনে এই ছেলেটির অপূর্ব্ব বীরত্বের কথা আমি প্রায়ই স্মরণ করতাম, কৃতজ্ঞ-অন্তরে!

[শ্রাবণ, ১৩৪৬] অনুবাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

গ্রামের ছড়া

এদেশে, ওদেশে—সে দেশে, কত ছড়া ছড়িয়ে আছে। তোমার মুখে আমার মুখে তার মুখে—কত রঙের বেরঙের ছড়া। কেউ বলে, কেউ বলে না। আবার কেউ বলতেও জানে না।

সব দেশের কথাও একরকম না। আবার সব দেশের কথাও আমরা বুঝিনে। কত নাম-না-জানা গাঁয়ে তোমাদেরই মত ছোট ছোট খোকাখুকুরা হাজার রকম ছড়া জানে। সে সব ছড়া যদি তোমরা শুনতে তবে তাদের সাথে নিশ্চয় ভাব করতে চাইতে।

আমি অনেকদিন পাড়াগাঁয়ে ছিলুম। সেখানে গ্রাম্য ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে অনেকগুলো ছড়া শিখে এসেছি। তোমরা যেমন বই পড়তে পার, তারা কেউ বই পড়তে পারে না। তারা ছড়া কেটে কথা বলে। সন্ধ্যাবেলায় মাটির প্রদীপের আড়ালে বসে বুড়ো ঠাকুরদার কাছে রূপকথা শোনে। আমি তাদের কতকগুলো ছড়া তোমাদের শুনাব। তাদের ভাষা তোমরা বুঝতে পারবে না মনে করে ছড়াগুলো অনুবাদ করে দিলুম। যদি ছড়াগুলো তোমাদের ভাল লাগে এর পরে আরও কতকগুলো ছড়া তোমাদের অনুবাদ করে দেব।

পাড়াগাঁয়ের একটি ছোট মেয়ের বিয়ে হবে। বাড়ীতে বিয়ের বাজনা বাজছে। মেয়েটি খেলতে খেলতে সে কথা ভুলে গেছে। তখন তার সাথীরা তাকে যেয়ে বলল—

ঢোল বাজে ঘামুর ঘুমুর সানাই বাজে র'য়ে
পরের ছেলে নিতে এলো ঢোল টোকর দিয়ে।

পরের ছেলের সাথে মেয়েটির বিয়ে হবে। সেখানে ত আর মনের মত করে খেলার ঘর সাজান যাবে না। সেখানে ঘোমটা দিয়ে তাকে লজ্জাবতী বউ সাজতে হবে। তাই মেয়েটি তার সাথীদের বলল, আজকের মত আয় তোদের সাথে শেষ খেলা খেলে যাই।

আয় লো খেলার সই খেলার সাজ নিয়ে,
আর তো খেলব না খেলা পরের ঘরে গিয়ে।

কিন্তু সেই খেলাঘর হ'তে তাকে টেনে নিয়ে গেল গুরুজনেরা। তারপর—

আম কাঁঠালের পীঁড়িখানি খি মউ মউ করে
তারির উপর বাপ ভাই কন্যা দান করে।

এই ভাবে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। বরের দেশে যেতে মেয়েটির মন চায় না! কিন্তু বাপ খুড়ো চোখের জল মুছতে মুছতে তাকে ভিন্‌দেশী বরের দেশে এগিয়ে দিয়ে এলো।

খুড়ো যায় রে জেঠা যায় রে বাপ যায়রে হেঁটে
শিশুকালে হৈল বিয়ে পরাণ যায়রে ফেটে।

খুড়ী জেঠী সবাই কাঁদছে পথের দিকে চেয়ে। সবার কান্নাই মেয়েটি সইতে পারে, কিন্তু মা জননী যে ঘরের দরজা ধরে বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত কাঁদছে সে কান্না মেয়েটি কেমন করে সইবে?

খুড়ী কাঁদেন জেঠী কাঁদেন সকল কাঁদেন পর
মা-জননী কাঁদেন আমার বেলার আড়াই পর।
খুড়ীলো জেঠীলো মাকে নে'যা ঘরে,
মায়ের কাঁদনে আমার পরাণ পাগল করে।

এই ভাবে নিজে কেঁদে, মা বাপকে কাঁদিয়ে মেয়েটি বিদায় হয়ে গেল।

অচেনা বরের দেশে মেয়েটির নানান কষ্ট। শাশুড়ী ননদীর অত্যাচার। শাশুড়ী তাকে বেগুন কুটতে বলেছিল। কিন্তু বেগুণে পোকা লেগেছে। মেয়েটি তখন বেতে শাক তুলতে গেল। অচেনা দেশ। অজানা তার রীতিনীতি! যেখানে পা বাড়ায় সেখানেই বিপদ।

এপারে ওপারে বেতে শাকের ডগা জল্‌মল খেলে
বেতে শাক তুলতে গেলাম সাপে যে পট মেলে।
সাপের জ্বালায় গেলাম ঘরে ননদ ঠোকর মারে,
ঘরের পিছে গেলাম সেথায়, মশা ভন্ ভন্ করে।
মশার জ্বালায় গেলাম ঘাটে কুমীর ভাসান ধরে,
কুমীর দেখে গেলাম নায়ে, নাও টলমল করে!
নৌকা ছেড়ে গেলাম বনে বাঘে যে ডাক ধরে,
বাঘের ভয়ে গেলাম মাঠে কোলা গড় গড় করে,—
কোলার জ্বালায় গেলাম হাটে, হাট গমগম করে।

এমনি অবস্থা তার নিত্যি নিত্যি হয়। এত দুঃখে মেয়েটি জলে ডুবে গেল।

হাড় হ'ল ভাজা ভাজা মাংস হ'ল দড়ি
আয়রে নদীর জল ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।

নদী দিয়ে কারা যেন নাও বেয়ে যায়। মনে বড় আশা যদি বাপ ভাইএর দেশে খবর পাঠান যায়।

কে যাসরে নৌকা বেয়ে লাল লগিটি দিয়ে,
কে যাসরে নৌকা বেয়ে নীল লগিটি দিয়ে,
আমায় যেন বাপের বাড়ী দাদারা যায় নিয়ে।

সেই নৌকার মাঝিরাই যে তার দাদারা, মেয়েটি তা জানত না। তারা উত্তর করল—

থাক থাক বোনটিরে চেয়ে পথের পানে,
নিতে আসব শাটিয়াধান কাটার অবসানে।
শাটিয়াধান থোকা থোকা আগায় বসে টিয়ে,
এমন সোণার বোনরে দেছি পরের সাথে বিয়ে।

তখন আকাশে মেঘ এসেছে। বাতাসে নৌকার পালে দোলা দিচ্ছে। মেয়েটির প্রাণ কিছুতেই মানে না।

ওপারেতে কালো রঙ,
বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্
এপারেতে লঙ্কা গাছ রাঙা টুকটুক করে
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।

ভাইদের নৌকা তখন আরও খানিক এগিয়ে গেছে। তারা যেতে যেতে উত্তর করে :—

এ মাসটা দাও বোন কাঁদিয়ে কাটিয়ে
ও মাসেতে নিতে আসব পাল্কীতে সাজিয়ে।

ভাইরা চলে গেল। মেয়েটির সকল মন ভরে ওঠে কান্নায় :—

"তোরা কে কে যাবি বাপমার দেশে।"
কার সাথে যাব, কার সাথে কব
দুঃখের কথা কা'রে দিয়ে লিখিয়ে পাঠাব।
দুঃখে যেতাম শুধু যেতাম সেও ছিল ভাল
মনের তাপে গায়ের বরণ হয়ে গেল কালো।

তার কেবলই মনে পড়ে—

বাপের বাড়ীর জোড় কলসী গলায় গলায় জল
সেই কলসীর জলের লাগি মন হ'ল চঞ্চল।

আরও মনে পড়ে—

বাপের বাড়ীর পুণ্যি পুকুর পদ্মফুলে ঘেরা
চার ধারে তার চম্পাকলি শিমুল গাছের বেড়া।

অনেক দিন পরে ভাইরা এসে তাকে বাপের বাড়ীর দেশে নিয়ে গেল। পাড়াপ্রতিবেশীরা কাছে এসে অবাক। যাকে তারা একদিন রাঙা বধূর বেশে বরের দেশে পাঠিয়েছিল, তার এই কি ছিরি।

অলকমণি রাজার রাণী কি বলব আর
অলকমণির কপাল পুড়ে হ'ল ছারখার!
দু-দুটো দাসী দিলুম পায়ে তেল দিতে
আম কাঁঠালের বাগান দিলুম ছায়ায় ছায়ায় যেতে।
উড়কি ধানের মুড়কি দিলুম পথেতে জল খেতে।
রাজা গেল রাজ্য গেল, গেল যে সমুদায়
বাতি দিতে রাজপুরিতে নাইক কেহ হায়।

আজ সব দিক দিয়েই মেয়েটির কপাল পুড়েছে। ছোট কালের সেই এত আদরের বাপ মা আর বেঁচে নেই। খেলার সাথীদের নানান দেশে নানান গাঁয়ে বিয়ে হয়েছে। এত দরদের ভাইরা এখন পর হয়ে গেছে। ভাইবৌরা তাকে ঠোকর মেরে কথা কয়। বাপের বাড়ীর উঠানে বসে মেয়েটি কাঁদল। মায়ের জন্যে কাঁদল। বাপের জন্যে কাঁদল। কিন্তু হায়, আজ কেউ এসে তার চোখের জল মুছাল না।

সেই ছেলেবেলাকার খেলাঘর আজও প'ড়ে রয়েছে। আগেকার দিনের সব কথা মনে পড়ে! আর ত এ পথে সে আসবে না। কার আদরের জন্যেই বা আসবে।

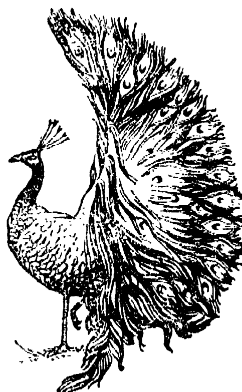
তাই বড় অভিমানে সে আজ ফিরে চলেছে। কোথায় চ'লেছে তা কেউ জানে না। যাবার পথে মেজো ভাইটির সাথে দেখা। ছেলেবেলায় যে দোলনায় তারা দুলত সেই দোলনায় দুলতে দুলতে মেয়েটি বলল :—

দোল দেরে দোল মেজো ভাই—
লাল শাড়ীখানা দাও বাড়ী যাই।
মা যদি থাকত
ডুলি ধ'রে কাঁদত।

আজ ত মা বেঁচে নেই। কে আর দোলার খুঁটি ধরে তার জন্যে কাঁদবে। বড় অভিমান তাই ভাইকে আবার বলে দিল—

এইখানটিতে খেলেছিলাম ভাঁড়াকাটি নিয়ে
এইখানটি রুধে দিও ময়না কাঁটা দিয়ে।

[শ্রাবণ, ১৩৪০] জসীমউদ্দীন



বাপের কি মনে থাকে-

। এই লেখাটী লিখেছিলেন আমেরিকার একজন বিখ্যাত সম্পাদক। র নাম হলো ডবলু, লিভিংষ্টোন লার্ণেড। ইংরেজীতে এই লেখাটির ম হলো, Father forgets। এই লেখাটি বেরোনোর পর, মেরিকার প্রায় সব কাগজেই এই লেখাটিকে তাঁরা ছেপেছিলেন। াতের নানান্ ভাষায় এই ছোট্ট লেখাটী অনূদিত হয়ে বেরিয়েছে। ় ছোট্ট লেখাটীর মধ্যে বাপ আর ছেলের সম্বন্ধের মধ্যে যে অপূর্ব্ব ্রতা আছে, তাকে এমন সুন্দর ভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে যে, জগতের ল দেশের লোকের কাছে এটা অতি প্রিয় হয়েছে। আজকে মৌচাকের ঠক-পাঠিকাদের জন্যে এই লেখাটী অনুবাদ করান হলো—আমার শ্বাস তোমাদের প্রত্যেকেরই ভাল লাগবে]

সোণার ছেলে শোন; যদিও তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ, বুও মণি, তোমাকেই বলছি। তুমি শোন!

এই রাত্রিবেলা চুপি চুপি তোমার শোবার ঘরে তামার মাথার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছি; দেখছি, ছোট াতখানি গাল-চাপা দিয়ে অকাতরে তুমি ঘুমোচ্ছো—ভজে কপালে তোমার কালো কোঁকড়ান চুল উড়ে এসে লেগে রয়েছে। চুপি চুপি এসে তোমার মাথার শিয়রে াড়িয়ে আমি তাই দেখছি!

তোমার ঘরে আসবার আগে, লাইব্রেরী-ঘরে বসে বই ়ড়ছিলাম, হঠাৎ দমকা বাতাসের মত, বিষম এক দুঃখ ়সে মনকে অস্থির করে দিলে। সেই সঙ্গে এলো নিদারুণ অনুতাপ। তোমার ওপর রাগ করে তোমাকে ভৎর্সনা ়রেছিলাম। তাই লাইব্রেরী-ঘর ছেড়ে, চুপি চুপি অপরাধীর মত তোমার মাথার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছি।

তোমাকে যে ভৎর্সনা করেছিলাম, সেই কথাই শুধু ়াবছি; স্কুলে যাবার সময় যখন তুমি পোষাক পরছিলে, খন দেখলুম ভাল করে হাত পা মুখ পরিষ্কার না করে, একবার শুধু গামছাটা মুখে ঠেকিয়েই তুমি ছুট্‌ছিলে, সেইজন্যেই তো তোমার ওপর ভারী রাগ হলো। তারপর দেখি, জুতোটাও পরিষ্কার করে রাখো নি! তাড়াতাড়ি ়রে বই নামাবার সময় যখন দেখলাম যে, তুমি জিনিসপত্র ়ুড়ে মেঝেতে ফেলছো, তখনই না রেগে ধমকে উঠলাম?

তারপর খাবার সময়ও তুমি অনেক অন্যায় করেছিলে। টেবিলের ওপর কনুই দিয়ে খেতে নেই, তোমাকে কতদিন ়লেছি, বলেছি ওটা অসভ্যতা কিন্তু দেখি, সেই খাবার টেবিলে তুমি কনুই দিয়ে খেতে আরম্ভ করেছ। বার বার তোমাকে বলেছি, তুমি নিজে যখন তোমার রুটীর মাখন াখাবে, তখন খুব বেশী ঘন করে মাখন লাগাবে না, কিন্তু দেখলুম তুমি রীতিমত পুরু করেই তোমার রুটীতে মাখন লাগালে! তার জন্যে যে অন্যের মাখন কম পড়তে পারে, সে দিকে তোমার দৃষ্টিই নেই।

তারপর, বিকেল-বেলার কথা ধর! অফিস থেকে ফেরবার পথে দেখি, তুমি রাস্তার ধুলোয় হাঁটু লাগিয়ে আপনার মনে মার্ব্বেল খেলছো। মোজাটা কি করে চারিদিক থেকে ছিঁড়েছে। তোমার বন্ধুদের সামনে তোমাকে তখন লাঞ্ছিত করেছিলাম। কতবার তোমাকে বলেছি, মোজার দাম বড্ড বেশী, তোমাকে নিজে যদি কিনে পরতে হতো, তাহ'লে হয় ত আরও সাবধানে ব্যবহার করতে! বাপ হয়েও, তোমাকে এই কথা বলতে হয়েছে!

তারপর মনে পড়ে, পড়বার ঘরে রাত্রিবেলা যখন একলা বসে বই পড়ছিলাম, চুপি চুপি ভয়ে ভয়ে, দরজার কাছে এসে তুমি দাঁড়ালে; তোমার চোখ দুটীর দিকে চেয়ে মনে হলো, তুমি যেন কত আহত হয়েছ। তুমি কুন্ঠিত হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলে। তুমি কিছু বলবার আগেই তাড়াতাড়ি কাগজ থেকে মুখ তুলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে রে মণি? তুমি কিছু বলো নি; ছুটে এসে শুধু ননীর মতো কোমল, ফুলের মত পবিত্র, ঐ দুটী হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরেছিলে। তারপর কিছু বলবার আগেই দেখি, তুমি চলে গিয়েছ—চুপ করে শুনলাম, সিঁড়ি দিয়ে তোমার ওপরে চলে যাওয়ার শব্দ।

তারই কিছুক্ষণ পরে, আমার হাতের বই গেল হাত থেকে পড়ে। হঠাৎ বিষম এক ভয় এলো মনে! তোমার বদ্ অভ্যাসের জন্যে তোমাকে ভৎর্সনা করেছি—কিন্তু এ আমার নিজের কি বদ্-অভ্যাস হতে চল্লো? শুধু দোষ দেখার, শুধু ভৎর্সনা করার, একি বদ্ অভ্যাস হতে চল্লো? তুমি যে ছোট ছেলে, আমার মত বয়সে বুড়ো হও নি, সে কথা আমি বারবার ভুলে যাই কি করে? কেন আমি চাই, আমার বয়সের মত করে তোমাকে দেখ্‌তে? তুমি যা দিতে পার না, তোমার বয়স যা দিতে পারে না, কেন তোমার কাছে আমি তাই চাই? তুমি কি ছেলে হয়ে আমার কাছে শুধু এই উপহারই পাবে?

তুমি যে কত ভাল, তুমি যে কত সুন্দর, সে কি আমি জানি না! প্রতি রাত্রির অন্ধকার দূর করে, বিশ্বজগতে আলো ছড়িয়ে যে উষা আছে, জানি তোমার মনটী সেই উষার মত স্নিগ্ধ, সুবিশাল। রাত্রিতে শোবার আগে, সেই যে তুমি কোন কথা না বলে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলে, সেই যে ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরেছিলে, তখনই আমি তার পরিচয় পেয়েছিলাম। তারপর আর কিছু যায় আসে না! তাই, এই রাত্রিবেলা, এই অন্ধকারে, চুপি চুপি তোমার মাথার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছি, তোমার শিয়রে অপরাধীর মত এই আমি নতজানু হলাম। শোন, সোণার ছেলে, আমি আজ লজ্জিত!

জানি, যে অপরাধ করেছি, তার পক্ষে এই অনুশোচনা অতি সামান্য। আমি জানি, কাল সকালবেলা যখন তুমি

ঘুম থেকে উঠবে, তখন যদি তোমাকে এই সব কথা বলি, কিছুই বুঝতে পারবে না। তা নাই বা বল্লাম, কাল থেকে আমি সত্যিই তোমার "ড্যাডি" হব! তোমার সঙ্গে গল্প করবো, তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াব, তুমি কষ্ট পেলে তোমার সঙ্গে সেই কষ্ট নেবো; যদি ভুলে কখনও অধীর হয়ে রূঢ় কথা মুখে আসে, জিভ্ কামড়ে থাকবো। লোকে যেমন করে মন্ত্র জপ করে, তেমনি করে অহোরাত্র এই মন্ত্র জপ করবো যে, যাকে আমি ভর্ৎসনা করতে যাই, সে নিতান্ত শিশু, ফুলের মত ছোট্ট শিশু!

আমি অন্যায় করেছি, আমি ভেবেছি তুমি বড় হয়েছ। দিনের বেলায় তোমাকে যখনই বকেছি, তখনই ভুল করে ভেবেছি যে, তুমি বুঝি আমাদেরই মত মস্ত বড় একজন মানুষ। আজ এখন, এই রাত্রির অন্ধকারে, বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আছ—দেখছি কতটুকু তুমি! এই তো মাত্র সেদিনও তোমার মার কাঁধে মাথা রেখে তাঁর কোলে ঘুরে বেড়িয়েছ! এখনই কি তোমার কাছে অত খানি দাবী করা উচিৎ হয়েছিল?

[আশ্বিন ১৩৪২]

যদি আমি রাজা হইতাম

[এই প্রবন্ধটী সম্রাটের রজত জুবিলী উপলক্ষে সমস্ত বাংলা দেশের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বাংলাভাষায় "আমি যদি রাজা হইতাম" প্রবন্ধের প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়াছে ও মহামান্য গবর্ণরের প্রদত্ত স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছে]

মনে পড়ে শৈশবে কত বর্ষায় বৃষ্টিমুখরিত রাত্রে দিদিমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া গল্প শুনিয়াছি—বিদেশী রাজকুমার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া কত দেশ দেশান্তরের উপর দিয়া উড়িয়া চলে—বন্দিনী রাজকন্যার উদ্দেশে। সহস্রযুগের নিদ্রা ভাঙাইয়া রাজকুমারীকে সঙ্গে লইয়া অবশেষে রাজ-সিংহাসনে বসিয়া রাজ্যশাসন করে। কত প্রজা, কত সৈন্য, কত তাহার অর্থ, সম্পদ, প্রতিপত্তি। শুনিতে শুনিতে এই শিশু হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যাইত। ঘুমে যখন চোখের পাতা জড়াইয়া আসিত, তখনও চোঁখের উপর ভাসিত রত্ন সিংহাসন, স্বর্ণনির্ম্মিত রাজদণ্ড, সুসজ্জিত রাজসভা। সেই সভায়, সেই মাণিক্যখচিত রাজ সিংহাসনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে তখন বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিতাম না।

কিন্তু, আজ সেই রাজাও নাই, সে রাজ্যও নাই। কোন লঘুপক্ষ শুভ্র শারদ মেঘের হাল্‌কা ভেলায় চড়িয়া, সেই আমার ভাবনা সাধনা বিহীন শিশুরাজ্যখানি সুদূর অস্তাচলের দেশে ভাসিয়া গেল, তাহার আর কোন সন্ধানই পাইলাম না।

কিন্তু শৈশবের সেই কোমল শিশুহৃদয়খানি এখনও ত আমার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে, তাই এই কঠোর বাস্তবজীবনেও কেমন করিয়া জানি না—শৈশবের সেই রঙীন স্মৃতিগুলি এখনও মাঝে মাঝে মনের কোনে দোলা জাগায়।

আশ্চর্য্য,এখনও আপনাকে রাজা বলিয়া কল্পনা করিতে করিতে বাস্তব জগৎকে ভুলিয়া যাই। কল্পনার তরী ভাসিয়া যায় এক অদৃষ্টপূর্ব রাজ্যে—সে দেশে আমিই রাজা।

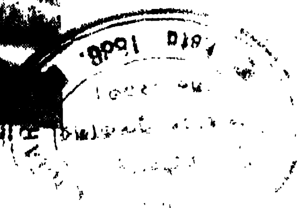
প্রভাত রবির কিরণ যখন আমার গজদন্তশুভ্র প্রাসাদের চূড়ার উপর দিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, অশোককুঞ্জে সদ্যনিদ্রোত্থিত কোকিল দ্বিধাভরে মৃদুস্বরে ডাকিতে থাকে, তখন আমার প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়াইয়া আমি পূবের আকাশে তরুণ রবির বর্ণচ্ছটা মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখি।

ক্রমে ক্রমে মহানগরী জাগিয়া উঠে। দলে দলে সুস্থ, সবলকায় নরনারী আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়ে। আমার প্রাসাদের দক্ষিণে স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী, তাহার পরপারে বিস্তৃত সবুজ ভূমি। দিনের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দলে দলে কৃষকেরা আসিয়া জড় হয়। আনন্দোজ্জল মুখে সকলে কাজ করিয়া চলে; ক্লান্তি নাই, গ্লানি নাই, অবসাদ নাই। মেয়েরা দলে দলে গান গাহিতে গাহিতে ধান কাটে, গাছে জল দেয়। কাজ করাটা ইহারা হেয় মনে করে না। নিতান্ত তুচ্ছ কাজ করিতেও ইহারা অপমান বোধ করে না। কর্ম্মই ধর্ম্ম, কর্ম্মই সাধনা এবং কর্ম্মই সিদ্ধি এই বাণীই আমি দেশের মধ্যে প্রচার করিয়া দিয়াছি—আমার প্রজাদের ইহাই মূলমন্ত্র।

প্রজারা পরিশ্রম করিয়া শস্য উৎপাদন করে; তাহার এক দশমাংশ রাজার প্রাপ্য কর। তাহাদের পরিশ্রমের সবটুকু ফল নিঃশেষে হরণ করিয়া তাহাদের পরিশ্রমের অবমাননা করি নাই।

ক্রমে বেলা বাড়িয়া যায়। স্নানাগারে স্নান সমাপন করিয়া রাজপরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া আমি রাজসভায় প্রবেশ করি; অমাত্যগণ অভিনন্দন করিয়া উঠে; মাঙ্গলিকগীতি সমাপ্ত হইলে আমি ধীরে রাজসিংহাসনে উপবেশন করি।

প্রথমে বিচার কার্য্য আরম্ভ হয়। যদি কোনও দুরূহ সমস্যা অধীনস্থ শাসনকর্ত্তাগণ মীমাংসা করিতে অসমর্থ হন, তবে তাহা আমার দৃষ্টি গোচর করা হয়। উপস্থিত সকল



ঝড়

[শিল্পী—শ্রীশৈলেন চক্রবর্ত্তী]



আদর

আমাত্যগণের অভিমত গ্রহণ করিয়া যতদূর সম্ভব তাহার ন্যায় মীমাংসা করা হয়।

তারপর হয়ত দৌবারিক আসিয়া জানায়, "দ্বারে বিদেশী রাজদূত সমাগত।" তাহাকে যথোচিত সমাদর করিয়া আহ্বাণ করা হয়। সে হয়ত জানায়, বিদেশী রাজা, যুদ্ধ-প্রার্থী। আমি অসম্মতি জানাই, যুদ্ধ নয়, অর্থবিনিময়ও নয়, একমাত্র বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে আমি সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করি। বিদেশীদূত আমার বার্ত্তা বহন করিয়া চলিয়া যায়।

তারপর আমি দেশের বিদ্যাচর্চ্চা, ব্যায়াম চর্চ্চা প্রভৃতি বিষয়গুলির অনুসন্ধান লই। অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিয়া জনসাধারণের মনে জ্ঞানের শিখা জ্বালাইয়া তোলাও আমার কর্ত্তব্যের অঙ্গ। শিক্ষা ও সুরুচির আনন্দ যেন সকলেই উপলব্ধি করিতে পারে ইহাই আমার একাগ্র সাধনা।

কাহারও ধর্ম্মে আমি হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না; কিন্তু জাতিভেদের কুপ্রথা যেন দেশ হইতে তিরোহিত হয়, ইহা আমার প্রধান উদ্দেশ্য। জ্ঞানের আলোকের সাক্ষাৎ পাইলে জনসাধারণ জাতিভেদের অনাবশ্যকতা ও কুফল সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ইহার পর রাজসভা হইতে প্রেরিত পরিব্রাজকগণ দেশের অন্নসত্র, জলসত্র, পান্থালয়গুলির সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, সেই বিবরণী পাঠে যেখানে যত ত্রুটি তাহার সংশোধন করিবার জন্য যথাসাধ্য সুব্যবস্থা করা হয়।

সভার সকল কার্য্য শেষ হইলে, স্মিতমুখে ভাবাবিষ্ট নয়নে কবি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়। তাহাকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আমার পার্শ্বে বসাই। নির্জ্জন সভাকক্ষে বহুক্ষণ তাহার সহিত কাব্যালোচনা করিয়া বিদায়কালে আমার কণ্ঠের শুভ্রকুন্দের মালা তাহাকে পরাইয়া দিই।

প্রতিদিন বৈকালে সৈন্যবিভাগ পরিদর্শন করিয়া নবীন সৈনিকদের নির্ভীক হৃদয়ে উৎসাহের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেওয়াটা আমার একটা কর্ত্তব্য।

রাজকার্য্যের ফাঁকে ফাঁকে আমি মাঝে মাঝে নগরীর বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াই। কিন্তু রাজবেশে নয়, সামান্য নাগরিকের বেশে; নহিলে দেশের স্বরূপ প্রকাশ হয় না। কারণ, মানুষ যেখানে বিশিষ্টতার আভাস পায়, সেখানেই যে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করে।

কোনও দিন সন্ধ্যায় আমি নগরীর রাজপথ ধরিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসি। পথের দুইধারে কোনও প্রকার আবর্জনা নাই। আমার প্রজাদের এই শিক্ষাটুকু দিতে পারিয়াছি যে জীবনের পথকে নির্ম্মল পবিত্র করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনের চলার পথকেও পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। পথের দুইধারে লতাকুঞ্জ। কর্ম্মক্লান্ত দিনের শেষে প্রজা সাধারণ সেখানে ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার কোনটিতে বসিয়া তরুণ শিল্পী বাঁশী বাজায়, কোনটিতে শিশুর দল কলহাস্য তোলে

নগরী হইতে কিছু দূরে একটি বিশাল অট্টালিকা। দেশের মধ্যে যাহারা দরিদ্র কিন্তু কার্য্যক্ষম নহে, তাহাদের রাজ-সরকার হইতে অর্থ সাহায্য করিয়া এইখানে বাস করিতে দেওয়া হইয়াছে। এখানে থাকিয়া, তাহারা যাহার যতটুকু সম্ভব ততটুকু কাজ করিয়াও দেশবাসীর সেবা করে। দেশে ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ। কারণ ভিক্ষাবৃত্তি মানুষকে স্বাবলম্বনশক্তিহীন, নির্ভরশীল ও লোভাতুর করিয়া তোলে।

নগর হইতে বহুদূরে পাহাড়তলীতে এক প্রশস্ত অট্টালিকা। ইহা দেশের রুগ্ন প্রজাদের আশ্রয় স্থল, এইখানে রাখিয়া তাহাদের চিকিৎসার যতদূর সম্ভব সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। একজন রোগীকে সহজ লোকের মধ্যে রাখিয়া শত শত সুস্থ সবল লোককে স্বাস্থ্যহীন করিয়া তোলা সমাজের পক্ষে যে অনেকখানি ক্ষতি!

দেশের শিল্প, বাণিজ্য, আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতিও সমাজের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। আমার রাজ্যে বৎসরের মধ্যে একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করা আছে। সেই দিন দেশের জননীদের উপলক্ষ করিয়া এক উৎসব করা হয়। যে জননীর ক্রোড়ে নন্দনকাননের দেবশক্তির মতন সুন্দর সবল শিশু, সমাজের ভাবী উন্নতির সূচনা প্রদর্শন করিতে পারে, সেই জননীকে রাজার নামাঙ্কিত স্বর্ণপদক প্রদান করিয়া দেশবাসী তাহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

কিন্তু কেবলমাত্র নিয়মগুলি পালন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া চলিলে, জীবনের উৎস শুষ্ক হইয়া যায়। তাই মানুষের জীবনে বৈচিত্র্য একান্ত আবশ্যক।

শরতের সোনালী রৌদ্রে যখন আকাশ ঝলমল্ করিতে থাকে, তখন আমার রাজ্যে একাদিক্রমে সাতদিনের অবকাশ চলিতে থাকে। এই কয়টি দিনের জন্য সকল কাজের বোঝা নামাইয়া রাখিয়া, উদ্দেশ্যহীনভাবে, সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছানুসারে, সময় অতিবাহিত করে। কেহ কাশের বনে কাব্যগ্রন্থ লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; কেহ নদীর তীরে বালুচরে আপনার মনে গান গাহিয়া দিন কাটায়।

এই দিন কয়টির জন্য আমারও পূর্ণ অবকাশ। রাজ্যের বাহিরে বনের মধ্যে পিয়াল গাছের তলায় তাঁবু খাটাইয়া, সামান্য কয়েকজন অনুচর লইয়া এই দিন কয়টি আমি কাটাইয়া দিই

সন্ধ্যায় অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণ আভা যখন বনের পাতায় পাতায় ঝিকমিক করিতে থাকে তখন আমি একাকী বনের পথে বাহির হইয়া পড়ি—কি জানি, কখন কোনও শকুন্তলার সঙ্গে দেখা হইয়া যাইতেও পারে!

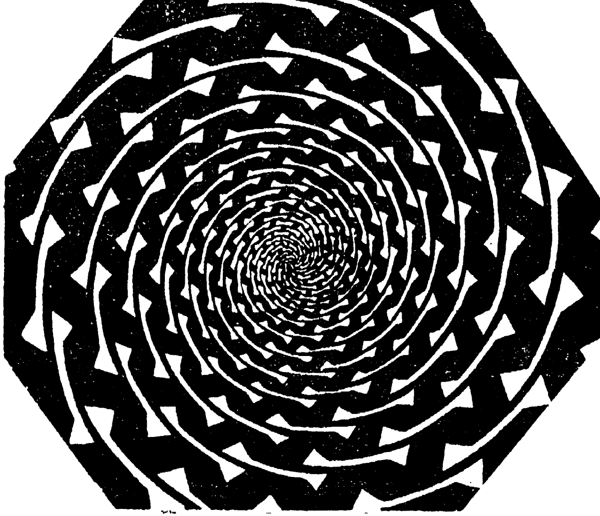
ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠে। দূরের অশত্থগাছের মাথায় সন্ধ্যাতারাটি একখণ্ড হীরকের মতন দপ্‌দপ্ করিয়া জ্বলিতে থাকে তখন আমি ধীরে তাঁবুতে ফিরিয়া আসি। দূরের তরল তমসাচ্ছন্ন দিক্‌-চক্রবালের দিকে চাহিয়া আমার প্রজাদের কথা, রাজ্যের উন্নতির কথা, চিন্তা করিতে থাকি। ভাবি, বিধাতা যে সৌভাগ্য আমাকে দিয়াছেন তাহার কতটুকু সম্মান আমি

রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। রাজা হইয়া, রাজত্বকে ও রাজার ঐশ্বর্য্যকে, ···না, প্রজার মঙ্গল ও দেশের উন্নতিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান করিয়াছি।

ভাবিতে ভাবিতে কেমন করিয়া জানি না, অকস্মাৎ হৃদয়ে বাস্তবের করাঘাত অনুভব করি। নিমেষে কল্পনার জাল ছিন্ন হইয়া যায়। কোথায় বা রাজা কোথায় বা তার রাজত্ব সবই যে বাতাসে মিলাইয়া গিয়াছে !!

১৩৪২] শ্রীমানসী চক্রবর্ত্তী

চোখের ধাঁধা



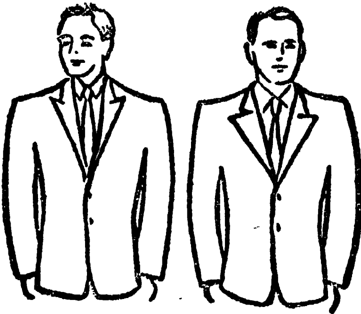
(১)

চোখে না দেখলে কোন তাজ্জব ব্যাপারই আমরা বিশ্বাস করতে চাই না। কথায় আবার আছে, চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন। কিন্তু চোখ এবং কাণকে দিয়েও আমরা ঘটনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে যে পারিনা; তার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এখানে চোখের দৃষ্টান্তই উল্লেখ করছি।

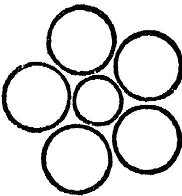
একনম্বর ছবিটার উপর চোখ রাখলে তোমরা দেখবে একটা লতানো রেখা ঘড়ির স্প্রিংয়ের মত গোল হয়ে এক প্রান্তে শেষ হয়েছে। একবার, দু'বার, বার বার চোখ ঘুরিয়ে দেখলেও ঐ একই ব্যাপার দেখতে পাবে। কিন্তু রেখাটির উপর পেন্সিল ধরে এগিয়ে গেলে কোন দিনই এর শেষ প্রান্তে পৌছতে পারবে না। কারণ এটা এক রেখা নয়। পৃথক পৃথক এক একটা বৃত্ত। অনেকগুলি বৃত্তের সমষ্টি নিয়ে এই ছবিটি আঁকা হয়েছে এবং রেখার পাশের অদ্ভুত আকৃতির সাদা অংশ গুলিই চোখে ধাঁধা লাগিয়ে আসল ব্যাপারটা চাপা দিচ্ছে।

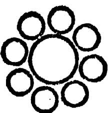


(২)



দু'নম্বর ছবিটার ব্যাপার হ'ল, দু'ভাই বোনে জোর ঝগড়া আরম্ভ হয়েছিল একটা পেন্সিল নিয়ে। ভাইয়ের দাবী, সে পেন্সিলটার বেশী অং পাবে। বোনটি রাজী নয়, সে বলে সমান ভাগ হবে। ওদের সেজদা এসে এ সমস্যার মীমাংসা করে দিলেন। পেন্সিলটার একটা নক্সা এঁকে দু'ভাগ করে তিনি ভাইয়ের সামনে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, কোনটা চাও। ভাই ছবির ডানদিকের বেশী অংশটা দেখেই নিলে। বোনটির জন্য তোমাদের নিশ্চয় খুবই দুঃখ হচ্ছে। তোমরা ভাবছ ভাইয়েরই জয় হ'ল। স্কেলটা নিয়ে নক্সা মেপে দেখলে সমান অংশই দেখতে পাবে। সত্যিই কি তাজ্জব নয়! বাঁ পাশের ভদ্রলোক দু'জনের মধ্যে মোটা ভদ্রলোককে ডাকতে বললে, তোমরা ডানদিকের ভদ্রলোককে অনায়াসে হাজির করতে পারবে। খুবতো আর মোটা নয়! কিন্তু আসলে এখানে কেউ অপরের তুলনায় মোটা নয়। ব্যাপারটা হ'ল কোটের কলারটা উপর দিকে তুলে দেওয়ায় একজনকে রোগা আর কলারটা নাবিয়ে রাখায় একজনকে মোটা দেখাচ্ছে।





(৩)

তিন নম্বর ছবিতে দু'টি পৃথক বৃত্তকে কেন্দ্র ক'রে অনেকগুলি বৃত্ত দেখতে পাচ্ছ। এই দু'টি বৃত্তের মধ্যে বড় বৃত্তটি খুঁজতে আর তোমাদের কোন অসুবিধাই হবে না। চোখে বাঁদিকেরটাই বড় দেখাচ্ছে। আসলে কিন্তু দু'টো বৃত্তই সমান মাপের।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়





প্রঃ—Yankee (ইয়াঙ্কী) বলে কাদের ?

উঃ—আমেরিকার আদিম অধিবাসী Red Indiansরা আমেরিকায় প্রথম আগত ইংরেজদের yangees বলতো। সেই থেকে আমেরিকাবাসীদের yankee বলা হয়।

প্রঃ—Flagকে half-mast করা হয় কখন ?

উঃ—কোন বড়লোক মরলে সম্মান দেখাবার জন্যে পতাকা half-mast করা হয়। প্রাচীনকালে যে যুদ্ধে হেরে যেত সে বিজয়ীকে সম্মান দেখাবার জন্যে তার পতাকা নিচু করে রাখতো—সেই থেকে এই প্রথার উদ্ভব হয়।

প্রঃ—সব চেয়ে বড় জলজন্তু কোন্‌টা ?

উঃ—তিমি মাছ।

প্রঃ—কোন্ সহরকে Eternal City বলা হয়।

উঃ—রোম সহরকে।

প্রঃ—একটা সমুদ্রকে Dead sea বলা হয় কেন ?

উঃ—Dead sea-র জল এমন লবণাক্ত যে এই জলে কোন জিনিষ বাঁচতে পারে না—জলীয় গাছ-পালা, কোন রকম জলজন্তু, এই জলে জন্মাতে পারে না—সেই জন্যে একে Dead sea বলা হয়।

প্রঃ—সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ট্রেণ যাবার সময় খোলা জায়গা থেকে বেশী আওয়াজ হয় কেন ?

উঃ—এর কারণ হচ্ছে ট্রেণ যাওয়ার শব্দটা সুড়ঙ্গের দেওয়ালে আঘাত লেগে ফিরে আসে—আর খোলা জায়গায় শব্দ চারিদিকের হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

প্রঃ—Asia কথাটি কোথা থেকে এলো ?

উঃ—Asia মানে Land of the dawn—সংস্কৃত কথা 'উষা' থেকে Asia হয়েছে।

প্রঃ—প্রথম বাংলা সংবাদ পত্রের নাম কি ?

উঃ—সমাচার দর্পণ।

[আষাঢ়, ১৩৪৬]

প্রঃ—সাহেবেরা করমর্দন করে কেন ?

উঃ—তোমরা হয়ত অনেক সময় দেখেছ যে সাহেবরা তাদের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলেই করমর্দন করে। তোমরা কি বলতে পার এই প্রথাটি কোথা থেকে এসেছে ? বহু শতাব্দী আগে আদিম অধিবাসীদের সময় থেকে এই প্রথা চলে আসছে। একটি আদিম অধিবাসী অন্য একটি আদিম অধিবাসীকে দেখলেই মনে করত যে সে তাকে আক্রমণ করতে আসছে ; এই জন্য তারা প্রথমেই পরস্পর পরস্পরের হাত বাড়িয়ে অস্ত্র ধরে ফেলত। অস্ত্র ধরলে দু'জনেই মনে করত যে অপর ব্যক্তিটি তার বন্ধু এবং তারা দুই জনেই বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হত। ক্রমে ক্রমে এই প্রথা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রঃ—চা কিম্বা কফি খেলে আমাদের ঘুম পায়না কেন ?

উঃ—তোমরা অনেকে পরীক্ষার সময় রাত্রি জেগে পড়া তৈরী করবার জন্য চা কিম্বা কফি খেয়ে থাক ; কিন্তু তোমরা হয়ত অনেকে জাননা চা কিম্বা কফি খেলে আমাদের ঘুম পায়না কেন।

চা আর কফির মধ্যে এমন একটি অদ্ভুত জিনিষ আছে যা আমাদের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে আমাদের সতেজ করে তোলে। অবশ্য চা কিম্বা কফি খেলে যে ঘুম পায়না, এ কথা বলা চলে না, তবে কড়া করে খেলে একদম ঘুম পায় না। চা'র মধ্যে যে জিনিষটি আছে তাকে বলে Theine আর কফির মধ্যে যে জিনিষ আছে তাকে বলে Caffeine। অধিক পরিমাণে চা, কফি, খেলে কিন্তু হিতে বিপরীত হয়; এতে অনিদ্রাজনিত ব্যারাম, (insomnia) ইত্যাদি হয়। তোমাদের চা কফি কিছুই খাওয়া উচিৎ নয়, কারণ এটা তোমাদের পক্ষে খুব খারাপ।

প্রঃ—মানুষের ভুরু থাকে কেন ?

উঃ—প্রত্যেক মানুষেরই একজোড়া ভুরু আছে, কিন্তু এই ভুরু থাকার কারণ কি ? কারণ কিছুই নয় শুধু আমাদের মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা ছাড়াও ভুরু থাকার আর একটা কারণ আছে। কোন প্রকার পরিশ্রমের জন্যে যখন কপাল দিয়ে ঘাম ঝরতে আরম্ভ করে তখন ভুরু থাকার জন্যে এই ঘাম কপাল গড়িয়ে চোখে এসে পড়তে পারেনা। ঘামের স্রোত ভুরুর কাছে আটকা পেয়ে অন্য দিকে চলে যায়।

[পৌষ, ১৩৪৬]

প্রঃ—আমদানী এবং রপ্তানী মানে কি ?

উঃ—বিদেশ থেকে যে সব জিনিষ নিজের দেশে আনা হয়, তাকে বলে আমদানী, আর নিজের দেশ থেকে বিদেশে যে সব জিনিষ পাঠান হয় তাকে বলে রপ্তানী।

পৃথিবীর সব দেশেই প্রায় একটা না একটা জিনিষ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, যেমন কোন দেশে কয়লা, কোন দেশে লোহা, কোন দেশে তেল ইত্যাদি। যে দেশে একটা জিনিষ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, সেই দেশ অন্যান্য দেশে এই জিনিষগুলি পাঠিয়ে দেয় এবং তার পরিবর্ত্তে

তাদের দরকারী জিনিষগুলি নিয়ে আসে। যেমন ধর, ভারতবর্ষে পাট খুব পাওয়া যায় কিন্তু কলকজা একদম তৈরী হয় না; সেইজন্য ভারতবর্ষ থেকে পাট অন্যান্য দেশে রপ্তানী করা হয় এবং তার পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষে কলকজা আমদানী করা হয়। এই রকম ভাবে প্রত্যেক দেশে বৈদেশিক বাণিজ্য আরম্ভ হয়।

আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে আমাদের জানা উচিত যে একটি দেশ অন্য একটি দেশের সঙ্গে সদা আদান-প্রদান সূত্রে আবদ্ধ আছে। মনে হয় যেন তারা পরস্পর তাদের দেনা পাওনা চেক্ দিয়ে শোধ করছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক দেশই তাদের রপ্তানীর সঙ্গে আমদানীর পরিবর্ত্তন করে।

প্র :—Dead seaতে মাছ বাঁচতে পারে না কেন?

উ :—Dead sea নাম তোমরা নিশ্চয় জান। কোন রকম জীবন্ত জীব-জন্তু এই সমুদ্রে পাওয়া যায় না বলে এর নাম Dead sea. Dead seaর জলে কি কি জিনিষ আছে তা যদি আমরা লক্ষ্য করি, তা হলেই বুঝতে পারব কেন এখানে কোন প্রাণী থাকতে পারে না।

প্রথমত: Dead sea নুনে পরিপূর্ণ, সেইজন্য মাছ বাঁচতে পারে না। দ্বিতীয়ত: এতে এমন অনেক বিষাক্ত জিনিষ আছে, যা কোন রকম প্রাণীই সহ্য করতে পারে না, তা ছাড়া chloride of lime নামে এক প্রকার বিষাক্ত চুন Dead seaতে আছে।

এই জলের নুনে বেশীর ভাগই chloride of magnesium আছে—তাই এই সমুদ্রের জল অন্যান্য সমুদ্রের জল থেকে অনেক তফাৎ।

প্র :—নাবিকেরা চওড়া ও ঢিলে প্যাণ্ট পরে কেন?

উ :—তোমরা যদি কখনও কোন নাবিকের প্যাণ্ট দেখ, তা হলে দেখবে যে সাধারণ প্যাণ্টের চেয়ে নাবিকদের প্যাণ্ট একটু চওড়া ও ঢিলে বিশেষত: নিচের দিকটা। তোমরা নিশ্চয় জান, নাবিকদের বেশীর ভাগ সময় জলের মধ্যে কাজ করতে হয়, যেমন ধর জাহাজের ডেক ধুতে হয় ইত্যাদি। যখন তারা এই কাজগুলি করে তখন তাদের প্যাণ্ট হাঁটু পর্য্যন্ত গুটিয়ে নেয়, কিন্তু সাধারণ প্যাণ্টগুলি তাড়াতাড়ি গুটান বড়ই কঠিন। এইজন্য নাবিকদের প্যাণ্ট চওড়া এবং বড় হয়।

প্র :—২২ ক্যারেট সোনা মানে কি?

উঃ—এক সময় Carat bean কিম্বা পদ্মফুলের বীজ দিয়ে সোনা ওজন করা হত এখনও আমাদের দেশে কুঁচ দিয়ে সোনা ওজন হয়। কোন জিনিষের মধ্যে যেটুকু খাঁটি সোনা থাকে তাকে ক্যারাট সোনা বলা হয়। ২২ ক্যারেট সোনা মানে, এমন একটা সোনার জিনিষ যার ২৪ ভাগের মধ্যে ২২ ভাগ সোনা এবং বাকী দু' ভাগ অন্য কোন ধাতু। ১৮ ক্যারেট সোনা মানে, একটা সোনার জিনিষের ২৪ ভাগের মধ্যে ১৮ ভাগ সোনা এবং বাকী ৬ ভাগ অন্য কোন ধাতু। [মাঘ, ১৩৪৬]

প্রঃ—মাছ কি জল খায়?

উঃ—যদি কোন জন্তু জল না পেয়ে শুকিয়ে যায়, তা-হলে সে মরে যায় কিম্বা জল না পাওয়া পর্য্যন্ত মৃতবৎ পড়ে থাকে। সেইজন্য প্রত্যেক জীবজন্তুর জল দরকার এবং মাছকেও জল পান করতে হয়। কিন্তু আমরা যখন জলের মধ্যে মাছকে দেখি, তখন মনে হয় যেন ২৪ ঘণ্টাই তারা জল গিলে খাচ্ছে। অন্যান্য জন্তুদের মত মাছকেও নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে হয়, এই জল গেলাটা নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য হয়। জলে অক্সিজেন থাকে, এই অক্সিজেনই তারা জল থেকে টেনে নিয়ে বাঁচে। এই নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাপার মাছদের যে কান্‌কো আছে, তাই দিয়ে হয়। মাছরা যখন জল পান করে তখন আমাদেরই মত মুখ দিয়ে পান করে।

[চৈত্র, ১৩৪৬]

প্রঃ—জগতের সব চেয়ে বড় জলের বাঁধ কোথায়?

উঃ—ভারতবর্ষে, সিন্ধুপ্রদেশে। নাম লয়েড বারাজ্ (Lloyd Barrage)। সেই বাঁধের সঞ্চিত জল থেকে ৫½ মিলিয়ন একর জমিতে জল সরবরাহ হতে পারে। এর জল যেখানটাতে সঞ্চিত থাকে, তাকে ইংরেজীতে বলে dam। লয়েড ডামের ইঁটের কাজের আয়তন হলো ২২½ মিলিয়ন কিউবিক ফিট্। এর আগে মিসরের "আসাউয়ন ডাম"কে জগতের এই ধরণের সব চেয়ে বড় জলাধার মনে করা হতো। লয়েড ডামের বিশালতার যদি ধারণা করতে হয়, তা হলে মনে কর এই কাজে যত মাল মশলা বা ইঁট লেগেছে, তাই দিয়ে যদি একটা ৬ ফিট উঁচু এবং ১৫ ইঞ্চি পুরু পাঁচিল তৈরী করা যায়, তাহলে সে পাঁচিলটা কত বড় হবে জান? সে পাঁচিলটার যদি একমুখ থাকে কলকাতায়, এলাহাবাদে গিয়ে পড়বে তার আর এক মুখ।

প্রঃ—আকাশ কেন নীল?

উঃ—সর্ব্বপ্রথম যে বৈজ্ঞানিক এই প্রশ্নের উত্তর বার করেন, তাঁর নাম হলো জন টিণ্ডাল। আকাশ সূর্য্য থেকে আলো পায়। সূর্য্য যখন থাকে না, তখন আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়, সুতরাং আকাশের মধ্যে এমন কিছু আছে, যা, অন্য সব রঙগুলোকে সূর্য্যের শাদা আলোয় আটকে রেখে, আমাদের চোখে শুধু নীল আলোটা ফেলে।

সমস্ত আকাশ অসংখ্য ছোট ছোট ধূলোর কণায় ভরা। পর্দ্দার মত এই সব ধূলো বাতাসে ঝুলে থাকে। এই সব ধূলোর কণার যা আয়তন, তাতে আলোর বড় বড় তরঙ্গ-গুলো তাতে ধরা পড়ে; আর যে সব আলোর তরঙ্গের ফলে আমরা নীল দেখি, সেগুলো আমাদের চোখে ফেলে। সেই জন্যে আমরা আকাশকে নীল দেখি।

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪]

প্রঃ—ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বড় জেলা কোন্‌টী?

উঃ—ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে বড় জেলা হলো মান্দ্রাজের ভিজিয়ানাগ্রাম, তার আয়তন হলো ১৭,১৬৮ বর্গমাইল। [আষাঢ়, ১৩৪৪]

প্রঃ—মাঝে মাঝে আকাশের "তারা খসে পড়তে" দেখা যায়—ব্যাপারটা কি ?

উঃ—তোমরা জান যে এক একটা তারার আয়তন হলো, এই পৃথিবীর শত শত গুণ বেশী। সুতরাং সত্যিকারের কোন তারা খসে পড়ে না। পরিষ্কার রাত্রিতে অনেক সময় আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দেখা যায় যে, ঠিক তারার মত একটা জ্বলন্ত জিনিস ছুট্‌তে ছুট্‌তে পৃথিবীর দিকে এসে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। অনেক সময় এই ভাবে "তারার বৃষ্টি" হতে থাকে। এ সমস্তই হলো উল্কাপাত। সূর্য্যের চারিদিকে ছোট ছোট পাথরের টুক্‌রো ঝাঁকে ঝাঁকে সূর্য্যের চারিদিকে নিয়ত ঘুরছে। তাদের মধ্যে কোন ঝাঁক একবার যদি পৃথিবীর আকর্ষনের সীমার ভেতর এসে পড়ে, তখন তারা স্থান-চ্যুত হয়ে সবেগে পৃথিবীর দিকে ছুটে চলে আসে। পৃথিবীর ওপরে যে বায়ুমণ্ডল আছে, তার ঘর্ষণে সেই পাথর গরম হয়ে জ্বলে ওঠে, সেই সময় আমরা তাকে উল্কারূপে দেখ্‌তে পাই। পৃথিবীতে পৌঁছবার আগেই অনেক উল্কা পুড়ে ছাই হয়ে বাতাসেই মিশিয়ে যায়, আবার কোন কোনটা পাথরের টুক্‌রো হিসাবে মাটীতে এসে পড়ে।

প্রঃ—পেট্রল বা পেট্রলিয়ম কি জিনিস ? কোথায় কেমন ভাবে পাওয়া যায় ?

উঃ—পেট্রল বা পেট্রলিয়ম হলো খনিজ তেল। আমাদের কেরোসিন তেল এবং মোটর চালাবার জন্যে পেট্রল আমরা খনির ভেতর থেকে পাই। মাটীর তলায় এই তেল এলো কি করে ? পৃথিবীতে মানুষ আসার বহু যুগ আগে কোন প্রাচীন যুগে, সেকালকার জীব-জন্তুর দেহাবশেষ মাটী চাপা পড়ে যায়। তারপর কালের প্রভাবে চারিদিকের মাটীর চাপে এবং গরমে সেই সব দেহাবশেষ থেকে চুঁইয়ে পেট্রোলিয়ম্ জমা হয়েছে। উত্তর আমেরিকায় প্রচুর পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায়। এশিয়া ও য়ুরোপেও জায়গায় জায়গায় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে পাঞ্জাবে ও আসামে পেট্রলিয়ম পাওয়া যায়।

প্রঃ—বায়ু না হলে আমরা জীবন-ধারণ করতে পারি না। কিন্তু বায়ু কি ?

উঃ—বায়ু হলো এক রকম মিশ্র গ্যাস অর্থাৎ কয়েকটী গ্যাস মিলে বায়ু হয়। বায়ুর উপাদানের মধ্যে ৪ ভাগ নাইট্রোজেন গ্যাস, ১ ভাগ অক্সিজেন গ্যাস আছে। তা ছাড়া বায়ুতে সামান্য পরিমাণ কর্বন ডাই-অক্‌সাইড গ্যাস এবং কিঞ্চিৎ জলীয় বাষ্প থাকে।

১০০ ভাগ বায়ুতে—

অক্সিজেন থাকে	২০·৬১	ভাগ
নাইট্রোজেন "	৭৭·৯৫	"
কার্বণ ডাই-অক্‌সাইড	০·৪০	"
জলীয় বাষ্প	১·৪০	"

[শ্রাবণ, ১৩৪৪]

প্রঃ—নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত "Statue of Liberty" কোন্ দেশের লোকের দ্বারা নির্ম্মিত হয়েছিল ?

উঃ—ফ্রান্সের। [ভাদ্র, ১৩৪৪]

প্রঃ—এরোপ্লেন ও এয়ারশিপে প্রভেদ কি ?

উঃ—সাধারণত আকাশে দু'রকমের যান চলে, এক শ্রেণীকে বলে এয়ারশিপ্, আর এক রকম হলো এরোপ্লেন। যে সমস্ত ব্যোমযান বায়ুর চেয়ে হাল্কা তাদের এয়ারশিপ্ বলে এবং যে-সমস্ত যান বায়ু-অপেক্ষা ভারী তাদের এরোপ্লেন বলে। সাগর-জলে যেমন জাহাজ ভেসে চলে, তেম্‌নি বায়ু-সমুদ্রেও উড়োজাহাজ ভেসে চলে। এখানে একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে। জল যেমন জড় বস্তু, বাতাসও ঠিক তেমন জড়বস্তু। চাইলেই আমরা জল দেখতে পাই। কিন্তু বাতাস এত সূক্ষ্ম যে আমরা দেখতে পাই না—শুধু সূক্ষ্ম বলে নয়, বায়ু বর্ণহীন। জলের যেমন ওজন আছে, গতি বেগ আছে, বাতাসেরও তেমনি ওজন আছে, গতি-বেগ আছে। জলের যেমন কোন জিনিস ধারণ করবার শক্তি আছে অর্থাৎ ভার বইবার শক্তি আছে, বাতাসেরও ঠিক তেমনি ভার বইবার শক্তি আছে। এখন একটা উপমা দেওয়া যাক্। ধর, খুব পুরু বিছানা পাতা রয়েছে, তার ওপর যদি একটা পালক রাখ, বিছানার কোথাও কোন পরিবর্ত্তন হবে না, পালকটাও বিছানার মধ্যে চেপে বসে যাবে না। বিছানার ওপরেই সেটা থাকবে, কিন্তু একটা ভারী লোহা যদি বিছানার ওপর রাখ, যে জায়গায় রাখবে, বিছানাটা সেই জায়গায় বসে যাবে ; লোহার জিনিসটা শুদ্ধ। যে জিনিসের ওপর রাখা হয়, তার চেয়ে যে জিনিস রাখা হয় তা যদি হাল্‌কা হয়, তাহলে সে জিনিস আর তার মধ্যে ডুবে বা তলিয়ে যেতে পারে না। বিছানার বেলাতে যেমন, জলের বেলাতেও তেমনি। জলে একটা পালক ফেলে দাও। পালকটা ভাসতে ভাসতে স্রোতের সঙ্গে চলে যাবে। একটা লোহা ফেল—তক্ষুনি ডুবে যাবে, কারণ লোহা জলের চেয়ে ভারী। কিন্তু একটা লোহার গামলা এনে পুকুরের জলে ভাসাও, গামলাটা ভেসে থাকবে—কারণ গঠনের দরুণ, নির্ভর করে থাকবার পক্ষে যে প্রচুর জলের ভার পায়, সে জলরাশির ভার গামলার চেয়ে ঢের বেশী ভারী। যে বিরাট গ্যাসের ব্যাগ, লোকজন যন্ত্রপাতি নিয়ে, উড়োজাহাজেরূপে বায়ু সমুদ্রে চলাচল করে, সীমাহীন বায়ু-সমুদ্রের ভার তার চেয়ে ঢের বেশী। এই জন্যই উড়োজাহাজ বা এয়ারশিপকে বলা হয় বায়ুর চেয়ে হালকা আকাশ-যান (lighter than air-machine)। সমুদ্রের জাহাজের মত, বায়ু সমুদ্রের জাহাজও মাধ্যাকর্ষণের সাহায্য পায় অর্থাৎ তারা যে জিনিসের ওপর ভার দিয়ে ভাসে সে জিনিস তাদের চেয়ে ভারী। কিন্তু এরোপ্লেনের—তুলোর বিছানায় ভারী লোহার মত তলিয়ে যাবার আশঙ্কা আছে অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে মাটীতে টেনে ফেলতে পারে। বাতাসের চেয়ে ভারী হওয়ার দরুণ তাকে পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধেই

আকাশে উড়তে হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে তাহলে এরোপ্লেন আকাশে ওড়ে কি করে? যদি খুব জোরে একটা ঢিল ছোঁড়া যায়, তাহলে কি হয়? মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে মাটির দিকে প্রতি মুহূর্ত্ত টানা সত্ত্বেও, সেই ঢিলটার ছোঁড়বার সময় যতখানি জোর তুমি দিয়েছ, সেই জোর যতক্ষণ থাকবে, ঢিলটাও ততক্ষণ শূন্যপথ দিয়ে চলতে থাকবে। জোর কমে গেলেই মাটিতে পড়ে যাবে। এখন যদি এই ঢিলটার পিছনে এমন জোর দেওয়া যায়, যাতে এক ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা, কি আরও বেশী সময়ের জন্য সেই জোরটা ঢিলটার সঙ্গে থাকবে, তাহলে ঢিলটাও ততখানি সময় সেই বেগে শূন্যপথে চলবে। ঢিলটা মাটীতে পড়ে যাবার একমাত্র কারণ হচ্ছে, মাধ্যাকর্ষণের টান। কিন্তু সেই টানের চেয়ে জোর যদি আর কোনও টান অনবরত তার পিছনে রাখা যায়, তাহলে মাটীতে পড়বার আর কোনও কারণ থাকে না, সেইজন্য এরোপ্লেনকে অনবরত আকাশে চলতে হয়, তার থামবার উপায় নেই। হাতে ছুঁটে ঢিলের পিছনে আমরা যে জোর দিই, এরোপ্লেনের পক্ষে এরোপ্লেনের এঞ্জিন অনবরত সেই জোর দিচ্ছে। সেইজন্যেই এরোপ্লেন যেটুকু বায়ুর ওপর ভর করে থাকে তার চেয়ে ভারী হওয়া সত্ত্বেও শূন্যপথে অবিরাম চলতে থাকে।

প্রঃ—এই খেলাগুলির উৎপত্তি স্থান কোথায়?

উঃ—পোলো। ইতিহাসে বলে যে পোলো খেলার উৎপত্তি হলো প্রাচীন পারস্য। ফিরদৌসীর শাহ্ নামায় পোলো খেলার উল্লেখ আছে। পারস্যের রাজা আলেকজান্দারকে পোলো বল এবং 'ষ্টিক' উপহার দিয়েছিলেন। মোগল আমলে মোগল বাদশাহরা পোলো খেলার বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে একদল মনিপুরী খেলোয়াড় প্রথম কলকাতা সহরে পোলো খেলার প্রবর্ত্তন করেন এবং তাঁদের দেখাদেখি ভারত-প্রবাসী ইংরাজরা পোলো খেলা আরম্ভ করেন। ১৮৭১ সালে দশম হাসার সৈন্যদল বিলাতে প্রথম এই খেলার প্রচলন করেন।

ক্রিকেট। ক্রিকেট হলো ইংলণ্ডের সব চেয়ে প্রিয় খেলা এবং ইংলণ্ডেই ক্রিকেট খেলার উদ্ভব হয়। চসারের বিখ্যাত ক্যান্‌টারবুর‍্যারীর গল্পে ক্রিকেট খেলার উল্লেখ আছে।

ফুটবল। ফুটবল হলো ইংলণ্ডের খেলা। একে বলা চলে, The winter game of England, তবে ইতিহাস থেকে জানা যায় যে প্রাচীন রোমানরা ফুটবল খেলতেন এবং তাঁরা যখন বৃটেন দখল করেন, তখন এই খেলা তাঁরা ইংলণ্ডে চালান। ক্রিকেট খেলার চেয়েও ইংলণ্ডে ফুটবল খেলার প্রচলন ঢের আগে হয়। ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম্-ফিট্জ্‌ষ্টিফেন বলে একজন লোক লণ্ডন শহরের একখানি ইতিহাস লেখেন। সেই ইতিহাসে লণ্ডনে প্রথম ফুটবল খেলার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

গল্‌ফ্। গল্‌ফ্‌কে স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় খেলা বলা হয়। ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে এই খেলা স্কটল্যাণ্ডে বেশ প্রচলিত হয়েছে, দেখতে পাওয়া যায়। [আশ্বিন, ১৩৪৪]

প্রঃ—প্রত্যেক জাতির একটি করে জাতীয় খাদ্য আছে—যেমন বাঙালীর ভাত। নীচের খাদ্যগুলি কোন্ কোন্ জাতের খাদ্য?

বীফ্‌রোষ্ট	সওয়ারক্রাট
আলু	হাঙ্গরের ডানা

উঃ—বীফরোষ্ট—ইংলণ্ডের; আলু—আয়ারল্যাণ্ডের; সাওয়ারক্রাট—জার্ম্মাণীর; হাঙ্গরের ডানা—চীনের।

[অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪]

প্রঃ—সমুদ্র কেন লোনা?

উঃ—বৈজ্ঞানিকেরা একটা হিসেব করে দেখেছেন যে প্রতি বছরে জগতের বিভিন্ন নদী থেকে ৬৫০০ কিউবিক মাইল জল সাগরে গিয়ে পড়ে। পৃথিবীর মাটী থেকে নানা রকমের ধাতব এবং লবণ-জাতীয় উপাদান এই জলের সঙ্গে অনবরত সাগরে গিয়ে জমা হচ্ছে। সাগরের জলে যে জিনিসটা খুব বেশী পাওয়া যায় এবং যার জন্যে তার স্বাদ হোলো লোনা, তার নাম হচ্ছে Sodium Cloride সোডিয়াম ক্লোরাইড্—অর্থাৎ সাধারণ যে নুন আমরা ব্যবহার করি। যে সব জায়গায় আমরা সূর্য্যের বেশী উত্তাপের জন্যে সাগরের জল খুব শিগ্‌গির আর খুব বেশী করে বাষ্পে পরিণত হয়, সেখানকার সাগরের জল আরও বেশী লোণা—কারণ তাতে নুনের ভাগই খুব বেশী থাকে—জল তো উবে যায়। সেই জন্য Red sea-র জল এত বেশী লোনা আর ভারী।

প্রঃ—নিম্নলিখিত লোকগুলি কোন্ জাতির লোক এবং কিসের জন্য বিখ্যাত—ইশপ্, নেপোলিয়ন্, দীপঙ্কর, হ্যানিবল, কলম্বাস্, যিশুখৃষ্ট, তানসেন।

উঃ—ইশপ—পশু-পাখীদের নিয়ে নীতি-গল্প রচনা করে ইনি জগতে অমর হয়ে আছেন। এঁরই গল্প আমরা কথামালায় পড়ি। তিনি জাতিতে গ্রীক ছিলেন। জন্মেছিলেন, এসিয়া মাইনরে।

নেপোলিয়ান্—জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ বলে পরিগণিত হন। তিনি জন্মেছিলেন কার্সিকাতে এবং তাঁরা আসলে ছিলেন ইতালিয়ান্।

দীপঙ্কর—প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ। ইনি বৃদ্ধ বয়সে জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার করবার জন্যে হিমালয় পার হয়ে তিব্বতে যান। ইনি বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাঙালী ছিলেন।

হ্যানিবল—বীরপুরুষ ও যোদ্ধা; জন্ম আফ্রিকার কার্থেজ শহরে; জাতিতে কার্থেজিয়ান্। এঁরা রোমের প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু ছিলেন।

কলম্বাস—বিখ্যাত নাবিক ও আমেরিকার নব আবিষ্কর্ত্তা; ইতালীর জেনোয়া শহরে জন্মেছিলেন—জাতিতে ইতালিয়ান্ ছিলেন।

যিশুখৃষ্ট—খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ। এশিয়া

মাইনরে বেথেল-হেমে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে য়িহুদী ছিলেন।

তানসেন—ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক রূপে পরিগণিত হন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এত বড় নাম ভারতবর্ষে আর নেই। তাঁর জন্মভূমি ঠিক জানা নেই। তিনি জাতিতে হিন্দু ছিলেন—পরে তিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন।

প্রঃ—নীচের জন্তুগুলির জন্মভূমি কোথায় ?

পেঙ্গুইন, ক্যাঙ্গারু, টিয়াপাখী, বাইসন্, সজারু, হিপোপটেমাস্।

উঃ—পেঙ্গুইন—দক্ষিণ মেরু-অঞ্চল
কাঙ্গারু—অষ্ট্রেলিয়া
টিয়াপাখী—ভারত দ্বীপপুঞ্জ
বাইসন—কানাডা
সজারু—অষ্ট্রেলিয়া
হিপোপটেমাস্—আফ্রিকা

প্রঃ—রক্ত কি দিয়ে তৈরী ? কেন এত লাল ? তার কাজ কি ?

উঃ—রক্ত তরল পদার্থ বটে কিন্তু আসলে রক্ত দুরকমের কণিকা দিয়ে তৈরী—একটাকে বলে শ্বেত কণিকা আর একটাকে বলে রক্ত-কণিকা বা লাল-কণিকা। এই লাল-কণিকাগুলো শাদা কণিকাগুলোর চেয়ে বেশী বলে রক্ত এত লাল দেখায়। প্রতি বর্গ মিলিমিটারে রক্তের এই লাল-কণিকা সংখ্যায় প্রায় ৫ মিলিয়ন থেকে ৬ মিলিয়ন পর্য্যন্ত থাকে। রক্তের হলো তিনটে অংশ—একটা হলো এই দুরকমের কণিকা, তা ছাড়া একটা তরল পদার্থ এবং গ্যাস আছে। কণিকা, তরল পদার্থ আর গ্যাস—এই তিন নিয়ে হলো রক্ত। আমাদের রক্তে যে লাল-কণিকা গুলি আছে তাদের কাজ হলো, আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে অক্‌সিজেন নিই, সেই অক্‌সিজেনকে দেহের সর্ব্বত্র চালিয়ে দেওয়া। [মাঘ, ১৩৪৪]

প্রঃ—সূর্য্য কি ওঠে ও অস্ত যায় ?

উঃ—না, পৃথিবীর গতির জন্যে সূর্য্যের ওঠা ও অস্ত যাওয়া বোধ হয় বটে।

প্রঃ—চাঁদ বাড়ছে কি কমছে কেমন করে বোধ হয় ?

উঃ—যখন চাঁদের আকার ইংরাজীর অক্ষর C মত তখন চাঁদ বাড়ছে আর যখন উল্টো Cর মত (অর্থাৎ Ɔ) তখন চাঁদ কমছে। [ফাল্গুন, ১৩৪২]

প্রঃ—নূন কেন পিপাসা বাড়ায় ?

উঃ—যতখানি নূন খাওয়া দরকার, তার চেয়ে বেশী খেয়ে ফেল্‌লে অতিরিক্ত নূন রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। রক্ত এই নূনকে ধুয়ে ফেল্‌তে চায়। শরীর যে এ কাজের জন্য আরো জল চায়, পিপাসাই তার চিহ্ন। [বৈশাখ, ১৩৪১]

প্রঃ—অনুমতি না নিয়ে গোপনে পালিয়ে যাওয়াকে ইংরেজীতে French Leave বলে কেন ?

উঃ—আগে ফরাসী সৈন্যেরা যখন যুদ্ধ করে কোন দেশ দখল করতো, তখন প্রায়ই সেই সব বিজিত দেশে লোকের বাড়ীতে ঢুকে, তাদের অনুমতি না নিয়েই, যে জিনিস তাদের ভাল লাগতো তাই নিয়ে চলে আসতো। এই ভাবে বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করা—সেই ফরাসী সৈনিকদের রীতি থেকে ফরাসী কায়দায় দাঁড়িয়ে গেল এবং ক্রমশঃ বিনা অনুমতিতে গোপনে সরে পড়ার নাম হয়ে গেল French Leave. [জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩]

প্রঃ—কোন্ সাগরে জাহাজ চলাচল এখনও পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই ? কোন্ সাগরে মানুষ পড়ে গেলে, সাঁতার না জানলেও সহজে তলিয়ে যাবে না ?

উঃ—এই দুটি প্রশ্নেরই উত্তর হলো, Sargasso Sea। সারগোজো সাগর আতলান্তিক মহাসমুদ্রের অন্তর্ভুক্ত বটে, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত সেই সাগর জলের ওপর দিয়ে জাহাজ যাতায়াত করতে পারেনি। তার কারণ কি ? তার কারণ হলো যে, এই বিরাট জল-ভাগে এক রকম সামুদ্রিক আগাছা জন্মায়—বৈজ্ঞানিকরা সেই আগাছার একটা মস্ত বড় ল্যাটিন নাম দিয়েছেন, Saragassum bacciferrum। এই আগাছার নাম থেকেই এই সাগরের নাম হয়েছে Sargasso Sea। এই আগাছা সেখানে এত বেশী আর এত ঘন হয়, যে খুব শক্তিশালী এঞ্জিনও তার মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না ; তার ওপর সবচেয়ে বিপদ্ হচ্ছে যে, প্রোপেলারে এমনভাবে আগাছাগুলো জড়িয়ে যায় যে প্রোপেলার অচল হয়ে যায়। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বাস প্রথম এই রহস্যময় সাগর আবিষ্কার করেন। এই অতি ঘন আগাছার দরুণ কোন মানুষ যদি তার ওপর পড়ে যায়, তা হলে, সে যদি ছটফট না করে, অনায়াসে ভেসে থাকতে পারে। এই অগম্য-সাগর সম্বন্ধে নাবিকদের মধ্যে নানা রকমের কাহিনী—আর কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

প্রঃ—"গুড-বাই" কথাটীর আসল মানে কি ?

উঃ—Good-bye কথাটীর আসল রূপ হচ্ছে God be with you ; সেইটে ক্রমশঃ কথায় কথায় ছোট হয়ে দাঁড়িয়েছে Good-byeতে। বিদায়ের সময় মানুষ ঐ ভাবে প্রার্থনা জানাতো, সেই জন্যে বিদায়ের সময় 'গুড-বাই' বলার প্রথা চলিত হয়।

প্রঃ—ইংলণ্ডের প্রথম Poet Laureate কে ?

উঃ—কবি জন ড্রাইডেন (John Dryden) হলেন ইংলণ্ডের প্রথম Poet Laureate ; ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭০০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। কবিতা এবং প্রবন্ধ ছাড়া, তিনি অনেক নাটক লিখেছিলেন। The Indian Emperor, Aurangzebe বলে তাঁর দুখানি নাটক আছে।

প্রঃ—কচুরীপানাকে Lady Morgan's Flower বলে কেন ?

উঃ—কচুরীপানা আমাদের দেশে আগে ছিল না। কচুরীপানার জন্মভূমি হলো দক্ষিণ আমেরিকা। লেডী মরগ্যান বলে একজন মেম-সাহেব সেখানে গিয়ে কচুরী

পানার ফুল দেখে সেই গাছ আমাদের দেশে নিয়ে আসেন। সেদিন অবশ্য তিনি কল্পনা করতেই পারেন নি যে এই কচুরীপানা থেকে বাংলা দেশের এত সর্ব্বনাশ হবে। তিনি এনেছিলেন বলে, তাঁর নাম অনুসারে কচুরীপানার আর একটা নাম হলো, Lady Morgan's Flower, বিশেষ করে পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে এই নাম বিশেষ চলিত; কারণ নারায়ণগঞ্জেই লেডী মর্গ্যান তাঁর বাড়ীর পুকুরে এই গাছ প্রথম গজিয়ে ছিলেন।

প্রঃ—আলোক-বর্ষ (light-year) কাকে বলে ?

উঃ—সাধারণত দূরত্ব মাপতে হলে আমরা "মাইল" ধরে হিসেব করে থাকি, নাবিকরা জলপথে "নট" ধরে হিসেব করে থাকেন কিন্তু যাঁরা গ্রহ নক্ষত্রের দূরত্ব নিয়ে আলোচনা করেন তাঁদের আর "মাইলের" হিসেবে কুলোয় না। গ্রহ-নক্ষত্রদের পরস্পর দূরত্ব বার করতে হলে, সাধারণ হিসেবে যে অঙ্ক দাঁড়ায়, তা গণনা করা অতি দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেই জন্যে গ্রহ-নক্ষত্রদের দূরত্বের হিসেবের সুবিধা হবে বলে, তাঁরা একটা নূতন মাপের সৃষ্টি করেছেন, তাকেই বলে আলোক-বর্ষ অর্থাৎ Light-year. আলো প্রতি সেকেণ্ডে যায় ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। এক বৎসরে এই আলোক-রশ্মি যতদূর পথ যেতে পারে, তত মাইল হলো এক আলোকবর্ষ। অর্থাৎ, (১৮৬০০০ × ৩৬৫¼ × ২৪ × ৬০ × ৬০) মাইল= ৫,৮৭৬,০৬৮,৮৮০,০০০ মাইল হলো এক আলোক বর্ষ। আজকাল যে সব নতুন তারকা-গুচ্ছ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের কেউ কেউ আমাদের পৃথিবী থেকে ২৩০,০০০ আলোক বর্ষ দূরে আছে। [শ্রাবণ, ১৩৪৩]

প্রঃ—কলম্বাস্ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। সেই নব-আবিষ্কৃত দেশের নাম আমেরিকা হলো কেন ?

উঃ—আমরা সবাই জানি যে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বাস্ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক হতো যদি কলম্বাসের নাম অনুসারে সেই নতুন আবিষ্কৃত দেশের নামকরণ করা হতো। কিন্তু তা যে হয় নি, তা আমেরিকার নামেই বোঝা যায়। কিন্তু কেন সেই দেশের নাম আমেরিকা হলো ?

কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করবার ৭ বছর পরে Amerigo Vespucci আমেরিগো ভেস্‌পুচ্‌চি বলে একজন ইতালীয়ান্ নাবিক আমেরিকার দক্ষিণ উপকূলে আসেন। য়ুরোপে ফিরে গিয়ে সেই নতুন দেশের বর্ণনা করে তিনি একখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বই লেখেন। সেই বইখানা সেই সময় খুব চলতি হয়। লোকে সেই জন্যে কথায় কথায় সেই নতুন দেশকে বলতো Amerigo's Land অর্থাৎ আমেরিগো যে দেশের কথা লিখেছে, সেই দেশ। কিছুদিন পরে, এই Amerigo's Landই রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়াল, America।

প্রঃ—'হর্স পাওয়ার' কাকে বলে ? ঘোড়ার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ?

যন্ত্রের কাজ করবার শক্তি মাপবার জন্যে হর্স-পাওয়ার উদ্ভব হয়েছে। বিখ্যাত যন্ত্র নির্ম্মাতা এবং বৈজ্ঞানিক জেম্‌স্ ওয়াটের এক পরীক্ষা থেকে এই কথার উৎপত্তি হয়। একবার তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে, কি মাত্রায় সাধারণত একটা ঘোড়া কাজ করে। পরীক্ষার ফলে তিনি ঠিক করলেন যে, একটা ঘোড়া ১ সেকেণ্ডে ৫৫০ ফুট-পাউণ্ড কাজ করে এবং সেইটেই হলো ১ হর্স-পাওয়ার; অর্থাৎ ১ হর্স-পাওয়ার বলতে সেই মাত্রার কাজ বোঝায়, যাতে ৫৫০ পাউণ্ড ওজন এক ফুট তুলতে ১ সেকেণ্ড দরকার হয়।

প্রঃ—বাংলা মাসের নাম বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ইত্যাদি হলো কেন ?

উঃ—জ্যোতিষীরা চন্দ্র-সূর্য্যের গতি-পথের নাম রেখেছেন রাশি-চক্র। এই রাশি-চক্র ১২টি অংশে বিভক্ত। রাশি-চক্রের দ্বাদশ রাশিতে ২৭টি নক্ষত্র আছে। সাতাশ দিনে রাশি-চক্রে চাঁদের ভ্রমণ শেষ হয়। এক এক দিন চাঁদ এক এক নক্ষত্রের ঘরে থাকেন; এই ভাবে সাতাশ দিনে চাঁদ সাতাশটি নক্ষত্র ঘুরে বেড়ান। এই নক্ষত্রদের নাম অনুসারে আমাদের মাসের নামকরণ হয়েছে। যে মাসের পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদ বিশাখা নক্ষত্রে থাকে, সেই মাসের নাম হলো বৈশাখ। সেই রকম জ্যৈষ্ঠা, আষাঢ়া, শ্রবণা, ভাদ্রপদা, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্যা, মঘা, ফাল্গুনী ও চিত্রা নক্ষত্রের নাম অনুসারে আমাদের মাসগুলির নাম হয়েছে, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন এবং চৈত্র।

[ভাদ্র, ১৩৪৩]

প্রঃ—দিনের বেলা তারারা কোথায় যায় ?

উঃ—রাত্রি হলে আমরা আকাশে দেখতে পাই মুক্তার মত তারারা ঝল্‌মল্ করছে। কিন্তু যেই রাত্রির অন্ধকার কেটে গেল—সূর্য্যের আলো দেখা দিল—অমনি দেখতে দেখতে তারারা অদৃশ্য হয়ে গেল। তারা কোথায় গেল ? তারা কোথাও যায়নি। যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই আছে, শুধু সূর্য্যের প্রখর আলোর দরুণ তাদের আলো আর আমরা দেখতে পাচ্ছি না। অন্ধকার ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলছে—ঘর অন্ধকার বলে সেই প্রদীপটা প্রথমেই চোখে পড়ে। কিন্তু সেই ঘরে যদি ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বেলে দেওয়া যায়, তাহলে দেখবে প্রদীপটা নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। সেই রকম সূর্য্যের প্রচণ্ড আলোর তেজে, দিনের বেলায় তারার প্রদীপ আর দেখা যায় না। সূর্য্যের আলো নিভে গেলে সন্ধ্যাবেলায় আবার তারার প্রদীপ জ্বলতে দেখা যায়। [পৌষ, ১৩৪৩]

প্র :—চোখ খুলে কারা ঘুমায় ?

উ :— চোখ বোঁজা বলতে আমরা যা বুঝি তা মাছেরা কখনও করে না। অথচ তারা যে ঘুমোয় না এ কথা বলা চলে না। তারা চোখ খুলেই ঘুমোয়। চোখের পাতা না থাকলে চোখ বোঁজা ত যায় না! সাধারণ মাছের চোখের

পাতা নেই ; সেইজন্যে তাদের চোখ খুলেই ঘুমোতে হয়। সাপেদের বেলাতেও তাই। উপযুক্ত চোখের পাতা না থাকার দরুণ, তাদের চোখের দিকে চাইলে মনে হবে যে তারা যেন সর্ব্বদাই জেগে আছে। কিন্তু চোখ না বুঁজলেও, তারা ঘুমোয়!

প্র :—বাতাস নইলে কোন্ প্রাণী বাঁচে না। মাছ বাঁচে কি করে?

উ :—সাধারণত আমরা যখন দেখি জলের ওপরে মুখ নাড়তে নাড়তে মাছগুলো ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে তখন আমাদের মনে হয় বুঝি মাছগুলো জল খাচ্ছে। মানুষের মতই ওদের বেঁচে থাকতে হলে যেমন জল খাওয়া দরকার, তেমনি দরকার বাতাস থেকে অক্সিজেন নেওয়া। কিন্তু তাদের নাক কোথায়? আর বাতাসই বা তারা পায় কোথায়? আমরা যেমন নাকের মধ্যে দিয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নি, মাছেরা তেমনি কান্‌কোর মধ্যে দিয়ে জল-গ্রহণ করে নিঃশ্বাসের কাজ করে। সেইজন্যে মাছগুলোকে জলের ওপর যখন আমরা ভেসে বেড়াতে দেখি, তখন তারা তাদের কান্‌কোর ভেতর দিয়ে জল নিয়ে নিঃশ্বাস নেয়। জলের সঙ্গে যে অক্সিজেন মিশে থাকে, মাছের রক্ত সেই অক্সিজেনটুকু গ্রহণ করে জলীয় অংশ ফেলে দেয়। এইভাবে অন্য সব প্রাণীর মতই অক্সিজেন নিয়ে জলে মাছ বেঁচে থাকে। [মাঘ, ১৩৪৩]

প্রশ্ন :—আকাশ-যানে জগতের প্রথম যাত্রী কে বা কারা?

উঃ—মানুষের নানা আবিষ্কারের গোড়ার পাতায় অনেক সময় দেখা যায় যে, মানুষের সহায়করূপে রয়েছে ইতর প্রাণীরা। বহু মারাত্মক পরীক্ষার পর, মানুষ এক একটা জিনিষ আবিষ্কার করতে পেরেছে এবং সেই মারাত্মক পরীক্ষায় আত্মদান করেছে চতুষ্পদ প্রাণীরা। আমাদের এক একটা বিশেষ বিশেষ ওষুধের পেছনে এইভাবে কত ইতর প্রাণীর আত্মদান আছে যে তা বলা যায় না।

আকাশ-যানে জগতের সর্ব্ব প্রথম যাত্রীরূপে আমরা যাদের দেখতে পাই, তারা কোন দুঃসাহসী মানুষ নয়, তারা হলো মিঃ ছাগল, মিসেস্ হাঁস এবং মিঃ মোরগ! আলেকজান্দারের "বিউকেফেলা" বা প্রতাপসিংহের "চৈতকে"র মতো যদি তাদের কোন নাম থাকতো, তাহলে তাদের নাম বিমানপোত-চালনার ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকতো।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দের কথা, ফ্রান্সে তারা দু'ভাই খেলা করতে করতে ক্রমশঃ আকাশে ওড়াবার জন্যে বেলুন তৈরী করলো। তাঁদের নাম হলো জোসেফ এবং ষ্টিফেন মণ্টগলফার। প্রথমে তাঁরা ধোঁয়ার সাহায্যে বেলুন ছাড়তেন। কিন্তু সে বেলুন বেশীদূর উঠতো না এবং বেশীক্ষণ ওপরে থাকতে পারতো না। এই সময় হেনরী ক্যাভেণ্ডিস্ হাইড্রোজেন গ্যাস আবিষ্কার করলেন। এই নুতন গ্যাসের গুণ হলো যে সেটা খুব হাল্‌কা। মণ্টগলফার দুই ভাই এই নতুন গ্যাস পুরে বেলুন ছেড়ে কৃতকার্য্য হলেন। তাঁদের বেলুন প্রায় ১০০০ ফিট উঁচুতে উঠলো।

এই ব্যাপারের পর তাঁদের দু'ভাই এর ডাক পড়লো রাজধানীতে। রাজধানীতে গিয়ে রাজা এবং রাজ সভাসদদের সামনে এই ব্যাপার দেখাতে হবে।

তাঁরা দু'ভাই প্যারিসে এলেন। সরকারী খরচে এক বৃহৎ বেলুন তৈরী করা হলো। সেই বেলুনের সঙ্গে শক্ত তার দিয়ে একটা ঝুড়ির বাক্স ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

সেই ঝুড়ির বাক্সে একটি ছাগল, একটি মোরগ এবং একটি হাঁসকে উঠিয়ে দেওয়া হলো।

সেই তিনটী প্রাণীকে নিয়ে বেলুন আকাশের দিকে উঠলো।

সেদিন সেই ঘটনা দেখবার জন্যে ফ্রান্সের রাজা থেকে দরিদ্র চাষা পর্য্যন্ত সকলে সমবেত হয়। সকলেই সেই তিনটী হতভাগ্য প্রাণীর ভাগ্য সম্বন্ধে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে বেলুন যখন মাটীতে নামলো তখন দেখা গেল যে, জগতের প্রথম আকাশ-যাত্রীর দল নিরাপদেই আবার মাটীতে পৌচেছেন। ছাগলটী নিশ্চিন্তমনে ঘাস চিবোচ্ছে, মোরগটি বিজ্ঞভাবে ঘাড় তুলে একবার জয়ধ্বনি করে উঠলো এবং মিসেস্ হাঁস পুকুরের কাদামাটীর জন্যে ডানার ঝাপট দিয়ে উঠলো।

এই তিনটী প্রাণীই হলো জগতের প্রথম বিমান-যাত্রী। [অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩]

প্রঃ—লোহায় মরচে পড়ে কেন?

উঃ—লোহায় যখন মরচে পড়ে তখন এই মরচে জিনিষটা আর লোহা নয়—অন্য জিনিষে পরিণত হয়েছে। এটা এখন লোহা এবং অক্সিজেনে মিশ্রিত একটা অন্য জিনিষ হয়েছে, যার নাম Iron Oxide (রসায়নিকরা বলবে ferric oxide). লোহার গায়ে যখন জলীয় জিনিষ কিম্বা কোন রকম এসিড লাগে তখন এই পরিবর্ত্তন হয়। তুমি যদি লোহাকে একেবারে খাঁটি জলে (অর্থাৎ যে জলে কোন রকম এসিড নাই) ডুবিয়ে রাখ, তাহলে দেখবে লোহার কোন রকম মরচে পড়ে নি। কিন্তু যদি লোহাকে বাতাসে রাখা যায় তবে এতে মরচে ধরতে আরম্ভ করে—কারণ বাতাসে জলীয় জিনিষ ছাড়া কারবনিক এসিড গ্যাসও আছে।

প্রঃ—ঘাস সবুজ কেন?

উঃ—ঘাসের কোষে (cell) এর মধ্যে এক রকম রং-তৈরী করার জিনিষ আছে,—এর নাম chlorophyll. এই রংটা গাছের পাতায় সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছে। এই জন্যই গাছের পাতা সবুজ। আমাদের শরীরের রক্ত লাল—কারণ Hæmogloben নামে এক রকম লাল রং আমাদের রক্তকে লাল করে রেখেছে। এই ক্লোরোফিলের রং সবুজ বলে গাছের পাতা থেকে নানা রকম সবুজ রং তৈরী হয়।

প্রঃ—ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা হয় কেমন করে?

উঃ—ঝিনুকের মধ্যে যে মাংসপিণ্ড থাকে—তা অত্যন্ত

সহজেই উত্তেজিত ও চঞ্চল হয়। কোন রকম নাড়াচাড়া কিম্বা কোন রকম বাধা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ঝিনুকরা তাদের খোলার ভিতরের সমস্ত দেহে একটা শক্ত চকচকে মসৃণ জিনিষ দিয়ে ঢেকে দেখ। এই জিনিষের নাম হচ্ছে —Mother of pearl. এই Mother of pearl থেকে নানা রকম জিনিষ তৈরী হয়—যেমন বোতাম, ছুরির হাতা, —ইত্যাদি। যদি কোন ঝিনুককে তার মাংসের মধ্যে উত্তেজিত করা হয়, তবে সে তখনই এই পাতলা Mother of Pearlএর এক আবরণ দেয়—এই আবরণ পরে ছোট ছোট গোল বলের আকার ধারণ করে—তাকে আমরা মুক্তা বলি।

প্রঃ—একটা মুরগী বছরে কতগুলো ডিম পাড়ে?

উঃ—মুরগী সাধারণত বছরে ১২০টি ডিম পাড়ে।

প্রঃ—পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে চওড়া নদী কোন্‌টা?

উঃ—আমাজোন নদী পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে চওড়া নদী।

প্রঃ—তিমি মাছ সাধারণত কত বছর বাঁচে?

উঃ—তিমি মাছ সাধারণত ৫০০ বৎসর বাঁচে।

প্রঃ—গরু কেমন করে মাটি থেকে ওঠে?

উঃ—গরু প্রথমে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে ওঠে।

প্রঃ—সাধারণ মানুষ বছরে কত দুধ খায়?

উঃ—মানুষ সাধারণত ৫৪ গ্যালন দুধ বছরে খায়।

প্রঃ—শরীরে রক্ত কত গতিতে চলে?

উঃ—শরীরে রক্তের গতি ঘণ্টায় প্রায় ৭ মাইল।

প্রঃ—ডিম থেকে মুরগী ও হাঁস হতে কতদিন লাগে?

উঃ—মুরগীর ডিম ফুটতে ২১ দিন এবং হাঁসের ডিম ফুটতে ২৬ দিন লাগে। [মাঘ, ১৩৩৮]

প্রঃ—ঘোড়া মাটির উপর শুয়ে পড়লে কোন পায়ে ভর দিয়ে ওঠে?

উঃ—সামনের দুটি পা দিয়ে।

প্রঃ—তরল পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভারী কোন্ জিনিস?

উঃ—পারা, জলের চেয়ে ১৩·৬ গুণ ভারী।

প্রঃ—পৃথিবীর নিজের দেহে আলো আছে কিনা?

উঃ—না, সমস্ত আলো সূর্য থেকে আসে।

প্রঃ—পৃথিবীর মধ্যে দিয়ে সোজা লাইন টানলে সে লাইন কত লম্বা হয়?

উঃ—প্রায় ৮০০০ মাইল। [অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭]

কোন্‌টা সত্যি

(ক) কেউ যদি বলে, আমি একজন Stevedore, তাহলে বুঝতে হবে,

(১) লোকটা খুব উদার।

(২) জাহাজের মাল-নামানো বা চালানোর কাজ করেন

(৩) লোকটা সমাজ-পরিত্যক্ত।

(৪) সরকারের বন-বিভাগের একজন বড় কর্ম্মচারী।

উঃ—(ক) ২। [চৈত্র, ১৩৪৪]

(খ) আমরা যখন ঘুমোই, তখন আমাদের চোখের তারা হয়ে যায়,

(১) পিনের ডগার মত ছোট

(২) আরও বড়

(৩) যেমন ছিল, তেমনিই থাকে

উঃ—(খ) ১;

(গ) বাষ্প-চালিত যন্ত্রের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা হলেন,

(১) জেমস্ ওয়াট্

(২) জর্জ্জ ষ্টিফেনসন্

(৩) আর্কিমিডিস্

(৪) ডেনিস্ প্যাপিন্

(৫) রোজার বেকন

(৬) নাম-হীন এক প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক

উঃ—(গ) ৪;

(ঘ) আমরা সিল্ক পাই,

(১) এক রকম তুলো থেকে

(২) এক রকম পোকা থেকে

(৩) এক রকম শস্যের শাঁস থেকে

উঃ—(ঘ) ২;

(ঙ) যিশুখৃষ্ট জন্মেছিলেন,

(১) খৃষ্টাব্দের প্রথম বৎসর

(২) খৃষ্টাব্দের আগের বছরের ২৫শে ডিসেম্বর

(৩) খৃষ্টাব্দের ছ বছর আগে

উঃ—(ঙ) ৩; [বৈশাখ, ১৩৪৫]

(চ) ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ স্পেনের রাণীর কাছ থেকে নীচের একটি জায়গা বিবাহ যৌতুকস্বরূপ পান

সুমাত্রা	ম্যাডাগাস্কার
বোম্বে	সিংহল
আমেরিকা	জাভা

উঃ—বোম্বে;

(ছ) পলাশী যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে সিরাজদ্দৌলা যখন পালিয়ে যান, তখন তিনি,

ঘোড়ায় চড়ে পালিয়েছিলেন,

উটে চড়ে পালিয়েছিলেন

পায়ে হেঁটে পালিয়েছিলেন

পাল্কীর মধ্যে লুকিয়ে পালিয়েছিলেন।

উঃ—উটে চড়ে পালিয়েছিলেন।

(জ) কংগ্রেস ভারতবর্ষের কতক কতক অঞ্চলের নতুন নামকরণ করেছেন। আজকাল বিদর্ভ বল্লে বোঝায়

বোম্বে যুক্ত-প্রদেশ
মহীশূর মধ্য-প্রদেশ
বেরার বিহার

উঃ—বেরার

(ঝ) তিব্বতে প্রথম ভারতবর্ষীয় প্রবেশ করেন,

শরৎচন্দ্র দাস, নয়ান সিং, কিষণ সিং

উঃ—শরৎচন্দ্র দাসের আগে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নয়ান সিং তিব্বতে প্রবেশ করেন

(ঞ) জগতের সবচেয়ে পুরাণো খবরের কাগজ হলো,

নিউইয়র্ক টাইমস্ টিট্ বিট্স্
ম্যাঞ্চেষ্টার গারডিয়ান স্পেকটেটর
পিকিং গেজেট লণ্ডন ডাইজেষ্ট

উঃ—পিকিং গেজেট।

[আশ্বিন, ১৩৪৫]

কোনটা ঠিক

(১) "দালাই লামা" বল্লে বুঝতে হবে—

(ক) চীন-সম্রাটের উপাধি (গ) তিব্বতের ধর্ম্ম-গুরু
(খ) মেকসিকোর প্রেসিডেণ্ট (ঘ) বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থ

উঃ—(১) গ ;

(২) ডুমুরের ফুল বলে,

(ক) কিছু নেই (খ) নিশ্চয়ই আছে

উঃ—(২) খ—তবে সে ফুল বাইরে থেকে দেখা যায় না। ডুমুর কেটে ভেতরে যদি একটা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, ছোট ছোট গুঁড়ি গুঁড়ি যেগুলো রয়েছে, সেইগুলো হলো ডুমুরের ফুল।

(৩) কোন কোন আমের ভেতরে, কাটলে দেখা যায় যে পোকা রয়েছে। সেই পোকা আমের ভেতর এসেছে

(ক) গোড়া থেকেই (খ) আমের ভেতরে জন্মায়
(গ) আম যখন খুব ছোট থাকে তখন

উঃ—(৩) গ—আম যখন খুব ছোট থাকে, তখন পোকা আমের গায়ে ডিম পাড়ে। সেই ডিম থেকে খুব সরু বাচ্চা হয়ে, আমের গায়ে ছেঁদা করে ভেতরে ঢুকে যায়। আম যত বড় হতে থাকে, তার গায়ের ছেঁদা বুঁজে যায় আর ওধারে আমের ভেতরে পোকাটাও বড় হতে থাকে।

(৪) নীচের একটি প্রাণীর দেহে হাড় নেই,

(ক) সাপ (গ) চামচিকে
(খ) শামুক (ঘ) মাকড়শা

উঃ—(৪) খ ;

(৫) কলিকাতায় গড়ের মাঠে যে মনুমেণ্ট আছে, তা তৈরী হয়েছিল,

(ক) ইংরেজ কর্তৃক বাংলা দেশ দখলের জয়স্তম্ভ রূপে
(খ) নেপালের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত একজন ইংরেজ সেনাপতির স্মৃতিরক্ষা জন্যে
(গ) কেল্লার উপর নজর রাখবার জন্য

উঃ—(৫) খ—অক্টরলোনি বলে একজন ইংরাজ সেনাপতি।

(৬) আকাশে মেঘ হলে, নীচের একটা গাছের পাতা বুঁজে যায়।

(ক) তেঁতুল (গ) লজ্জাবতী
(খ) সীম (ঘ) পদ্ম

উঃ—(৬) ক ;

(৭) নীচের বিষয়গুলির মধ্যে এমন একটি জিনিস আছে, যার সবচেয়ে বড়টা ভারতবর্ষে আছে

(ক) রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্ম (খ) মিউসিয়াম্
(গ) রেলের টানেল (ঘ) খাল

উঃ—(৭) ক—সোনপুর—জগতের মধ্যে দীর্ঘতম রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম্ম। [আষাঢ়, ১৩৪৫]

(৮) সরকারী কাজের জন্যে পোষ্ট-আফিসের চিঠিপত্র সর্ব্বপ্রথম এরোপ্লেনে যায়—

এলাহাবাদ থেকে প্যারিস থেকে
লণ্ডন „ বার্লিন „
নিউ ইয়র্ক „ বোম্বে „

উঃ—(৮) এলাহাবাদ থেকে ;

(৯) দশ টাকার নোটের ওপর যে সই থাকে, সে সই হোলো—

বাংলার গভর্ণরের বড়লাটের
রাজার প্রধান মন্ত্রীর
সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের রিসার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণরের

উঃ—(৯) রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গভর্ণরের

(১০) কোন্টা ঠিক।

জলের রঙ আছে জলের রঙ নেই

উঃ—(১০) জলের রঙ আছে

(১১) গ্রহদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো,

বৃহস্পতি শনি
শুক্র মঙ্গল
বুধ নেপচুন

উঃ—(১১) বৃহস্পতি

(১২) পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়

খনিতে রাসায়নিকের কারখানায়

উঃ—(১২) খনিতে। [শ্রাবণ, ১৩৪৫]

গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা



১। পাগল করা গান

"কন্‌ডাকটার যখন তুমি ভাড়া কোন পাবে
পাসেঞ্জারের সামনে টিকিট পাঞ্চ করিয়া দেবে ;
হল্‌দে টিকিট দেবে তুমি চার পয়সা পেলে
সবুজ রংএর টিকিট—যদি ছ পয়সা মেলে ;
নীল বরণের টিকিট তরে আট পয়সা নেবে
পাসেঞ্জারের সামনে টিকিট পাঞ্চ করিয়া দেবে ;
কন্‌ডাকটার যখন তুমি ভাড়া কোন পাবে
পাসেঞ্জারের সামনে টিকিট পাঞ্চ করিয়া দেবে।"

সকাল বেলায় খবরের কাগজ পড়ছিলাম, দেখলাম ঐ মজার পদ্যটা খবরের কাগজে লেখা রয়েছে—বেশ ভাল লাগল; আবার পড়লাম, তারপর আর একবার; পদ্যটা মুখস্ত হয়ে গেল। ক্রমাগত মাথার ভিতর ঐ কথাগুলি ঘুরতে লাগল। এসে স্নান করে ভাত খেতে বসলাম—ভাত মাখছি আর বলছি—

"কন্‌ডাকটার যখন তুমি ভাড়া কোন পাবে
পাসেঞ্জারের সামনে টিকিট পাঞ্চ করিয়া দেবে।"

বলেই চলেছি,......। বামুন বললে, "ওকি বাবু, খান"; উঠে পড়লাম, বললাম, "ভাল লাগছে না—"

ঘরে এসে খাতা পেন্‌সিল নিয়ে বসলাম—আপন খেয়ালে লিখেই চলেছি—

"হল্‌দে টিকিট দেবে তুমি চার পয়সা পেলে
সবুজ রংয়ের টিকিট—যদি ছ পয়সা মেলে।"

বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, লিখে চলেছি অবিরত, পাতার পর পাতা.........বিকেল ৫টা বেজে গেল, উঠে পড়লাম। ভাবলাম, দুর ছাই—একটু বেড়িয়ে আসি। বেড়াতে বেরিয়ে তালে তালে মনে পড়তে লাগল—

"নীল বরণের টিকিট তরে আট পয়সা নেবে
পাসেঞ্জারের সামনে টিকিট পাঞ্চ করিয়া দেবে।"

বাড়ী ফিরে এলাম—চেয়ারে বসে নিজের মনে মনে খালি ঐ গান গেয়ে চলেছি—রাত্রিতে শুয়েছি, ঘুম আর হয় না, মাঝ রাত্রিতে নিজের মনে বলে চলেছি—"পাসেঞ্জারের সামনে টিকিট পাঞ্চ করিয়া দেবে"—না, আমি দেখছি পাগল হয়ে যাব। তার পরের দিনও ঐ রকম করে কাটলো। সারাদিন নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, খালি নিজের মনে ঐ পাগল করা গান গেয়ে চলেছি। তার পরের দিন এক বন্ধু এসে হাজির—বললেন,—"ওকি, তোমার হয়েছে কি? একি চেহারা, মনে হচ্ছে যেন তুমি শ্মশানের চিতা থেকে উঠে আসছ, ব্যাপার কি? চোখ বসে গেছে, অসুখ হয়েছিল নাকি?"

আমি বললাম, অসুখ নয়—চল একটু বেড়িয়ে আসি বাসে করে।

বেরিয়ে পড়লাম দুজনে—বাসে উঠে বন্ধু অনর্গল বকে চলেছে। আমার খেয়াল নাই, আমার মনে হচ্ছে বাস যেন বলছে—

"কন্‌ডাকটার যখন তুমি ভাড়া কোন পাবে
পাসেঞ্জারের সাম্‌নে টিকিট পাঞ্চ করিয়া দেবে।"

খানিকক্ষণ পরে বন্ধু বললে—তোমার হয়েছে কি? আমি এত কথা বললাম, তোমার কাছ থেকে একটা কোন জবাব পেলাম না, কারণটা কি?

আমি বললাম—

"হল্‌দে টিকিট দেবে তুমি চার পয়সা পেলে
সবুজ রংয়ের টিকিট—যদি ছ পয়সা মেলে।"

বন্ধু বললেন,—বারে, বেশ সুন্দর গান ত', বল দেখি গোড়া থেকে—

বললাম, আবার বললাম,—তারপর আবার একবার—বন্ধুর মুখস্থ হয়ে গেল—।

বন্ধু নিজের মনে গান করতে লাগলেন—আশ্চর্য্য! যেই বন্ধু গান করতে আরম্ভ করলেন, অমনি আমার মনে হলো ঐ গান আমি প্রথম শুনছি। এর আগে এ গানের একটি লাইনও আমি শুনি নাই; তারপর ফিরে আসবার সময় আমি বকে যেতে লাগলাম, কিন্তু বন্ধুবর একেবারে চুপচাপ। আমি বললাম, "কিহে, ব্যাপারখানা কি বলত? বন্ধু বললেন—

"কন্‌ডাকটার যখন তুমি ভাড়া কোন পাবে
পাসেঞ্জারের সাম্‌নে টিকিট পাঞ্চ করিয়া দেবে।"

বেশ বুঝতে পারলাম, ঐ গানের ক্রিয়া এবার বন্ধুবরের মস্তিষ্কে আরম্ভ হয়েছে; যাই হোক, বাড়ী ফিরে এলাম...।

চারদিন পরে বন্ধু এসে হাজির—তার চেহারা দেখলে ভয় হয়। চোখ দুটি লাল, চুলগুলো উড়ছে, যেন মনে হয় গাঁজা খেয়ে আসছে এই মাত্র—বললুম, ব্যাপারটা কি? সে বল্লে, বন্ধু, আমায় বাঁচাও, আমি পাগল হয়ে যাব—আমি বললাম, কি হয়েছে তোমার বল দেখি—সে বল্লে, ভাই, আমি গিয়েছিলাম বর্দ্ধমানে; আমার এক আত্মীয় সেখানে হঠাৎ মারা গেছে তাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেখানে যখন আমরা সবাই মিলে শ্মশানে যাচ্ছি, সবাই খুব গম্ভীর, আমি তখন খুব গম্ভীর ভাবে গেয়ে চলেছি—

"পাসেঞ্জারের সামনে টিকিট পাঞ্চ করিয়া দেবে।"

তারপর শ্মশান থেকে বাড়ী ফিরে এসে বসে রয়েছি; যিনি মারা গিয়াছেন, তার স্ত্রী এলেন, তিনি এখানে ছিলেন

না; তাঁর বাপের বাড়ীতে ছিলেন, এসে খুব কাঁদতে লাগলেন—আমায় বললেন,—"আপনি ত তাঁর শেষ সময়ে উপস্থিত ছিলেন—তিনি কি কিছু বলে গেছেন?" আমি তখন সব ভুলে গেছি, আমার মনে হল, এ জগতে সব মিথ্যা, সত্যি শুধু—

"কন্‌ডাকটার যখন তুমি ভাঁড়া কোন পাবে
পাসেঞ্জারের সামনে টিকিট পাঞ্চ করিয়া দেবে।"

আমি আপন মনে গেয়ে চলেছি—

"হল্‌দে টিকিট দেবে তুমি চার পয়সা পেলে
সবুজ রংয়ের টিকিট—যদি ছ পয়সা মেলে।"

তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমার তখন যেন চমক ভাঙ্গল; তাড়াতাড়ি বললাম, দেখুন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কিছু মনে করবেন না,—এই বলে উঠে চলে এলাম—বন্ধু আমায় বাঁচাও, আমার আহার নেই, নিদ্রা কি রকম আমি ভুলে গেছি, আমি এবার পাগল হয়ে যাব।

বন্ধুকে নিয়ে গেলাম এক ইস্কুলে, দেড়শত ছেলে বসে ছিল—আমি বন্ধুকে বললাম, তোমার গান একবার শোনাও! বন্ধু গাইলেন—একবার, দু'বার, তিনবার। ব্যস, অমনি দেড়শো ছেলে এক সঙ্গে সেই গান আরম্ভ করলে। আর বন্ধু তখন সেই পাগল-করা গানের হাত থেকে নিস্তার পেলেন; তাড়াতাড়ি বন্ধুকে সেখান থেকে নিয়ে এলাম। তারপর সে গান আর শুনিনি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সে গান যেন আর শুনতে না হয়।

পাঠকগণ ও পাঠিকাগণ, সাবধান, কখনও দু'বারের বেশী এই গান শুনো না, পাগল হয়ে যাবে, আমায় বিশ্বাস কর, এই গানে মাদকতা আছে, যেই শুনি—

"কন্‌ডাকটার যখন তুমি ভাড়া কোন পাবে
পাসেঞ্জারের সামনে টিকিট পাঞ্চ করিয়া দেবে।"

অমনি মনে হয় আবার শুনি, কিন্তু সাবধান।*

[ভাদ্র, ১৩৩৭] শ্রীরণজিতকুমার মিত্র

* বিখ্যাত আমেরিকান লেখক Mark Twain এর "Punch Brothers Punch" এর অনুবাদ।

২। শরতে

যুগে যুগে প্রকৃতিকে ঘিরে ঘিরে সব ঋতুদের খেলা চলেছে,—গ্রীষ্মের দারুণ দাহনের পর নেমে আসে বর্ষা,—তারপর, ওর খেলা শেষ হ'তে না হ'তেই নেপথ্যে চেয়ে দেখি শরতের হাসিমুখটি ঝিক্‌মিক্ করছে।

আমি সব চেয়ে ভালবাসি এই শরৎকে। বাদল দিনের ঝরঝরানি গানকে ছাপিয়ে ওর উল্লসিত মনের হাসি আকাশে, বাতাসে, শ্যামল প্রান্তরে ঝলমল করতে থাকে। শরতের বাঁশী শুনতে পেয়ে মাঠও আজ খুসীতে হাততালি দিয়ে উঠেছে। দেখে দেখে মনে হয়, বিশেষ ক'রে আমাদের জন্যেই এই শরতের সোনার রৌদ্র সৃষ্টি হয়েছে—বর্ষার সৌন্দর্য্য থাকুক কবিদের জন্যে তোলা, বসন্ত তার আনন্দ সম্ভার সাজিয়ে রাখুক না যৌবন দেবতার পায়ের তলায়—কিন্তু আমাদের জন্যে আছে শরৎদিনের সোনালী হাসি; একে স্পর্শ করে আমাদের মনে ছুটীর গান যেন বেজে ওঠে, ওর সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যেন বলতে পারি,—"আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি"

কিশোর শরতের প্রাণের অকারণ চপল খুসী আমাদের মনকে নাড়া দেয়—আনন্দে হাঁক ছেড়ে বলে—"ওরে, দোলরে দোল।" আমাদের মন অমনি নেচে উঠে—ঘর থেকে ছুটে মাঠে বেড়িয়ে আসি—শরৎ যে আজ আমাদের মনের কাছে ডাক পাঠালো! শরৎ এসেই তার খেলার সখীদের কাছে নীল আকাশের সঙ্গে নিমন্ত্রণের চিঠিটি পাঠিয়েছে—শরতের হাওয়া সে বাণী উড়িয়ে নিয়ে এসে কেবলি গাইছে—"দে দোল, দে দোল—ওরে দোল।"

কি ক'রে আমরা চুপ ক'রে থাকি? শরতের গান, শরতের খুসী, শরতের হাওয়া, শরতের চঞ্চলতা জরুরী পরোয়ানা পাঠিয়ে দিল আমাদের মনের দরজায়; আমাদেরও শরতের সঙ্গে পৃথিবীর উৎসবের আসরে নামতে হবে। কেবলি মনে হচ্ছে, আমি যদি কবি হ'তাম, তাহ'লে রবি ঠাকুরের নটরাজ যেমন করে বর্ষার আর বসন্তের পালাগান গেয়েছিল, আমিও তেমনি ক'রে আমার একতারাটি হাতে নিয়ে শরতের সভায় বসে ওর প্রাণের সুরটি বাজাতাম। শরতের মনে যখন যে রাগিণী বাজতো, সে আর কেউ জানতে পেতো না, শুধু জানতো আমার খেলার সাথীর দল—যখন ছুটির দিনে ওদের সম্মিলিত কলধ্বনির মাঝখানে আমার একতারাও একটি সুরে ঝঙ্কার তুলতো।

পূর্ণিমা রাত্রিতে পূর্ণ চাঁদের মায়া যেমন ক'রে সাগরের বুকে মাতন জাগায়, শরতের আবির্ভাবও কৈশোরের স্বপ্নময় চিত্তে তেমনি সাড়া আজ জাগিয়ে তুলেছে।

শরৎ, তোমার ডাকে আমরা ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছি সব পুরাতনকে পিছনে ফেলে—তোমার আলো দিয়ে আমাদের অভিষিক্ত ক'রে তোল। আমরাও আমাদের মুগ্ধচিত্তের সমস্ত বিস্ময় ও আনন্দ নিয়ে তোমায় বরণ করছি।

[ভাদ্র, ১৩৪২] কুমারী মাধুরী সেন

৩। বর্ষ শেষের বাদল সন্ধ্যা

বর্ষের শেষে দিন। কাল রাত থেকে বিরামবিহীন বর্ষণ আরম্ভ হয়েছে। থম্‌থমে আকাশ। প্রলয় বুঝি ঘনিয়ে এল। মাঝে মাঝে ম্লানায়মান ফাটাল দিয়ে বিজলীর এক ঝলক্ হাসি দেখা যাচ্ছে। এ কী বর্ষণ! বিরাট গাছপালার মাথাগুলি কে যেন এক ঝাঁকি দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। অসময়ের ধারা বর্ষণ বুঝি এমনিই হয়।

বিশাল প্রাসাদের এক ক্ষুদ্র কক্ষে জান্‌লার ধারে বহুক্ষণ ধরে বসে বসে মঞ্জুলা ঐ পুঞ্জীভূত ঘন কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর কী মনে ক'রে সে উঠ্‌লো। ধীরে ধীরে তার বীণ নিয়ে এসে মেঘমল্লার তান ধরলো। বাজনাতে তার হাত ছিল, শিক্ষা ছিল, আর সর্ব্বোপরি ছিল আশ্চর্য্য সাধনা। তার সেই সুর মেঘের গুরু গুরু ডাকের সঙ্গে বৃষ্টিধারার ঘুমপাড়ানী ঝরঝরানি সুরের সঙ্গে, বজ্রের প্রলয় সঙ্গীতের সঙ্গে সমান তালে তালে কী এক অপূর্ব্ব মন্দ্রিল তানে বাজতে সুরু কোরেছে। মুক্ত বাতায়ন পথে বৃষ্টিকণা, সঙ্গে তুষার শীতল ঝড়ো-হাওয়া তা'র মুক্ত বিপর্য্যস্ত কেশে, তা'র বসনে ভূষণে, তার সে সুন্দর হীরার কর্ণাভরণে এই একবার দোলা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার সে খেয়াল কোথায়? মঞ্জুলার চাঁপার কলির মত আঙুল বীণের তারের উপর দিয়ে যেন স্বপ্নের আমেজ নিয়ে ওঠানামা কোরছে। সিক্ত বসনাঞ্চল মাটিতে পায়ে কাছে লুটিয়ে আছে। ক্লান্তিতে তা'র কোমল ক্ষুদ্র ললাটে শ্বেত চন্দনের মত স্বেদবিন্দু একটি একটি কোরে ফুটে উঠেছে। ও যেন সুদূর যুগান্তরের অসীম কালো চিত্রপটে আঁকা চিরন্তনী উদাসিনী রাজরাণী মীরাবাঈ। ওর গভীর কালো পল্লব ভারাবনত স্বচ্ছ দুই আঁখি যেন কোন্ সুদূরে নিবদ্ধ! শ্রান্ত বীণ ওর মৌন এখন। শুধু সেই শুদ্ধ বীণের সুর মূর্চ্ছনা ধূপের ধোঁয়ার মত, সুমধুর স্বপ্নের মত, চন্দন সৌরভের মত, ধীরে ধীরে ঐ প্রায়ান্ধকার কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে, প্রাসাদ থেকে প্রাসাদান্তরে ক্রমে দূর দূরান্তরে বিলীয়মান।

[**ফাল্গুন, ১৩৪২**] শ্রীতপতী রায়

৪। বর্ষা

"মাহ ভাদর" নয় কিন্তু "ভরা ভাদর" এসে পড়েছে। কদিন ধরে বৃষ্টি নেমেছে—দিনরাত অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণে মন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে। জান্‌লা দিয়ে দেখ্‌ছি অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে—টিপ্‌ টিপ্‌ টিপ্‌। দেখতে বেশ লাগে। মনে পড়ে যখন খুব ছোট ছিলুম তখনকার কথা—প্রথম বৃষ্টির দিনে কারুর কথা না শুনে সেই বৃষ্টিতে ভেজা। আজও মনে হচ্ছে দৌড়ে দিয়ে উঠোনে ভিজ্‌তে আরম্ভ করি। কল্‌কাতা সহর—প্রকৃতিকে গলা টিপে মারবার বন্দোবস্ত এখানে প্রচুর। কাজেই জানলা থেকে প্রথমেই চোখে পড়ে কালো জলে ভেজা পিচের রাস্তা—আর তার উপর দিয়ে মানুষের অবিরাম যাওয়া আসা, কত রকমের লোকই না যাতায়াত করছে। পা পিছলে পড়া তো আছেই—জানিনা কেন এই দৃশ্য দেখলে সবাই না হেসে থাকতে পারে না।

পাশের বাড়ীতে অনবরত রেকর্ড বাজ্‌ছে—"আকাশের নীলিমা মেঘেতে হারা, অবিরাম বহে বাদল-ধারা।" আজ এই গান শুনতে কি সুন্দরই না লাগছে, কিন্তু অন্য সময় এত ভাল লাগবে কি—বরঞ্চ বিরক্তিই হবে। ছয় ঋতুর মধ্যে বর্ষাই যে রূপে শ্রেষ্ঠ তা সব কবিই স্বীকার করেছেন—আর এই বর্ষাকেই কেন্দ্র করে তাঁদের কবিত্বের একটা দিক বিকসিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের বর্ষা সম্বন্ধীয় অনেক কবিতাই আছে। তার মধ্যে কতকগুলির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। যেমন—"ঐ আসে... জলসিঞ্চিত...ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা—শ্যাম গম্ভীর সরসা।" "গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি—গরজে গগনে গগনে।" আরো কতই না আছে। কিন্তু এই কল্‌কাতা সহরে রবীন্দ্রনাথের "নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা"—কি করেই বা আমাদের চোখে পড়বে। কেমন করেই বা দেখতে পাবো—"নব তৃণদল ঘন বনছায়ে, পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জ।" মনে আক্ষেপ থেকে যায়। বর্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনা আলোচনা করে 'থিসিস্' লেখা যায়—কাজেই সে চেষ্টা না করাই ভালো। বর্ষার আরো একটা দিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোট্ট, "শ্রাবণ—সন্ধ্যায়" কি সুন্দর করেই না ফুটিয়েছেন। তা এখানে অবান্তর।

[**আষাঢ়, ১৩৪৩**] শ্রীমমতা চ্যাটার্জ্জী

৫। কলকাতায় শরৎ

শরৎ আসে বছরের পর বছর আলোর বন্যা নিয়ে; তার আগমন আমাদের কাছে নূতন নয়। কিন্তু তবু মনে হয় এবারকার শরতের আগমনটা যেন অন্য সব বারকে ছাপিয়ে গেল তার রূপ প্রকাশে! চির নবীন বাংলার এই শরৎ!

প্রকৃতির সমস্ত সৃষ্টির পেছনে কী গভীর ছন্দানুভূতি আছে তা ঋতুগুলির পরস্পরের যোগসূত্রের কথা ভাবলে আমরা বুঝতে পারি। বর্ষার পর শরতের আগমন বাংলায় কতখানি সুসঙ্গত আর সুসমঞ্জস, মনে হ'লে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। বর্ষাশেষে প্রকৃতির সমস্ত কিছু পুনরুজ্জীবিত হ'লো, পরিপূর্ণ জীবনের লাবণ্যে ভরপুর হ'লো, আর তার পরেই আলোর (আর আনন্দের) বাণ ডেকে এলো—শরৎ। বাংলার এই অবস্থাকে কবির ভাষায় বলতে হয়—

"হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।"

আবার তারপরেই দেখবো—"নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা।" শরতে যে রূপটি প্রকটিত হয় বাংলার মাঠে, ঘাটে, প্রান্তরে আমরা তা থেকে অনেকখানি বঞ্চিত। কল্‌কাতা-বাসী আমরা, আমরা বলতে পারি না বাংলা মাকে সম্বোধন ক'রে—

"পারেনা বহিতে নদী জল ভার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর,
ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন সভাতে।"

আমরা দেখতে পাইনা "ক্ষেতে ভরা ধান" দৃশ্যটা কেমন, আর তার সে গন্ধও পেতে পারি না, যা "গ্রাম পথে পথে" ছড়িয়ে আছে বিধাতার আশীর্ব্বাদের মতো। কিন্তু তবু কোল্‌কাতার ইটকাঠেও শরৎ রঙ ধরায়, এখানকার নগণ্য গলি গুঁজিতেও তা'র দাক্ষিণ্য থাকে না অপ্রকাশিত, এখানকার বাঁধা-ধরা ঠিকঠাক করা রাস্তা, ঘর-বাড়ি আর যানবাহনও আলোয় আলোয় ছেয়ে গিয়ে হঠাৎ অভাবনীয়রূপে দেখা দেয়; মনে হয়, এদের মধ্যেও এতো সৌন্দর্য্য, এতো অপূর্ব্বত্ব আছে তা তো কোনোদিন চোখে পড়ে নি। ঘরের জানালার কিম্বা রাস্তার ওপরকার যে খণ্ড আকাশ শরতে দেখা দেয়, সেই সাদার ছোপ দেওয়া উজ্জ্বল নীল আকাশের গায়ে লেখা থাকে স্পষ্ট অক্ষরে—"সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।"

কলকাতার অগণ্য বদ্ধ কুঠুরীতে বসেও শরতের উজ্জ্বল সকালে এই স্বচ্ছ নীলাভ আকাশের ওপর দিয়ে কল্পনার পাখা উড়িয়ে সেই যুগে ফিরে যেতে খুব বেশী দেরী হয় না, সে যুগে আমাদের দেশে রাজা ছিলেন, আর রাজ্য ছিল; সে যুগে শরতের এমনি সব শুভদিনে রাজারা বেরুতেন দিগ্বিজয়ে, এই আলোর আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে। আন্তরিকভাবে মনে হয়—

"ইতিহাসের আত্মজয়ী বিশ্ববিজয়ী
তাদের মাভৈঃ বাণী বাজে নীরব নির্ঘোষণে
নির্ম্মল এই শরৎ রৌদ্রালোকে।"

হে বাংলার শরৎকাল, তোমায় অভিনিন্দিত করি।

[অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩] শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

৬। "ভাগ্যে যে লিপি লিখিলা"—

রাজার বাগানে ফুটেছে—এক মস্ত বড় রক্ত গোলাপ।

কত লোক দেখে সে ফুল, কেউ তাকে বৃন্তচ্যুত করতে সাহস পায় না।

এক কবি······দেখে সে ফুল, হাতে দিতে ভয় হয়, তবু সেই ফুল তার কবিতার উৎস খুলে দেয়।

তারপর আসে এক ক্লান্ত শ্রান্ত পথিক! তার পথের ক্লান্তি জুড়াতে সে চায় সেই গোলাপের গন্ধে। কিন্তু—সে যে রাজার ফুল, তাই ভরসা হয় না তাকে স্পর্শ করতে!

আবার আসে একজন। সে এক বৈজ্ঞানিক, তার কাছে ফুলের রূপ, গন্ধ, স্পর্শ কিছুই ধরা পড়ে না। সে চায় সেই রাঙ্গা বুকে রক্তের নদী বইয়ে দিতে; তাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে তার প্রাণকে ধ্বংস করতে আর সে কোমল দেহের শিরা উপশিরা ছিঁড়ে বের করতে। কিন্তু ফুলের প্রাণের চেয়ে নিজের প্রাণের দাম বেশী তা সে বোঝে। তাই তার বৈজ্ঞানিক ক্ষুধাকে অতৃপ্ত রেখেই তাকে সরে যেতে হয়।

ফুলটি তখনও দুলতে থাকে সগর্ব্বে, রাঙা মুখখানি হাসিতে ভরিয়ে। তার হাসির ছটায় সারা পূব আকাশ লাল হয়ে ওঠে। দখিন বাতাস দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে আসে।

এমন সময় এলো এক নবীন ভক্ত—দেবতার পূজারী। আন্‌মনা তার দৃষ্টি! কেমন করে যেন তার চোখ পড়ল সেই রাঙ্গা গোলাপটির উপরে। নির্ভয়ে নির্ভাবনায় একবার সূর্য্যের স্তব করে সে পরম স্নেহে তুলে নিল তাকে, ঢেলে দিল তার দেবতার পায়ে।

ফুলটি একবার তাকালো তার নিষ্ঠুর মুক্তিদাতার দিকে, তারপর লুটিয়ে পড়ল ঠাকুরের রাজীব চরণে।

এমনিই হয় মানব জীবনে—জীবনের শেষে যার আছে উচ্চ লক্ষ্য, সব বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে সে জ্ঞাতসারে হোক আর অজ্ঞাতসারে হোক পৌঁছবেই সেখানে। কখনও আসে তীব্র আনন্দ, কখনও আসে অসহ্য দুঃখ। হয়ত চরম মুহূর্ত্তেও সে পাবে অপ্রকাশ্য ব্যথা, তবু তার গম্য স্থান যেখানে, সে না চাইলেও তাকে সেখানে যেতে হবে। দুঃখে হোক, সুখে হোক তার জীবনের পরিণতি, সাধনা সিদ্ধি সে পাবে।

[চৈত্র, ১৩৪৫] শ্রীঅঞ্জলি সরকার

৭। গ্রীষ্ম-প্রশস্তি

গ্রীষ্ম এসেছে তার রুদ্র মূর্ত্তি নিয়ে। মাথায় পিঙ্গল জটাজাল, দম্‌কা হাওয়ায় উত্তরীয় তার উড়ছে দিকে দিকে, ধূলায় ধূসর পরিধেয় তার নীল আকাশের তলায় গৈরিকের মতো, হাতে অদৃশ্য ত্রিশূল; প্রচণ্ড পদক্ষেপে এসেছে সে উত্তপ্ত মাঠে, ঘাটে, প্রান্তরে—মাঠের শেষে নিশ্চিহ্ন পায়ে চলা পথের উপর। ক্ষণে ক্ষণে তার ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসের স্ফুলিঙ্গে চরাচরের গা পুড়ে যাচ্ছে, বিল-পুকুর উঠছে শুকিয়ে, ভীতা নদী হচ্ছে শীর্ণা। তার রোষ কষায়িত দৃষ্টির ইঙ্গিত পেয়ে একটা অশরীরি জন্তু তার বিরাট লাঙ্গুলে আগুন হাওয়া আর ধুলো জড়িয়ে নিয়ে অত্যাচারী শাসকের যথেচ্ছ চাবুকের মতো ব্যবহার করে চলেছে; অসহ্য তার ঝাপটের ঘায় ঝাঁকড়া-মাথা গাছগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে বেদনায়, যেন নিষ্ঠুরের পায়ে জানাচ্ছে নিষ্ফল নিবেদন নীরব কাতরোক্তিতে, সদ্য জীবন-রসে ভরপুর সবুজ পাতা গা থেকে শুকিয়ে ঝরে পড়ে যাচ্ছে, পড়ে হাওয়ায় হাওয়ায় কোথায় উড়ে যাচ্ছে! কচিৎ পথিকের দৃষ্টি—ঝাপসা হয়ে আসছে, তাকে গরম হাওয়ায় জর্জ্জরিত, বিভ্রান্ত, ক্ষণেকের জন্য দিক্‌ভ্রান্ত করে অকরুণ জীবটা নিস্তব্ধ দুপুরের খর রৌদ্রে ছুটছে অন্য নিরীহ শিকারের সন্ধানে। তীক্ষ্ণ সূর্য্যের তাপে মনে হচ্ছে পৃথিবীর বুঝি ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে, সহ্যের শেষ সীমায় এসে সে যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে, এইবার গর্জ্জনে ফেটে পড়বে, চূর্ণ বিচূর্ণ করে নিজেকে লুপ্ত ক'রে দেবে! আকাশের মুখ উত্তাপে বিবশ। স্থূল নভস্তলের এই শান্তিশূন্য মূর্ত্তি দেখে রুদ্র সন্ন্যাসী যেন অসংলগ্ন বাতাসে অট্টহাসি হাসছে।

হে সন্ন্যাসী, তোমার এ ভয়ঙ্কর রূপ যে আমাদের সহ্যাতীত। হে ভৈরব, তোমার এ তাণ্ডব মূর্ত্তি সংবরণ করো; এ ভীম রূপ রূপান্তরিত করে স্নিগ্ধ শ্যাম মূর্ত্তিতে দেখা দাও, তুমি শান্ত হও।

"হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ।"

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪] শ্রীকল্পনা মুখোপাধ্যায়

৮। নববর্ষ

ভাই বোন,

দেখতে দেখতে বসন্তরাণীর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি বছরও কেটে গেল। কারও কোন কথা তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করল না, সে চলে যাবেই, সে গ্রাহ্য করল না। লোকের দুঃখ, সে শুনল না যে কত লোক তাকে ডেকে বলছে—"ওগো যেও না, আমার অনেক কাজ যে আজও অসম্পূর্ণ রয়েছে।" ওঃ কি নিষ্ঠুর সে; পাষাণের চেয়েও কঠিন তার প্রাণ। কবিও তাই বলেছেন:—

'Time and tide wait for none'

এসেছে বৈশাখ নতুন বছরের পদ চিহ্ন এঁকে। আমরা মনে মনে কত আকাশ-কুসুম রচনা করেছি। কত কি নতুন সঙ্কল্প করছি, কত আনন্দের দিনের আশার স্বপ্ন দেখছি। ভাবছি, যেমন নূতন বছরের সঙ্গে আমাদের এক বছর বেড়ে গেল, তেমনি সকল দিক দিয়েই বেড়ে উঠতে চেষ্টা করব। ব্যস্ত মৌমাছিরা যেমন কত খেটে চেষ্টা করে তাদের মৌচাক সুন্দর করে গড়ে তুলতে, তেমনি আমরাও প্রাণপণে চেষ্টা করব সকল দিক দিয়ে আমাদের মৌচাককে বড় করে তুলতে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে মৌচাকের কল্যাণ কামনা করি। ভাই বোনেরা নববর্ষের শুভেচ্ছা মৌচাকের উজ্জল পাতায় ভাগ করে নিও, আজ এখন শেষ করি।

[বৈশাখ, ১৩৪৬] কুমারী নীলিমা চক্রবর্ত্তী

৯। একটি জীবন

গারো পাহাড়ে নাম-না-জানা এক গাছে হয়েছিল আমার জন্ম। আমাদের ছোট গৃহে আমি থাকতুম সুখে। কুলকুল রবে ঝরণারা শোনাত গান; সর্ সর্ শব্দে বাতাস দিয়ে যেত কাঁপন জাগিয়ে গাছের শাখায় শাখায়—পাতায় পাতায়। বুনো হাতীর দল গা ঘেঁষে যেত আমাদে[র] আশ্রয়দাতা তরুর। পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যেত দি[নের] আলোক-রশ্মি, রাতে কয়েকটি তারা।

আমাদের কণ্ঠে ফুটলো ভাষা, কোমল পাখা দিয়ে উড়ে বেড়াবার দুরাকাঙ্ক্ষা জাগলো মনে। আমি ছিলাম স[ব] চেয়ে দুঃসাহসী। একলা একদিন সুযোগ পেয়ে উড়তে গিয়ে গেলাম পড়ে। কঠিন আঘাতে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে-ছিলাম। মানুষের করস্পর্শে জ্ঞান ফিরে এলো। পাহাড়ে[র] ছেলে, একজন গারো আমাকে নিয়ে চলেছে।

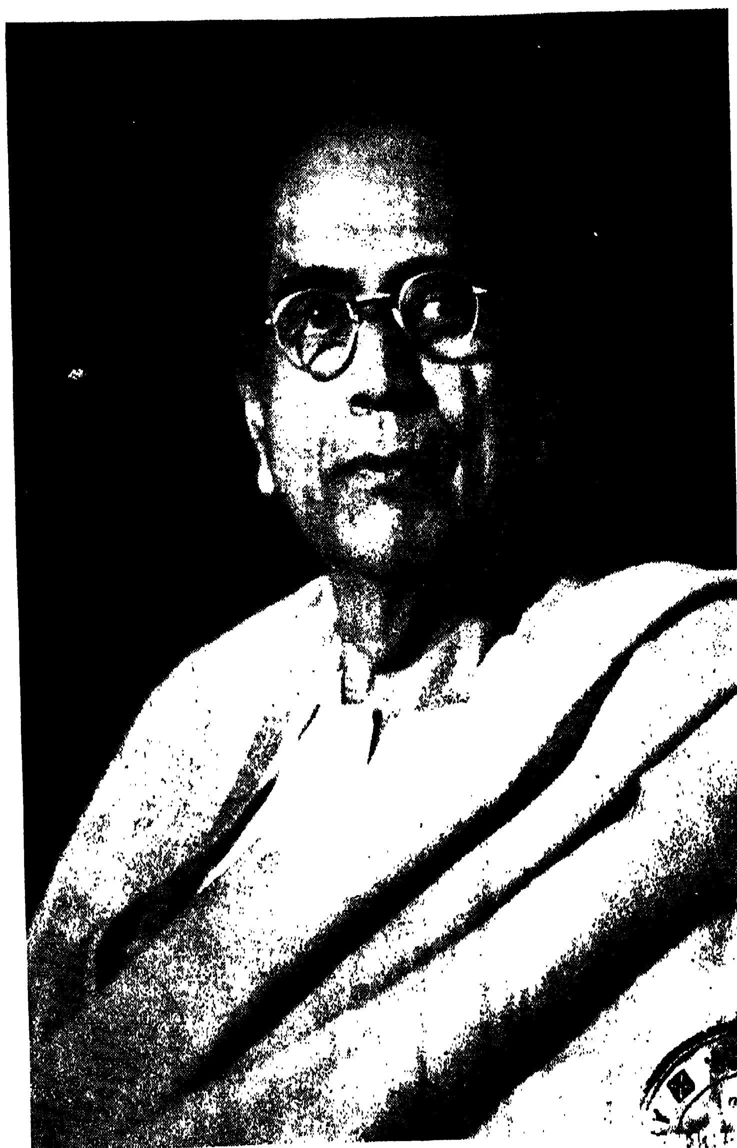
যে আমাদের আশ্রয় দিলে সে এক ডাক বাংলোর চৌকিদার। একটা বাঁশের খাঁচা হলো আমার কারাগার। কোথায় মুক্ত আকাশ বাতাস! কোথায় আমার বিহঙ্গ মা বাবা! তাদের বুকে কি আমায় হারিয়ে আমারই মত ব্যথা-উৎস উথলে উঠছে? আহার মুখে নিয়ে তাদের চোখ কি জলে ভরে ওঠে? দিন যায়……।

মাঝে মাঝে মুক্তি পাই, কিন্তু কোথায় যাব? মা-বাবার কাছে? পথ চিনি না যে! তাই সন্ধ্যায় নিজের খাঁচাতেই ফিরে আসি।

গারো চৌকিদার এক বাঙ্গালী পরিবারের হাতে আমায় সঁপে দিয়েছে। তাদের সঙ্গে এসেছি নগরে। নগরটি অতি ছোট। এখানে আমার বন্দীদশা আরো ঘুচেছে সারাদিন উড়ে বেড়িয়ে সন্ধ্যায় ফিরি খাঁচায়—সেটা আর আমার কারাগার নয়, রাত্রির আশ্রয়।

সেদিন আমার ফিরতে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল আমার মানুষ বন্ধুরা আমায় খুঁজে না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে। আমি গৃহেই আশ্রয় নিলাম। রাতটা গেলে সকালে আত্মপ্রকাশ কোরবো।……মধ্যরাত্রে হঠাৎ পৃথিবী কেঁপে উঠলো দুরু দুরু—দুল্‌তে লাগলো ঘর বাড়ী—আমি ভয়ে চীৎকার করলাম, কিন্তু কোথায় মিলিয়ে গেল আমার ক্ষুদ্রকণ্ঠের আর্ত্তস্বর! কম্পন ক্রমে দোলায় বাড়লো। ভাঙতে লাগলো ঘরবাড়ী। একটা দেয়াল ভেঙ্গে পোড়লো আমার ওপরে। চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চুণ বালিতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। বুকের হাড়গুলি বুঝি চূর্ণ হয়ে গিয়েছে—রক্তে ভিজে উঠলো নরম পালকগুলো। রূপরসে ভরা পৃথিবী বিদায়! বিদায় আমার মানুষ বন্ধুরা! আমার দেহ যখন তোমরা দেখ্‌তে পাবে তখন আমি কোথায়!

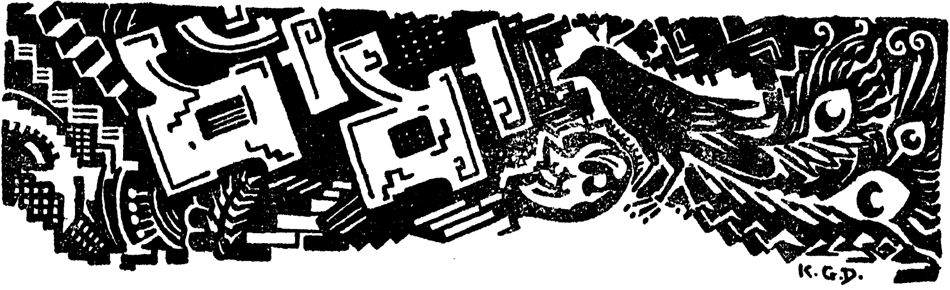
[চৈত্র, ১৩৪৭] কুমারী সবিতা দে



শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পী—শ্রীশম্ভু সাহা।





১। তিনটি হরফে নাম, শক্ত জবাব
চিনতো তাদের শুধু বাদশা নবাব।
গোড়ার হরফটাকে দাও যদি ছুটি—
হোতে পারে তাতে বেশ লুচি আর রুটি।

উঃ—বেগম (বৈশাখ, ১৩২৭)—নরেন্দ্র দেব

২। পাখী নয়, উড়ে যায়,
মুখ নাই, ডাকে।
বুক ফেটে আলো ছোটে
কান ফাটে হাঁকে।

উঃ—মেঘ (আষাঢ়, ১৩২৭)

৩। দেখতে তাকে পৃথিবীর মত। সে আমাদের সাম্‌নেই আছে—অথচ তাকে ধরা ছোঁয়া যায় না। তাকে দেখাও যায়—দেখাও যায় না। তাকে একলা পেলে আমরা তুচ্ছ করি—কিন্তু আর কারুর সঙ্গে থাকলে তাকে আর ঠেলে রাখা যায় না। কে সে?—হেমেন্দ্রকুমার রায়

উঃ—শূন্য = ০ (শ্রাবণ, ১৩২৭)

৪। খেলেই মরণ—অথচ বাজারে তাকে কিনতে পাওয়া যায় না। কি তার নাম?—হেমেন্দ্রকুমার রায়

উঃ—খাবি (শ্রাবণ, ১৩২৭)

৫। আমরা একসঙ্গে অন্ধকারে বন্ধ হয়ে থাকি। কেন? কারণ একবার বাইরে এলেই সর্ব্বনাশ,—আমাদের মাথা খুঁড়ে মুখ পুড়িয়ে মরতে হয়, ঘরের ভিতরে আর আমরা ফিরতে পাই না। আমাদের নাম কি?— হেমেন্দ্রকুমার রায়

উঃ—দেশলায়ের কাঠি (শ্রাবণ, ১৩২৭)

৬। লতা নয়, পাতা নয়, লতিয়ে লতিয়ে যায়।
সর্ব্বাঙ্গ থাকিতে শুধু চক্ষু দুটী খায়॥

উঃ—ধোঁয়া শ্রীলোকনাথ সাহা (কার্ত্তিক, ১৩২৭)

৭। দুই অক্ষরে এমন একটি শব্দের নাম কর, যা নদীতে দেখা যায়—আর যার প্রথম অক্ষর দ্বিতীয় অক্ষরকে খুব ভালবাসে। —শ্রীস্নেহলতা গুপ্ত

উঃ—মাঝি (কার্ত্তিক, ১৩২৭)

৮। কোন পাতার গাছ নাই? (পৌষ, ১৩২৭)

উঃ—বইএর পাতা বা চোখের পাতা

৯। তার আপনার দেখবার শক্তি নাই—কিন্তু অপরকে দেখিয়ে দেয়—বল ত, সে কে?

উঃ—চশমা শ্রীঅনিলকুমার চন্দ (পৌষ ১৩২৭)

১০। আমার শরীর সব সময়ে কাপড়ে ঢাকা—আমার কাপড় খুলতে চেষ্টা করলে তোমাদের চোখে জল এসে পড়বে—তারপর অনেক কষ্টে কাপড়গুলো খুলে নিলে দেখবে যে আমার আর কিছুই নেই—বলত আমি কে?

উঃ পেঁয়াজ। (পৌষ, ১৩২৭)

১১। আমি যে শুধু শুয়েই থাকি তা নয়! আমি দাঁড়াতেও পারি যখন আমার মাথা ঘোরে—বলত আমি কে? শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বরাট (ফাল্গুন, ১৩২৭)

উঃ—লাট্টু

১২। রামবাবু শীকার করতে গেছলেন—শীকার করলেন শুধু হরিণ আর হাঁস। সেগুলো নিয়ে ফিরছেন, আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কি মশাই, কতগুলো মারলেন, রামবাবু বল্লেন ৪০টা মাথা আর ৯৬টা পা আছে। বলত, কটা হরিণ আর কটা হাঁস রামবাবু শীকার করেছেন।

উঃ—রামবাবু ৮টা হরিণ ও ৩২টা হাঁস শীকার করেছিলেন (ফাল্গুন, ১৩২৭)

১৩। লম্বা চেহারা হাড় কালো,
হাড়ে কাজ পাবে কেটে ফেলো।
ভাঙ্গে যদি হাড় ফের কাটো,
দেখে ত কত বুদ্ধি আঁটো।— (শ্রাবণ, ১৩২৮)

উঃ—উড্ পেন্সিল

১৪। দেহ নাই কিন্তু রং কালো।
পা নাই তবু চলি ভালো॥
মুখ নাই তবু মোর ডাকে।
ছেলেমেয়ে সব ভয়ে কাঁপে॥—(ভাদ্র, ১৩২৮)

উঃ—মেঘ

১৫। আমি যে হেঁয়ালি নিজে—নাই হাত-পা,
চলি তবু দিন-রাত শ্রান্ত হই না।
মুখ মোর ঢের বড় মাথাটার চেয়ে,
গলা নেই, কবি বলে, চলি গান গেয়ে!
ফেঁপে উঠি,—ফুলে উঠি, সদাই চঞ্চল,
এক তিল থির নই,—ধরি খুব বল।
ভাগ্যে আমি আছি, তাই, খেয়ে-দেয়ে বাঁচো,
হেথা-হোথা ঘোরো-ফেরো। কে আমি, তা আঁচো!—সৌম্যেন্দ্র (কার্ত্তিক, ১৩২৮)

উঃ—নদী

১৬ খোলোসের ভিতর সাদা সাপ।
ফণায় বিষ নেই, ল্যাজের দাপ॥
—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (মাঘ, ১৩২৮)

উঃ—তলোয়ার

১৭। ভাঙা ঘরে ভূতের নৃত্য।
চোখের উপর ঘটছে নিত্য॥
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (মাঘ, ১৩২৮)

উঃ—খৈ ভাজা

১৮। সাদা ক্ষেতের কোণে কোণে।
কালো কলাই কেবল বোনে॥
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। (মাঘ, ১৩২৮)

উঃ—লিখন

১৯। রসে টস্ টস্ পাকা ফল।
পাড়্‌তে কারো নাইক বল॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

উঃ—নক্ষত্র (মাঘ, ১৩২৮)

২০। নড়ন-চড়ন নাইক মোটে ছোটে মাঠের পার।
আকাশ থেকে খবর আনে অন্ত পাওয়া ভার॥

উঃ—চোখ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (মাঘ, ১৩২৮)

২১। মাটীর ভাঁড়ে সাতটা ফুটা।
জল পড়েনা একটি ফোঁটা॥— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

উঃ—মানুষের মুণ্ড (মাঘ, ১৩২৮)

২২। এক পিঁড়িতে দুটি ভাই।
তবু ছোঁয়া ছুঁয়ি নাই॥—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

উঃ—গরুর সিং (মাঘ, ১৩২৮)

২৩। মাঝ-পুকুরে লম্বা খোঁটা।
খোঁটার উপর গুদাম গোটা॥
গুদাম-ভরা নানান্ মাল।
লাগ্‌ল আগুন! হায় কপাল॥
পুকুর-ভরা রইল জল।
মাল গেল সব রসাতল॥—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

উঃ—তামাক খাওয়া (মাঘ, ১৩২৮)

২৪। এমন কি জীব আছে, যার মাথা তো নেইই—তাছাড়া মুখও নেই, পেটও নেই—অথচ ক্ষিদে আছে বিষম; তার পা'ও নেই—অথচ সব জায়গাতেই যেতে পারে,—আবার ডানা নেই—অথচ শূন্যে থাকতে পারে, সাঁতার জানেনা—কিন্তু ডুবেও মরে না।
হেমেন্দ্রকুমার রায় (ফাল্গুন, ১৩২৮)

উঃ—বীজাণু

২৫। আমার মাথা ঘুরিয়ে লোকে ফেলে দেয়,—যাবার সময় আমি আমার লেজ ফেলে যাই—দরকার হলে তোমরা আমার লেজ ধরে টান—আমি কোন জন্তু নই—বলত আমি কে? হেমেন্দ্রকুমার রায় (ফাল্গুন, ১৩২৮)

উঃ—মাছ ধরা জাল

২৬। তিন অক্ষরে নাম সবে ভালবাসে তায়।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দেখ কত রস হায়॥
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে হই অবতার।
বল দেখি ভাই সবে কি নাম আমার॥
কুমারী অশোকা দত্ত (কার্ত্তিক, ১৩২৯

উঃ—আরাম

২৭। রক্ত মাসে গড়া দেহ নাহি হেলে দুলে
ঝুটার বদলে মোরে দেখায় সকলে।
সমশ্রেণী মাঝে মোর মাথা সর্ব্ব নীচে
বয়সেতে বড় কিন্তু গোনা হয় পিছে॥
গোপালকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (কার্ত্তিক, ১৩২৯)

উঃ—বুড়ো আঙুল

২৮। অর্দ্ধেক জলেতে মোর অর্দ্ধেক তরঙ্গে
নাচিয়া নাচিয়া উঠে বাতাসের সঙ্গে
মিষ্ট বাক্যে সকলের তুষ্ট করি মন
বল দেখি শিশু তুমি, আমি কোন জন।

উঃ—জলতরঙ্গ (পৌষ, ১৩২৯)

২৯। এমন কি আছে যার শরীর অপেক্ষা মুখ বড়।

উঃ। নদী বা গ্রামোফোনের ফানেল (পৌষ, ১৩২৯)

৩০। দাঁত আছে নাহি খাই, এমনি বরাত
নহিক মুখোস আমি, নহিক করাত
ঘরে ঘরে সদা থাকি, ত্রিবর্ণে গঠিত,
মধ্যবাদে সবে মোরে বলে পরিচিত।

উঃ—চিরুণী শ্রীগিরিজাকুমার বসু (মাঘ, ১৩২৯)

৩১। একটা সাদা ঘোঁড়া একটা কালো ঘোঁড়ার পিছনে ক্রমাগত ছুটছে, কিন্তু কেউ কাউকে ধরতে পারছে না। বলত এরা কে? (ফাল্গুন, ১৩২৯)

উঃ—দিন ও রাত্রি

৩২। সমুদ্রে জল নাই, সহরে বাড়ী নাই, পৃথিবীতে লোক নাই, এমন জায়গা কোথায়? (ফাল্গুন, ১৩২৯)

উঃ—মানচিত্র

৩৩। এমন কি কাজ যা করতে করতে ধরা পড়ে গেলে সাজা হবে কিন্তু কোনো ফাঁকে যদি কোরে ফেল্‌তে পারো তা হলে তোমায় কেউ কিছু করতে পারবে না।

উঃ—আত্মহত্যা (আষাঢ়, ১৩৩০)

৩৬। শেষ কাট্‌লে জলে নাচি,
মাঝ কাট্‌লে রোজই আছি,
মাথা কাট্‌লে তোমাদের ধাঁচই,
ঠিক রাখলে তোমাদের কাছাকাছি।

উঃ—বানর (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০)

৩৭। সিধে রাখ খুব বাধ্য, উলটাও রাখা অসাধ্য।

উঃ—বশ গিরিজাকুমার বসু (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০)

৩৮। চালে আছি বটে কুমড়ো নই
ফুল নই তবু গন্ধ বই
কাঁচায় পাড়ে, শুখোলে রস
আমায় পেলে দুনিয়া বশ! নরেন্দ্র দেব

উঃ—চা (মাঘ, ১৩৩০)

৩৭। চলিলে দাঁড়ায় সে দাঁড়াইলে পড়ে
আরো বলি শুন, তার প্রাণ নাইক ধড়ে।
শ্রীসুজাতা রায় (মাঘ, ১৩৩০)

উঃ—বাইসাইকেল বা লাট্টু

৩৮। যদি আড়াইটা পায়রা আড়াই দিনে আড়াইটা ডিম পাড়ে তা হোলে একটা পায়রা দশ দিনে কটা ডিম পাড়বে। জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (ফাল্গুন, ১৩৩০)

উঃ—৪টা ডিম পাড়বে।

৩৯। হাত আছে মাথা নাই পেট ঝল ঝল করে,
বাঘ নয় ভালুক নয় আস্ত মানুষ গেলে।
বলত সে কে ? সত্যেন্দ্রকুমার বসু (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১)

উঃ—জামা

৪০। জগন্নাথের ৯টি ছেলে; প্রত্যেকটি ছেলের একটি করে বোন আছে—বলতো জগন্নাথের ছেলে-মেয়ে কটি ? (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১)

উঃ—জগন্নাথের ৯টি ছেলে ও একটি মেয়ে

৪১। দু-পা ছিল চার-পায়েতে
এক পা ছিল কোলে
চার-পা এসে' এক-পা নিল।
দু পা ওঠে জ্বলে !
চার-পা তুলে দু পা বেগে
চার পায়েরে হানে
এক পা ফেরৎ পাবে বলে' ॥
বল, পা'গুলির কি মানে ?—(শ্রাবণ, ১৩৩১)

উঃ—দু' পা (মানুষ) চার পা (টুল) এক পা (পাঁঠার ঠ্যাং) চার পা (কুকুর)

৪২। দাঁড়াইয়া থাকিলে আমি অসার অচল
ধরিয়া তুলিলে আমি ফিরে পাই বল ॥
তখন যেখানে লয় সেখানই যাই
প্রাণ হীন দ্বিপদ আমি মুখে কথা নাই ॥
—সত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক (মাঘ, ১৩৩১)

উঃ—সাইকেল

৪৩। সে জিনিসটা কি যা তোমাদের নিজের হলেও তোমার বন্ধুরা বেশী ব্যবহার করে ? (চৈত্র, ১৩৩১)
উঃ—নাম

৪৪। এই ছোট যোগের অঙ্ক থেকে ছয়টা নম্বর বাদ দিতে হবে যাতে বাকি তিনটে নম্বরের যোগ ফল ২০ হয়

৭৭৭
৯৯৯
১১১

উঃ- ১
১৯

২০

(পৌষ, ১৩৩২)

৪৫। নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি সাজিয়ে জীবজন্তুর নাম কর :—

১। ন কটকবক ্য
২। া শ ক ক ল
৩। ত হ স ল ী (ভাদ্র, ১৩৩৩)

উ :—বন্যকুক্কুট, বৃকলাশ, জলহস্তী

৪৬ একটি রেকাবিতে বারোটি মিহিদানা আছে, বারোটি ছেলে এলো। প্রত্যেকে একটি করে মিহিদানা নিলে; রেকাবিতে একটি মিহিদানা রইলো। কি করে হোল বল তো ? বজ্রনাথ (ফাল্গুন, ১৩৩৩)

উ :—এগারো জন ছেলে একটি করে মিহিদানা নেবার পর রেকাবিতে একটি মিহিদানা বাকী রইলো তো ! শেষের ছেলেটি রেকাবি সমেত মিহিদানা নিলে।

৪৭। একটি কুয়ো। এক ব্যাঙ্ সেই কুয়োয় পড়েছিল। কুয়োটা ছিল ৩০ ফুট গভীর। বেচারা ব্যাঙ।—সে ওপরে উঠতে চায়—কুয়োর ব্যাঙ হবে না। চেষ্টা করে সারাদিন বেচারা ৩ ফুট ওঠে। আর রাত্রে পিছলে ২ ফুট নেমে যায়। বল তো, ওপরে উঠতে তার কতদিন লেগেছিল ?—বজ্রনাথ (ফাল্গুন, ১৩৩৩)

উ :—প্রথম দিনে ব্যাঙ তিন ফুট উঠলো। রাত্রে দু ফুট পিছলে নামলো ; দ্বিতীয় দিনে চার ফুট উঠলো আবার রাত্রে দু ফুট নামলো ; ২৭ দিনে ব্যাঙ ২৯ ফুট উঠলো, রাত্রে দু ফুট নামলো। তারপর ২৮ দিনের দিন ২৭ ফুট থেকে ৩ ফুট উঠে ৩০ ফুটে বাজী শেষ—এবং একেবারে ডগায় ওঠার দরুণ তাকে রাত্রি অবধি অপেক্ষা করতে হোলো না, পিছলেও পড়লো না। কাজেই ৩০ ফুট ওপরে উঠতে তার ২৮ দিন লেগেছিল।

৪৮। হাতে আছে হাতে নাই
হাত বাড়ালে পেতে নাই। (ভাদ্র, ১৩৩৪)

উ :—হাতের কনুই

৪৯। একটু সামান্য বাতাসে আমি কেঁপে উঠি কিন্তু আমিই আবার সব চেয়ে ভারী জিনিস বইতে পারি। আমি কে ? (মাঘ, ১৩৩৪)

উ :—সমুদ্র

৫০। পথে যেতে যেতে একটি ভদ্রলোক একটা পাখী দেখে, সেই পাখীর নামটা চিৎকার করে বলে উঠলেন। সাম্নে কয়েকটি সাহেব-মেম যাচ্ছিলেন। তাঁরা সেই নাম শুনেই বেজায় চমকে তখনি পেছনে তাকালেন। কেন বল তো ? (ফাল্গুন ১৩৩৪)

উ :—বুল বুল (Bull ! Bull)

৫১। কোন ফুল আর পাখীর নাম এক ? (ভাদ্র, ১৩৩৫)
উঃ —বক

৫২। কোন ফল আর ফুলের নাম এক ? (ভাদ্র, ১৩৩৫)
উঃ —বেল

৫৩। কোন খাবার আর খবরের নাম এক ? (ভাদ্র, ১৩৩৫)
উঃ—সন্দেশ

৫৪। কোন গাড়ী আর তালের নাম এক ? (ভাদ্র, ১৩৩৫)
উঃ—মটর

৫৫। কোন সহর আর গহনার নাম এক ? (ভাদ্র, ১৩৩৫)
উঃ—ব্রোচ

৫৬। কোন নদী ও ওজনের নাম এক ? (ভাদ্র, ১৩৩৫)
উঃ—পো

৫৭ কোন সহর আর ডালের নাম এক ? ..
উঃ মসুরী (ভাদ্র, ১৩৩৫)

৫৮। কোন হ্রদ আর বেলার নাম এক (ভাদ্র, ১৩৩৫)
উঃ। বৈকাল

৫৯। নীচের লেখাটিতে কয়েকটি পশুপক্ষীর নাম লুকান আছে। বের করতে পার কি ?—

রামসিং, হরি, নবীন এই তিন জনেই ব্যবসা করছিল ; কবে জীবনবাবু যোগ দিলেন কেউ টের পায় নি। তিনি সহায় না থাকলে আজ ব্যাঙ্কে বা ঘরে এক পয়সাও থাকত না। ব্যাবসার বাড়ীটি নিতান্ত ছোট, চারিদিকে পাঁচিলও নাই, বাঁশের বেড়া লতা পাতা দিয়ে ঘেরা ; সামনে কড়েয়া বাজার। এঁদের তৈরী খোস পাঁচড়া ইত্যাদির ওষুধ ভাল। পাকা কুলা, ধনে, উলট কম্বল, লবণ, রসুন, সোহাগা ইত্যাদি মিশিয়ে তৈরী করেছেন। (আশ্বিন, ১৩৩৫)

উঃ। সিংহ, হরিণ, বেজী, কেউটে, হায়না, বাঘ, চিল, বেড়াল, নেকড়ে, চড়াই, কাক, নেউল, বানর, গাই।

৬০। নীচের লেখার মধ্যে কয়েকটি ফুলের নাম (দেশী ও বিলাতী) লুকান আছে। বের করতে পার কি ?

বৃদ্ধ বয়সে মুকুন্দবাবুর বালক রবীন্দ্রের সঙ্গে এখান হইতে লালগোলা পর্য্যন্ত যাওয়া তাঁহার বয়স হিসাবে লম্বা পাড়ি বলা চলে। এই বিকট গরমের সময় কেন সেখানে গেলেন জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলেন, "অনেক মাল তীর্থে যাইবার সময় চালান আসে। আমি তাহার রসিদ খালি লিখিয়াছিলাম ; ম্যানেজার বকলমে আমার নাম রসিদে সহি করিয়া মাল খালাস করিয়া লইয়া লালগোলায় খরিদ্দারের নিকট টাকা আদায় করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। টাকাও কিছু কম লহে নাই—প্রায় ১০,০০০।
(আষাঢ়, ১৩৩৬)

উঃ—কুন্দ, কবরী, গোলাপ, বেল, টগর, জবা, মালতী, লিলি, বক, কমল

৬১। কোন্ বাজনার মাঝখানে খোয়া আছে ?
উঃ—পাখোয়াজ (বৈশাখ, ১৩৩৭)

৬২। কোন্ বাজ্না কোলকাতার কাছেই ?
উঃ—বেহালা (বৈশাখ ১৩৩৭)

৬৩। কোন্ বাজ্না দিয়ে বাসন মাজা হয় ?
উঃ—খোল (বৈশাখ ১৩৩৭)

৬৪। কোন্ বাজনা নৃপতিকে আহ্বান করছে ?
উঃ—এসরাজ (বৈশাখ, ১৩৩৭)

৬৫। কোন্ সহরের ভেতরে হাল্কা জিনিষ পোরা আছে ? (বৈশাখ, ১৩৩৭)
উঃ—শোলাপুর

৬৬। কোন্ দ্বীপ শস্য ? (বৈশাখ, ১৩৩৭)
উঃ—যবদ্বীপ

৬৭। কোন্ দ্বীপ ঝাল ? (বৈশাখ, ১৩৩৭)
উঃ—লঙ্কা

৬৮। কোন্ সহরের গলার অসুখ ? (বৈশাখ, ১৩৩৭)
উঃ—কাশী

৬৯। কোন্ সহর একের চেয়ে কিছু কম ?
উঃ—নাসিক (বৈশাখ, ১৩৩৭)

৭০। কোন্ জায়গা বল্ছে সে স্নান করে নি ?
উঃ—নাইনি (বৈশাখ, ১৩৩৭)

৭১। কোন্ জায়গা ভুলে যায় ? (বৈশাখ, ১৩৩৭)
উঃ—ভোলা

৭২। কোন্ জায়গা সাদা ? (বৈশাখ, ১৩৩৭)
উঃ—ধলা

৭৩। কোন্ জায়গা পাওয়া যাবে না ?
উঃ—পাবনা (বৈশাখ, ১৩৩৭)

৭৪। চারটি মেয়ে আর তাদের চার জনের চারটি ভাইয়ের মধ্যে ৩২টা আম ভাগাভাগি ক'রে নিল। ভাগাভাগি এই ভাবে হ'লো ; লীলা—১টা আম, শীলা—২টা আম, বীণা—৩টা আম, সীতা—৪টা আম। অমল বোস পেল তা'র বোনের সমান সংখ্যা আম, বিনয় ঘোষ পেল তা'র বোনের দ্বিগুণ, অনিল রায় পেল তা'র বোনের তিন গুণ, অজিত সেন পেল তার বোনের চার গুণ। এই হিসাব থেকে বলতে পার কি, ছেলেরা কে কটা আম পেলে, আর মেয়েদের কার কি পদবী ? (ভাদ্র, ১৩৩৭)

উঃ—মেয়েদের নাম—লীলা রায়, শীলা সেন, বীণা বোস, সীতা ঘোষ।

ছেলেরা আম পেল—অমল—৩টা ; বিনয়—৮টা, অনিল—৩টা, অজিত—৮টা।

৭৫। একটি সংখ্যা ৮ বার ব্যবহার করে ১০০০ কর। (পৌষ, ১৩৩৭)

উঃ—

```
888
 88
  8
  8
  8
----
1000
```

৮৮৮ + ৮৮ + ৮ + ৮ + ৮ = ১০০০

৭৬। একটা রেল লাইনের উপরে ২৫টা ষ্টেসন আছে। প্রত্যেক ষ্টেসন থেকে প্রত্যেক অন্য ষ্টেসনে যেতে হলে সবসুদ্ধ কতগুলো বিভিন্ন টিকিট কিনতে হবে বলতো ?
উঃ—৬০০ টিকিট (মাঘ, ১৩৩৭)

৭৭। পাঁচটা বেড়াল পাঁচ মিনিটে যদি পাঁচটা ইঁদুর

ধরে, তবে ১০০ মিনিটে ১০০টা ইঁদুর ধরতে কতগুলো বেড়াল লাগবে। (মাঘ, ১৩৩৭)

উঃ—সেই পাঁচটা বেড়ালই পারবে

৭৮। একটা ঘড়ির ৭টা বাজতে যদি ৭ মিনিট লাগে, তবে ১০টা বাজতে কত সময় লাগবে। (মাঘ, ১৩৩৭)

উঃ—১০½ সেকেণ্ড

৭৯। চার অক্ষরে আমি তৈরী। সোজা অবস্থায় আমি একটি অলঙ্কার। আমাকে ওল্টালে আধখানাতে হয় একটা বিষাক্ত জীব আর বাকী আধখানাতে বোঝায় খুব ছোট অংশ। (আষাঢ়, ১৩৩৮) উঃ—নাকছাবি।

৮০। ৪৫ থেকে ৪৫ বাদ দিলে কেমন করে ৪৫ থাকে দেখাও ? (কার্ত্তিক, ১৩৩৮)

উঃ— ৯৮৭৬৫৪৩২১···যোগ করলে ৪৫
১২৩৪৫৬৭৮৯ ··যোগ করলে ৪৫
৮৬৪১৯৭৫৩২··· যোগ করলে ৪৫

৮১। এমন একটা জিনিষের নাম কর যে তার বাড়ী সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ? (পৌষ, ১৩৩৮)

উঃ—শামুক

৮২। হাত আছে তবু চুরি করে না। (ফাল্গুন ১৩৩৮)

উঃ—ঘড়ি

৮৩। পা আছে কিন্তু হাঁটে না (ফাল্গুন, ১৩৩৮)

উঃ—টেবিল

৮৪। দাঁত আছে কিন্তু চিবোয় না (ফাল্গুন, ১৩৩৮)

উঃ—চিরুনি

৮৫। চোখ আছে কিন্তু দেখতে পায় না

উঃ—সূঁচ (ফাল্গুন, ১৩৩৮)

৮৬। হাত আছে কিন্তু খাটে না (ফাল্গুন, ১৩৩৮)

উঃ—চেয়ার

৮৭। মুখ আছে কিন্তু চোখ নাই, কান নাই, নাক নাই (ফাল্গুন, ১৩৩৮)

উঃ—ঘড়ি

৮৮। পাখা আছে কিন্তু পাখী কিম্বা পোকামাকড় নয়

উঃ—এরোপ্লেন (ফাল্গুন, ১৩৩৮)

৮৯। উড়ে যায় কিন্তু পাখা নাই (ফাল্গুন, ১৩৩৮)

উঃ—সময়

৯০। জলের উপরে, জলের নীচে তবুও জল ছোঁয় না, কে সে ? (বৈশাখ, ১৩৩৯)

উঃ—একটি মেয়ে মাথার উপর এক কলসী জল নিয়ে ব্রীজের উপর দিয়ে চলেছে

৯১। তুলোর মত হাল্কা কিন্তু হাত দিয়ে ধরা যায় না, কি জিনিষ ? (বৈশাখ, ১৩৩৯)

উঃ—ধোঁয়া

৯২। একটা খরগোস ও একটা কচ্ছপে দৌড় আরম্ভ হয়েছে। কচ্ছপ গন্তব্য স্থানের ¾ পথ এগিয়ে যাওয়ার পর খরগোস দৌড়তে আরম্ভ করলে। কচ্ছপ যখন এক গজ যায়, তখন খরগোস যায় চার গজ। দৌড়ে কে জিতেছিল বল ? (ভাদ্র, ১৩৩৯)

উঃ—খরগোস আর কচ্ছপ একসঙ্গে গন্তব্য স্থানে পৌছেছিল

৯৩। কোন্ জন্তু চারটির ? (মাঘ, ১৩৩৯)

উঃ—গণ্ডার

৯৪। কোন জন্তু বলে, সে গান গায়। (মাঘ, ১৩৩৯)

উঃ—গাই

৯৫। কোন্ জন্তুর তুটি সুর ? (মাঘ, ১৩৩৯)

উঃ—গাধা

৯৬। কোন্ পাখীকে পাক দিতে বল্‌ছে।

উঃ—পেঁচা (মাঘ, ১৩৩৯)

৯৭। কোন্ পাখীর আর দেশের এক নাম।

উঃ—পেরু, টার্কি (মাঘ, ১৩৩৯)

৯৮। কোন্ ফল বোম্বাই অঞ্চলের এক রাজা।

উঃ—জাম (মাঘ, ১৩৩৯)

৯৯। কোন মাছ উল্টালে পাখী হয়। (মাঘ, ১৩৩৯)

উঃ—খলিশা

১০০। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, আমার গাড়ীর নম্বর কত ? ছেলে বাবাকে জব্দ করবার জন্য বললে প্রথম ও শেষ সংখ্যা একই—এই দুই সংখ্যাকে গুণ করলে মধ্যের দুই সংখ্যাকে পাওয়া যায়। আবার মধ্যের এই দুই সংখ্যার যোগফল প্রথম ও শেষ সংখ্যা ধরিয়ে দেয়। বলত গাড়ীর নম্বর কত ? (মাঘ, ১৩৩৯)

উঃ—৯৮১৯

১০১। বাতাসে আমার বাড়ী—তুমি আমাকে ধরতে পারলেও স্পর্শ করতে পারবে না—আমি কে ? (পৌষ, ১৩৪১)

উঃ—রেডিও-স্বর

১০২। এমন একটা সংখ্যা আছে যাকে ২, ৩, ৪, ৫ কিম্বা ৬ দিয়ে ভাগ কোরলে অবশিষ্ট থাকবে মাত্র এক ; কিম্বা ৭ দিয়ে ভাগ কোরলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই সংখ্যাটী কি ? (পৌষ, ১৩৪১)

উঃ—৩০১

১০৩। United States of America—এই ইংরেজী কথার মধ্যে কতগুলো অন্য দেশ আছে বের করতো ? (ভাদ্র, ১৩৪২)

উঃ—Ecuador, Armenia, Austria, Sumatra, Canada, Russia, Rumania, France, India, Siam, Tasmania, Sudan.

১০৪। আমার চেয়ে আর কেউ পৃথিবীতে জিনিষ ভাল ভাবে লুকিয়ে রাখতে পারে না। কোন কিছু নিরাপদে রাখতে হলেই আমার হাতে দিতে হয়। যদিও সে সব জিনিষ আমার নিজের কাছে না রেখে দূরে রেখে দেই। নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করার ক্ষমতা আমার নাই—অন্যের আদেশেই আমাকে চলতে হয়। আমি কে ? (পৌষ, ১৩৪২)

উঃ—চাবি

১০৫। সব রকম আকার ও চেহারা আমার আছে,

কিন্তু আমার রক্ত মাংসের শরীর নাই। ভয় পেও না, আমি ভূত নই। আমার জন্ম মৃত্যু নাই। বলত আমি কে? (মাঘ, ১৩৪২)

উঃ—ছায়া

১০৬। দুধের মত সাদা মার্বেলের দেওয়াল, তার নীচে সিল্কের মত নরম জিনিষের আবরণ। তার ভিতরে সোনার মত স্বচ্ছ বল। দরজা নাই, প্রাচীর নাই, তবুও মানুষ এইটি ভেঙ্গে সোনা নেয়। (মাঘ, ১৩৪২)

উঃ—ডিম

১০৭। আটটী ভদ্রলোক এলেন হাওড়া ষ্টেশনে—যাবেন সকলে নানা দেশে। আট জনই কথা কন হেঁয়ালীর ভাষায়। টিকিট কিনতে এলেন। টিকিটবাবু বললেন—কোথাকার টিকিট চাই? আট ভদ্রলোক হেঁয়ালীর ভাষায় আট জায়গার নাম করলেন। প্রথম ব্যক্তি বললেন,—আমি যাবো ৬০০ কাঠা। দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন,—আমি কোদাল দিয়ে মাটী কাটি। তৃতীয় ব্যক্তি,—ইংরেজদের বাজারে। চতুর্থ ব্যক্তি—গোড়ার স্বর। পঞ্চম—গোপীর জঙ্গল। ষষ্ঠ—অনেক বর্ম্মীজ্। সপ্তম—লাট্টুর ডগা ঢাকা। অষ্টম—হাতীর হাঁড়ি। (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭)

উঃ—দ্বিতীয় ভদ্রলোককে টিকিট দেওয়া হলো, কোপাই; তৃতীয়—সাহেবগঞ্জ; চতুর্থ—মুলতান; পঞ্চম,—বৃন্দাবন; ষষ্ঠ—মগরা; সপ্তম—আল্মোড়া; অষ্টম—গজ্হণ্ডী।

১০৮। সে জিনিষটা কি যার মাংসও নাই, হাড়ও নাই অথচ তার ৫টা আঙ্গুল আছে? (ফাল্গুন, ১৩৪৪)

উঃ—দস্তানা

১০৯। কোন জিনিষ নিজেকে পুড়িয়ে অপরকে গুপ্ত রাখে? (বৈশাখ, ১৩৪৫)

উঃ—গালা—খামের ভিতর চিঠিকে গুপ্ত রাখে

১১০। কোন জিনিষ কলকাতা থেকে বম্বে চলে যায় কিন্তু একবারও নড়ে না। (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫)

উঃ—রেল লাইন

১১১। জলে যদি রাজি থাকো,
পরে দিয়ো তা।
কি ফুলের নাম এটি—
বলো দিকি গা। (ভাদ্র, ১৩৪৫)

উঃ—অপরাজিতা

১১২। শ্রীরামের একপুত্র
এলো বঙ্গদেশে—
বঙ্গের ব কাটি দিয়া
চর্ব্বি খাই শেষে। (ভাদ্র, ১৩৪৫)

উঃ—লবঙ্গ

১১৩। কোন জিনিষ সব সময়ে মাথা নীচু করে চলে? (পৌষ, ১৩৪৫)

উঃ—জুতোর কাঁটা।

১১৪। তিন অক্ষরে নাম মোর আকার কিছু নাই
আমি যদি জোরে আসি বিরক্ত সবাই।
ধীর যদি আমি তবে শান্তি পায় নর
একেবারে না আসিলে সবে মরো মরো
কায়াহীন কোন বস্তু বলহ সত্বর।

উঃ—বাতাস (ফাল্গুন, ১৩৪৫)

১১৫। আমি যখন এলাম, তুমি তখন এলে না।
যখন তুমি এলে সর্ব্বস্ব খেলে
এখন আমার বৃদ্ধকাল দেখে তুমি চলে গেলে
—কুমারী বাণী রায় (আষাঢ়, ১৩৪৬)

উঃ—দাঁত

১১৬। একটা লোকের ১৩ সের ওজনের ওজন ছিল। হঠাৎ পড়ে গিয়ে ওজনটা ভেঙ্গে তিন টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু ভাঙ্গলেও ওজন ঠিক থাকল। এই তিন টুকরো ভাঙা ওজন নিয়ে সে দেখলে, যে ১ থেকে ১৩ সের যে কোন সেরের ওজন অনায়াসে করতে পারে। বলতো, প্রত্যেক টুকরো ওজনের ওজন কত ছিল। (আশ্বিন, ১৩৪৬)

উঃ—১ সের, ৩ সের, ৯ সের

১১৭। একজন মিস্ত্রী একটা ঘরের দেওয়ালগুলো তিন দিনে রং করেছিলো। এইভাবে কাজ ক'রে এর চেয়ে লম্বায় দ্বিগুণ, চওড়ায় দ্বিগুণ, উঁচুতে দ্বিগুণ ঘর রং করতে কতদিন লাগবে। (বৈশাখ, ১৩৪৭)

উঃ—দুদিন লাগবে

১১৮। একজন লোক পয়সার অভাবে ফেলে দেওয়া সিগারেটের শেষ টুক্‌রো (Cigarette ends) দিয়ে একটা পুরো সিগারেট তৈরী করে খায়। এই রকম সাতটি টুকরো দিয়ে তার একটা গোটা সিগারেট তৈরী হয়। সে অনেক কষ্ট করে ৪৯টি সিগারেটের টুকরো যোগাড় করল। সে কটা সিগারেট তৈরী করেছিল বলত? (বৈশাখ, ১৩৪৮)

উঃ—আটটা। কারণ সাতটা সিগারেট খাওয়ার পর, সাতটা সিগারেটের শেষাংশ থাকবে, আর সেই দিয়ে একটি সিগারেট তৈরী হবে।

১১৯। তিনজন নরখাদক এবং তিনজন ধর্ম্মপ্রচারক নদী পার হবে। কিন্তু নৌকা আছে একটি, তাতে আবার মাত্র দুজন ধরে। কিন্তু কোন প্রকারেই নৌকতেই হোক কিম্বা ঘাটের এপারে কিম্বা ওপারেই হোক, নরখাদকদের দল ভারী করা চলবে না। কি উপায়ে নদী পার হওয়া যায় বলত? (বৈশাখ, ১৩৪৮)

উঃ—প্রথমে একটি ধর্ম্মযাজক এবং একটি নরখাদক নদীটি পার হবে। তারপর ধর্ম্মযাজকটি ফিরে আসবে, তারপর দুজন নরখাদক নদী পার হবে, তাদের মধ্যে একজন ফিরে আসবে, তারপর দুজন ধর্ম্মযাজক পার হবে, তাদের মধ্যে একজন ধর্ম্মযাজক এবং আর একটি নরখাদক ফিরে আসবে আবার দুজন ধর্ম্মযাজক পার হবে। একজন নরখাদক ফিরে আসবে, শেষে দু'জন নরখাদক নদীটি পার হবে।

শুভ কামনায়

(১)

তোমার মধুচক্রের চারিদিকে যারা মধুর আশায় ঘোরে ফেরে তাদের জন্য আমার কাছে একটা আশীর্ব্বাণী দাবী করেছ। এরা সবাই ছেলেমানুষ, কথার চেয়ে রূপকথার দাম এদের কাছে অনেক বেশী; তাই তাদের কাছে আমি একটা সত্যিকারের রূপকথাই বলছি।

সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে, আমার ছেলেবেলায় যে বাংলাকে আমি দেখেছি আজকের বাংলার সঙ্গে তার কোন মিল নেই বলা চলে। তখন কলকাতা ছিল একটা সাধারণ সহর, এর বুকে ঝোপ জঙ্গল ছিল, সে ঝোপে সাপ-খোপও থাক্‌তো। যারা এখানে বাস কোরতো তারা জানতো তারা সহরেই আছে কিন্তু পাড়াগাঁয়ের আবহাওয়া থেকে তারা একেবারে পৃথক হয়ে পড়েনি। আজকের মত কর্ম্ম-ব্যস্ততা তখন কলকাতাবাসীদের ছিল না—আর ছিল না তাদের আজকের মত অন্নচিন্তা।

আজ সময় গেছে বদলে। আমার চোখের উপর কোলকাতার কত রূপ পরিবর্ত্তনই দেখলাম। রাজধানীর রূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশেরই চেহারা বদলে গেছে। ছোটবেলা যেখানে দেখেছি গিসগিস করছে মানুষ, বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারার কৃষক, সচ্ছল অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, সেখানে আজ দেখি ডোবা আর জঙ্গল, লোক-গুলো খেতে পায় না, দিনের পর দিন রোগে ভুগে নিজের নিজের ব্যবসা ছেড়েছে—গ্রাম আজ জন-হীন। সেদিন আর এদিন তুলনা করলে মনে হয় রূপকথার রাক্ষস এসে দেশটাকে একেবারে হতশ্রী করে দিয়েছে। কোলকাতায় তখন ট্রাম-বাস ছিল না। এত রাস্তা, এত দালান, এত আলো, এত বিলাসিতা সেদিন কেউ ভাবতেই পারেনি। আজকের কোলকাতা সেদিনের তুলনায় স্বর্গ। এও মনে হোতো রূপকথা, যদি না স্বচক্ষে এগুলি দেখ্‌তাম! বাঙ্গালী আজ খেতে পায় না—তার ব্যবসা-বাণিজ্য উপার্জ্জনের সকল পন্থা আজ অন্যের হাতে চলে গেছে। এখন একটা কেরাণীগিরি চাকরীর জন্য বাঙ্গালীর ছেলে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিতান্ত হতাশ ভাবে। যে সময় শিক্ষার নাম করে বি-এ, এম-এ পাশ করার মোহে বাঙ্গালী ছিল মাতোয়ারা, তখন ভিন্ন প্রদেশ থেকে লোক এসে যোগ্যতায় বাঙ্গালীর ব্যবসাগুলি দখল করে ফেলেছে—কিন্তু এর জন্য কোন জবরদস্তি করেনি। নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে তারা বাঙ্গালীর অমনোযোগিতার সুযোগ নিয়ে বুদ্ধি আর পরিশ্রমের জোরে মস্ত বড় ব্যবসা গড়ে তুলেছে। অর্থহীনতার পুরস্কার স্বাস্থ্যহীনতা—তাই বাঙ্গালী আজ মরতে বসেছে! যদি তাকে বাঁচতে হয় তবে ডিগ্রীর মোহ ছাড়তে হবে। ভাব-প্রবণতা, বিলাসিতা, আত্মম্ভরিতা—যা নাকি বাঙ্গালীর জীবনে শিকড় গেড়ে বসেছে, সেগুলিকে দূর করে দিয়ে প্রাণপণে পরিশ্রম করতে হ'বে, আগের আগের দিন ফিরিয়ে আনতে হবে, যেদিন বাংলার চাঁদ সদাগর সপ্ত ডিঙ্গা মধুরকর নিয়ে বাণিজ্য করতে বের হত।

এই আমার সত্যিকারে রূপকথা। বাংলা দেশের কিশোর কিশোরী মধুর লোভে সপ্ত ডিঙ্গা মধুকরের স্বপ্ন দেখুক, এই আমার আশীর্ব্বাদ! শুভার্থী

(ফাল্গুন, ১৩৪৭) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

(২)

ANAND BHAWAN,
Allahabad, 11-7-40.

I like to write for children but I am afraid I have no time whatever to send you message for your magazine. At present I must content myself by sending my good wishes to the children who read your magazine and to hope that they will grow up into free sons and daughters of India.

Yours sincerely
JAWAHARLAL NEHRU

(৩)

To the Children of Bengal :—

Little citizens of the future, I am happy to be able to say a few words to you through your children's corner. I hope you are all doing your best to build up your bodies and your minds and preparing yourselves for the day when you will have to work to make your country great and beautiful. The children of India are very fortunate. They have a wonderful heritage and traditions, and if they wish, they can make their country even more beautiful in the future than it has been in the past. We elder people look to you for great things. I know you will not disappoint us.

Your affectionate friend
VIJAYALAKSHMI PANDIT

(৪)

"মৌচাক-এর মধুচক্র মারফৎ বাংলার ছেলেমেয়েদের জন্যে একটী বাণী পাঠাবার জন্য আমায় অনুরোধ করা হয়েছে। আমি নিজের পক্ষ থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাণী পাঠাবো এমন যোগ্যতা আমার হয়েছে বলে মনে করি না।

আমি শিক্ষক মানুষ, কেবল সেই অধিকারে ছেলেদের একটু আধটু উপদেশ দেবার সাহস করতে পারি। সেই সাহস নিজের কথায় নয়, পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর কথায় তাঁর একটী প্রার্থনা আমার কাছে খুব ভাল লাগায় সেই প্রার্থনাটিকে আমি তাঁর বাণী হিসাবে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিচ্ছি। সোক্রাতেস (Socrates) প্রাচীন গ্রীসের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানেতা ছিলেন। তাঁর শিষ্য প্লাতোন (Platon বা Plato) এবং প্লাতোন-এর শিষ্য আরিস্তোতল—এঁরাই ইউরোপে দার্শনিক চিন্তার পত্তন করে যান। যে আদিগুরু থেকে ইউরোপের চিন্তাধারার উদ্ভব, সেই সোক্রাতেস্-এর প্রার্থনা এটী—

"হে প্রিয় বিশ্বদেব 'পান্' এবং এই স্থানের দেবতাগণ, আমার প্রতি দয়া করো, যাতে আমি ভিতরে আমার মনে-প্রাণে আমার আত্মার মধ্যে সুন্দর হতে পারি; বাইরে আমার যে সম্পদ আছে তা যেন আমার ভিতরে আত্মার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারে (অর্থাৎ আমার আচারে ব্যবহারে আর অন্য সব বিষয়েও যেন আমি সুন্দর হতে পারি)! আমি যেন কেবল জ্ঞানবান ব্যক্তিকেই ধনী বলে মনে করি। আত্ম-সংযত মানুষ যতটুকু ধন-সম্পদের ভার বইতে পারে, আমার যেন ততটুকুই ধন-সম্পদ হয়।"

(পৌষ, ১৩৪৭) শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৫)

—সে কোন্ কালের কথা, মৌচাকের পত্তন দেওয়া হচ্ছে তখন; সেই সময়ে তখনকার ছোট-বড় মৌমাছিরা মিলে আমরা একটা "মৌচাক মেলা" খুলে মৌচাকের জন্য মধু নয়, কিছু অল্প-সল্প অর্থ সংগ্রহ করেছিলুম! সেদিনের কথা মনে করে আনন্দ পাই। প্রদর্শনীতে ছিল কেবল ছোট ছোট ছেলেদের লেখা ছবি, তাদের ভাঙ্গা খেলনা, পুতুলের কাপড়, সেলাই—যা তার একটা মস্ত সংগ্রহ। টিকিট কিনে বন্ধুবান্ধবেরা দেখে আমোদ পেয়েছিল ছেলেমানুষি দেখে আমাদের। তারপর ছোট-বড় লেখক আমরা কোমর বাঁধলেম মাসিক "মৌচাক"-এর ডাকে—ঘরে ঘরে যাতে মধু পৌঁছে দেয়, সেজন্য। সেই মৌচাকের প্রথম অবস্থায় উৎসাহ কত ছিল আমাদের, তখনকার ছোট-বড় মৌমাছির দল এখন আমরা বড় হয়ে গেছি, কেউ কেউ বুড়ো হয়ে গেছি, তবু মৌচাকের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক ভুলতেও পারিনি, ছাড়তেও পারিনি।

আমাদের সেই নতুন মৌচাক সেকালের, এখন বড় হয়ে কত মৌমাছিকে মধু জোগাচ্ছে এটা ভাবতে ভারি আনন্দ লাগছে।

মৌমাছির দল বাড়লো, মৌচাক বাড়লো দিনে দিন, নতুন করে মধুর জোগান দিয়ে চল্লো শিশু-মনের, এ দেখেও সুখ পাচ্ছি আজ। তোমাদের সেই সেকালের মৌচাক মেলার এবং মৌচাকের মধুলুব্ধ।—

(বৈশাখ, ১৩৫১) শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬)

তোমরা যে যুগে জন্মেছ সে যুগে দেখ্‌ছ মানুষের নিষ্ঠুরতা কি ভীষণ আকার ধ'রেছে! বড়দের জীবন তো বিপন্ন হয়েইছে, ছোটদের জীবনও নিরাপদ নয়। দেশে দেশে যে সব ছেলেমেয়েরা এই নির্ম্মম যুদ্ধের মধ্যে কষ্ট পাচ্ছে তাদের কথা তোমরা ভুলতে পারবে না তা জানি; কারণ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে রয়েছে একই শিশু জগৎ—সেখানে দেশ নিয়ে, ভাষা নিয়ে ছেলেমেয়েদের আলাদা করা চলে না। তারা যদি বেঁচে থাক্‌তে পায়, বেড়ে উঠতে পায়, তবেই সমাজ ও সংসার টি'কে থাকতে পারবে। এই কথাটি যেন নূতন ক'রে সেদিন শুনে এলামে বিশ্বকবির মুখে শান্তি-নিকেতনে। তোমরা হয়ত কাগজে প'ড়েছ তিনি আশী বছরে পা দিয়েছেন ব'লে Oxford বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে একটি উপাধি দিয়ে সম্মানিত ক'রেছেন। সেই উপলক্ষ্যে নানা দেশের, নানা জাতির লোক কবির কাছে আসেন। সেই বড় উৎসবের আগে ভোর বেলা আমরা কবিকে নিয়ে বসেছিলাম তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মন্দিরে। কবির দেবোপম ললাটে প'ড়ল চন্দন, প'ড়ল তরুণ রবির আলো। কবি যেন বুঝতে পার্‌লেন আমাদের মনের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে কোন্ সমস্যা, কোন্ বেদনা। তাই যেন শিশুর মত সহজ প্রেরণায় এই বিষম নৈরাশ্যের দিনে তিনি শোনালেন এক অপূর্ব্ব আশার বাণী। সে বাণী শুনে ধন্য হ'য়ে গিয়েছি কিন্তু তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবার মত ভাষা পাব কোথায়? তবু তার একটু আভাস তোমাদের দিতে চেষ্টা করি: কবি বল্‌লেন—

"আজকের দিনে মনে হতে পারে পৃথিবী যেন জরা ও মৃত্যুতে অভিভূত; যে দিকেই চাই চোখে পড়ে হিংসা ও নিষ্ঠুরতা; অসত্য ও অপ্রেমের অন্ধকারে যেন সব তলিয়ে গিয়েছে। তবু কেন জানি না এই কথাটা বার-বার মনে আসে যে যুগে যুগে কত মহাপ্রাণ, কত বুদ্ধ, কত খ্রীষ্ট, এমনি গাঢ় অন্ধকার ভেদ ক'রে আমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রতে এসেছেন, আমাদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। ভ্রান্ত মানুষ তার নিষ্ঠুরতা দিয়ে পুঞ্জীভূত ক'রেছে কত অন্যায় কত কদর্য্যতা। অথচ যুগে যুগে দেখেছি, পৃথিবীর শৈশবে যেমন কত কঠিন মাটী ও পাহাড়ের স্তর চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে বেরিয়ে এসেছে সত্যের অগ্নিশিখা, পুড়িয়ে পবিত্র করে নূতন ক'রে গড়েছে আমাদের জগতকে—মানব সমাজও তেমনি মনে হয় যেন নূতন করে ভেঙ্গে গড়া হচ্ছে। আমরা এই যুগে হয়ত দেখ্‌ছি ভাঙ্গার তাণ্ডবলীলা; তাই ভয় পাচ্ছি! কিন্তু এ সবের ভিতর দিয়েই এগিয়ে চলেছে গড়ার কাজ; আমাদের পৃথিবী বুড়ো হয়নি, জরাজীর্ণ হয়নি—কত শত অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়ে দূর হয়ে আসছে মানুষে মানুষে ভেদ, জেগে উঠছে নূতন ন্যায় ও সত্য, নূতন প্রেম, নূতন

উপহার  উপহার



পাহাড়ী পথে

পূর্ণতা। আমার শেষ জীবনে এই স্বপ্ন, এই আশা জানিয়ে যেতে চাই…”

মৌচাকের বন্ধুদের এই ছোট্ট অসম্পূর্ণ গল্পটী আমার আন্তরিক শুভ ইচ্ছার সঙ্গে উপহার দিলাম।

অগ্রহায়ণ, ১৩৪০] শ্রীকালিদাস নাগ

(৮)

My heartiest Bijoya greetings to all the readers of this magazine. Let us all think to-day of our beloved country with her great rivers and wide plains, crowned with the snow-white Himalayas, which to us is the most beautiful in the world. She claims our love and life-long devotion.

C. V. Raman

(৯)

আমার বয়স তখন পনেরো কি ষোলো। “শিশু”ও নই, “সন্দেশ” খাবার সাধও ক্রমে মিটে আসছে। এমন সময় দেখলুমপ্রথম সংখ্যা “মৌচাক”। প্রথম থেকেই মধুর আস্বাদনে আকৃষ্ট হলুম। সুরুতেই ছিল সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা “সব চিন্ খেলোয়াড় সব জানি খেলতে” আর শেষের দিকে ছিল নরেন্দ্র দেবের ধাঁধা। তার উত্তর মনে আছে—“বেগম।”

তখনকার দিনে “মৌচাকে” যাঁরা লিখতেন, (যেমন, অবনীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মণিলাল, হেমেন্দ্রকুমার, প্রেমাঙ্কুর, প্রিয়ম্বদা) তাঁরা “ভারতী” প্রভৃতি অন্যান্য পত্রিকাতেও লিখতেন। তাঁদের সবাইকে “মৌচাকে” পেয়ে চেনা লেখকের সঙ্গে দ্বিতীয়বার চেনার আনন্দ পেতুম। এতগুলি গুণীলোককে এক আসরে নামানো যে-কোনো সম্পাদকের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হতো। ছেলেদের আসরে নামানো তো দস্তুরমত আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাঁরাও ছেলেদের অনুকম্পা করে যেমন তেমন রচনা দিয়ে ভোলাতেন না; উঁচু দরের সাহিত্য সৃষ্টি করতেন।

পরবর্ত্তী কালে “মৌচাকে”র জন্য আমিও কলম ধরেছি—ধরতে শিখেছি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ছেলেদের জন্যে লেখা বড়দের জন্যে লেখার চেয়েও শক্ত। তারা ভালো জিনিষটিই চায়, না পেলে ছাড়বে না, অথচ তাদের হজম হওয়া চাই। তার জন্যে বিশেষ করে ভাবতে হয়। আজকাল আমি অত সময় পাইনে বলে “মৌচাকে”র দাবী মেটাতে পারিনে। কিন্তু “মৌচাক” চিরদিনই আমার প্রিয়। ইতিমধ্যে আমার ছেলেমেয়েদের প্রিয় হয়েছে। আমাদের দু’পুরুষের কাগজ। আশা করি তিন পুরুষের হবে। সম্পাদক মহাশয় দীর্ঘায়ু হোন।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

(১০)

১৯২৫ সালের কথা। ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম সুধীরবাবুদের দোকানে যাই। সেখানে তখন প্রতি বিকালে একটি সাহিত্যিক আড্ডা হোত। আমি তখন নতুন সাহিত্যিক, ‘প্রবাসী’তে কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছি মাত্র এবং ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের খসড়া করচি। এঁদের এই বৈকালিক আড্ডাটি আমার বড় ভাল লাগতো। কাজকর্ম্মের অবসরে মাঝে মাঝে ‘মৌচাক’ আপিসে এসে এই আড্ডাতে যোগ দিতাম। ১৯২৯ সালে আমি কলিকাতায় আবার ফিরে আসি, কয়েক বৎসর বিহার প্রবাসের পরে। ঐ বৎসরেই ‘পথের পাঁচালী’ প্রকাশিত হয়। ঐ সাল থেকে ‘মৌচাক’ আপিসে আমার যাওয়া আসা বাঁধা নিয়মে সুরু হয়ে গেল।

অনেক সাহিত্যিক, শিল্পী, মজলিসি ও রসিক ব্যক্তির সমাগমে ‘মৌচাক’এর এ আড্ডা গমগম করতো। এইখানেই বন্ধুবর হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণীন্দ্রলাল বসু, ৺সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। সুধীরবাবুর আদর-আপ্যায়নে কত বর্ষার বৈকাল ও শীতের সন্ধ্যার চায়ের মজলিস এখানে সরস ও আনন্দময় হয়ে উঠেচে, কত ঠোঙা ঠোঙা ‘অবাক জলপান’ ফেরিওয়ালার ঝুলির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বাদল দিনে অতিথি সৎকারে সহযোগিতা করেচে; ‘মৌচাক’এর ইতিহাসের সঙ্গে সে সবের ইতিহাসও জড়ানো।

একদিন সুধীরবাবু বল্লেন—বিভুতিবাবু, মৌচাকের জন্যে লিখবেন ?

আমি একপায়ে খাড়া। বল্লুম—নিশ্চয়ই।

—কি লিখবেন বলুন।

—কি ধরণের লিখি আপনিই বলুন।

—ছেলেদের উপন্যাস দিন। কি বলেন ?

এভাবে ছেলেদের জন্য লেখা উপন্যাস ‘চাঁদের পাহাড়’ এর সূত্রপাত। সুধীরবাবুর উৎসাহ না পেলে হয়তো ও বই লেখাই হোত না।

আজকাল কলকাতা থেকে দূরে বাস করি। কিন্তু ‘মৌচাক’এর বৈকালিক আড্ডার আকর্ষণ এমন মোহবিস্তার করেচে মনে, যে, কলকাতায় এলেই ওখানে না গিয়ে পারি না, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও যাওয়া চাইই। বন্ধুবর সরোজ রায়চৌধুরী আসে, মণীন্দ্র বসু আসে, সুধীর বাবু ও অপূর্ব্ব বাবু তো থাকেনই—অতীত দিনের আনন্দ-মুহূর্ত্তগুলি আবার যেন সজীব হয়ে ওঠে, সে সব দিনের হারানো অনুভূতিগুলি আবার যেন ফিরে পাই। সেজন্যই ‘মৌচাক’ কাগজের ওপর আমার কেমন একটা ব্যক্তিগত টান আছে—এর ভালমন্দ ব্যক্তিগত লাভক্ষতির দৃষ্টি নিয়েই দেখি।

আমি জানি ‘মৌচাক’ শুধু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দবর্দ্ধন করে না, তাদের পিতামাতারও অবসর-বিনোদনে যথেষ্ট সাহায্য করে।

চাঁইবাসায় একটি বন্ধু গভর্ণমেণ্টের এন্‌জিনিয়র ও বিদ্বান ব্যক্তি। আমায় বল্লেন—এবার 'মৌচাক'এ হেম বাগচীর 'গরমেটো' কবিতা পড়েছেন?

আমি বল্লুম—এখনও পড়িনি।

—পড়ে দেখবেন। চমৎকার রস আছে ওর মধ্যে। আজ দুপুরে মসগুল হয়েছিলাম 'মৌচাক'খানা নিয়ে। এ রকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। একটা মাত্র মনে হোল।

'মৌচাক'এর লেখা যখন লিখতে বসি, তখন কল্পনা-নেত্রে দেখি বহু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও তাদের কর্ম্ম-ক্লান্ত পিতাঠাকুরদের উৎসুক দৃষ্টি, সবাই যেন লেখার দিকে চেয়ে রয়েচে একদৃষ্টে—তবে অক্ষমতার জন্যে তাদের সে ঔৎসুক্য চরিতার্থ হয়তো সব সময় করে উঠতে পারি না—সে কথা আলাদা।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১১)

মনে পড়ে আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে আড্ডায় বসে শিশু-সাহিত্যের আলোচনা হোতে হোতে ছোটদের জন্য একখানা মাসিকপত্র প্রকাশ করবার কল্পনা আমাদের মাথায় জাগে। সুধীর অগ্রণী হোয়ে তার সমস্ত লাভ লোকসানের ভার মাথায় নিতে রাজী হলেন। বলা বাহুল্য লাভের আশা তখন (বোধ হয় এখনও) সুদূর পরাহত ছিল।

মৌচাকের নামকরণ করেছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। নাম ঠিক হোয়ে যাবার পর সুধীরচন্দ্র মহা উৎসাহে মৌচাকের মধু-সংগ্রহের কাজে লেগে গেলেন। যে সাহিত্যিক-গোষ্ঠিকে কেন্দ্র ক'রে 'মৌচাক' প্রথম প্রকাশিত হোলো তাঁদের মধ্যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পী চারুচন্দ্র রায়, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি ছিলেন প্রধান। এরা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ—এঁদের কাছে যখনই গিয়েছি তাঁরা বিমুখ করেন নি। মনে পড়ে একবার রবীন্দ্রনাথ মৌচাকে প্রকাশের জন্য একসঙ্গে অনেকগুলি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। তাঁদের সেই স্নেহের দান মৌচাকে সঞ্চিত হোয়ে আছে।

প্রথম থেকেই 'মৌচাক' ছোটদের মহলে একটা সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। তাদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি, বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জাগিয়েছিল। অনেক ছেলে-মেয়ে সম্পাদকের উৎসাহে মৌচাকে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। এদিক দিয়ে দেখলেও মৌচাকের দান নগণ্য নয়।

গত চব্বিশ বৎসরের মধ্যে জগতে, বিশেষ কোরে আমাদের দেশে—রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য ও জীবনের নানাদিকে যে দ্রুত পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং হচ্ছে, ইতিহাসে তার তুলনা নেই বল্লেই চলে।

"তারপরে কভু উঠিয়াছে মেঘ,
কখনো রবি,
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো
শান্ত ছবি।"

এই দুর্দ্দিন-সুদিনের তোলপাড়ের মধ্যে 'মৌচাক' সম্পাদক সুদক্ষ কর্ণধারের মতন মৌচাককে লক্ষ্যের উদ্দেশে নিয়ে চলেছেন, এজন্য তাঁকে আজ আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

'মৌচাক' যখন জন্মগ্রহণ করে তখন আমরা যুবক ছিলুম। চব্বিশ বৎসর গত হয়েছে, আজ আমরা বৃদ্ধ। সেদিন 'মৌচাকে'র সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠ। জীবনের নানা কাজে জড়িয়ে পড়ে সে ঘনিষ্ঠতা শিথিল হলেও তার সঙ্গে আমার নাড়ীর সম্পর্ক—সে সম্বন্ধ ছিন্ন হবার নয়। তাকে এই বিশেষ দিনে আশীর্ব্বাদ করি—সে চিরজীবী হোক, তার মধুভাণ্ডার অক্ষয় হোক!

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

(১২)

মৌচাক পঁচিশ বছরে পড়লো। কয়েক মাস আগে আমি পঁয়তিরিশ পেরিয়েছি। মৌচাকের যখন জন্ম, আমার বয়স তখন এগারো। তার আগে পর্য্যন্ত বাংলাদেশের কিশোর চিত্তের একচ্ছত্র অধীশ্বর ছিলো 'সন্দেশ'। যে-বছর সুকুমার রায়ের মৃত্যু হলো, সেই বছরেরই চৈত্র সংখ্যায় এই হৃদয়বিদারক খবরটি বেরুলো যে সন্দেশ আর বেরুবে না। বালক ছিলুম, সুকুমার রায়ের মৃত্যু-সংবাদে কতটা মর্ম্মাহত হয়েছিলুম মনে নেই, কিন্তু মাসে মাসে 'সন্দেশ' আর পাবো না একথা ভেবে মনটা অত্যন্ত মুষড়ে পড়ে-ছিলো। কিন্তু সেই চৈত্র মাসেরই মাসিকপত্রে বিজ্ঞাপন দেখলুম যে মৌচাক নামে ছোটোদের একটি নতুন মাসিক-পত্র বেরচ্ছে। সন্দেশের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই মৌচাকের আবির্ভাব—ঘটনাটি যেন বানানো গল্পের মত সাজানো। তক্ষুণি আমার সমবয়সি একটি আত্মীয়ের নামে ফরমাশ গেলো কলকাতায় মৌচাক আপিশে। তারপর বৈশাখ মাসে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ নির্লজ্জের মতো এতকালের বন্ধু সন্দেশের শোক ভুলে গিয়ে মৌচাক নিয়ে মেতে উঠলুম।

প্রথম সংখ্যার মৌচাকের দুটি জিনিষ আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। প্রথমেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা—

'ঝরছে রে মৌচাকের মধু,
গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ায়—'

আর সর্ব্বশেষে একটি ধাঁধা

'তিনটি হরফে নাম, শক্ত জবাব,
চিনতো তাদের শুধু বাদশা নবাব
গোড়ার হরফটিকে দাও যদি ছুটি
হতে পারে তাতে বেশ লুচি আর রুটি।'

ধাঁধা হিসেবে এটি নিশ্চয়ই অনন্যসাধারণ নয়, কিন্তু এর মধ্যে পদ্যের যে পদলালিত্য, আছে, সেইটেই আমার ভালো লেগেছিলো। আরো একটি জিনিষ পাওয়া গেলো মৌচাকে, যেটি সে-যুগে অত্যন্ত অভিনব। সেটি সম্পাদকের চিঠি। 'ওগো আমার স্নেহের ভাইবোনেরা, মৌচাকের প্রিয় গ্রাহক-গ্রাহিকা' এই ব'লে আরম্ভ করে একটি সরস সুস্নিগ্ধ চিঠি লিখে সম্পাদক মশাই আমার, এবং নিশ্চয়ই আরো অনেকের, হৃদয় মুহূর্তে জয় ক'রে নিলেন। এখানে ব'লে রাখি যে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের উদ্দেশে সম্পাদকীয় পত্ররচনার মৌচাকই প্রবর্তক। কয়েক বছর পরে মৌচাকের ঐ অংশটা ঝরে পড়ে; তারপর সম্প্রতি আমাদের শিশু-পত্রিকাগুলিতে এই চিঠি লেখা ব্যাপারটার প্রবল পুনরুত্থান দেখা যাচ্ছে—তার আকৃতি প্রকৃতি কিছুই প্রথম মৌচাকের চিঠির মতো নয়। আজকালকার চিঠিপত্র আগাগোড়াই রেডিওর অনুকরণ; সে যুগে রেডিও ছিলো না, চিঠিটা চিঠির মতো করেই লেখা হতো।

মৌচাকের প্রথম সংখ্যা আমাকে এমন অভিভূত ক'রে ফেললো যে দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই সেই আত্মীয়টিকে নিরুদ্বেগে সরিয়ে দিয়ে আমি গ্রাহক হয়ে বসলুম। সম্পাদক মশাইর প্রিয় ভাইবোনদের মধ্যে আমিও একজন হবো না, এ আমার প্রাণে কিছুতেই সইলো না। গ্রাহকশ্রেণীতে ভর্তি হয়ে নিয়েই সম্পাদকের উদ্দেশে আমি পাণ্ডুলিপির শিলাবর্ষণ করতে লাগলুম। যদিও বয়স মাত্র এগারো, আমি তখন তিন-চারখানা বড়ো-বড়ো রুল-টানা খাতা কবিতা লিখে ভরিয়ে ফেলেছি, তার উপর প্রতি মাসে স্বসম্পাদিত হাতে লেখা পত্রিকায় গদ্যপদ্যরচনার খরস্রোত ব'য়ে চলেছে। যখন যে লেখা ভালো লাগতো, তক্ষুনি তার অনুকরণে কিছু লিখে ফেলতে না-পারলে আমি টিকতেই পারতুম না। মৌচাকের দ্বিতীয় সংখ্যায় গ্রীষ্ম-বিষয়ক একটি পদ্য বেরুলো—খুব সম্ভব হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা, আমি চটপট তার একটি নকল খাড়া করে মৌচাকে পাঠিয়ে দিলুম, এবং চটপট সেটি ফেরৎ এলো। দুঃখিত হলুম, কিন্তু দমে গেলুম না। আমার রচনানীড় থেকে আরো কয়েকটি বাছা বাছা শাবককে মৌচাকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলুম, নির্ব্বিঘ্নে সব কটিই ঘরে ফিরে এলো। ভারি মন খারাপ হয়ে গেলো! মন খারাপ হবার বিশেষ একটু কারণও ছিল। মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় নামে দুটি বালক লেখকের গল্প মৌচাকে বেরচ্ছিলো—জনশ্রুতি শুনেছিলুম তারা আমারই সমবয়সি—তাদের আশ্চর্য্য রচনাশক্তি দেখে তারিফ করতুম যত, ঈর্ষা করতুম ঠিক ততখানি। হায়রে, তাদের পাশে আমারও কি একটুখানি স্থান হতে পারে না? সে-রকম কোন লক্ষণই তো দেখা যাচ্ছে না। কিছুটা আমার মনের অসংবরণীয় উত্তেজনায়, এবং কিছুটা স্নেহান্ধ গুরুজনের প্ররোচনায়, মৌচাক-সম্পাদককে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখে ফেললুম। সে-চিঠি যেমন মূঢ়, তেমনি দুর্বিনীত; যেমন উদ্ধত তেমনি কর্কশ। পরের সংখ্যার মৌচাকে সম্পাদকীয় চিঠিতে ছাপার অক্ষরে তার জবাব পেলুম। সম্পাদক মশাই দয়া ক'রে আমার নামটা যে উল্লেখ করেননি, আজও সে-কথা ভেবে তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা হয়। অমন তীব্র ভর্ৎসনা কখনো আমাকে কেউ করেন নি। ব্যথিত হলুম, কিন্তু রাগ করলুম না। ভর্ৎসনার ফল ভালো হ'লো, কেননা ওটা যথার্থই আমার প্রাপ্য ছিলো। তারপরে মৌচাকে আর কখনো লেখা পাঠাইনি। মোহন-শোভনের সমকক্ষ হবার দুরাশা মন থেকে মুছে গেলো। আমি নম্র হতে শিখলুম। অথচ মৌচাকের পাতায় ছাপার অক্ষরে আমার নামটা দেখবো এ ইচ্ছাটাকে কিছুতেই চাপা দিতে পারছিলুম না। উদারচিত্ত সম্পাদক মশাই আমার মতো অক্ষমের জন্যও ব্যবস্থা রেখেছিলেন। আমার নাম ছাপা হতো ধাঁধার উত্তরদাতাদের মধ্যে; শ'খানেক নামের মধ্যে আমার নামটি খুঁজে বের করে নিয়ে তারই দিকে মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে থাকতুম। সেখানেও আমার নাম থাকতো শেষের দিক, অন্তত পঞ্চাশটি নামের পরে। লক্ষ্য করতুম, প্রথম নামটা প্রায় প্রত্যেক মাসেই থাকতো নীলিমা সরকার, তারপর মৃত্যুঞ্জয় বরাট ও পরিমল রায়কে কাছাকাছি পাওয়া যেতো। একবার দেখলুম সর্ব্বপ্রথম নাম পরিমল রায়, তাও আবার তারকা-চিহ্নিত, তলায় ছোটো অক্ষরে লেখা, 'ইনি টেলিগ্রামে ধাঁধার জবাব দিয়াছেন'। পরবর্ত্তী জীবনে ওই পরিমল রায় আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠেন। তাঁর মুখে শুনেছিলুম যে মৌচাকের ধাঁধার উত্তরদাতাদের মধ্যে তাঁর নাম সর্ব্বপ্রথম ছাপা হোক, এটি তাঁর গভীর আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিলো, অথচ নীলিমা সরকারের কাছে মাসের পর মাস ক্রমান্বয়ে পরাস্ত হচ্ছিলেন। মরীয়া হয়ে একবার করলেন কী, যেদিন মৌচাক এলো, সেদিনই ধাঁধার জবাব টেলিগ্রাফ ক'রে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে মৌচাক-আপিসে সকলের আগে পৌঁছায়। কিন্তু আমার মাথায় এমন-কোনো চমৎকার বুদ্ধি কখনো খেলেনি, বুদ্ধিটা স্বভাবতই কিছু ভোঁতা ছিলো বলে ধাঁধার জবাব বের করতেও আমার বিস্তর সময় লেগে যেতো—তাই লাষ্ট বেঞ্চি থেকে আমি আর প্রোমোশন পেলুম না। তবে গ্রাহক-গ্রাহিকার চিঠির মধ্যে আমারও দু'চারখানা চিঠির ভগ্নাংশ যখন ছাপা হলো, তখন আমার মৌচাক-সাধনার একটি সিদ্ধির সোপানে আমি যেন এসে পৌঁছলুম। লেখা ছাপা না-হয় হয়নি—চিঠি তো ছাপা হয়েছে।

ইতিমধ্যে একবার কলকাতায় এসে গুরুজনের সঙ্গে ৯০।২এ হ্যারিসন রোডে, মৌচাক আপিস দেখে গিয়েছিলুম। সম্পাদক মশাইকে চোখে দেখলুম, বইয়ের ভরা ঘরটির সৌগন্ধ্য নিঃশ্বাসে গ্রহণ করলুম—কোনো কথা নিশ্চয়ই বলিনি, কেননা আজকালকার ছেলেদের মতো স্মার্ট আমি ছিলুম না। একটি মূল্যবান স্মৃতি বহন ক'রে নিয়ে ফিরে গেলুম আমার পাড়াগেঁয়ে সহরে।

এরই অল্পকাল পরে আমি 'বড়ো' হয়ে উঠলুম, বড়ো সহরে এলুম, অদূরে কলেজ দেখা যাচ্ছে। মৌচাকের গ্রাহক কথাটা আর যেন আত্মসম্মানের অনুকূল মনে হ'লো না। তারপর কলেজ-জীবনের প্রথম পর্য্যায়ে ফরাশি, রুশ এবং স্ক্যাণ্ডিনেভীয় সাহিত্যের মধ্যে এমনভাবে মগ্ন হলুম যে মৌচাকের কথা আর মনেই রইলো না। স্বরচিত খান দু'তিন বইও প্রকাশিত হলো, নিজের সম্পাদনায় মাসিকপত্র বেরুলো—এবার আর হাতে-লেখা নয়, একেবারে ছাপার অক্ষরে।

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতায় এসেছি। বন্ধু অচিন্ত্যকুমার বললেন, 'সুধীরবাবু তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান, চলো তোমাকে নিয়ে যাই।' একদিন দুপুর বেলা ১৫ নং কলেজ স্কোয়ারের খস্‌খস্‌এর পর্দ্দা ঢাকা ঘরে অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে প্রবেশ করলুম। সুধীরবাবু আমার কাছে মৌচাকের জন্য লেখা চাইলেন। আমি বললুম, 'ছোটদের জন্য তো কখনো লিখিনি।' সুধীরবাবু বললেন, 'লিখুন না।' মনে-মনে ভাবলুম, দেখি না চেষ্টা করে, হয়তো পারবো। ঢাকা ফিরে গিয়েই একটি কবিতা লিখে পাঠালুম, পরের সংখ্যার প্রথমেই সেটি ছাপা হলো। মৌচাকে সেই আমার প্রথম লেখা, তারপর গদ্য-পদ্য অজস্র লেখা মৌচাকে লিখেছি তা সকলেই জানেন।

মৌচাক-সম্পাদক উশকিয়ে না দিলে ছোটদের লেখায় আমি কখনোই হয়তো হাত দিতুম না। আমার সমসাময়িক অনেক লেখকের সম্বন্ধেই এই কথা বলা যায়। সন্দেশ ছিলো একটি প্রতিভাবান পরিবারের মুখপাত্র, আর মৌচাকে বাংলার সমগ্র সাহিত্যজগৎ প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে যিনিই কিছু-না-কিছু কৃতী হয়েছেন, তাঁকেই সুধীরবাবু মৌচাকের লেখক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন—এটি তাঁর সম্পাদনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যিনিই বড়োদের জন্য ভালো লিখেছেন, তাঁকে দিয়েই তিনি ছোটোদের জন্য লিখিয়ে নিয়েছেন—ফল প্রতি ক্ষেত্রেই ভালো হয়েছে। মৌচাকের লেখক-তালিকার মধ্যে ভারতী-যুগ থেকে কল্লোল-যুগ পর্য্যন্ত সকল নামজাদাকেই পাওয়া যাবে।

এক সময়ে আমাকে ছোটদের লেখার একটা নেশায় পেয়েছিলো, বলেই লিখতে পারতুম। তার পিছনে ছিলো মৌচাক-সম্পাদকেরই দরাজ দাক্ষিণ্য। মনে আছে এক বার রাত জেগে মৌচাকের জন্য লিখছিলুম, একটি গল্প শেষ করে মনে হল আর একটা লিখি, তক্ষুণি আরম্ভ করলুম এবং শেষ ক'রে শুতে গেলুম। আজ আর ছোটদের জন্য লিখতে মনের মধ্যে সে রকম উৎসাহ পাই নাই। মৌচাকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা কমে গেছে, লেখক-সংখ্যা বেড়েছে, এবং তরুণ লেখকদের জায়গা ছেড়ে দেয়া বড় লেখকদের সামাজিক কর্ত্তব্য।

একটা মজার গল্প বলে এ-লেখা শেষ করি। আমার বয়স তখন বাইশ কি তেইশ। একদিন সন্ধ্যাবেলা বাস্‌-এ করে ভবানীপুরে বাড়ি ফিরছি। হাতে সদ্য-প্রকাশিত একখানা মৌচাক, তক্ষুণি মৌচাক-আপিস থেকে নিয়েছি। বাস-এ বসেই একটি সিগারেট ধরিয়ে খুব আগ্রহ-সহকারে মৌচাক খুলে পড়ছি, পাশের একটি ছোকরা-মতো ভদ্র লোক আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'Subscriber ?' আমি নেতিসূচক মাথা নেড়ে আবার মৌচাকে মন দিলুম, কিন্তু বুঝতে পারলুম এই লোকটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ। তিনি জানতে চেয়েছিলেন আমি মৌচাকের গ্রাহক কিনা, এবং ঐটুকু বয়সেই সিগারেট ধরেছি কিনা। আপনি বলবেন না তুমি বলবেন স্থির করতে না পেরে প্রশ্নটা অস্পষ্টভাবে করেছিলেন, জবাব যেটা পেলেন সেটাও সুস্পষ্ট নয়। হয়তো আমার চেহারা এবং মৌচাক পাঠে আমার গভীর আগ্রহ—দুটোই তাকে প্রতারিত করেছিলো। হয়তো অনেকক্ষণ মনে মনে এ নিয়ে তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন—সত্যি, মৌচাকের একজন গ্রাহক বাস্‌-এ বসে সিগারেট খাচ্ছে, এ দৃশ্য কি সহ্য করা যায়!

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

(১৩)

বন্ধু আমার মৌচাক যে পড়লো এবার পঁচিশে,
নয়ক' সে আর দুধের শিশু, নয়ক' নেহাৎ কচি সে।
জ্ঞান লভেছে অনেকখানি বয়স বাড়ার সাথেও,
অনেক রাঙা মধুর স্মৃতি হোলো যে ওর পাথেয়।
আমি তখন তরুণ কিশোর, আপনা মোর বিহারে,
আলাপ হতেই বন্ধুভাবে টেনে নিলাম ইহারে।
টান্‌লো সেও নিবিড়ভাবে, ডাকলো আমায় গভীরে,
জাগিয়ে দিল আমার ভিতর ঘুমন্ত এক কবিরে।
দীর্ঘ বছর ডাকছে সে আজ বালিকা আর বালকে,
অজ্ঞানতার আঁধার হতে যাচ্ছে নিয়ে আলোকে।
রসিক জনে সবাই জানে ডাক্‌ছে সে যে কি সুরে,
মৌতাতে তার তাতিয়ে দিল হাজার হাজার শিশুরে।
কত জ্ঞানী, কত গুণীর কলম তুলির পরশে,
স্বপন-ভরা স্মৃতির রঙে সত্যি হোলো বড় সে
আপ্‌নি বড় হয়ে আবার করল বড় সকলে,
সারা কিশোর রাজ্যখানি আস্‌লো তাহার দখলে।
মৌচাকেরই খোপে খোপে মধুর ভাঁড়ার ভরা যে,
মৌমাছিদের জন্যে তাতে মধুমহল গড়া যে।
আমি ছিলাম মৌমাছি এক, পুষ্ট মধু আহারে,
এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জানাই আমি তাহারে।
মৌচাকেরই রত্নাগারের ছিলেন যাঁরা জহুরী,
আজকে তাহার জন্মদিনে পাইনা দেখা বহুরই।
সুদূর পথে দিলেন পাড়ি তাঁদের মাঝে অনেকে,
আজকে দিনের উৎসবে ভাই করবে তাদের মনে কে?

হারিয়ে গেলেন যে সব গুণী বিস্মরণের অতলে,
তাঁদের আমি প্রণাম জানাই, স্মরণ করি সকলে।
মৌ-ভাঁড়ারী সুধীর বাবু মানুষটি নয় সিধে সে,
ছাড়িয়ে গেছে তাঁহার সুনাম স্বদেশ আর বিদেশে।
সফলতায় উঠুক ভরে দীর্ঘ তাঁহার সাধনা,
দীর্ঘ জীবন লভুন তিনি, এই আমাদের কামনা।
মৌচাকেরই সরস মধু দিন সবারে বিলিয়ে,—
আমরা তুলি জয়ধ্বনি হাজার গলা মিলিয়ে।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

(১৪)

এই বৈশাখে মৌচাক চব্বিশ বছর উত্তীর্ণ হয়ে পঁচিশ বছরে পড়ছে!

চব্বিশ বছর আগেকার কথা আজ মনে পড়ছে। তখন ২২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে (এখন সুকিয়া ষ্ট্রীটের নাম হয়েছে কৈলাস বোস ষ্ট্রীট) 'ভারতী' অফিসে নিত্য আসর বসে। সে আসরে গান-গল্প হয়, সাহিত্যের নানা আলোচনা হয়। বহু গুণী জ্ঞানী রসজ্ঞ বন্ধুর সমাবেশ হয়।

আসরে উঠলো ছেলেমেয়েদের মাসিক পত্রের কথা। "মুকুল" উঠে গেছে, "সন্দেশ" মুমূর্ষু; ছেলেমেয়েদের মনকে জাগিয়ে তোলবার জন্য, মাতিয়ে তোলবার জন্য যোগ্য মাসিকের অভাব। আসরে তখনি স্থির হয়ে গেল, ছেলে-মেয়েদের জন্য মাসিক পত্র প্রকাশ করতে হবে। কে নেবে ভার? বন্ধুবর সুধীরচন্দ্র ওকালতির মায়া, হাকিমীর মোহ ত্যাগ করে গ্রন্থ প্রকাশের কাজে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। তাঁর মনে বিরাট উদ্দীপনা, কর্ম্মশক্তির প্রচণ্ড প্রেরণা! তিনি বললেন,—আমি নেবো ছেলেমেয়েদের পত্রিকা প্রকাশের ভার। সে ভার বইতে তিনি চাইলেন আমাদের সকলের সহযোগিতা! আমরা প্রস্তুত। সেই আসরেই ঠিক হয়ে গেল—সামনে শুভ বৈশাখ—সেই বৈশাখ থেকেই নব-পত্রিকার প্রকাশ সুরু হবে!

তখনি কথা উঠলো পত্রিকার কি নাম রাখা হবে? নানা জনে নানা নাম বাতলাতে লাগলেন। সত্যেন্দ্রনাথ (কবি ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত) বললেন—নাম রাখা হোক 'মৌচাক'! সানন্দে সকলে এ-নামকে বরণ করে নিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম-তালিকা তৈরী হলো।

স্থির হলো, সকলে মিলেমিশে কাজ করবো—কারো ঔদাস্য চলবে না। ছেলেমেয়েদের জন্য বিচিত্র বিশিষ্ট রকমের রচনা জোগাতে হবে। শুধু গল্প, কবিতা ও ধাঁধা নয়—পৃথিবীর কোথায় কি আছে, কি হচ্ছে—সব রকমের খবর দিয়ে তাদের মনকে নানা দিক দিয়ে সচেতন করে তুলতে হবে!

এ কাজে কারো উৎসাহ কম ছিল না। আমাদের মধ্যে বন্ধুবর মণিলাল (৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়) 'শিশু-সাহিত্য' রচনায় সকলের অগ্রণী ছিলেন। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্য ছেলেমেয়েদের মনে কল্পলোক জাগিয়ে তুলেছিল। আমরা যা কিছু লিখতুম, সব বড়দের জন্য। ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন করে কিছু লিখতে হবে। উৎসাহে সবার প্রাণে বিপুল সাড়া জাগলো। প্রতি মাসের রচনায় যাতে নূতনত্ব থাকে, বৈশিষ্ট্য থাকে—সেদিকে থাকে—সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা লিখতে লাগলুম গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এবং দেশ-বিদেশের কথা।

বৈশাখ মাসে, প্রথম সংখ্যা ছেপে বেরুলো। ছেলে-মেয়েদের মহলে কি অভ্যর্থনা পেলো। কিন্তু রচনা-বৈচিত্র্যে ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিলেও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় হতে পারে না। আমরা চাইলুম ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মনের সম্পর্ক পাতাতে। মৌচাকের পৃষ্ঠায় খোলা হলো সম্পাদকের আলাদা আসর। এই আসরে সম্পাদক চিঠি-পত্রের মারফৎ ছোট-ছোট পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় করে তুলবেন—এই হলো লক্ষ্য। সম্পাদক সুধীরচন্দ্র তখন নানা কাজে ব্যস্ত—আমার উপরে ভার পড়লো এ আসরে বসে চিঠিপত্র লিখে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সহযোগ স্থাপন করা। মাসের পর মাস চিঠি লিখে ছেলে-ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ করে তুললুম। ছেলেমেয়েদের আমন্ত্রণ জানানো হলো, তোমরা লেখো কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, দেশবিদেশের কথা—ছাপাবার যোগ্য মনে হলে সেই লেখা মৌচাকে ছাপা হবে। এ আমন্ত্রণে ছোটদের মহলে সাড়া জাগলো। তাঁরা নানা লেখা লিখে পাঠাতে লাগলেন।

সুখের বিষয়, সে সময় আমাদের আমন্ত্রণে যাঁরা লেখায় হাত মক্সো সুরু করেছিলেন, আজ মক্সোর গুণে পাকা লেখা দিয়ে তাঁরা মৌচাককে মধু-রসে সমৃদ্ধ করে তুলছেন।

তখনকার দিনে যাঁরা ছিলেন মৌচাকের পাঠক-পাঠিকা, আজ তাঁদের ছেলেমেয়েরা তাঁদের সে বড়োর আসনে এসে বসেছেন। মৌচাকের উপরে বংশপর্য্যায়ে এই যে স্নেহ-মমতা-মায়া, এ স্নেহ-মমতা-মায়া পঁচিশ বৎসর ধরে সমানে ভোগ করা কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়। সে সৌভাগ্য মৌচাক লাভ করেছে—এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, মৌচাকের প্রয়োজন আছে—মৌচাকের মধু নিঃশেষ হয়নি, এবং সেজন্য মৌচাককে বাঁচিয়ে তাজা রাখা চাই।

এদেশে ছেলেমেয়েদের কাগজকে পঁচিশ বছর বাঁচিয়ে রাখা সহজ কথা নয়। কারণ এ কাজে ব্যবসায়ী বুদ্ধি খাটে না। এখানে ছেলেমেয়েদের মন বুঝে মন জেনে তাদের মনকে খুসী করার জন্য রস-পরিবেষণ করতে না পারলে বাঁচা কঠিন। রসের ক্ষেত্রে বড়োর সঙ্গে ফাঁকি চলে; ছোটর সঙ্গে চলে না। ছোটদের জাগ্রত মনে ফাঁকি বা ধাপ্পা ধরা পড়ে যায়। মৌচাক তাদের সঙ্গে ফাঁকি বা ধাপ্পাবাজি করেনি কখনো। মৌচাক সম্পাদক নিষ্ঠাভরে তাঁর সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য করে আসছেন বলেই মৌচাক পঁচিশ বছরেও টাটকা আছে, প্রাণশক্তিতে সতেজ আছে। এজন্য সম্পাদক মহাশয়কে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

আজ পঁচিশ বছরের উদয়াগ্রে মৌচাকের স্বাস্থ্য-সম্পদ সম্বন্ধে এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করি। মৌচাকের ছোট পাঠক-পাঠিকাকেও আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বলি—মৌচাককে তোমরা যেন আরো পঁচিশ বছর পরে তোমাদের উত্তর সাধকদের হাতে এমনি অম্লান গৌরবে তাদের সাথী করে দিতে পারো!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(১৫)

তারপর চব্বিশ বছর কেটে গিয়েছে।

চব্বিশ বছর আগে যাঁরা ছিলেন বালক, আজ তাঁরা যৌবনের সীমা পার হয়েছেন এবং অনেকেরই মাথার উপর থেকে আবিষ্কার করা যাবে পাকাচুলের গোছা। আজ তাঁরা কি পাঠ করছেন জানিনা, কিন্তু তাঁদের ছেলেমেয়েরা হয়তো এখনো ভালোবাসে "মৌচাক"কে।

চব্বিশ বৎসর! ছোটদের আর কোন কাগজ বাংলা-দেশে এতগুলো বছরের গণ্ডী পার হয় নি। তখন ছোটদের উপযোগী একমাত্র উল্লেখযোগ্য মাসিক ছিল "সন্দেশ"। কিন্তু "মৌচাক" তার এই সঙ্গীকে হারিয়েছে অনেক বছর আগেই।

আজ দেশে ছোটদের পুঁথি ও পত্রের অভাব নেই, কিন্তু আমাদের ছেলেবেলা কেটেছে বড় কষ্টে! বই পড়বার নেশা যখন ধরেছে, তখন শিশু-পত্র "সখা" এবং "সখা ও সাথী"র পরমায়ু ফুরিয়েছে। একখানি মাত্র ছোট্ট কাগজ ছিল বৈকুণ্ঠ দাসের "মুকুল"। কিন্তু মরুভূমির বুকে এক বিন্দু তুষার-কণার মত, সেই সামান্য খোরাকে মনের ক্ষুধা মিটত না,—একদিনেই—না, ঘণ্টা দুই তিনের মধ্যেই একমাসের "মুকুল" হয়ে যেত গত সংখ্যার কাগজের মতন পুরাতন। তখন বুভুক্ষু মন চারিদিকে তাকিয়ে দেখত দুর্ভিক্ষের দুঃস্বপ্ন! বাজারে দু চারখানা ছোটদের বই ছিল বটে, কিন্তু জলখাবারের পয়সা জমিয়ে তার প্রত্যেকখানিই কিনে বার বার প'ড়ে জীর্ণ ক'রে ফেলেছি।

এমন অবস্থায় চোরের মতন চুপি চুপি বাবার নিষিদ্ধ পুস্তকালয়ে গিয়ে ঢোকা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। সেখানে বাস করতেন নানা গ্রন্থের ভিতরে চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম, মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি আরো অনেক। এরা বাংলা সাহিত্যের গৌরববর্দ্ধন করলেও শিশুদের বন্ধুত্বকে স্বীকার করতেন না! এবং এঁদের বন্ধু বলে দাবি করতে গেলে শিশুদের কাঁচা মন যে এঁচড়ে পাকা হয়ে ওঠে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। তাই এদের সঙ্গে লুকিয়ে পরিচয় স্থাপন করতে গিয়ে মাঝে মাঝে ধরা প'ড়ে গুরুজনদের হস্তগত হয়ে যে **'আনন্দ'** লাভ করেছি আজও তা ভুলতে পারি নি। আর ছিল রামায়ণ ও মহাভারত। কিন্তু ও দুখানি মহাকাব্যেরও অনেক অংশ দশ বারো বছরের শিশু মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ছিল না। তখনো ছোটদের রামায়ণ ও মহাভারত সঙ্কলন করবার জন্যে কারুর আগ্রহ হয় নি।

তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগল সাহিত্যিক হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। বড় হয়ে কলম ধরলুম বড়দের জন্যেই এবং অল্পবিস্তর খ্যাতি অর্জ্জনও যে করলুম, একথা বললে বোধহয় জাঁক দেখানো হবে না।

কিন্তু তখনো এদেশের ছোটদের সাহিত্য দেখে দুঃখ অনুভব করতুম। তখন শিশুদের জন্যে লেখা বাংলা পুস্তকের সংখ্যা কিছু কিছু বেড়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু যে বয়সে বালক ও তরুণদের মন ঠাকুমা-দিদিমার রূপকথার রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, সেই বয়সের উপযোগী পুস্তক রচনার জন্যে বিশেষ কোন উৎসাহই দেখতে পেতুম না।

অবশ্য ইতিমধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর "রাজকাহিনী"র গল্পগুলি রচনা ক'রে নাবালক ও সাবালকদের মন সমান ভাবে তুষ্ট করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথেরও একাধিক রচনা যাঁরা শিশু নন তাঁদেরও খুসি করতে পেরেছে। স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়েও ছোটদের সাহিত্যকে শিল্পজনোচিত সূক্ষ্মভাষায় অলঙ্কৃত করতে আরম্ভ করছেন। কিন্তু এ-সব হচ্ছে ছোটদের প্রতি দু-একজনের ব্যক্তিগত ভালোবাসার দৃষ্টান্ত মাত্র! বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত লেখকই তখন ছোটদের জন্যে একটুকুও মাথা ঘামানো দরকার ব'লে মনে করতেন না। কেবল আমাদের শৈশববন্ধু স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের "সন্দেশ" ছেলেদের খেলাঘরে টিম্-টিম্ ক'রে জ্বল্‌ত শিবরাত্রের সল্‌তের মত।

এই গেল চব্বিশ বছর আগেকার কথা। (ইতিমধ্যে "মুকুল"কেও দু-একবার বাঁচাবার চেষ্টা হয়েছে, যদিও "মুকুলে"র গৌরব আর ফিরে আসে নি।)

এই সময়ের একদিনের কথা বলছি। সুকিয়া ষ্ট্রীট। "ভারতী"-কার্য্যালয়ের তিন তলার সুদীর্ঘ ঘর। সন্ধ্যাবেলা। সেখানকার নিয়মিত আসর বসেছে। যতদূর মনে পড়ে, উপস্থিত ছিলেন স্বর্গীয় কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এবং হয়তো আরো কেউ কেউ।

সেই আসরে এসে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার প্রস্তাব করলেন, তিনি ছোটদের জন্যে একখানি মাসিকপত্র বার করতে চান—অবশ্য আমরা সকলে যদি সাহায্য করি। প্রস্তাবে সকলেই সানন্দে সম্মতি প্রকাশ করলেন এবং সব চেয়ে বেশী উৎসাহিত হয়ে উঠলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

সুধীর বললেন, 'কিন্তু কাগজের কি নাম হবে ?'

সত্যেন্দ্রনাথ চেয়ারের উপরে উবু হয়ে দুই এক মুহূর্ত্ত অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'মৌচাক'।

উপস্থিত সকলেই স্বীকার করলেন, খাসা নাম।

সুধীর তখন সবে কলেজ ছেড়ে প্রকাশকের আসন গ্রহণ করেছেন, এখানকার মত দশবার ভেবে কোন কাজে হাত দেন না, মনে তাঁর বিপুল উদ্যম। তখনি আয়োজন আরম্ভ হল এবং অনতিকাল পরেই হল 'মৌচাকে"র প্রথম আত্মপ্রকাশ।

অন্যের কথা বলতে পারি না, কিন্তু সুধীর আমাকে কী সুযোগই দিলেন! "মৌচাক" হল যেন আমাদের ঘরোয়া কাগজ! ছেলেবেলায় সে-যুগের ছোটদের যে দুঃখ দেখেছি এবং নিজের প্রাণে অনুভব করেছি, এতদিন পরেও তাঁর স্মৃতি ভুলিনি। হয়তো আমাদের দলের অন্যান্য লেখকদেরও মনের ভিতরে এই দুঃখের বাল্যস্মৃতি লুপ্ত হয়ে যায় নি। তাই আমরা সকলে মিলে মহা উৎসাহে "মৌচাকে"র জন্যে লেখনী ধারণ করলুম।

যাঁরা শিশুত্বের সীমা পেরিয়ে কৈশোরে বা প্রথম যৌবনে পা দিয়েছেন, বাংলা ভাষায় তাঁদের উপযোগী ঘটনা-বিচিত্র উপন্যাস তখন একখানিও ছিল না। বলা বাহুল্য, চব্বিশ বৎসর আগে সেই শ্রেণীর তরুণরাই অবসর কালে পাঠ্য পুস্তকের অভাব অনুভব করতেন একান্তভাবে। বিলাতে এ বিভাগের অভাব দূর করেছেন ষ্টিভেন্‌সন প্রমুখ অসংখ্য লেখক। এমন কি তাঁদের অনেকে সাহিত্যে স্থায়ী নাম কিনেছেন এবং বাংলাদেশে কোন কোন অতি মুরুব্বি ব্যক্তির মতন বিলাতী সমালোচকরা তাঁদের রচনাকে "সাহিত্য নয়" বলে উড়িয়ে দিয়েও বাহাদুরি প্রকাশ করেন না।

একদিন সুধীরকে বললুম, "অ্যাডভেঞ্চারের গল্প হচ্ছে বিলাতের ছোটদের সাহিত্যের একটি প্রধান অবলম্বন। আমার মনে হয়, এখানেও ছোটদের মহলে এ-রকম রচনার আদর কম হবে না। একবার পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়?"

সুধীর সব সময়েই নূতন নূতন পরীক্ষার পক্ষপাতী। তিনি তখনি বললেন, "বেশ তো, 'মৌচাকে' এই ধরণের একখানি উপন্যাস লিখেই দেখুন না!"

তারপর "মৌচাকে" বাংলা দেশের প্রথম ঘটনাবিচিত্র উপন্যাস বেরুলো—"যকের ধন।"

ফল হল এমন আশাপ্রদ ও বিস্ময়জনক যে, তারপর "মৌচাকে" এই শ্রেণীর রচনাই হয়ে উঠল একটি প্রধান বিশেষত্ব এবং তারপর ঘটনাবিচিত্র উপন্যাসের অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখে এ-বিভাগে বাংলা দেশের কত বিখ্যাত লেখক যে হস্তার্পণ করেছেন সে-কথা আর বিশেষ ভাবে না বললেও চলবে।

আর একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি। "মৌচাকে"র অসামান্য আদর ও সাফল্য এর কারণ কিনা জানিনা, কিন্তু "মৌচাক" প্রকাশের পর থেকেই বাংলাদেশের ছোটদের সাহিত্যের ক্রমোন্নতি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত দ্রুত। এত শ্রেষ্ঠ লেখক এক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছেন তার সংখ্যা হয় না। এবং তাঁদের হাতের ছোঁয়া পেয়ে আমাদের ছোটদের সাহিত্য আজ আর নিছক শিশু-সাহিত্য বলে গণ্য হয় না। কেবল ধারে নয় ভারেও সে কাটতে পারে। কারণ আজ কাল বড়দের মহলের চেয়ে যে ছোটদের মহলে বেশী বই প্রকাশিত হচ্ছে না, সে কথা জোর করে বলা সহজ নয়। হিসাব করে দেখলে মন্দ হয় না।

এই আশ্চর্য্য উন্নতির সম্ভবপর হয়েছে "মৌচাক প্রকাশের পর, গত চব্বিশ বৎসরের মধ্যেই। গল্পে, উপন্যাসে, ভ্রমণ-কাহিনীতে, কবিতায়, ইতিহাসে, জীবন চরিতে ও বিজ্ঞানে এবং আরো নানান বিভাগে দেখি, আজকে ছোটদের মন আর উপবাসের ভয়ে কাতর হয় না। এমন কি বড়দেরও কাগজ আজকাল ছোটদের মন রাখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে!

এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে বলা উচিত। শিশু-সাহিত্য ও ছোটদের সাহিত্য এক জিনিষ নয়। শিশু-সাহিত্য বলতে বুঝি, যার পাঠকের বয়স দশ বারো বৎসরের বেশী নয়। কিন্তু ছোটদের সাহিত্যের রসগ্রহণ করতে পারে বালক থেকে যুবকেরা পর্য্যন্ত। এমন কি আরো বড়দেরও আমি ছোটদের জন্যে লেখা বই পড়ে খুসি হতে দেখেছি।

এ যুগে "মৌচাক" এবং আরো যে-সব ছোটদের কাগজ আসে, সাধারণতঃ তারা শিশুদের চেয়ে উর্দ্ধ স্তরের পাঠকদেরই জন্য প্রকাশিত হয়। এখানকার তথাকথিত 'শিশু-সাহিত্যে'র অধিকাংশ পুস্তকও হচ্ছে এই শ্রেণীর, এটুকু যেন সকলেই স্মরণ রাখেন।

আজ সুদীর্ঘ চব্বিশ বৎসর কাল ধরে সুধীর হয়ে আছেন 'মৌচাকে'র সুদক্ষ কর্ণধার। তাঁর সাদর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ শক্তিধর লেখক হয়েছেন "মৌচাকের" মধুকর। এঁদের সাহায্যে কেবল "মৌচাক"ই বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছোটদের পত্রিকা হয়ে উঠে নি, উপরন্তু আমাদের ছোটদের সাহিত্যও যে নানাদিক দিয়ে বিশেষ-ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, সে সত্য কেহই অস্বীকার করতে পারবেন না। "মৌচাকে" প্রকাশিত অধিকাংশ রচনাই পরে পুস্তকাকারে বাংলা সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে ;— তাদের সংখ্যা কত জানি না। কিন্তু তাদের এক জায়গায় এনে সাজিয়ে রাখলে যে বেশ একটি ছোটোখাটো লাইব্রেরীর সৃষ্টি হয়, এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যায়। বলা বাহুল্য, এর জন্যে প্রশংসার দাবি করতে পারেন সুধীরচন্দ্র। এবং এই কারণেই ছোটদের সাহিত্যে তাঁর নাম স্থায়ী হয়ে থাকবে বলে বিশ্বাস করি।

নিজের সম্বন্ধে আর একটা কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। আগে ছিলুম আমি বড়দেরই লেখক। কিন্তু "মৌচাক" আমাকে দিনে দিনে বেশী মায়ার টানে টেনে এমন ভাবে ছোটদের কাছে এনে ফেলেছে যে, বড়দের কথা ভাববার যথেষ্ট অবসর আর পাই না। "মৌচাক" বদলে দিয়েছে আমার সাহিত্য-জীবনের ধারা। এজন্যে আমি দুঃখিত

নই। কারণ ছোটদের হাসিমুখই আজ আমার জীবনে জাগায় সব চেয়ে মিষ্ট আনন্দ।

অতএব "মৌচাক"কে ধন্যবাদ।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

(১৬)

হ্যারিসন রোডে তখন মৌচাকের অফিস। ফুটপাত দিয়ে ঘোরাঘুরি করি। কখনো ভিতরে ঢুকে একখানা মৌচাক চেয়ে নিয়ে পৃষ্ঠা ওলটাই। কাঠের বেড়ার ওদিকে, আরো ভিতরে, অন্ধকার—অন্ধকার আফিস। সত্যি অন্ধকার কিনা জানি না, খোঁজ নেবারো দরকার মনে করিনি। সেই অন্ধকারটা হয়তো নিজের মনেই সৃষ্টি করেছিলুম—রহস্যের অন্ধকার। বিখ্যাত সব সাহিত্যিকেরা রোজ সেখানে জমায়েৎ হন, সেই তাদের পরিবেশের ধূসরতা। না-জানা না-শোনার কল্পলোক। যেন কত দূরের রাজ্য। স্বপ্নের আবছায়া।

সেই গণ্ডির মাঝে কোনো দিন গিয়ে বসতে পাবো এ সেদিন রাজা হওয়ার মতোই দুরাশা ছিল। কিন্তু মৌচাক এমনি জিনিষ, কোথায় কোন ফুলে কি সামান্য মধু আছে, সব এনে সঞ্চিত করবে তার চক্রপুটে। এ ব্যাপারে মৌচাকের কৃতিত্ব অসামান্য, অনন্যসাধারণ। বাংলা দেশে এমন কোনো কৃতী সাহিত্যিক নেই যাঁর সঙ্গে না মৌচাক সম্পর্ক রেখেছে, সে যে-দলেরই হোক, বা যে বয়সের। একমাত্র 'প্রবাসীই' কিছু পরিমাণে এ জাতীয় সর্বজনীনতার দাবি করতে পারে। কিন্তু যেখানে সামান্যতম প্রতিশ্রুতি নিয়েও লেখকের আবির্ভাব, সেখানেই মৌচাক পাঠিয়েছে তাকে তার নিমন্ত্রণ, বিন্দুই হোক, আর পুঞ্জই হোক, আহরণ করে এনেছে সেই মধু, বিতরণ করবার জন্যে।

আমি তখন "বিচিত্রা" অফিসে সব-এডিটরি করি যখন মৌচাকে আমার প্রথম লেখা ছাপা হয়। তারপর প্রায় কুড়ি বছর মৌচাকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে মৌচাকের দৃষ্টিভঙ্গিও যে নিয়ত-অগ্রসর এটাই তার সবচেয়ে বড় কীর্তি। মৌচাকই একমাত্র কাগজ যে ছেলেমেয়েদেরকে সব সময়ে নবীন ও অগ্রসন্ধানী রাখবার ব্রত নিয়েছে। তাদেরকে ভাবতে শিখিয়েছে, বুঝতে শিখিয়েছে, নিজেদেরকে তৈরি করবার নির্ভুল ইংগিত দিয়েছে। আর এই কাজে সমবেত করেছে সে দেশের সমস্ত লেখকলিপিকর। বাঙলার জাতীয় ইতিহাসে মৌচাকের এ দান, এ কৃতকর্মতা অবিনশ্বর হয়ে থাকবে।

মৌচাকের সাফল্যের কারণ শুধু সাহিত্যিকদের সহ-যোগিতাই নয়, বাঙলার কিশোর-কিশোরীর আনুকূলই নয়, স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্য, সৌহার্দ ও সাধুতাও।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(১৭)

পঁচিশ বছর আগেকার এক সোনালী ভোর—
মেঘে মেঘে লাল আবছা আকাশ
ঘুম ভেঙে হাই তুলছে বাতাস,
ফুল খুঁজে খুঁজে মধু—মৌচাক গড়ে ভ্রমর...
পঁচিশ বছর আগেকার এক সোনালী ভোর।
পঁচিশ বছর পরে আজকের রূপোলী দিন...
মধু উছলায় মৌচাক চুঁয়ে
লোভে লোভে চাঁদ নেমে আসে ভুঁয়ে,
মহুয়া-বনের ডালে মৌ খোঁজে পরী ও জিন—
পঁচিশ বছর পরে আজকের রূপোলী দিন।
পঁচিশ বছর আগেকার সব ছেলে ও মেয়ে
লতা পাতা ঘেরা ছাতে এক কোণে
মৌচাক খুলে পড়ে মনে মনে,
জানেনা কখন স্বপ্নেরা নামে চক্ষু বেয়ে—
পঁচিশ বছর আগেকার সব ছেলে ও মেয়ে।
পঁচিশ বছর পরে আজ যারা হয়েছে বড়—
সন্ধানে তারা নিরুদ্দেশের
পথে পথে ফেরে দেশে-বিদেশের,...
ভবিষ্যতের পাথেয় কেউবা করেছে জড়ো—
পঁচিশ বছর পরে আজ যারা হয়েছে বড়।
পঁচিশ বছর আগেকার তবু পুরানো কথা
হঠাৎ কখন পড়ে যায় মনে
অশ্রু জড়ায় চক্ষের কোণে—
পুরাণো চাঁদের জ্যোছনায় ভাসে নতুন ব্যথা,—
পঁচিশ বছর আগেকার যত পুরাণো কথা।
পঁচিশ বছরে এলো সংসার অনেক ঘুরে···
কত আশা আজ হ'য়েছে দুরাশা
বিদ্বেষ হ'লো কত ভালবাসা,
কাছাকাছি যারা ঘিরেছিল তারা গিয়েছে দূরে,
পঁচিশ বছরে এলো সংসার অনেক ঘুরে।
পঁচিশ বছরে পৃথিবী তবুও তেমনি আছে···
সেই সোনা-গলা ভোরের আকাশ,
সেই মধু-ঢালা দখিনা বাতাস,
মৌমাছিদের মধু-মৌতাত ফুলের কাছে...
পঁচিশ বছরে পৃথিবী আজো তেমনি আছে।
পঁচিশ হাজার বছর পরেও এমন রবে
মনের বনের মৌচাক ফাঁদ...
মধু লোভে লোভে ধরা দেবে চাঁদ···
চাঁদমুখগুলি বেছে বেছে চাঁদ নামবে যবে
পঁচিশ হাজার বছর পরেও তেমনি রবে।
পঁচিশ বছর আগেকার কথা ভেবে কি লাভ?
নতুন দৃষ্টি নয়নে যাদের—
আকাশের নীল ছুঁয়েছে—তাদের
কথা মনে পড়ে দূর হয় যত মনস্তাপ;—
পঁচিশ বছর আগেকার কথা ভেবে কি লাভ!

মহাপ্রস্থানের পথে যুধিষ্ঠির

নন্দলাল বসু অঙ্কিত



পুতুল

পঁচিশ বছর পরে সান্ত্বনা তাইতো আছে
হারিয়েছি বলে মিছে চাই পিছু—
সবার মধ্যে থাকবে তা কিছু,—
পুরাণো গেলেও নূতন প্রাণেরা আসবে কাছে,
পঁচিশ বছর পরে সান্ত্বনা তাইতো আছে।

পঁচিশ বছরে মৌমাছিদের পাখনা ছুঁয়ে
ফুলেদের মন মৌ হ'য়ে থাক—
দেখ্‌ছে লোভীরা মধু মৌচাক···
চাঁদমুখগুলি বেছে বেছে চাঁদ নাম্‌ছে ভুঁয়ে
চিশ বছরে মৌমাছিদের পাখনা ছুঁয়ে।

উমা দেবী

(১৮)

মৌচাকের জন্মের সঙ্গে বাংলা দেশে সেদিন যে-সব ছেলেমেয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল, তাদের বয়স আজ পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হলো···তারা আজ যুবক···

মৌচাকও তাদের সঙ্গে সঙ্গে আজ পঁচিশ বছরে পড়লো ···কিন্তু সে চির কিশোর·· এই পঁচিশ বছর ধরে সে বাংলার কিশোর কিশোরীদের জন্যে মধু সঞ্চয় করে এসেছে···

আজ যারা বাংলার ঘরে জন্মাচ্ছে, তারা আবার যখন পঁচিশ বছরে পড়বে, তারাও দেখবে পঞ্চাশ বছরের কিশোর-সাথী তাদের জন্যে তেমনি মধু আহরণ করে চলেছে...

এমনি ধারা চলুক যুগে যুগে মৌচাকের মধু আহরণের মেলা, আজ কায়মনোবাক্যে তাই প্রার্থনা করি...

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়



রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅমিয় রায় অঙ্কিত



(১)

আমার মৌ-ভাণ্ডারী ভাই বোনেরা!

আজ আমাদের প্রার্থনা স্বরু হবে কাকে ঘিরে, এ মাসের প্রার্থনায় আমাদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠবে কার বাণী? কার ছায়া পড়বে তোমাদের আমাদের সকলের অন্তরে অন্তরে?

এসো, আজ আমরা প্রার্থনা করি তাঁকে ঘিরে, সমস্ত বিশ্ব যাঁর দীর্ঘ আয়ু ও সুন্দর পরমায়ুর প্রার্থনায় মুখর হয়ে উঠেছিল গত ২৫শে বৈশাখ।

এসো, আজ আমরা প্রার্থনা করি আর শ্রদ্ধা বিনম্র চিত্তে বলি: হে কবিগুরু, তোমার অশীতিতম জন্মতিথি উৎসবে তুমি সমস্ত বিশ্বের শ্রদ্ধা প্রণাম গ্রহণ করেছিলে—সে শ্রদ্ধা প্রণাম আত্মগোপন করেছিল সর্ব্বকালের সর্ব্ব দেশের ও সর্ব্ব জাতির কিশোর কুমার কুমারীদের স্পর্শহীন প্রণাম!

তোমায় প্রণাম করি!

হে যুগ-সূর্য্য, তুমি প্রতি জন্মতিথিতে নব নব রূপে জন্মগ্রহণ করেছ! তোমার প্রতিভার ও জ্ঞানের বাণী রবিরশ্মির আলোর বাণী বহন করে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

তুমি সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের ও সর্ব্বজাতীর! তাই তোমায় প্রণাম করি। তুমি ঋষি, সত্যদ্রষ্টা ও সাধক। বাংলা ও ভারতের কিশোর প্রণাম গ্রহণ করো।

মনের গহনে আপনার সাধনায় নিমগ্ন থেকেও তুমি নিখিল বিশ্বের বেদনা বিস্মৃত হওনি! তুমি তোমার প্রতিভা দীপ্ত জ্ঞানের আলোর অন্ধকার দ্বার উন্মোচন করে নবযুগের বাণী এনেছ আমাদের কাব্যে, সাহিত্যে, সমাজে ও রাষ্ট্রে। তাই এ পৃথিবী তোমায় প্রণাম পাঠায়। তুমি কবি কিন্তু কর্ম্মী; তোমার ভাবের ও কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেছ—শান্তিনিকেতন।

দুর্গত দুঃস্থ মানব সমাজ তোমায় পেয়ে ধন্য হয়েছে, তাই হে চির-কিশোর তুমি, আমাদের কিশোর প্রণাম গ্রহণ করো। প্রার্থনা করি তোমার শান্তির বাণী সন্দেহ সংঘাত সঙ্কুল পৃথিবীর আত্মাকে স্পর্শ করে ধন্য হোক—প্রার্থনা করি তুমি দীর্ঘকাল ধরে—আপন প্রতিভা দীপ্তিতে সারা পৃথিবীকে প্রদীপ্ত করো।

এই হোক আমাদের এ মাসের প্রার্থনা, হে কিশোর কবি—বাংলার কিশোর-কিশোরীদের সূর্য্যার্ঘ নাও।

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭]

(২)

আমার মৌ-ভাণ্ডারী ভাই-বোনেরা!

ভাদ্রের আয়ু ফুরিয়ে আসছে, শেষরাত্রি তার আগামী দিনের সূর্য্য আনবে নব দিনের নব মাসের বার্ত্তা! এই সন্দেহ ও সংঘাতের কঠিনতম মুহূর্ত্তে নতুন দিনের নতুন সূর্য্য নিয়ে আসুক নববার্ত্তা, আগামী দিনের পৃথিবী আবার নতুন করে জাগুক। এই শুভকামনা নিয়ে আজ এ মাসের মধুচক্রের উদ্বোধন হোক।......কাণে এসে বাজছে কোন দূরের বাড়ীতে পাঠে রত কোমল কণ্ঠের কাকলি:—

The bee, I dare say, has been long on the wing,
To get honey from every flower of the spring;
For the bee never idles but labours all day,
Thinks, wise little insect, work better than play.

তোমাদের মত ছোট বয়সে এমনি করে আমিও একদিন এ কবিতা পড়েছিলাম। আজকে আমার প্রার্থনা স্বরু হোক তোমাদের সকলকে ঘিরে। মৌমাছি তোমরা—মৌমাছির পাখার স্পন্দন কখনো থামে না, তারা পেছিয়ে পড়ে না—ক্লান্ত হয় না। পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে তাদের মধু আহরণ চলে।

আজকে প্রার্থনা করি, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, ধ্যান-ধারণায়, ত্যাগে তেজে সারা জীবন ধরে তোমাদের মধু আহরণ চলুক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা ছড়িয়ে পড়ো, মধু আহরণ করো, নিজের জন্য নয়, সকলের জন্য। নিরন্নকে অন্ন দাও। তৃষ্ণার্ত্তকে দাও বারি, অন্ধ-আতুর জনে দাও সেবা। যাদের মুখ নিরক্ষরতায়, অভাবে, অত্যাচারে কালো হয়ে উঠেছে তাদের সেই কালো মুখ আলো করে তোলো, তোমাদের সেবাযত্নে ও আন্তরিকতায়! তোমরা বাঁচো, অপরকে বাঁচাও।

To get honey from every flower—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র হতে মধু চয়ণ করে আনো এদেশের সর্ব্বহারাদের জন্য। এই হোক আমার আশীর্ব্বাণী তোমাদের প্রতি, এই হোক এ মাসের প্রার্থনা তোমাদের সকলকে ঘিরে।

[আশ্বিন, ১৩৪৭]

(৩)

"জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নি শিখা, লেহি লেহি বিরাট অম্বর
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃত-স্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার।"

তোমায় প্রণাম করি হে নূতন। তোমার স্পর্শে জীর্ণ পীত পত্রের মতো সমস্ত গ্লানি অপমান কদর্য্যতা দূর হয়ে যাক—

হে সুন্দর, তোমার সৌন্দর্য্যে আমাদের সমস্ত কদর্য্যতা সমস্ত অসৌন্দর্য্য, সমস্ত গ্লানি নিঃশেষে মুছে যাক্—আমাদের সুন্দর করো তুমি।

বিষাক্ত বায়ুতে পৃথিবীর দিক্‌মণ্ডল আজ পরিপূর্ণ; এই কদর্য্য ও বিষাক্ত বাতাসে মানুষের প্রাণ-বায়ুতে বিষাক্ত কালিমা। তোমার নিঃশ্বাস সুরভিতে পৃথিবীর বিষাক্ত বায়ু সুরভিত হোক। সমস্ত জগতে আজ হানাহানি ও স্বার্থের সংঘাত। সবলের অসহ অত্যাচারে দুর্ব্বলের কাতরোক্তি দিকে দিকে শোনা যায়—সমস্ত মানব সমাজ আজ ভীত, সন্ত্রস্ত ও বিহ্বল। সারা পৃথিবী জুড়ে দেখি এই ভয় বিহ্বল মানুষের বিশৃঙ্খল পাদবিক্ষেপ আশ্রয়ের আশায়, অন্নের আশায়, প্রাণরক্ষার আশায় সকলের মুখে কাকুতির ছায়া।

হে বৈশাখ, তুমি সুন্দর, তুমি সুস্থ, তুমি যৌবন— পৃথিবীর এই জীর্ণ কাতরতা থেকে তুমি দাও পৃথিবীকে মুক্তি। তোমার অরুণ-আলো আমাদের অন্তর থেকে গ্লানির সন্দেহের সংঘাতের কালো মেঘ বিদূরিত করুক— ভয় বিহ্বল জনতার চোখে দাও আনন্দ স্বপ্ন, আমাদের বাহুতে দাও সর্ব্বজয়ী বল, বুকে দাও আশা—কানে দাও বলদৃপ্ত-মন্ত্র।

হে সুন্দর আমাদের দাও সুন্দর প্রাণ
সুন্দর করো মানুষের মনকে
সুন্দর করো ক্লেদোক্ত পীড়িত পৃথিবীকে

নব সূর্য্যোদয় ঘটুক—নব বছরের প্রভাতে এই হোক আমাদের প্রার্থনা! [বৈশাখ, ১৩৪৯]

(৪)

আমার আদরের ভাইবোনেরা!

শীতের অকরুণ স্পর্শে একদিন আমরা বিশ্ব-প্রকৃতিকে রিক্ত ও বর্ণহীনা দেখেছিলাম, দেখেছিলাম, সর্ব্বাঙ্গে তার রিক্ততা আর সজ্জাহীন-আভরণ, দেখেছিলাম পথে প্রান্তরে, বৃক্ষে বৃক্ষে, লতায় পাতায় কোন অকরুণের কঠোর স্পর্শ— তাই তার অঙ্গখানি ঘিরে ছিল অভাব ও সব হারাণোর দীর্ঘ ছায়া।

—একদিন দেখেছিলাম প্রকৃতিকে রিক্তা, সর্ব্বস্বহারা ছায়াময়ী। কিন্তু আজ?—সে ছায়াময়ী আবার কায়াময়ী হয়ে উঠ্‌লো কোন সুন্দরের শুভস্পর্শে। পত্র-হীন পুষ্প-হীন প্রকৃতির মাঝে এলো প্রাণ স্পন্দন, এলো জাগরণের পালা, তাই জেগে দেখি রিক্তা মেয়েটির চোখে-মুখে সর্ব্বাঙ্গ ভরে এসেছে প্রাণ-প্রাচুর্য্য, তার মৃত্যু-ম্লান মুখে দেখি প্রাণের বিদ্যুৎ-বহ্নি। সে রিক্তা মেয়ে প্রাচুর্য্যের মাঝে, আনন্দ সম্ভারের মাঝে গেছে হারিয়ে। বসন্তের মাধুরিমার মাঝে প্রভাত সূর্য্যের অজস্র অরুণিমায় নিয়ে সে যেন নতুন হয়ে এলো সকলের কাছে।

একদিন যাকে কাঁদতে দেখেছিলাম আজ সে হাস্‌ছে। এই নাকি প্রকৃতির নিয়ম। এই সুন্দরের শুভস্পর্শ আমাদের জীবনে এসে ছোঁয়া দেয়, মন প্রাণ তাই আমাদের ভরে ওঠে প্রাকৃতিক ছন্দের সুরে তালে লয়ে।

এসো আজ আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধাভরে প্রার্থনা করি। বর্ত্তমান পৃথিবীর যে ধ্বংসমুখর রূপ দেখছি,—তা পৃথিবীর শেষ রূপ নয়, বর্ত্তমান পৃথিবীর যে স্বার্থ-সংঘাত দেখছি তা পৃথিবীর শেষ কাম্য নয়, বর্ত্তমান পৃথিবীর যে মৃত্যু কোলাহল শুনছি, তা পৃথিবীর শেষ সুর নয়, বর্ত্তমান পৃথিবীর যে বিক্ষোভ ও চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখছি তা পৃথিবীর প্রাণ-চঞ্চলতার রূপ নয়।

এসো আমরা পৃথিবীর এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি: এই ধ্বংসের মাঝখান থেকে, এই হানাহানি ও আঘাতের মাঝ থেকে মানুষ নতুন করে জাগুক যেমন নতুন করে জেগেছে বসন্তের প্রকৃতি। এই ধ্বংসের স্তূপ থেকে, এই সহর শ্মশান থেকে বেরিয়ে আসুক নতুন মানুষের দল মানুষের অধিকার সব মানুষকে বিলিয়ে দেবার জন্য, বেরিয়ে আসুক নতুন পৃথিবী—যেমন ক'রে শীতের রিক্ততায় ও সব হারানোর ভেতর থেকে আত্ম-প্রকাশ করলো বসন্ত-সৌন্দর্য্য। বনে বনে ফুল ফুটেছে, নব কিশলয় দেখা দিয়েছে পথে প্রান্তরে, নব পল্লবে রিক্ত শাখা উঠেছে ভরে।

এসো প্রার্থনা করি: মানুষের বর্ত্তমান রিক্ততা শূন্যতা দূরে যাক্, হাহাকার ঘুচুক, হাসি ফুটুক প্রতিটি মানুষের মুখে। সব হারানো মানুষ—সব ফিরে পাক।

—এই হোক আমাদের এ মাসের প্রার্থনা।

[ফাল্গুন, ১৩৪৮]

(৫)

এ মাসেও প্রতি মাসের প্রার্থনা নিয়ে তোমাদের কাছে এলাম। আশা করি তোমরা সকলে সমবেতভাবে এ প্রার্থনায় যোগ দেবে। প্রার্থনার সঙ্গে সংযুক্ত হবে শুধু তোমাদের সমবেত কণ্ঠস্বর নয়, এই প্রার্থনার সঙ্গে মিশিয়ে থাকবে তোমাদের কিশোর আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা।

এসো, আজ প্রার্থনা করি এদেশের কিশোর-কিশোরী-দের জন্যে। এদেশের কিশোর-কিশোরী তোমরা, তোমাদের জীবনে নানা বাধা, বিপত্তি, ভয়। তোমাদের

সামনে বিস্তৃত পথের দু'ধারে নানা প্রলোভন, সন্দেহ কণ্টকিত কিশোরজীবন। বর্ত্তমান জীবনে কি তোমাদের কর্ত্তব্য, কাজ, কোন পথ তোমাদের গন্তব্য পথ? এদেশের কিশোর-কিশোরী তোমরা বন্দী, কেউ সংসারের সহস্র রকম বিলাসে, আহত তোমরা কেউ দারিদ্র্যের কষাঘাতে, স্নেহের অত্যাচার তোমাদের সর্ব্বাঙ্গে। বড়দের ভাবনা, বুড়োদের ভাবনা, কিশোর মনে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তোমাদের কিশোর মন জরাগ্রস্থ হয়ে উঠছে—প্রার্থনা করো এই বন্দীত্ব থেকে, এই স্নেহের অত্যাচার থেকে, তোমরা মুক্তি পাও। নিজেদের ভাবনা নিজেরা ভাবতে শেখো। সংসারের মধ্যে তোমরা নানা বিলাসে, আরামে, স্নেহের, দারিদ্রের নাগপাশে বাঁধা। তোমরা জানিয়ে দাও, আমরা কোন দল বিশেষের নই, আমরা এদেশের, এ জাতির। আমরা নিজেরাই সব রকম বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করব। এই হোক আমাদের এ মাসের প্রার্থনা।

[আষাঢ়, ১৩৫০]

(৬)

মৌমাছি ভাই বোনেরা, অনেকদিন পরে আবার শুন্‌তে পেলুম তোমাদের মধুগুঞ্জন ধ্বনি। নতুন করে আমরা আজকে আবার এক হলুম। আমাদের ওপর দিয়ে, এদেশের ওপর দিয়ে, যে ঝড় বহে চলেছে তার তো শেষ হয় নি—এমন দিনে কি হবে আমাদের প্রার্থনা?

এসো আজকে আমরা প্রার্থনা করি—আমাদের মৌমাছি ভাই বোনদের জন্যে। যে সব ভাইবোন মধুচক্র ছেড়ে গেছে, বা যে সব ভাইবোনি মধুচক্র প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে প্রথম আমার কাছে এসেছিল এবং আজকে হাজারো মৌমাছির মধুগুঞ্জনের মাঝে যাদের গুঞ্জন আমি শুন্‌তে পাই না—এ মাসের প্রার্থনায় আমরা স্মরণ করবো সেই সব ভাই বোনেদের। এসো সমবেত কণ্ঠে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করো, বলো: আমাদের এই সমস্ত ভাইবোনেরা—যারা গিয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে, যারা রত আছে আতুরের সেবায়, যারা আছে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে, যারা আছে মহৎ আদর্শে ব্রতী হ'য়ে এবং যারা চলে গিয়েছে মহা-জীবনের মধুচক্রে, তাদের সবাইকে আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি—প্রার্থনা করি তাদের মঙ্গল হোক। তারা সুখী হোক, সুন্দর হোক। তাদের কথা, কাজ, তাদের ধ্যান-ধারণা, তাদের আত্মা বাংলার এই মধুচক্রকে যেন আরো বলিষ্ঠ এবং সত্যিকারের আসরে পরিণত করতে পারে। এই হোক আমাদের এ মাসের প্রার্থনা।

[অগ্রহায়ণ, ১৩৫০]

শেষ

